ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

দুঃশাসনের দুই বছর

২০০৭-২০০৮

দুঃশাসনের দুই বছর

২০০৭ – ২০০৮

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

ইছামতি প্রকাশনী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোঃ রশিদুর রহমান
ইছামতি প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১৫৫২৪৩৩৫১৫
E-mail : isamoti@dhaka.net
website : www.isamoti.com

প্রকাশকাল
ফাল্গুন, ১৪১৭

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সুখেন দাস

বর্ণবিন্যাস
মায়ের দোয়া কম্পিউটার

মুদ্রণ
ইছামতি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য
৪০০.০০ টাকা মাত্র

'Dushshasoner Dui Bachor' by Dr. Rezwan Siddiqui Published by Md. Rashidur Rahman of Isamoti Prokashoni, 38 Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100, First Edition : February Two Thousand Eleven, Price : Tk. 400.00 Only US. $ 20.00

ISBN : 984-70305-0105-0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এই দুঃসহ সময়ের সহযাত্রী
ফরহাদ মজহার,
মাহমুদুর রহমান-কে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি এদেশে এক আজগুবি স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইনউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে সে সরকার রাষ্ট্রকে নিয়ে গিয়েছিল ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় যখন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছিল, তখনই দেশ থেকে গণতন্ত্র নস্যাৎ করে স্বৈরশাসন প্রবর্তনের সে উদ্যোগ নিয়েছিল ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় সে অপশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন নীতির পদাঙ্ক অনুসারী জাতিসংঘ পর্যন্ত। এদেশ থেকে গণতন্ত্র, এমনকি রাজনীতিকে নির্বাসিত করার জন্য জেনারেল মইন বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার কুশীলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দিন আহমদ।

এই পদলেহী সেবাদাসেরা বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান একে একে ধ্বংস করে দেয়। এই ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই কার্যত বিপন্ন করে তোলে। একই সঙ্গে তারা বস্তি উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদ, হাট-বাজার উচ্ছেদ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ প্রভৃতির নামে কোটি কোটি মানুষের জীবিকার সংস্থান ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ যে দেশের জনগণ অপার সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল দেশকে, সেই দেশের জনগণের পেটে লাথি মেরে দেশকে ভিখারীর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন জেনারেল মইনউদ্দিন। সেই সঙ্গে দেশের সকল শিল্পপতি-ব্যবসায়ীকে কাল্পনিক দুর্নীতির অভিযোগে আটক করে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগে চরম বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে দেশের ঐ শত্রুরা। মানুষের প্রাত্যহিক আয়-উপার্যন বন্ধ, ব্যবসা বাণিজ্য-আমদানি-রফতানি বন্ধ, বিনিয়োগের চরম স্থবিরতা, এক লক্ষ টাকাও ব্যাংক ব্যালেন্স আছে কিনা তা নিয়ে দুর্নীতি অনুসন্ধানের নামে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনে ঐ অসাংবিধানিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের পদলেহী মইন-ফখরেরা। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা এক সম্ভবনাময় রাষ্ট্রকে পেছনে অনন্ত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের পর সবচাইতে দুঃসময়ের মোকাবেলা করে।

পৃথিবীর অর্থনীতি বিষয়ক অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান সাশ যখন ঘোষণা করল যে ২০১৬ সালের মধ্যে যে এগারোটি দেশ পৃথিবীতে 'নিউ ইকোনোমিক জায়ান্ট' হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে, বাংলাদেশ তার অন্যতম। তখনই আরও দুই একজনের মতো আমিও প্রমাদ গুণেছিলাম। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে, বাংলাদেশের সাবধান হবার কাল শুরু হল। বাংলাদেশ যাতে কিছুতেই অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে উঠতে না পারে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সেই চক্রান্ত করবে। ২০০৭ সালের এক-এগারোতে প্রমাণ হল যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার একেবারে কোমর বেঁধে সে চক্রান্ত করেছে। এর ফলে অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ এখন বহুলাংশে নিঃস্ব। এর সার্বভৌমত্ব প্রশ্নবিদ্ধ। জনগণ অনিরাপদ। এর অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংসপ্রাপ্ত। লুঠ, দুর্নীতি এখন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত। অবৈধ পথে অর্জিত টাকা শেয়ার বাজার ঘুরিয়ে আনলে হালাল। এমন এক আজব দেশের পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁবেদার দল এক-এগারোর পর দেশে এমন এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে, থমকে গিয়েছিল সবাই। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে যারা নীতি-বিশ্লেষণ করেন, তারাও থমকে গিয়েছিলেন। রাজনীতি বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। গণতন্ত্র ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। সম্পন্ন মানুষের রাষ্ট্র ভিক্ষুকের রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছিল। তখন কোন না কোন সত্য-সাধককে তো বুক খুলে দাঁড়াতেই হয়। আমিই সে অধম। সকল রক্তচক্ষু, প্রাণভয়, জেলজুলুমের ভয় সব কিছু উপেক্ষা করে প্রথম দিন থেকেই, কিংবা বলা যায়, ষড়যন্ত্রের শুরু থেকেই এই আয়োজনের বিরোধিতা করেছি। ঐ অসাংবিধানিক সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে রুখে দাড়িয়েছি। কলম ছাড়া আমার আর কোন হাতিয়ার নেই। আমি সেই কলমেই এই স্বৈরাচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রথম দিন থেকে লড়াই চালিয়ে গেছি। লড়াই আমার জীবনের ধর্ম। আমার পূর্ব পুরুষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের ধারাবহিকতায় আমি এক সামান্য সৈনিক। অসুর সংহারের সঙ্কল্পেই কলম ধরেছিলাম। মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত। তিনি রাষ্ট্রঘাতী বিশ্বাসঘাতক মইন শাসনকালে আমাকে আমার কলমের মাধ্যমে জনগণকে সত্য উপলব্ধি করাতে সহায়ক করেছিলেন। আমি লিখে গেছি।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র এখনও চলমান। আল্লাহ যেন প্রতি পদে জনগণকে সত্য উপলব্ধি করাতে আমাকে সহায়তা করেন, সে প্রার্থনাই করি। রাষ্ট্রঘাতী শাসকদের দুই বছরের শাসনকালে আমি ধারাবাহিকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। আমি অবিরাম ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিভাবে তারা রাষ্ট্রকে সংহার করছে এবং মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে শোকর করি, তিনি আমাকে সেই শক্তি ও সাহস দিয়েছেন। আর নয়া দিগন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, তারা আমার প্রতিটি লেখা অবিকল ছেপেছেন। সেজন্য তারা বিপদাপন্নও হয়েছেন। কিন্তু আমার লেখা কাটছাঁট না করার সাহসও দেখিয়েছে। এই গ্রন্থ ঐ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ধারাবহিক উন্মোচন। প্রতি সপ্তাহে আমি আমার বিবেক, আমার দেশপ্রেম, আমার শিক্ষা, আমার আদর্শকে ভিত্তি করে ঐ রাষ্ট্রঘাতীদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে লিখে গেছি। এটি কোন গবেষণা গ্রন্থ নয়। তবে বাংলাদেশের ভয়াবহ দুঃসময়ের স্থিরচিত্র—এইটুকু দাবি করতে চাই।

আর আমি বরাবরই নিজের বই প্রকাশের ব্যাপারে অসচেতন। অর্ধ শতাধিক বই আমার প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোন প্রকাশকের দারস্থ হইনি। এবারও ইছামতি প্রকাশনীর মোঃ রশিদুর রহমান এসে একটি পাণ্ডুলিপি দাবি করায় দুঃশাসনের দুই বছর ২০০৭-২০০৮ প্রকাশিত হল। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

এই বই পড়ে পাঠক যদি রাষ্ট্রঘাতী মইন-ফখর সরকারের রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত উপলব্ধিতে রাখতে পারেন, তাহলেই এই শ্রম সার্থক মনে করব।

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী
কলাবাগান, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আমার গদির হরিণ চাই ১১
জলিল সাহেবদের পাড়িও জমিল ভালোই ১৭
এক হাতে পূর্ণ হলো সুধা, আর হাতে চূর্ণ হলো পাত্র ২২
একটি অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক দলের খসড়া ২৭
পিএসসি কেনো সফল হলো, জবাব চাই ৩২
প্রভাবশালী ফোন সচল হয়েছে? ৩৭
আ. লী. মহারাজ সাধু হলো আজ, বিএনপি চোর বটে ৪১
....সবে দাও পাজিদের জাত মেরে ৪৬
চাই একই যাত্রায় অভিন্ন ফল ৫১
নিজের রচা ওই কারাগারে আ'লীগ মরিছে ভুগে ৫৫
এজেন্ডা কমিয়ে আনাই ভালো ৬১
শেখ হাসিনা পারবেন, আর কেউ পারবে না? ৬৫
আতঙ্কের মধ্যে উৎপাদন হয় না ৬৯
রাজনীতির টোকাইয়েরা লাফঝাঁপ দিচ্ছে ৭৩
সংস্কার কাকে বলে? ৭৮
হায় ব্রুটাস, অবশেষে তুমিও! ৮৩
এসব সিদ্ধান্ত নতুন দুর্নীতির জন্ম দিতে পারে ৮৭
আমাদের মূল্যবোধ যেন আহত না হয় ৯২
শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হয় জনগণের ওপর ৯৭
যুক্তরাষ্ট্র-বিশ্বব্যাংক-ভারত কেন ফুলায় ১০২
সরকার যেন জনগণের প্রতিপক্ষ না হয় ১০৭
তিনি একথা বলার কে? ১১২
খালেদা জিয়ার বিপর্যয়ে সুশীলরা কাঁদছে ১১৬
খাস দিলে ফিরছি তো? ১২১
ঋণ নেবে না, সুদ দেবে না, তা হবে না ১২৭
তাহলে ড. মোজাফফর বাদ যাবেন কেন? ১৩১
এবার কাউকে অবিলম্বে আটক করতে বলবেন না? ১৩৭
পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন ১৪২
নেমে যাচ্ছি পিছিয়ে পড়াদের দলে ১৪৬
২৮ অক্টোবর : বর্বরতার একটি দিন ১৫১
সাইফুর রহমান আর ফ্লাইং ডাচম্যানের গল্প ১৫৭
নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে নির্বাচন কমিশন ১৬২
লড়াই হোক এগিয়ে যাওয়ার, পিছিয়ে পড়ার নয় ১৬৬
রাজনীতিশূন্যতা বিপদ বাড়িয়েছে ১৭১
নির্বাচন কমিশনকে এ দায়িত্ব কে দিলো ১৭৫
আওয়ামী পদাঙ্কে নির্দলীয় সরকার ১৮০

www.pathagar.com

জাগ্রত হোক জাতির বিবেক ১৮৫
আওয়ামী লীগের সরল সমীকরণ ১৮৯
'সত্যিকার গণতন্ত্র' অজানা গন্তব্যে ১৯৪
আমরা যখন বাদ্যি বাজাই ১৯৮
দক্ষ জনপ্রশাসনের স্বার্থে ২০২
রাজনীতিবিদদের কি শিক্ষা হয়নি? ২০৬
ভারত পিরিতি বালির বাঁধ ২১১
এসব কী করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২১৬
আমাদের নন্দলালেরা, মধ্যবিত্তকে চালের লাইনে দাঁড় করিয়ে জাতীয় দাবি খুঁজছেন? ২২০
তবু সংশয় যে দূর হয় না ২২৪
সংস্কারবাদীদের জন্য সুখবর নেই ২২৯
অনিশ্চিত বন্ধুর পথে যাত্রা ২৩৪
কেড়ে নিলেন ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের গ্রাস? ২৩৮
হ্যালো সিইসি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন কি? ২৪২
অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি ২৪৬
ছহি ক্ষুদ্র মান্নাননামা ২৫১
দেশ ছেড়ে চলেই গেলেন শেখ হাসিনা ২৫৬
ছুঁচোর কেত্তন ২৬০
দুর্নীতি কি সত্যি কোনো ইস্যু ছিল? ২৬৫
পানিতে নামলে চুল ভিজবেই ২৭০
হ্যালো সিইসি বুঝতে পারছেন কি? ২৭৪
বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে ভারতের উপহার! ২৭৯
বাংলাদেশকে আরো দুর্বল কে করল? ২৮৪
বিদেশী শ্রমবাজার নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে ২৯০
কত ঘণ্টা দিন মাসে দ্রুততম সময় হয়? ২৯৫
নিষ্ঠুর অমানবিক ও নির্লজ্জ ৩০০
নির্বাচন বানচাল করতে চায় বিএনপি? ৩০৫
সিইসি সাহেব, কার হাসি কে হাসে ৩১০
আশরাফুল ইসলাম কি বুঝে বলেছেন? ৩১৬
হঠাও রেনেটা লক, বাঁচাও বাংলাদেশ ৩২০
'চার দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস' ৩২৫
সিইসি সাহেবের ময়লা যাচ্ছে না ৩৩০
গোপনে যে কত খাত ধ্বংস হয়ে গেছে! ৩৩৫
দুদক, থামলে ভালো লাগে ৩৩৯
ছল-ছুতার তো অভাব হয় না ৩৪৪
মিডিয়ায় নির্বাচনী অপপ্রচার ৩৪৯

www.pathagar.com

আমার গদির হরিণ চাই

গত ৩ জানুয়ারি ঢাকার এক দামি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে তারা অংশ নেবেন না। তাদের এ ঘোষণার আগে সর্বশেষ দাবি ছিল, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। ভোটার তালিকা ছেপে প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনার স. ম. জাকারিয়াকে ছুটিতে যেতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিতে হবে।

এসব দাবির যৌক্তিকতা থাক বা না থাক, এগুলোকে গুরুত্ব সহকারেই বিবেচনা করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তাই ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার চেষ্টা করেছে নির্বাচন কমিশন। হালনাগাদ করতে গিয়ে যারা নতুন ভোটার হলেন, তাদের নামও ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে কমিশন। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সচিব আবদুর রশীদ সরকার জানান, যেহেতু ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই এটা হাতে লিখেই সংরক্ষণ করার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু একটি জোটের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ওই তালিকা ছাপার বন্দোবস্ত করা হয়। নির্বাচন কমিশনার স. ম. জাকারিয়াকে কেন ছুটিতে যেতে হবে, তা কখনও স্পষ্ট ছিল না। একটাই অভিযোগ, তিনি দলীয় লোক এবং চারদলীয় জোটের লোক। কিন্তু তারও কোনো প্রমাণ কেউ কোনোদিন তুলে ধরেননি। স. ম. জাকারিয়া দীর্ঘকাল ধরে নির্বাচন কমিশনে কাজ করেছেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের সচিব ছিলেন। তার কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্যই সম্ভবত তাকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। এ রকম একজন দক্ষ লোককে কেন বিদায় করতে হবে? তা সত্ত্বেও তাকে ছুটিতে যেতে হলো। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করল। আসন ভাগাভাগি করল। মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীরা কর্মী-সমর্থক নিয়ে সুধা সদনের সামনে শুয়ে পড়ে অনশন করলেন। ঢাকার প্রার্থী ডা. ইকবাল মধ্যরাতে শত শত সমর্থক নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের বাড়ি ঘেরাও করলেন। যাদের মনোনয়ন নিশ্চিত, তারা এলাকায় গিয়ে জনসংযোগ শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ করেই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন শেখ হাসিনা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেন। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার কাছে আমাদের কিছু প্রশ্ন থাকল।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের দাবি বাস্তবায়নের জন্য বেশি বাড়াবাড়ি করেছিলেন কয়েকজন উপদষ্টো। যেটা তাদের দায়িত্বের অংশ ছিল না। তবু তারা প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ ও নির্বাচন কমিশনার স. ম. জাকারিয়াকে ছুটিতে পাঠানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কারো কারো ভাবটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, কি জানি হনুরে আমি। সন্দেহ নেই, যিনি উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন, তিনি দায়িত্ববান ও সম্মানিত লোক। কিন্তু এই সমাজে শুধু উপদেষ্টারাই সম্মানিত ব্যক্তি আর কেউ সম্মানিত নন? সম্মানিত নন একজন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি? সম্মানিত নন দীর্ঘ কর্মঅভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একজন নির্বাচন কমিশনার? সম্মানিত ব্যক্তি কি ছিলেন না দেশের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি? এসব উপদেষ্টা সেদিকে খেয়াল না করে আওয়ামী লীগের দাবি বাস্তবায়নের জন্য যে লাফালাফি করেছিলেন। তাতে এসব উপদেষ্টার সম্মানই জনসমক্ষে ক্ষুণ্ন হয়েছে। ভাগ্য ভালো, এই উপদেষ্টারা পরিষদ থেকে চলে গেছেন।

আওয়ামী লীগের এত সব অন্যায় আবদার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমরা এতজন সম্মানিত লোককে অসম্মানিত করলাম। আওয়ামী নেতাকর্মীরা রাজপথে নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করল। এত রক্ত ঝরল। অর্থনীতির কী বিশাল ক্ষতি হল। কিন্তু এতে লাভ হলো কার? ফল হল কি? কিছুই না। শেষ পর্যন্ত এতকিছু সত্ত্বেও নির্বাচন বর্জন করল আওয়ামী লীগ। জটিল করে তুলল দেশের পরিস্থিতি।

আগেও আওয়ামী লীগ বা ডান-বাম-উত্তর-দক্ষিণের মহাজোটের দাবি ছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিতে হবে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে। রাষ্ট্রপতি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদের (৬) নম্বর উপধারা অনুযায়ী। এই অনুচ্ছেদের প্রথম চারটি উপধারা অনুযায়ী কাউকে পাওয়া যায়নি। ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী পাওয়া গিয়েছিল সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে। তাকে সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য করেছে আওয়ামী লীগ। এখন তাদের দাবি (৫) নম্বর উপধারা অনুযায়ী কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে। (৫) নম্বর উপধারায় আছে, 'যদি আপিল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশের যেসব নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।'

তার অর্থ যেকোনো উপযুক্ত নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা যাবে। কে হবেন তাহলে সেই দেবতুল্য নাগরিক? যাকে মেনে নেবে সব রাজনৈতিক দল? যারা বিচারপতিদের মানেন না। প্রধান বিচারপতির এজলাস ভাংচুর করে আগুন দেন। যারা অ্যাটর্নি জেনারেলকে মানেন না। তার পদত্যাগ বা বরখাস্তের দাবি করেন। যারা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে মানেন না। নির্বাচন কমিশনারদের মানেন না। কোনো সরকারি

www.pathagar.com

কর্মচারীকে মানেন না। তারা কাকে মানবেন? হয়তো তারাই একজন লোক দেবেন, তাদের খুব পছন্দের। অন্য সবাইকে মেনে নিতে হবে তাদের সেই মনোনীত লোককে। এই কি তাহলে সমাধান?

আর এই আন্দোলন প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলীয় জোট বা মহাজোট কেউই একথা মনেই রাখতে চাইল না যে, সদ্য বিলুপ্ত জাতীয় সংসদে মাত্র এক-ষষ্ঠমাংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে আওয়ামী লীগ। বাকি ছয়-পঞ্চমাংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। তাদের কথার মূল্য দেয়া উচিত ছিল আওয়ামী লীগের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। সেটা ভুলেই গিয়েছিল আওয়ামী লীগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু উপদেষ্টা। আওয়ামী লীগের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য দিতে হবে। অন্যদের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছাই থাকতে পারবে না।

আসলে নিজেদের মতামত ছাড়া অন্য কোনো মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আওয়ামী লীগে কখনওই গড়ে ওঠেনি। পরমতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও পরমত দলনই আওয়ামী লীগ রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেটা স্বাধীন বাংলাদেশেও বারবার ঘটেছে। তার প্রমাণ আছে ১৯৭২-৭৫ সালের আওয়ামী দুঃশাসনে যেমন, তেমনি শেখ হাসিনার বর্তমান রাজনীতিতেও। ওই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালে তিনি অবিরাম সংবাদপত্র দলন করেছেন। তার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বাহিনী বারবার বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়েছে। বিরোধী রাজনীতিবিদদের জেলে পুরেছেন, সাংবাদিকদের জেলে পুরেছেন। শেষ পর্যন্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণে মাত্র চারটি সংবাদপত্র রেখে বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছেন। তেমনিভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের দমন-পীড়ন করেও যখন তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায়নি, তখন নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন সব রাজনৈতিক দল। চালু করেছেন একদলীয় স্বৈরশাসন। গঠন করেছেন একটিমাত্র রাজনৈতিক দল– কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল। এর বাইরে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দিয়ে কেড়ে নিয়েছেন সব গণতান্ত্রিক অধিকার। প্রশাসনকে করেছিলেন পদানত। বিচার বিভাগকে করেছিলেন অনুগত।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাও তেমন মনোভাবই পোষণ করেন বলে প্রমাণ হয়ে গেল। তাদের মহাজোটের বাইরেও কোনো রাজনৈতিক দল আছে, সে কথা ভুলেই গেছেন তিনি। সেসব দলেরও কোনো কথা থাকতে পারে, তার কোনো তোয়াক্কাই করছেন না তিনি। তিনি যা বলবেন সেটাই মেনে নিতে হবে দেশের সকল মানুষকে, প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে। তার দল বিচারপতিদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করেছে। হামলা চালিয়েছে শীর্ষ বিচারালয়ে। এই খামখেয়ালিপনার নাম গণতন্ত্র নয়। শুধু তাই নয়, যে সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল তার পছন্দ নয়, সেগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন তার অনুষ্ঠান বা সভায়। কী অভূতপূর্ব গণতন্ত্রের চর্চা!

গত ৩ জানুয়ারি মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গিয়েও নির্বাচন না করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার পেছনে অনেক কারণের কথা তিনি বলেছেন। তিনি

www.pathagar.com

বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা ও ১০ উপদেষ্টা মিলে একটি প্যাকেজ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যখনই আমরা এটা মেনে নিলাম, তখনই অদৃশ্য নির্দেশে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ উপদেষ্টাদের সর্বসম্মত প্যাকেজ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কিভাবে তিনি বিরোধিতা করলেন, বোঝা গেল না। কারণ স. ম. জাকারিয়া তো ছুটিতে গেলেন। প্যাকেজ প্রস্তাবের মধ্যে বাস্তবায়ন হওয়া বাকি ছিল রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দেয়া। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তারপরও উপদেষ্টা ধীরাজ কুমার নাথ বলেছেন, প্যাকেজ প্রস্তাবের সামান্য কিছু বাদে সবটুকুই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে সেটুকু তারা মেনে নেবেন। মনে হলো, তিনি খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তে।

শেখ হাসিনা বলেছেন, এখন পর্যন্ত একটি সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। নির্বাচন কমিশন তিন ধরনের ভোটার তালিকা সরবরাহ করছে। এতে নাম, পিতার নাম, ভোটার ক্রমিক নম্বর কোনোটারই মিল নেই। অনেক ক্ষেত্রে একই হোল্ডিং নম্বর ও ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে ভোটারের নাম, বয়স ও পেশা সব তথ্যই ভিন্ন। ২০০০ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে, এমন ভোটারদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। তালিকায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে অনেক ভোটারের নাম কেটে দিয়ে ব্যাপক হারে ভুয়া ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এসব অভিযোগ সম্পর্কে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সচিব আবদুর রশীদ সরকার বলেছেন, এ অভিযোগ সত্য নয়। আদালতের নির্দেশের কারণে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা যায়নি। ২০০০ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামালে যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা হয়েছিল, সেটাই ভোটার তালিকার ভিত্তি। তার সঙ্গে সংযোজন-বিয়োজন করা হচ্ছে মাত্র। সেই সংযোজন-বিয়োজনের তালিকা ভিন্ন। ফলে তালিকা একাধিক হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। একই হোল্ডিং নম্বরে ভিন্ন নাম থাকা অস্বাভাবিক হবে কেন? ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার প্রাথমিক পর্যায়ে ওই হোল্ডিং নম্বরে যিনি ভাড়া থাকতেন, তিনি বাসা বদল করে থাকতে পারেন। সম্প্রতি হালনাগাদের সময় নতুন ভাড়াটের নাম উঠেছে। সেটাই স্বাভাবিক। এতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে কেন? ২০০০ সালের মূল তালিকায় যাদের নাম আছে, তাদের নাম থাকবেই? শেখ হাসিনার হিসাব মতে তাহলে ২০০০ সালের ভোটার তালিকা প্রণয়নের পর এ পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি বাংলাদেশে। মৃত ব্যক্তির নামও ভোটার তালিকায় থাকতেই হবে? আর ভুয়া ভোটারের নামে ভোট দেবে কে? তারা কি ভারত থেকে আসবে না কি আসমান ফুঁড়ে নামবে? আমি আমার নিজের ভোট দেব, নাকি জেল জরিমানার ঝুঁকি নিয়ে ভুল লোককে বাপ ডেকে ভুয়া নামের ভোট দেব?

শেখ হাসিনা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, নির্বাচনের দিন প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের সেই ভোটার তালিকা দেয়া হবে যা থেকে ইতোমধ্যেই মহাজোটের নেতাকর্মী, সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। আমার ভয় লাগে যে,

www.pathagar.com

শেওড়া গাছে ভূত আছে। ওখান দিয়ে গেলে ভূতে আক্রমণ করতে পারে। তাই আমি আর এ পথে যাব না। বসে থাকব। পরিস্থিতি এরকম। মনে হওয়া বা শঙ্কা হওয়া এক জিনিস, আর ঘটনাটা ঘটা আরেক জিনিস। তাই এ বক্তব্য নিতান্তই ছেলেমি ও হাস্যকর। কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই, কেবল 'মনে হয়' এরকম ঘটনা ঘটবে, অতএব নির্বাচনে যাব না।

বিএনপির দুর্নীতির বিরুদ্ধেও এতদিন অনেক কথা বলেছেন মহাজোট নেতারা। শেখ হাসিনা তো একেবারে পাই টু পাই উল্লেখ করে বলেছেন, বিএনপির নেতারা কত লাখ কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে। শুধু শেখ হাসিনা কেন, বি. চৌধুরী ও কর্নেল অলিরাও এসব কথা বলেছেন জোর গলায়। বিএনপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এখন পর্যন্ত অভিযোগমাত্র। প্রমাণিত নয়। কিন্তু দুর্নীতির দায়ে জেলখাটা মহাজোট নেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দুর্নীতি তো প্রমাণিত। তাকে নিয়ে যে মহাজোট তাদের কি এখন আর দুর্নীতির অভিযোগ মানায়? যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাম নেতা টেলিভিশনে পর্দা কাঁপিয়ে এরশাদকে মহাদুর্নীতিবাজ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে কিছুতেই কোনো জোট হবে না বলে হুঙ্কার দিয়েছিলেন তারা এরশাদকে কাছে পেয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। সে দৃশ্যও ছিল দেখার মতো। আসলে এসব দুর্নীতি-ফুর্নীতির অভিযোগ যে কত নীতিহীন, সে কথা আবারও প্রমাণিত হলো।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনে যাওয়ার আর একটি শর্ত নতুন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে হবে। তাদের সব দাবি মেনে নিয়ে নির্বাচন পিছিয়ে দিলেই তারা যে নির্বাচনে যাবেন, তার গ্যারান্টি কোথায়? তার ওপরও দাবি হচ্ছে, নির্বাচন পর্যন্ত র‌্যাবের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে। আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ী নির্বাচনী তফসিল পাঁচবার পরিবর্তন করা হয়েছে। কই তারা তো নির্বাচনে এলেন না। আবার র‌্যাবের কার্যক্রম কেন বন্ধ রাখতে হবে? একথা সবাই স্বীকার করেন যে, র‌্যাবের তৎপরতার ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বহু উন্নতি ঘটেছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেছে দেশ থেকে। ছিঁচকে সন্ত্রাসীরাও সন্ত্রস্ত। তাহলে র‌্যাবের কার্যক্রম কেন বন্ধ রাখতে হবে? আওয়ামী লীগ দেখেছে, গুটিকয়েক সন্ত্রাসী দিয়ে হামলা চালিয়ে কয়েক হাজার নিরীহ মানুষ তাড়িয়ে দেয়া যায়। সাধারণ ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়ে ভোট কেন্দ্র দখল করে নিজেদের অনুকূলে সিল দিয়ে দিতে পারলেই পার হওয়া যাবে নির্বাচনী বৈতরণী। অতএব আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করার জন্যই দরকার র‌্যাব তৎপরতা বন্ধ করা।

আওয়ামী লীগের দাবির শেষ নেই। প্রাথমিকভাবে তারা হয়তো মনে করেছিল, এরশাদ, ইসলামী ঐক্যজোট ও খেলাফত মজলিস মিলে গেলে নির্বাচনে বিজয় সম্ভব। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে হয়তো তারা বুঝে গেছেন যে, এরশাদের জাতীয় পার্টি ও খেলাফত মজলিসকে সঙ্গে নিয়ে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়েছে। মহাঐক্য করার জন্য যে ১০০ আসন ছেড়ে দিতে হয়েছে প্রায় অস্তিত্বহীন দলগুলোকে, তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছে আওয়ামী লীগের শতাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী। তারা ধানমন্ডিতে শেখ হাসিনার

www.pathagar.com

বাসভবনের সামনে ধরণা দিয়েছে, বিক্ষোভ করেছে, অবস্থান ধর্মঘট করেছে, আমরণ অনশন করেছে- মনোনয়ন চাই। তাই দলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও তার নির্বাচনে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি যদি নিশ্চিত হতে পারতেন, নির্বাচনে জিতে ক্ষমতার গদিতে বসতে পারবেন, তাহলে হয়তো ঝুঁকিটা নিতে পারতেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও মহাজোট জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় আশায় যে গুড়ে বালি পড়েছে। ফলে তখনই নির্বাচনে যাব, যখন জানব, ক্ষমতার গদিতে বসা আমার নিশ্চিত।

কিন্তু ক্ষমতাই গণতান্ত্রিক রাজনীতির শেষ কথা নয়। জনসেবা ও জনকল্যাণই শেষ কথা হওয়া উচিত। সেটা সরকার গঠন করলেও যেমন সম্ভব, দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে সমানভাবে তা সম্ভব। আমাদের রাজনীতিকদের সে সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

আমরা সবাই তো চেয়েছি, নির্বাচনে অংশ নিক সব দল। উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হোক নির্বাচন নিয়ে। সেটা শুরুও হয়েছিল। কিন্তু সে পরিবেশ নস্যাৎ করে দিয়েছেন শেখ হাসিনা। আমরা চাই যেকোনো মূল্যে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ২২ জানুয়ারির নির্বাচনকে সফল করে তুলতে হবে। সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে হবে। কারো অন্যায় আবদারের কাছে নতি স্বীকার করা কিছুতেই সঙ্গত হবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন বলেই আমাদের আশা।

আওয়ামী লীগের নির্বাচন বর্জন ও নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তাদের এই সিদ্ধান্ত দৃশ্যত আগের অঙ্গীকারের পরিপন্থী। যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটায় এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে এবং সংঘাত পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ব্রিটিশ হাইকমিশনের একজন মুখপাত্র বলেছেন, আওয়ামী নেত্রীর এ সিদ্ধান্তে তারা হতাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এক গানে লিখেছেন, ‘তোরা যে যা বলিস ভাই/আমার সোনার হরিণ চাই।’ শেখ হাসিনা যেন বলতে চাইলেন, তোরা যে যাই বলিস ভাই/ আমার গদির হরিণ চাই। এ হরিণ তাকে কে ধরে দেবে!

১০.০১.২০০৭

www.pathagar.com

জলিল সাহেবদের পাড়িও জমিল ভালোই

সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। দেশ শান্ত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। আগের সব উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছেন। আওয়ামী লীগের শাসনকালে নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ড. ফখরুদ্দীন আহমেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সংবিধানের ৫৮ঘ(৫) ধারা মোতাবেক। তবে ওই ধারানুযায়ী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন জামায়াত নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এরপর আরও ১০জন উপদেষ্টা নিয়োগ পেয়েছেন। ২২ জানুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে কথা ছিল তা স্থগিত হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ তার দেশঘাতী, অর্থনীতিঘাতী, জনস্বার্থঘাতী অবরোধ কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিয়েছে। রাজপথে আওয়ামী লীগ সমর্থক 'সঙ্গীতশিল্পীরা' (?) যে অশ্রাব্য খিস্তিখেউড় শুরু করেছিল সঙ্গীতের নামে, আপাতত তারও অবসান ঘটেছে। এসব খিস্তিখেউড় রচিত হয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, বেগম খালেদা জিয়া, মতিউর রহমান নিজামী, তারেক রহমান প্রমুখকে নিয়ে। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা মঞ্চে বসে এসব খেউড় উপভোগ করেছেন। কী কদর্য রুচি! তারা একবারও ভেবে দেখতে চাননি যে, তাদের নিয়েও কোনো দিন এ ধরনের অশ্রাব্য গান রচিত হতে পারে। ভেবে দেখতে চাননি যে, ওসব গান শুনে তাদের স্বজন-সমর্থকরাও কানে আঙুল দিতে পারে। চারদলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ধন্যবাদ, এসব নিয়ে কোনো সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।

এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। আওয়ামী লীগ নেতা কামাল মজুমদার গ্রেফতার হলেও আওয়ামী লীগের তরফ থেকে 'কঠোর আন্দোলনের' কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে পরিবর্তন ঘটলেও সংসদ বিলুপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের বাধ্যবাধকতার পরিবর্তন ঘটেনি। সব মিলিয়ে সংবিধান লঙ্ঘিতই হয়েছে। চটপটে সব

www.pathagar.com

সাংবাদিক এখন প্রশ্ন করতে ভুলেই গেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক উপদেষ্টা বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের সব সদস্যের পদত্যাগ করা উচিত। কোনো সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেননি যে, এ কথা বলার এখতিয়ার তার আছে কি না। বরং সাংবাদিকরা ছুটে গেছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মাহফুজুর রহমানের কাছে। জানতে চেয়েছেন, উপদেষ্টারা যে বললেন, আপনাদের পদত্যাগ করা উচিত। পদত্যাগ করেছেন কি না। বিচারপতি মাহফুজুর রহমান শক্ত লোক। সাংবাদিকদের এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল হিসেবে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন, 'কোনো খবর নাই।' যেসব সাংবাদিক তাকে পদত্যাগ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছেন, ধারণা করি, সংবিধান সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব সীমিত। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা কি নির্বাচন কমিশন সংস্কারের কোনো সাংবিধানিক দায়িত্ব পেয়েছেন? এ দায়িত্ব তাদের নয়। সাংবাদিকরা সে প্রশ্ন উপদেষ্টাদের করেননি। উপদেষ্টারা চান যে, নির্বাচন কমিশনের সব সদস্য পদত্যাগ করে চলে যাক। কী সাংঘাতিক দাবি। তাহলে কি এই অনির্বাচিত ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিয়েছেন? মনে হয় নিয়েছেন। সাংবাদিকরাও মেনে নিয়েছেন। সুশীল সমাজও মেনে নিয়েছেন।

এদিকে নির্বাচন কমিশন সংস্কার বা ঢেলে সাজানোর দাবি আওয়ামী জোটের। বিএনপি জোট এ দাবি করেনি। তাহলে উপদেষ্টরা যে কমিশনকে চলে যাওয়ার দাবি করলেন। তবে কি বাংলাদেশে বিএনপি জোটের রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে? এই জোটের কি আর কোনো অস্তিত্বই নেই। কেউ যদি মনে করে থাকেন, আওয়ামী লীগ তথা মহাজোটের সদস্যরা সন্ত্রাস, লগি-বৈঠা আর অবরোধের মতো গণঘাতী কর্মসূচির তোড়ে ভেসে চলে গেছে বিএনপি তথা চারদলীয় জোট, তাহলে সেটা মারাত্মক ভুল হবে বলেই মনে হয়।

এখানে সাবেক স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রসঙ্গও বেশ চমকপ্রদ। এরশাদের জন্য ১৪ দলের সে যে কী মায়া! তিনি ন্যায়বিচার পাননি। ন্যায়বিচার চাওয়ার আগেই ন্যায়বিচার না পাওয়ার ঘোষণা বেশ আমোদের। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণকারী এই জোট এরশাদকে নিয়ে যা করল, তা উপভোগ করার মতো। জাপানি বোট ক্রয় মামলায় দুর্নীতির অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এ দুর্নীতির মামলায় তিনি দোষী। তবে তার বক্তব্য ছিল, এ মামলায় তার যে দু বছর সাজা চূড়ান্ত করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত, সে শাস্তি তিনি ইতোমধ্যে ভোগ করেছেন। নিম্ন আদালতের বিচার্য বিষয় ছিল, তিনি একই সঙ্গে অন্যান্য মামলায় যে সাজা ভোগ করেছেন, তাতে তার সাজা ভোগ করা হয়ে গেছে কিনা? নাকি তাকে নতুন করে আবার সাজা ভোগ করার জন্য কারাগারে যেতে হবে? আদালত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেয়নি। বলেননি যে, তিনি দুর্নীতি করেননি– অভিযোগটি সত্য নয়। বরং বলেছেন, অভিযোগ সত্য। তিনি জাপানি বোট ক্রয় মামলায় দুর্নীতি করেছেন। তবে নতুন করে তাকে আর জেল খাটতে হবে না। তিনি এ সাজা আগেই ভোগ করেছেন। তাহলে এই দুর্নীতিবাজকে কোলে নিয়ে এত

www.pathagar.com

বগল বাজাতে হবে কেন? এরশাদ দুর্নীতিবাজ, তাতে কী? তিনি তো এখন আওয়ামী জোটে যোগ দিয়েছেন। ফলে তিনি এখন দুধে ধোয়া পাকপবিত্র শিশুর মতো হয়ে গেছেন। এরশাদের মতো সোনার টুকরা ছেলেই আর হয় না। এরশাদ লক্ষ্মী!

এ পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগ উথাপিত দাবিদাওয়া অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নির্বাচনের কথা ভাববে, তার আগে নয়। তাদের বহু দাবি পূরণের পর রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে নতুন নতুন আরও বহু দাবি তারা তুলে ধরেন। সেগুলো হলো : রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। ভোটার তালিকা ছেপে প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে। জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ওএসডি করতে হবে বা তাদের নিয়োগ বাতিল করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার করতে হবে। নতুন সন্ত্রাসী তালিকা করে সে অনুযায়ী গ্রেফতার অভিযান চালাতে হবে। নির্বাচন থেকে কালো টাকার মালিকদের দূরে রাখতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব বিষয়ে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের কোনো দাবিই ছিল না। তারা বরাবরই বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে পারে, সে বিষয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে সব পদক্ষেপই যেন সংবিধানসম্মত হয়। সংবিধানসম্মত যেকোনো পদক্ষেপ তারা মেনে নেবেন। আর সে কারণেই তারা ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ওপর অত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফলে রাজপথে তারা অতটা সরব ছিলেন না। এটা যেন আরও কাল হলো। আওয়ামী লীগের নেতারা দেশঘাতী অবরোধ কর্মসূচির সময় জোর গলায় বললেন, দেশ চলছে, চলবে শেখ হাসিনার কথায়। তিনি বলেছেন, লঞ্চ চলবে না। লঞ্চ চলছে না। তিনি বলছেন, ট্রেন চলবে না। তিনি বলেছেন, বাস-ট্রাক চলবে না। বাস-ট্রাক চলছে না। সুতরাং দেশ চলবে হাসিনার কথায়। 'ইয়েস উদ্দিনের' কথায় দেশ চলবে না। আর শেখ হাসিনার কথায় দেশ চলায় অসহ্য ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সারাদেশের সর্বস্তরের মানুষ। তাই শেখ হাসিনার কথায় যাতে দেশ আর না চলে সেজন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রকাশ্যে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি জানিয়েছিলেন। জরুরি অবস্থা চলছে। এখন আর শেখ হাসিনার কথায় দেশ চলছে না। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

দেশে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ইতোমধ্যেই ক্ষুণ্ন হয়েছে। জরুরি অবস্থার মেয়াদ '১২০ দিন' হলেও, যেহেতু এখন সংসদ নেই, তাই পরবর্তী সংসদ গঠনের আগ পর্যন্ত জরুরি অবস্থা চলতে বাধা নেই বলেই মনে হয়। আরও যা কিছু হোক, পরবর্তী সংসদে তার অনুমোদন লাগবে। সে অনুমোদনের জন্য বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয়কেই দরকার। তারা কি তাতে আগাম সম্মতি দেবে? না দিলে কি তৃতীয় কোনো দল সেই নির্বাচনে বিজয়ী হবে, যারা সবকিছুর অনুমোদন দেবে? এসব প্রশ্ন থেকে একটা জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্রই ভেসে উঠছে। অনিশ্চিত লাগছে অনেক কিছুই।

www.pathagar.com

এদিকে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার প্রশ্ন আসছে। কেউ বলছেন, এই হালনাগাদ করতে সময় লাগবে এক মাস। কেউ বলছেন, তিন মাস। তারপর শুরু হবে ভোটার আইডি কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া। কেউ বলছেন, এতে সময় লাগবে ছয় থেকে আট মাস। কেউ বলছেন, সময় লাগবে চার বছর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তিন বছর। ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড বা আইডি তৈরিতে ন্যূনতম ব্যয় হবে হাজার কোটি টাকা। পর্দানশীন অনেক নারীর ছবি জোগাড় করতেও লেগে যেতে পারে মাসের পর মাস। আর ব্যাপারটা এরকম নয় যে, কাউকে আজই অর্ডার দিয়ে দিলাম, কাজে লেগে যাও বাবা আগামীকাল থেকে। হয়ে গেল? এর জন্য টেন্ডার আহ্বান, বাছাই, পুনঃটেন্ডার- এসব আনুষ্ঠানিকতাও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অতএব ধারণা করা যায়, নির্বাচন দূর অস্ত।

তাছাড়া হাজার হাজার গ্রামে কি হাজার হাজার মেশিন বসিয়ে আইডি কার্ড করতে হবে। সাধারণ মানুষ তার কাজ ফেলে নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে আসবে তো। সেটা যদি চরাঞ্চল হয়, তাহলে তাদের আসা-যাওয়ার খরচ কে যোগাবে? এ ছাড়া বিপুলসংখ্যক ভাসমান ভোটারের কাছে পৌঁছতে সময় লাগবে। কোথায়ও কোথায়ও আইডি কার্ড দেয়ার জন্য দিনের পর দিন ভোটারের পেছনে দৌড়াতে হবে। ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় পরিচয়পত্র করতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছর। এসব বিবেচনায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমাদের সময় লাগবে কমপক্ষে তিন বছর। অতএব, ধারণা করা যায়, নির্বাচন দূর অস্ত।

কিন্তু আওয়ামী লীগের এত সব দাবিদাওয়ার মূল উদ্দেশ্য কী? মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতায় যাওয়া নিশ্চিত করা। এমনভাবে সবকিছু সাজাতে হবে, যাতে জনগণ ভোট দিক বা না দিক, তাদের ক্ষমতায় যাওয়া নিশ্চিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন আওয়ামী লীগের বাকি দাবিদাওয়া বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর পরও যদি কোনো এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ মনে করে যে, তাদের ক্ষমতায় যাওয়া অনিশ্চিত, তখন যদি তারা নির্বাচন বর্জন করে, তাহলে কী হবে? কিংবা পরিস্থিতি যদি এমন দাঁড়ায় যে, ওই নির্বাচন করা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে জিতিয়ে দেয়ার জন্য। এর প্রতিবাদে যদি বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে অবরোধের ডাক দেয়, তখন কী হবে? তাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। আস্থার সঙ্কট দূর করার জন্য যে উদ্যোগ সেটাই যেন আবার আস্থার সঙ্কটে না পড়ে।

আওয়ামী লীগ যে কথা রাখে না, এ কথা বারবার প্রমাণ হয়েছে। সদ্য অবসর নেয়া প্রধান বিচারপতিরই সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার কথা ছিল। আওয়ামী লীগ বলল, না, প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানকে মানি না। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি কে এম হাসান অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। তাতেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসেনি। অকারণে অসম্মান করা হলো দেশের একজন প্রধান বিচারপতিকে। তেমনিভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে চলে যেতে হবে, বলল আওয়ামী লীগ। ব্যস, ছুটিতে যেতে বাধ্য করা হলেন বিচারপতি এম এ

www.pathagar.com

আজিজকে। নির্বাচনে এল না আওয়ামী লীগ। অকারণে অসম্মান করা হলো একজন বিচারপতিকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা বলছেন, চলে যাক নির্বাচন কমিশনের সব সদস্য। তারা আবার বলছেন, চলে যাক স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যরা। এতে রাজনৈতিক কোনো ফায়দা হবে বলে মনে হয় না। বরং আরও কিছু সম্মানিত ব্যক্তি অসম্মানিত হবেন।

এই পরিস্থিতি সামনে রেখে এখন আবার ভিন্ন কথা বলছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। গত ১৯ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বলেছেন, 'ভোটার আইডি কার্ডের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা বলেছি। কিন্তু ভোটার আইডি কার্ড ছাড়া নির্বাচন হবে না, এমন কথা আমরা কোনো দিন বলিনি।' তিনি বলেন, 'ভোটারদের পরিচয়পত্র দেয়ার পর নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনেক সময় প্রয়োজন। তাই এখন ভোটার আইডি কার্ড ছাড়াই নির্বাচন করা যেতে পারে। আইডি কার্ড তো এক দিনের মধ্যে করা সম্ভব নয়। তাই একটি সুষ্ঠু ভোটার তালিকা তৈরি করেই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব।'

হঠাৎ যে ভিন্ন সুর আবদুল জলিলের! তড়িঘড়ি করে, জনগণের ওপর জবরদস্তি করে, ভয় দেখিয়ে, আতঙ্ক সৃষ্টি করে ক্ষমতায় যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আবদুল জলিল সাহেবরা, সে স্বপ্ন কি ভেঙে খান খান হয়ে গেল? তাই এখন নির্বাচনে যেতে আইডি কার্ডের আর প্রয়োজন নেই? এদিকে অন্য অভিযোগও আছে। আওয়ামী লীগ আমলে ২০০০ সালে যে ভোটার লিস্ট করা হয়েছিল তাতে ৮০ লাখ ভুয়া ভোটার ছিল। আওয়ামী লীগ বাধা দিয়েছিল ২০০৬ সালে নতুন ভোটার লিস্ট করতে। নতুন ভোটার লিস্ট যাতে না হয়, তার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন ২০০০ সালের ভোটার লিস্ট বহাল রাখার জন্য। আদালত তা বহাল রেখেছে। আইডি কার্ড হলে ভুয়া ভোটাররা ভোট দিতে পারবে না– এটাও কোনো ভয় নয় তো।

আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দল তথা মহাজোট ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সংক্ষেপ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা একবারও ভাবেনি, সে পথ অতটা সংক্ষেপ করা সম্ভব কি না। এ সংক্ষিপ্ত পথ ততটা মসৃণ কি না। কিন্তু এ প্রয়াসের পরিণতি ভালো হয় না। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাস থেকে সামান্য উদ্ধৃতি : 'খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন। হারুর মাথার কাঁচাপাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দী পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের অভিজ্ঞতায় গড়িয়া তোলা বিস্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গেল।' ঘরে ফেরার পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য হারু ঘোষ বনপথ ধরেছিল। সেখানে বজ্র-বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'হারু ঘোষ পথ সংক্ষিপ্ত করিতে চাহিয়াছিল। পথ তাহার সংক্ষেপ হইল বটে। পাড়িও জমিল ভালোই।' জলিল সাহেব পণ্ডিত লোক। আশা করি উপলব্ধি করবেন।

২৩.০১.২০০৭

www.pathagar.com

এক হাতে পূর্ণ হলো সুধা, আর হাতে চূর্ণ হলো পাত্র

সন্দেহ নেই, দেশে একটি থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। রাজনীতিকরা অসহায়। চুপচাপ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন। তারা বলছেন, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নির্বাচন চাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারাও বলছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা নির্বাচন দেবেন। প্রয়োজনের চেয়ে একদিনও বেশি তারা ক্ষমতায় থাকবেন না। লাই পাওয়া বিদেশী কূটনীতিকরাও বলছেন, তারাও দেখতে চান যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধাননির্ধারিত সীমানার বাইরেও বহু কাজ করছেন। বহু কাজ করবেন বলে জানাচ্ছেন। সংবিধানে তাদের জন্য যে কাজ নির্ধারণ করা আছে, সে গণ্ডি তারা ছাড়িয়ে গেছেন বহু আগেই। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ শিষ্টাচারের সীমানা লঙ্ঘন করছেন তাদের সাংবিধানিক দায়িত্বের বাইরে গিয়েও।

যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) এমএ মতিন ২৫ জানুয়ারি বলেছেন, 'কমিশনকে ক্লাউনমুক্ত করতে হবে। অবশ্যই তাদের যেতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাবেক সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে পঙ্গু করে রেখেছিল। দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে আগে যেমন অধিকাংশ কর্মকর্তা দুর্নীতিবাজ ছিলেন, এখন দুর্নীতি দমন কমিশনেও অধিকাংশ কর্মকর্তা দুর্নীতিবাজ। তাদের সবাইকে সরাতে হবে।'

আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন গত বুধবার বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো দ্রুত নির্বাচন চায়। আমরাও যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করতে চাই। কালো টাকার প্রভাবমুক্ত সৎ ও স্বচ্ছ নির্বাচন করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে ধৈর্য ধরতে হবে। তিনি জানান, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকবে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, অবৈধ অস্ত্র বহন, উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডে কড়াকড়ি থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলোর দ্রুত নির্বাচন চাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা তো সমস্যা সৃষ্টি করিনি। সমস্যা তারাই সৃষ্টি করেছেন। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, আমরা চাকরি করতে আসিনি, এসেছি একটা নির্বাচন করতে। যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করতে চাই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নয় যে, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সবকিছু বাদ দিয়ে দ্রুত নির্বাচন করতে হবে। এর সঙ্গে জনগণ সম্পর্কিত। সৎ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের ধারা যাতে ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে সে লক্ষ্যে নির্বাচন করব। নির্বাচন কমিশন সংস্কার হলেই

www.pathagar.com

ভোটার তালিকা, আইডি কার্ডসহ সব কাজই দ্রুত সম্পন্ন হবে। তখন বলা যাবে নির্বাচন কত দ্রুত করা যাবে। নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক পদে যারা আছেন, তাদের সবার পদত্যাগ করে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে উপদেষ্টা মইনুল হোসেন বলেন, 'আমি একটা দায়িত্বশীল পদে আছি। আমি চাই না, যারা সম্মানিত লোক, তারা অসম্মানিত হোন। আমি তাদের মানসম্মান রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগের কথা বলেছিলাম। এ থেকে রাগান্বিত বা ক্ষুব্ধ হওয়া দুঃখজনক।'

তবে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে তিনি বলেছেন ভিন্নকথা। বলেছেন, কমিশন এতদিন কাজ করতে পারেনি। এখন এই দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবে। এসব মামলার দ্রুত নিস্পত্তি হবে। মামলা নিষ্পত্তির জন্য রুলস করা হবে। কমিশনকে সক্রিয় করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি তাদের ক্লাউন বা ভাঁড় বলে অভিহিত করেননি।

এখন যা কিছু ঘটছে, তার কোনো কিছুই যে সংবিধানের আওতায় ঘটছে না, এ প্রসঙ্গে আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ১৫ জানুয়ারি বলেছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সময়সীমা নিয়ে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে। সংবিধানের এই বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করা যাচ্ছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই সংবিধান বিভিন্নভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সংবিধানের যে ক্ষত হওয়ার তা হয়ে গেছে। আর যাতে ক্ষত না হয় সেটাই এখন ভাবতে হবে। সংবিধানের ক্ষতবিক্ষত হওয়ার যে বিষয়গুলো ঘটেছে, সেগুলোর বৈধতার পদ্ধতি বের করে সামনের দিনগুলোতে কিভাবে সংবিধানকে সমুন্নত রাখা যায় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা নিয়ে ভাবছে।

হ্যাঁ, এ সঙ্কট উত্তরণও সহজ কাজ নয়। সিনিয়র আইনজীবী ড. এম জহির বলেছেন, এর ধারাবাহিকতা দেয়ার জন্য ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা লাগবে। সংবিধান লঙ্ঘিত হওয়ার বিপদ বহুমুখী। সে বিপদ সম্পর্কে রাজনীতিবিদরা যথাযথ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারেননি। সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত ১৬ বছর ধরে গণতন্ত্রের যে ধারাবাহিকতা চলে আসছিল, সেটা তছনছ হয়ে গেছে একশ্রেণীর রাজনীতিকের অদূরদর্শিতায়। আর এই সুযোগে যার যা করার কথা নয়, সে তাই করছে। যার যা বলার কথা নয়, সে তাই বলছে। রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে এমন সব কথা কেউ কেউ বলছে, যার রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার খবর কখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু রাজনীতিকরা নীরব থাকছেন। কারণ তাদের নীরব থাকতে হচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বক্তব্য করা যাক। তিনি বলেছেন, নির্বাচন শুধু রাজনীতিবিদদের ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে জনগণও জড়িত। সুতরাং রাজনীতিবিদদের তাড়াতাড়ি নির্বাচন চাইলেই হবে না, ধৈর্য ধরতে হবে। মইনুল হোসেন যদি এর আগে একথা বলতেন, তা হলে আওয়ামী লীগ, ১৪ দল বা মহাজোট কী করত? পান্থপথ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পয়েন্টে তার

www.pathagar.com

কুশপুত্তলিকা দাহ করত। তার নামে অশ্লীল অশ্রাব্য গান বাঁধত। তাকে 'দেখিয়ে দেয়া'র হুমকি দিত। তাকে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিত। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সেই মইনুল হোসেনই আছেন। আওয়ামী লীগ যে টুঁ-শব্দটিও করছে না। কেন? মহাজোটের মহানেত্রী 'দেশরত্ন' শেখ হাসিনাই বা কোথায়? বলছেন না যে কিছু! ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন একজন সাধারণ মানুষ। বরাবর উচিত কথা বলার চেষ্টা করেছেন। তবে কামাল হোসেনের মতো জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করেননি। এ রকম একজন মানুষের ধৈর্য ধরার পরামর্শে আশা করি মহাজোট নেতারা প্রীত হয়েছেন।

আর বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট? তারাও ভালোই বেকায়দায় আছেন। ২৮ সেপ্টেম্বরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ যখন আন্দোলনে নামল, তখন দৃশ্যত চারদলীয় জোটের করার কিছুই ছিল না। তাদের তো কোনো আন্দোলন নেই। তারা বারবার বললেন, সংবিধানের আওতায় যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তাতে তাদের আপত্তি নেই। তারা না সরাসরি পক্ষ নিতে পারছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের, না তাকে ফেলে দিতে পারছিলেন। ফলে আন্দোলনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছিল। সেই প্রধান উপদেষ্টা গেলেন, উপদেষ্টামণ্ডলী গেলেন। নতুন প্রধান উপদেষ্টা এলেন, নতুন এক সেট উপদেষ্টা এলেন। আওয়ামী লীগ দারুণ খুশিতে বগল বাজাতে থাকল। তাদের জয় হয়েছে। বিএনপিকে তারা রাজপথে হারিয়ে দিয়েছেন। এবার নির্বাচনেও হারিয়ে দেবেন।

এখন দাবি তুলেছেন যথাশিগগির সম্ভব নির্বাচন দিতে হবে। আগে বলেছিলেন, ভোটার তালিকা শুদ্ধ করে, হালনাগাদ করে, ছাপিয়ে, ভোটার আইডি কার্ড করে, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, তাদের দাবি বাস্তবায়ন করে যথাশিগগির সম্ভব নির্বাচন দেয়া হবে। ধারণা করা যায়, দুই তরফের এই যথাশিগগিরের মধ্যে দুস্তর ফারাক রয়েছে। মহাজোটের হিসাবে এই যথাশিগগির মানে ৯০ দিন বা ১২০ দিন। অপর পক্ষে যথাশিগগির মানে তিন থেকে পাঁচ বছর। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেনতেনভাবে, সংবিধান রক্ষার নামে নির্বাচন করতে যাবে কেন? তাদের অবস্থানে তারা সঠিক আছেন। আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট নেতারা বলেছিলেন, সংবিধান মানুষের জন্য, জনগণের জন্য। সুতরাং সংবিধানের দোহাই দিয়ে যেনতেন একটা নির্বাচন বাংলার মাটিতে হতে দেয়া হবে না। সংবিধান পাশ কাটিয়ে তাদের দাবি পূরণ হচ্ছে– যেনতেন নির্বাচন হচ্ছে না। আশা করি তারা খুশি আছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সংবিধানে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের বাইরেও কিছু দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করেছেন। সেগুলো হলো– দুর্নীতি দমন, দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদি কাজ। সৎ ও যোগ্য

www.pathagar.com

লোক যাতে নির্বাচিত হতে পারে, তারা সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। এত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সময় তো লাগবেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব সাংবিধানিক পদেও শুদ্ধি অভিযান চালাতে যাচ্ছেন। উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন অসম্মান এড়াতে নির্বাচন কমিশনের সব সদস্যকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। অপর উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) এমএ মতিন বলেছেন, আরও মারাত্মক কথা। তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনে সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত সম্মানিত ব্যক্তিদের 'ক্লাউন' বলে অভিহিত করে তাদেরও পদত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। না পরামর্শ শুধু দেননি, হুমকিই দিয়েছেন বলা যায়। কারণ তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, তাদের যেতেই হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত উপদেষ্টাদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, বিষয়গুলো কি আরও একটু ভেবে দেখা যায় না? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের মেয়াদকাল সংবিধান অনুযায়ী সিকি বছর (৯০ দিন)। আর সাংবিধানিক পদে আসীন নির্বাচন কমিশনের সদস্য, দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। উপদেষ্টাদের ৯০ দিনের আগেও দু-এক সপ্তাহের মধ্যে বাদ করে দেয়া যায়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে অনেক উপদেষ্টাই এসেছেন এবং বাদ হয়ে চলে গেছেন। কিন্তু যে পদগুলো নিয়ে তারা কথা বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে তাদেরকে কেউ চলে যেতে বলতে পারে না। কিন্তু ক্ষণিকের অতিথি উপদেষ্টারা সেটা বলতে শুরু করেছেন। পাঁচ বছর দায়িত্ব পালনের এই গ্যারান্টিও সংবিধানে দেয়া হয়েছে যে কারণে তা হলো, তারা ওই সময়ে যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। কোনো একটি রাজনৈতিক জোটের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেয়া কিংবা এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের হেয় করা কতটা যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে– তা ভেবে দেখা দরকার।

তবে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন মেজর জেনারেল (অব.) এমএ মতিন। তিনি সব সভ্য-শিক্ষিত নাগরিকের মাথা হেঁট করে দিয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের দুর্নীতিবাজ ও 'ক্লাউন' বলে অভিহিত করে তিনি যেকোনো সুরুচিসম্পন্ন মানুষকে আহত করেছেন। জেনারেল মতিন বিরাট যোদ্ধা হতে পারেন। তবে তিনি বিচারপতি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার যোগ্যতা নিশ্চয়ই রাখেন না। সাংবিধানিক দায়িত্বে নিয়োজিত দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একজন প্রবীণ বিচারপতিকে তিনি ক্লাউন বলবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলরকে তিনি ক্লাউন বলবেন? এসব কথা রাস্তার অশিক্ষিত পিকেটারকেও হার মানায়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন সম্মানিত উপদেষ্টার কি তা মানালো?

www.pathagar.com

তবে এই ভয়াবহ অশিষ্ট পরিবেশ তৈরি করেছেন আমাদের রাজনীতিবিদরাই। তাদের কেউ কেউ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অসম্মানিত করেছেন। তারা রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যে রকম নোংরা, কুৎসিত, অশ্রাব্য ভাষায় কটূক্তি করেছেন, গান বেঁধেছেন, তাতে এসব দৃশ্যপট থেকে নীরবে সরে গেছেন সভ্য ভদ্র মানুষ। রাজনীতিকদের দেখানো সে পথেই এগিয়েছেন ওই উপদেষ্টা। কিন্তু সেদিন কি খুব দূরে, এমন পথ যারা দেখালেন, সে পথেরই বলি হবেন তারা নিজেরাও?

দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর যা কিছু ঘটেছে বাংলাদেশে, তার সবকিছুই গেছে আওয়ামী লীগের অনুকূলে। যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তারও সবকিছু ঘটবে আওয়ামী লীগের অনুকূলে। অর্থাৎ নির্বাচনে অংশগ্রহণের যা কিছু পূর্বশর্ত দিয়েছিল আওয়ামী লীগ, তার সবই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। তবু কি একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে, জয়ী হয়েছেন তারা? তর্জনী নাড়িয়ে নাড়িয়ে কী উদ্ধত ভঙ্গিতে অবরোধের নামে দেশ ধ্বংসের ঘোষণা, টেনে টেনে 'হতে দেব না' বলে সে কী আস্ফালন! ঢাকঢোল বাজিয়ে রাজপথে সে কী ইতরকাহন! সবই ফুরিয়ে গেছে যেন নিমেষেই। জয়ী হয়ে তুলে আনতে চেয়েছিলেন ক্ষমতার মৃত্যুসঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু দেশমন্থন করে যা উঠে এসেছে তা কি পান করা যাচ্ছে? নাকি এক হাতে পূর্ণ হলো সুধা, আর হাতে চূর্ণ হলো পাত্র। পান আর করা হলো না?

ফরাসি বিপ্লবের সময় নরহত্যার জন্য 'গিলোটিন' যিনি উদ্ভাবন করেছিলেন, তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল ওই গিলোটিনের নিচে গলা পেতে দিয়েই।

রুশ কথাসাহিত্যিক আন্তন চেখভের কালজয়ী রচনা '৬ নম্বর ওয়ার্ড' পড়েছেন অনেকেই। সেখানে এক সত্যানুসন্ধানী প্রতিবাদী যুবককে কায়েমি স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে নরকতুল্য পাগলা গারদ ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেখানকার এক চিকিৎসক। সেখানে অবর্ণনীয় নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের সহযোগী চিকিৎসককেও একদিন একই ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ভর্তি হতে হয় ছয় নম্বর ওয়ার্ড তথা পাগলা গারদে। নিয়তি ভারি নির্মম।

সঙ্গীতশিল্পী হায়দার হোসেনের গাওয়া জনপ্রিয় গান দিয়ে শেষ করতে চাই। সে গানের একটি কলি, 'আমি হালায় কলুর বলদ/ফাইস্যা গেছি/ ফাইস্যা গেছি মাইনকার চিপায়।' কে যে কলুর বলদ, আর কে যে কোথায় ফেঁসে গেছেন, তার সবটাই এখনো নিশ্চিত নয়।

০৭.০২.২০০৭

www.pathagar.com

একটি অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক দলের খসড়া

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনে এখন ব্যাপক ও চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটছে। প্রতিদিন নতুন নতুন চমক আসছে। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিদিন নানা ধরনের কাজের ঘোষণা দিচ্ছে ও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। জরুরি অবস্থা জারির কারণে মৌলিক অধিকারগুলো এখন আর নেই। রাজনৈতিক তৎপরতাও নিষিদ্ধ। রাজনীতিবিদরা আতঙ্কে। সন্দেহজনক চলাফেরা ও প্রমাণসাপেক্ষ দুর্নীতির দায়ে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতাকে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আইন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, আটক নেতাদের বিচার কাজ সম্পন্ন করা হবে তিন মাসের মধ্যেই। বড় রাজনৈতিক দলগুলো পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করেই যাচ্ছে। তথাকথিত সুশীল সমাজের বাকোয়াজি পূর্ণোদ্যমে চলছে। তাদের কেউ কেউ রাজনীতিবিদদের ঢালাওভাবে গালি দিয়ে যাচ্ছেন। তারা সব গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে দোষারোপ করছেন এবং এসব সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সংবিধান ও গণতন্ত্রমুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। আইন প্রণয়ন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ নয়। তবে সে উদ্যোগ তারা নিচ্ছেন। কারণ, রাজনীতিকে তারা দুর্নীতিমুক্ত ও দুর্বৃত্তমুক্ত করতে চান। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় বসতে পারেন, সে পথ তারা সুগম করতে চান। সেজন্য গ্রাম পর্যায় থেকে রাজনৈতিক দলের বিশেষত বিএনপির 'দুষ্ট' কর্মীদের পর্যন্ত আটক করা হচ্ছে। গত ১ মাসে কয়েক হাজার কাছাকাছি রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করে ভালো, সৎ ও যোগ্য লোকদের রাষ্ট্র পরিচালনায় আসার পথ সুগম করা হচ্ছে।

সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা যাতে নির্বাচন করতে পারেন, সেটা কে না চায়! রাজনীতি সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত হবে– কোনো গণভোট না নিয়েও বলা যায়, দেশের সব মানুষই তা চায়। এসব পদক্ষেপ নিয়ে তাই কোনো দোষ করেনি ড. ফখরুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

www.pathagar.com

এ ছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ফুটপাথ, রাস্তাঘাট থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে হাজার হাজার দোকানপাট ও হকার। যে জমি মামলা-মোকদ্দমা করে ১৫ বছর ধরে দখল করে রেখেছিল কোনো অবৈধ দখলকারী, তা এক রাতেই দখলমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এতেও উচ্ছেদকৃত দোকানি-হকাররা ছাড়া অন্যরা খুশিই হয়েছেন বলে ধরে নেয়া যায়। এসব উচ্ছেদ অভিযানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহায়তা করছে। এখন দেশের কল্যাণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা কিছু করছে, স্বাভাবিকভাবেই তার আইনগত বৈধতার প্রয়োজন হবে। ভবিষ্যৎ জাতীয় সংসদে এসব ব্যবস্থার অনুমোদন দরকার হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাতে লাগবে সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন। তখনকার দৃশ্যপট কী দাঁড়াবে? তখন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব কাজ অনুমোদনের জন্য এমন একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় থাকতে হবে, যারা বর্তমান সরকারের সব কাজ অনুমোদন করবে।

তেমন একটি রাজনৈতিক দল কীভাবে সম্ভব? সেটা সম্ভব করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন 'সুশীল' সমাজের দিগ্‌গজেরা। তারা বিগত কয়েক বছর ধরে বিদেশী অর্থ ও মদদে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও জনগণকে হেয় করার জন্য অবিরাম প্রচার-প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। যেসব প্রতিষ্ঠানের নামে তারা বাংলাদেশের জনগণের সাফল্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বাংলাদেশকে 'অকার্যকর রাষ্ট্র', 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে আছে সিডিপি (সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ), টিআইবি (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ) প্রভৃতি বিদেশী অর্থপুষ্ট প্রতিষ্ঠান। এরা আবার 'সুশীল' নাগরিকদের নিয়ে গঠন করেছেন একটি 'নাগরিক কমিটি'। (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন 'বাংলাদেশের সুশীল সমাজের ইতিবৃত্ত/ মাহমুদুর রহমান, নয়া দিগন্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)।

প্রতিষ্ঠানের নাম যাই হোক, বাংলাদেশকে হেয় করার এই প্রক্রিয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আছেন প্রায় একই সুশীলেরা। সিডিপির প্রাথমিক ট্রাস্টিরা হলেন : রেহমান সোবহান, ফজলে হাসান আবেদ (ব্র্যাক), কাজী ফারুক আহমেদ (প্রশিকা), সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, শাহীন আহমেদ, খুশী কবির, সৈয়দ হুমায়ূন কবির, ড. এফ আর মাহমুদ হাসান ও নূরুল হক। সিপিডির নাগরিক কমিটিতে আছেন : রেহমান সোবহান, লায়লা রহমান কবির, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র), এম সায়ীদুজ্জামান, ফজলে হাসান আবেদ (ব্র্যাক), সাবেক রাষ্ট্রদূত আবুল আহসান, ড. আনিসুজ্জামান, স্যামসন এইচ চৌধুরী (স্কয়ার গ্রুপ), মেজর জেনারেল অবঃ মইনুল হোসেন চৌধুরী, মাহমুদা ইসলাম, প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, এম হাফিজউদ্দিন খান, ড. ইকবাল মাহমুদ, প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ, লতিফুর রহমান, রাজা দেবাশিষ রায়, প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী,

www.pathagar.com

অ্যাঞ্জেলা গোমেজ, এম মুজিবুল হক, ড. মুহাম্মদ ইউনূস (গ্রামীণ ব্যাংক) ও ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য (নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি)। আবার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ট্রাস্টিরা হলেন : প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, মাহফুজ আনাম (ডেইলি স্টার/প্রথম আলো), এম হাফিজ উদ্দিন খান, তৌফিক নেওয়াজ, প্রফেসর খান সরওয়ার মুরশীদ, স্যামসন এইচ চৌধুরী, এস রুবী গজনবী, সুলতানা কামাল, প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ ও প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

প্রিয় পাঠক, একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, কোনো কোনো সুশীল আবার আছেন এই তিন কমিটির একাধিক কমিটিতে। সব মিলিয়ে সুশীলের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়। এর মধ্যে গত কয়েক বছরে সিপিডি আদাজল খেয়ে প্রচার করেছে, বাংলাদেশ চরম ব্যর্থ এক রাষ্ট্র। আর টিআইবি কাজ একটাই করেছে। তাহলো বাংলাদেশকে পৃথিবীর সেরা দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে প্রতিপন্ন করা। এই কয়েকজন সুশীল মিলে এমন একটা মিশনে কেন নামলেন? তাহলো বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে অপদস্থ করে অরাজনৈতিক জবাবদিহিতামুক্ত একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এ বিষয়ে সুশীল মাহফুজ আনাম তো আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে জোর গলায় বলেছেন, 'আমরাই আপনাদের ক্ষমতায় এনেছি'। অতএব, আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না। আমরা মানব না। এখনো আমরা যার বিরুদ্ধে যা খুশি লিখব।

প্রফেসর মোজাফফর আহমদ সাহেব পণ্ডিত লোক। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি এমন জেহাদে কেন নামলেন? তিনি যে বাংলাদেশকে এক নম্বর দুর্নীতিবাজ দেশ বানালেন, তার ভিত্তি কী? তারা বলেছেন, খবরের কাগজের রিপোর্ট। হায় সুশীল! খবরের কাগজের রিপোর্ট কতটা সত্য, কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা না করে দেশের সম্মান ধারাবাহিকভাবে ধূলায় লুটিয়ে দিলেন। খবরের কাগজে তো রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে সরকারি মন্ত্রী-এমপিরা ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে। আপনি তা বিশ্বাস করলেন? পুরো তিন বছরের বাজেটের সব টাকাই জোটের মন্ত্রী-এমপিরা খেয়ে ফেললেন? বলিহারি টিআইবি।

সে অধ্যায়ের যবনিকা পড়েছে। এখন সুশীল সমাজ-বান্ধব ব্যক্তিরাই সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে অনেকে মনে করছেন। দায়িত্ব গ্রহণ করে উপদেষ্টারা নির্বাচন কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যদের সাংবিধানিক পদ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছেন। সুশীল সমাজ-বান্ধবরা এসব পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে লোকজন বলাবলি করছে।

www.pathagar.com

দেশে শীর্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে আটক করা হয়েছে। আরও আটক হবে বলেন ধারণা করা যায়। আইন উপদেষ্টা বলেছেন, তিন মাসের মধ্যে এদের বিচার হবে প্রধানত দুর্নীতি দমন আইনে যে আইনই হোক, বিচারে শাস্তি হলে তারা আর আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সব দুর্নীতির বিচার হবে। তাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা হারাতে পারেন শত শত সাবেক মন্ত্রী-এমপি এবং 'দুর্নীতিগ্রস্ত' দলীয় কর্মীরা। ফলে রাজনীতির ময়দান হবে ফাঁকা। ভালো লোকেরা নির্বাচন করে জাতির সেবার জন্য এগিয়ে আসতে পারবেন। আইডিয়াটা চমৎকার।

কিন্তু ওই নির্বাচনের ফলাফল কাজে লাগানোর জন্য রাজনৈতিক দলের একটি কাঠামোর ভেতর দিয়ে সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে এলে ভালো হবে। সেখানেও শূন্যতা থাকবে না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, নাগরিক কমিটির সুশীল ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ জন্য তৈয়ার।

ভারত ও বাহরাইনে ১০ দিনের সফর শেষে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফিরে ড. মুহম্মদ ইউনূস বলেছেন, দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হলে অবশ্যই তিনি রাজনীতি করবেন। ঘরে বসে থাকবেন না। তবে নিজের প্রয়োজনে তার রাজনীতি করার দরকার নেই। চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযান সমর্থন করে তিনি বলেন, এখন একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তারা যাতে আর নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বর্তমান সরকারকে সব কিছু গুছিয়ে তারপর নির্বাচন করার পরামর্শ দেন। কবে রাজনৈতিক দল গঠন করবেন– এ রকম প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস বলেন, আমি যেকোনো কাজের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকি। দল গঠন করার জন্য এবিসিডি অনেক কিছু থাকে। সব ব্যাকরণ মেনেই যে আমাকে করতে হবে, এমন তো কিছু নয়। আর এর জন্য (রাজনৈতিক দল গঠন) বড় ধরনের শোডাউনেরও প্রয়োজন নেই। প্রচলিত রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে এর আগে ড. ইউনূস বলেছিলেন, দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক রাজনৈতিক দলগুলো। তাদের কোনো আদর্শ নেই। তারা টাকার জন্য রাজনীতি করেন। তাই দলগুলোকে পরিষ্কার করা দরকার।

উপদেষ্টা পরিষদে, নির্বাচন কমিশনে, দুর্নীতি দমন কমিশনে সুশীল-বান্ধব গুণীজনরা আসছেন। এখন ড. ইউনূস রাজনৈতিক দল করতে পারবেন। তাতে কোনো সমস্যাই হবে না। সে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কালো টাকা থাকবে না। কেউ কাউকে নির্বাচনে গাড়িতে করে আনবে না। পান-বিড়ি খাওয়াবে না। দুর্নীতি, চুরি-বাটপারি থাকবে না। টেন্ডারবাজি থাকবে না। ভূমিদস্যু থাকবে না। অত্যাচার-নির্যাতন থাকবে না। সুশীল প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে নিদেনপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতায়

www.pathagar.com

বসবেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংবিধানবহির্ভূত সব কাজকে বৈধতা দেবেন। তারপর দুর্নীতিমুক্ত দেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। কেমন চমৎকার একটা পরিবেশ। কিন্তু এমন পরিবেশ যদি অত সহজ হতো, তাহলে কার্ল মার্কসকে আর সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব বানাতে অত শ্রম-মেধা দিতে হতো না। টমাস মূরের 'ইউটোপিয়া' বইটি নিয়ে বসলেই কাজ হয়ে যেত। সে বইয়ে এমন এক সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, নিপীড়নবিহীন ও অন্যায়মুক্ত সৌহাদ্যপূর্ণ সমাজের চিত্র আছে। সত্যিই আদর্শ সে সমাজ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী ও নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানেন পাঠকরা। ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এ নাটকের বিষয়বস্তু। এ যুদ্ধের ইতিহাস যেমন শোকাবহ, তেমনি ভয়াবহ। হিন্দু ও মুসলিম পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সঙ্কল্প নিয়ে এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। সে যুদ্ধে স্থূল পরিণামে মারাঠাদের পরাজয় ও পতন ঘটে। মুসলিম শক্তি জয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মারাঠা শিবিরের এক সাধারণ সৈনিক দিলীপ। মুনীর চৌধুরী লিখেছেন, "দিলীপ দুর্বৃত্ত হলেও রঙ্গরসের আধার। সে হিরণবালাকে পেতে চায়। কিন্তু হিরণবালা আতা খাঁকে ভালবাসে, দিলীপকে পছন্দ করে না। সে দিলীপ একদিন সুযোগ পেয়ে ঢুকে পড়ে হিরণের কক্ষে। তার একটি সংলাপের অংশবিশেষ 'অপেক্ষা করতে করতে যখন একেবারে থ' হয়ে গেলাম তখনই না একবার ঘুরে একটু নেশা করে এসেছি। আর থাকতে না পেরে মরিয়া হয়ে, যা থাকে কপালে, ঝাঁপিয়ে পড়লাম তোমার ঘরের মধ্যে। এসে দেখি কেয়া মজা। মন্দির নির্জন, দেবী একা, বেআক্কেল পূজারী ব্যাটা বিদায় নিয়েছে।" ড. ইউনূসও কি সে রকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন? বেআক্কেল পূজারী ব্যাটারা এখন জেলে, মন্দির নির্জন। ক্ষমতার দেবী একা। এখনই মোক্ষম সময়!

পাদটীকা : পাকিস্তানের ইমরান খান ছিলেন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের প্রিয় ক্রিকেট তারকা। পাকিস্তানের সব নাগরিক তার আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছে, তার বেদনায় হয়েছে ভারাক্রান্ত। তিনি একটি রাজনৈতিক দল খুলেছিলেন। তার সে দলকে কেউ সমর্থন করেনি। ইমরান খানকে তারা ক্রিকেটার হিসেবে ভালোবেসেছিলেন, রাজনীতিবিদ হিসেবে পছন্দ করেননি। ড. মুহম্মদ ইউনূস এ কথা মনে রেখে অগ্রসর হলে সম্ভবত ভালো করবেন।

১৭.০২.২০০৭

www.pathagar.com

পিএসসি কেনো সফল হলো, জবাব চাই

বেসামরিক খাতে সর্বশেষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসি। দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংস করার জন্য যারা আদাজল খেয়ে লেগেছেন, তাদের বর্তমান টার্গেট এখন পিএসসি। পিএসসি সম্পর্কে এসব জেহাদি মিডিয়া লিখে লিখে দেশময় বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। ধ্বংস করে দিতে হবে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটিকেও। সৃষ্টি করতে হবে অরাজকতা। ব্যর্থ করতে হবে বাংলাদেশকে।

সম্প্রতি এক সুশীল দৈনিক 'সরকারি কর্মকমিশনে নিয়োগে রেকর্ড, কেলেঙ্কারিতেও রেকর্ড' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশ করেছে। একেবারে প্রধান সংবাদ বা লিড নিউজ। তথ্য-প্রমাণহীন এক বিশাল কল্পকাহিনী। তারও আগে থেকে 'সুশীল-বান্ধব' পত্রিকাগুলো পিএসসি সম্পর্কে নানা রকম কল্পকাহিনী ছেপেই যাচ্ছে। সর্বশেষ সুশীল সংবাদপত্রটির অভিযোগগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়।

সাংবিধানিক সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার জেহাদি উদ্যোক্তা ওসব পত্রিকার একটিতে লেখা হয়েছে, 'একের পর এক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, দলীয় লোকজন নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগে পিএসসি ও এর নেতারা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

পিএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁস দিয়েই শুরু করা যায়। আমরা আগেও বলেছি, প্রশ্ন কমন পড়া কোনো ব্যাপারই না। পিএসসি'র দু-চারটা প্রশ্ন কমন তো পড়তেই পারে। নইলে পরীক্ষার্থীরা লিখবে কী? পরীক্ষার আগে আগে এক শ্রেণীর পত্রিকা প্রায়ই প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ায়। তেমনি গুজব ছড়িয়েছিল ২৭তম বিসিএস নিয়ে। গত বছর মার্চ মাসে এমন খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু পরীক্ষার সময় দেখা গেল সেসবই গুজব। শেষে ১৯ মার্চ ঢাকার প্রায় সব পত্রিকা একযোগে লিখল প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ব্যাপারটা নেহাতই গুজব। ওই গুজব সম্পর্কে দৈনিক নিউ এজ : পত্রিকার শিরোনাম ছিল, 'ম্যাড রাশ ফর বিসিএস কোয়েশ্চন্স'। আজকের কাগজ : 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবের সত্যতা মেলেনি।' সমকাল : 'ওরা হতাশ।' নয়া দিগন্ত : 'কথিত প্রশ্ন না মেলায় বহু পরীক্ষার্থীর মাথায় হাত।' সংবাদ : 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব সঠিক নয়।' জনকণ্ঠ : 'সাতাশতম বিসিএসের ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি ॥ টুপাইস কামাই।' দিনকাল : 'প্রশ্নপত্র

www.pathagar.com

ফাঁসের গুজব গুজবই রয়ে গেল।' যুগান্তর : 'ভুয়া প্রশ্ন বেচে টাকা হাতিয়েছে প্রতারকচক্র।' ইত্তেফাক : 'বিসিএস পরীক্ষার শুরু ॥ ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা কামাই।' প্রথম আলো : 'রাতভর বিক্রি হয়েছে বিসিএস পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্নপত্র।' ইনকিলাব : 'বিসিএস'র ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি করে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে সংঘবদ্ধ চক্র।'

তা হলে? এসব সুশীল-বান্ধব পত্রিকা একদিকে লিখেছে বিসিএস-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নিতান্তই গুজব। আবার তারাই জোট বেঁধে এখন প্রচার করে যাচ্ছে, একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বিসিএস পরীক্ষার। এ কেমন স্ববিরোধী কর্মকাণ্ড।

একই ধরনের অভিযোগ দলীয় লোকজন নিয়োগ নিয়ে। এ বিষয়ে আমরা আগেও লিখেছি, কেউ ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত থাকলে তিনি বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অযোগ্য হয়ে যান না। তিনি যদি মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, তাহলে শুধু ছাত্ররাজনীতিতে জড়িত ছিলেন– এই অভিযোগে তাকে বাদ দেয়া যায় না। যা সঙ্গতও নয়, ন্যায়বিচারও নয়। সুতরাং ছাত্রলীগ-ছাত্রদল করেও বিসিএস পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব। এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অভিযোগ তিন শতাধিক নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগ নিয়ে। সেই পরীক্ষায় নিয়োগ পাওয়া ১৫-২০ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল, যারা ছাত্রদলের রাজনীতিতে জড়িত। কিন্তু বাকিরা কারা? তাদের নিয়োগও কি বাতিল করতে হবে? কিংবা ছাত্রদল করলে তাকে বসতে দেয়া যাবে না বিসিএস পরীক্ষা দিতে? এ আবদার গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তা ছাড়া দলীয় লোক নিয়োগ করতে চাইলে সেটা একেবারেই অসম্ভব। দলীয় লোকটিকে ৯০০ নম্বরের পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পরীক্ষা পদ্ধতি এমন যে, কারো পক্ষেই ওই পরীক্ষায় কোনো দলীয় লোককে পাস করিয়ে আনা সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মতোই নিশ্ছিদ্র সুরক্ষায় ওই পরীক্ষা নেয়া হয়। তবে মৌখিক পরীক্ষা হয় ১০০ নম্বরের। সেখানে উনিশ-বিশ করা সম্ভব। ৯০০ নম্বরের পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় যারা পাস করে আসেন, তারা সবাই যে যোগ্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হন বিসিএস'র প্রার্থীরা। এ ছাড়া মৌখিক পরীক্ষা নিতে যারা বসেন, তারা সবাই দলীয় লোক নন। তারা আলাদা আলাদাভাবে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর দিয়ে থাকেন। আবার শুধু মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ওপর ভিত্তি করেই কাউকে নিয়োগ দেয়া হয় না। তার লিখিত পরীক্ষার নম্বরে যোগ হয় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর। সে ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও চাকরি না পেতে পারেন কোনো প্রার্থী। মৌখিক পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে খারাপ করেছেন যিনি, চাকরি হতে পারে তার। আর যারা মৌখিক পরীক্ষা নেন, তারা কেউ জানেন না, সংশ্লিষ্ট প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে তথাকথিত 'দলীয় লোক' নিয়োগ কিভাবে সম্ভব, বোঝা দুষ্কর। কিন্তু ঢালাওভাবে অভিযোগ তুলেই যাচ্ছে কয়েকটি সংবাদপত্র।

www.pathagar.com

পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, পিএসসির চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ যে কারো বিরুদ্ধে যে কেউ করতে পারে। কিন্তু সে অভিযোগ সত্য কি না, সেটা তো প্রমাণ করতে হবে। পত্রিকায় লেখা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ আর দুর্নীতি এক কথা হতে পারে না। পত্রিকার দায়িত্ব অভিযোগ প্রচার করা নয়, অভিযোগ সত্য কি না, সেটা খোঁজ নিয়ে বের করে তা প্রকাশ করা। কোনো পত্রিকাই আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির নাম করে বলতে পারেনি যে, অমুক ব্যক্তি পিএসসির অমুক সদস্যকে চাকরির জন্য ঘুষ দিয়েছেন। তাহলে শুধু শুধু অভিযোগ তুলে চরিত্র হননের এই অপপ্রচার কেন ধারাবাহিকভাবে চালানো হচ্ছে?

এর পরের অভিযোগ অদ্ভুত ও হাস্যকর। সেটা হলো, কেন পিএসসি সফল হলো, কেন তারা পারল? কেন তারা ব্যর্থ হলো না। কী নষ্ট মর্মজ্বালা! সুশীল-বান্ধব পত্রিকাটি লিখেছে, জানা যায়, কেন নিশ্চিত নন আপনারা? এর নাম সাংবাদিকতা? বর্তমান চেয়ারম্যান দায়িত্ব নেয়ার পর ২১ ও ২২তম বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। এ পরীক্ষা তার আমলে অনুষ্ঠিত হয়নি। ফল প্রকাশ করে তিনি খুবই অন্যায় করেছেন? এরপর ২৩তম বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ আইনি জটিলতায় আটকে যায়। তাতে চাকরি প্রার্থীদের কি খুবই কল্যাণ হয়েছে? পরবর্তী সময়ে ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭তম বিসিএস পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশ তার আমলেই সম্পন্ন হয়। এ সময়ে তিনি বেশ ক'টি নন-ক্যাডার পরীক্ষা নিয়েছেন। পরীক্ষা নেয়া ও সময়মতো ফল প্রকাশ কি সাফল্য না ব্যর্থতা? যদি পরীক্ষা নেয়া না যেত, যদি সময়মতো ফল প্রকাশ করা না যেত, তাহলেই কি ওই সংবাদপত্র খুশি হতো? নাকি তারা বলত, সময়মতো পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশ না করায় বহু তরুণ চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে? দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেনি? পিএসসি ব্যর্থ। পিএসসি ব্যর্থ। আহা, সফল হয়ে ভারি বিপদে পড়েছে পিএসসি ।

বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় আনার দাবিদার এক ব্যক্তির প্রকাশিত পত্রিকাটি লিখেছে, 'অধ্যাপক জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে ১৬ হাজার ৪১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ১২ হাজার ৫৭৬ জন। পিএসসিতে এর আগের ২৫ বছরে যত নিয়োগ হয়েছে, গত পাঁচ বছরে নিয়োগের পরিমাণ (সংখ্যা নয়? নিয়োগপ্রাপ্তদের কি ওজন করা হয়েছে?) তার সমান বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে বলা হয়েছে। 'সব মিলিয়ে বর্তমান চেয়ারম্যানের মেয়াদে ২৪তম বিসিএস পরীক্ষায় ৫ হাজার ২২৪ জন, ২৫তম পরীক্ষায় ২ হাজার ৭২২ জন, ২৬তম পরীক্ষায় ১ হাজার ৬৩ জন এবং ২৭তম পরীক্ষায় ৩ হাজার ৫৬৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগ পান। এ ছাড়াও এ সময়ে ৩ হাজার ৮৪২ জন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। মাত্র পাঁচ বছরে এক সরকারের মেয়াদে এতটা দ্রুততায় রেকর্ডসংখ্যক নিয়োগের পেছনে সাবেক সরকারের দলীয় মনোবৃত্তি কাজ করেছে বলে অভিযোগ আছে।' পত্রিকাটি লিখেছে, 'পিএসসিতে এর আগের ২৫ বছরে

www.pathagar.com

যত নিয়োগ হয়েছে, গত পাঁচ বছরে নিয়োগের পরিমাণ তার প্রায় সমান বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। (সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেল কেন? গত ২৫ বছরের তথ্য পিএসসির কোনো গোপন ব্যাপার নয়। নিশ্চিত করা গেল না কেন? এর নাম সাংবাদিকতা, নাকি চরিত্র হননের নিকৃষ্ট অপপ্রচার?)

বর্তমান কমিশনেও আগের সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরা ছিলেন, তাদের মধ্যে 'জনতার মঞ্চের' নেতা সিরাজউদ্দীন ছিলেন, শেখ মুজিব হত্যা মামলার রায় দিতে গিয়ে যিনি দণ্ডপ্রাপ্তদের গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই জজ গোলাম রসুলও পিএসসি'র সদস্য ছিলেন। কই ছিল তখন এসব পত্রিকা? তখন যে তারা টুঁ শব্দটিও করেননি।

কী আশ্চর্য এই সংবাদ! পিএসসি'র কাজই চাকরিতে নিয়োগ দেয়া, শূন্যপদ পূরণ করে প্রশাসনকে গতিশীল করা। দক্ষ ও মেধাবীদের দেশসেবা নিশ্চিত করা। সে কাজটি যদি পিএসসি দক্ষতার সঙ্গে করে থাকে, তবে তো তাদের সাবাস দেয়া দরকার। বলা দরকার, 'সাবাস জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা ও আপনার সুযোগ্য সহকর্মীরা! আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।' তা না বলে আমরা এমনভাবে তাকে ধরলাম? কাজ করলি কেন বল? দেশের মেধাবী ছেলেমেয়েদের চাকরির ব্যবস্থা কেন করলি বল? দায়িত্ব কেন সঠিকভাবে পালন করলি বল? ছি! এই মানসিকতাকে ধিক্কার দেয়ার ভাষাও আমাদের জানা নেই।

আবার স্ববিরোধী মজার ব্যাপারও আছে ওই অপপ্রচারমূলক রিপোর্টে। তাতে লেখা হয়েছে, 'সূত্র মতে, পিএসসিতে মোট ৪৩৬টি পদ থাকলেও শূন্য রয়েছে প্রায় ২০০ পদ। কাজ-কর্মে সমস্যা তৈরি হলেও এসব জনবল নিয়োগ দিতে পারছে না পিএসসি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় শূন্যপদ বের করে নিয়োগের আয়োজন করতে পারলেও পিএসসি নিজেই শূন্যপদ পূরণ করতে পারে না।' এই নিয়োগ দিতে না পারাটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে ওই সুশীল-বান্ধব পত্রিকার দৃষ্টিতে। কী আশ্চর্য কথা! এক দিকে নিয়োগ দিতে পেরে ভারি অন্যায় করে ফেলেছে পিএসসি, অপরদিকে নিয়োগ না দিতে পেরেও ভারি অন্যায় করেছে পিএসসি। তাহলে পিএসসি কী করবে? কোন দিকে যাবে? না, তারা কী-ও করতে পারবে না?

পিএসসির দুর্নীতি-অনিয়মের কোনো প্রমাণ পত্রিকাটি তুলে ধরতে পারেনি। সবই অভিযোগ। অভিযোগ তো আসতেই পারে। কারণ পিএসসিতে যারা চাকরির আবেদন করেন, তাদের ৯৫ শতাংশেরই চাকরি হয় না। এসব হতাশ প্রার্থীদের কেউ কেউ বলতে পারেন, 'টাকা দিতে পারলে চাকরি হতো। আমার টাকার জোর নেই, তাই চাকরি হলো না।' এই অভিযোগের ভিত্তি কী?

এসব উড়ো অভিযোগের ভিত্তিতেই সম্ভবত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৭৫৭ জন পুলিশ কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা খুবই বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। সদ্য বিদায়ী সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ যদি বাতিল হয়, তাহলে তার

www.pathagar.com

আগের সরকারের আমলের নিয়োগ কেন বাতিল হবে না। এভাবে নিয়োগ বাতিলের রেওয়াজ চালু করলে বর্তমানে কর্মরত একজন সরকারি কর্মকর্তাও আর চাকরিতে থাকতে পারবেন না। প্রশাসন অচল হয়ে পড়বে। রাষ্ট্রও সত্যি সত্যি অকার্যকর হয়ে যাবে।

তাই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যাই বলি না কেন, তাদেরকে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে বলি। দেশের সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করার অর্থ রাষ্ট্রকে অকার্যকর করা। এসব তথাকথিত অভিযোগের ভিত্তিতে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন সদস্যদের। প্রমাণ করা হয়েছে, ওই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি অকার্যকর, ব্যর্থ। এসব তথাকথিত অভিযোগের ভিত্তিতে সুপ্রিমকোর্টের সদ্য বিদায়ী প্রধান বিচারপতিকে সাংবিধানিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। প্রধান বিচারপতির পদকে করা হয়েছে ব্যর্থ ও অকার্যকর। দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের বিদায় নিতে বাধ্য করা হয়েছ। প্রমাণ করা হয়েছে, ওই কমিশন ব্যর্থ ও অকার্যকর। এখন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাকি আছে সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসি। একটি রাষ্ট্র-স্বার্থবিরোধী মহল এখন উঠে পড়ে লেগেছে এই কমিশনকে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণ করতে। যারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তাদেরই চক্রান্তের অংশ এটি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যারা আছেন, তারাও এ দেশের মানুষ। আশা করি, তারা চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ নেবেন, যাতে দেশ সত্যি সত্যি ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত না হয়। অপপ্রচার সম্পর্কে তাদের সজাগ থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সদ্য যোগদান করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব: সাখাওয়াত হোসেন। অভিযোগ উঠেছে, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় ২০ হাজার টন গম আত্মসাৎ করেছিলেন। সে কথা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি তাকেও পদত্যাগে বাধ্য করবেন? এটাও 'অভিযোগ', পিএসসির তথাকথিত অনিয়ম-দুর্নীতিও 'অভিযোগ'। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো করবেন। চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে যেন চিলের পেছনে দৌড় না দেই। আগে যেন কানে হাত দিয়ে দেখি, কান কানের জায়গায় আছে কি না।

নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সফল ও কার্যকর রাষ্ট্র। এ দেশের মানুষ সেটাই প্রমাণ করেছে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে। তারা বাংলাদেশের জন্য বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। আমরা কেবল 'অভিযোগ' শুনে তা যেন নষ্ট না করে দেই।

২৩.০২.২০০৭

www.pathagar.com

প্রভাবশালী ফোন সচল হয়েছে?

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) একটি ভুল করেছে বলে তারা স্বীকার করেছেন। র‍্যাব গঠনের পর তাদের এ ধরনের ভুলের ঘটনা এটাই প্রথম। গত ৪ মার্চ তারা দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার 'মালিক-সম্পাদক ও গ্লোব শিল্প পরিবারের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদকে আটক করেছিলেন। কিন্তু 'নীতিনির্ধারক মহলের উচ্চ পর্যায় থেকে শক্ত তদবিরের পর তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে র‍্যাব।' এ ব্যাপারে র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কামান্ডার মাসুক হাসান দৈনিক আমার দেশকে জানান, 'আতিকউল্লাহ খান মাসুদ ছিলেন ভুল টার্গেট। গাড়ির নম্বর ভুল হওয়ায় র‍্যাবের টিম ওই গাড়ির আরোহী জনকণ্ঠ সম্পাদককে গ্রেফতার করে।' পত্রিকা ছাড়াও জনাব মাসুদের নানা ধরনের ব্যবসা রয়েছে। তার মধ্যে প্লট-ফ্ল্যাটের ব্যবসা অন্যতম। ফলে বহু গ্রাহকের তার বিরুদ্ধে রয়েছে নানা ধরনের অভিযোগ। এ সম্পর্কে দৈনিক আমার দেশ-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে 'জানা যায়, আতিকউল্লাহ খান মাসুদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। তার মালিকানাধীন গ্লোব কনস্ট্রাকশনসহ বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কয়েকটি প্রকল্পে রাজউকের অনুমোদন না নিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া জোরপূর্বক জমি দখল, টাকা নিয়ে ফ্ল্যাট না দেয়া, গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা ও হুমকি প্রদানের অভিযোগও বহু পুরানো। তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হঠাৎ করে ছাঁটাই এবং তাদের দেনা-পাওনা চুকিয়ে না দেয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এ ছাড়া দেশ থেকে বিদেশে মুদ্রা পাচার সিন্ডিকেটের বড় চক্রের সঙ্গে জড়িত আতিকউল্লাহ খান মাসুদ। বেশ কয়েক বছর আগে এই অভিযোগে তাকে একবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। মুদ্রা পাচার করেই তিনি কয়েক বছরের মধ্যে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। এ ছাড়া একাধিক বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে তার গভীর সখ্য এবং স্পর্শকাতর বেশ কিছু অভিযোগ এখন গোয়েন্দাদের হাতে।'

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক আতিকউল্লাহ খান মাসুদকে গ্রেফতারের খবর প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই রয়েছে। তবে এসব রিপোর্টের শিরোনামে আছে নানা চমৎকারিত্ব। শিরোনামগুলো দেখা যেতে পারে : অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখে পড়লেন জনকণ্ঠ সম্পাদক (জনকণ্ঠ), জনকণ্ঠ সম্পাদককে আটক করে ভুল স্বীকার

www.pathagar.com

করল র‍্যাব (প্রথম আলো), হামলার আশঙ্কায় স্বল্প সময়ের জন্য র‍্যাবের নিরাপত্তা হেফাজতে জনকণ্ঠ সম্পাদক (দৈনিক ইনকিলাব), জনকণ্ঠ সম্পাদককে আটকের স্বল্প সময় পরই মুক্তি (আজকের কাগজ), জনকণ্ঠ সম্পাদককে আটকের ৪০ মিনিট পর ছাড়া হলো (ইত্তেফাক), জনকণ্ঠ এডিটর হেল্ড বাই মিসটেক (ডেইলি স্টার), জনকণ্ঠ সম্পাদককে ভুল করে আটক করেছিল র‍্যাব (যুগান্তর), র‍্যাব প্রহরায় জনকণ্ঠ সম্পাদক (সংগ্রাম), জনকণ্ঠ সম্পাদক মাসুদ গ্রেফতার টেলিফোনের পর ছাড়া পেলেন (আমার দেশ)।

জনাব মাসুদের গ্রেফতার সম্পর্কে খোদ জনকণ্ঠ লিখেছে, 'জনকণ্ঠ সম্পাদক জনাব মাসুদ সকাল ১১টার দিকে জনকণ্ঠ অফিসে আসছিলেন। বাংলামোটর পার হয়ে নিউ ইস্কাটনের দিকে সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এলে র‍্যাব সদস্যরা তার গাড়ির গতিরোধ করে। র‍্যাবের এক কর্মকর্তা বলেন, আপনার ওপর হামলা হওয়ার আশংকা আছে। এ জন্য নিরাপত্তার কারণে তাকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে। এরপর র‍্যাব কর্মকর্তারা জনাব মাসুদকে তাদের গাড়িতে তোলেন। র‍্যাবের গাড়িটি হাইকোর্টের সামনে দিয়ে প্রথম সচিবালয়ের দিকে যায়। পথে তারা কোনো কথা বলেন না। সচিবালয়ের কাছে পৌঁছে গাড়ি ঘুরিয়ে তারা যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের সামনে। সেখানে গাড়ি থেকে তারা সবাই নেমে যান। প্রায় ১০ মিনিট বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল ফোনে কথা বলেন। এরপর র‍্যাবের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সেখানে আসেন। তিনি জনাব মাসুদকে বলেন, ইট ওয়াজ অ্যা মিসটেক। উই আর এক্সট্রিমলি স্যরি। আপনাকে এখন আমরা এস্কর্ট করে আপনার গন্তব্যে পৌঁছে দেব।' পরে তারা জনাব মাসুদকে জনকণ্ঠ অফিসে পৌঁছে দেন।

আর দৈনিক আজকের কাগজ জনাব মাসুদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন '...র‍্যাবের কর্মকর্তারা কোনো কথা না শুনে তাকে গাড়িতে তুলে নেয়। আতিক উল্লাহ খান মাসুদ জানিয়েছেন, র‍্যাবের (সদস্যরা) তাকে তাদের গাড়িতে তুলে নেয়ার সময় তিনি জনকণ্ঠের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি মোয়াজ্জেমকে কল করে তাকে আটকের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলেন। আতিকউল্লাহ খান জানান, র‍্যাবের গাড়ি তাকে নিয়ে মগবাজার চৌরাস্তা হয়ে চিফ জাস্টিসের বাসার সামনে দিয়ে সচিবালয়ের কাছাকাছি পৌঁছলে ওই গাড়িতে থাকা র‍্যাবের এক কর্মকর্তার মোবাইলে কল আসে। তিনি ওই কল রিসিভ করে কিছু সময় কথা বলার পর গাড়ি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের সামনে নিয়ে দাঁড় করানো হয়। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে র‍্যাবের ওই টিমের কমান্ডিং অফিসার তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোবাইলে প্রায় ১০ মিনিট কথা বলেন। পরে ওই কর্মকর্তা আতিকউল্লাহ খানকে বলেন, তাদের ভুল হয়ে গেছে। প্রায় ৪০ মিনিট পর র‍্যাব কর্মকর্তারা তাকে ইস্কাটনে জনকণ্ঠ ভবনে নামিয়ে দেন।'

কিন্তু মাত্র দু'দিন পর ঘটল ভিন্ন ঘটনা। ৭ মার্চ রাতে জনকণ্ঠ অফিস থেকে পুরনো অভিযোগে আটক করা হলো গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবারের চেয়ারম্যান জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদকে। এবারও তাকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। এবার আর ভুল স্বীকার করতে হয়নি তাদের।

www.pathagar.com

এ কথা তো প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, গত ৪ মার্চ র‍্যাব সদস্যরা ভুল করে জনাব মাসুদকে গ্রেফতার করেননি। অন্য কাউকে ভেবে যদি তারা জনাব মাসুদকে গ্রেফতার করতেন তাহলে তার জনকণ্ঠ অফিসে জনাব মাসুদের নিরাপত্তার অভাবের কথা তারা তুলতেন না। তারা নিশ্চিত ছিলেন, তারা জনকণ্ঠ সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদকে গ্রেফতার করতে এসেছেন এবং তাকেই গ্রেফতার করেছেন। র‍্যাব সদস্যরা তাকে র‍্যাব কার্যালয়ের দিকেই নিয়েই যাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে জনাব মাসুদ তার করেসপন্ডেন্টের মাধ্যমে যাদের টেলিফোনে কাজ হতে পারে তাদের ফোন করে জানাতে পেরেছিলেন। আমরা সাধারণ মানুষ। সরল হিসেবে বুঝলাম, ইস্কাটন থেকে সচিবালয়ের কাছাকাছি আসতেই গাড়িতে থাকা র‍্যাব সদস্য ফোন পান কোনো প্রভাবশালীর। ফজলুল হক হলের সামনে গিয়ে তিনি কর্তৃপক্ষীয় বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হন যে, জনাব মাসুদকে ছেড়ে দিতে হবে। তারা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ হিসেবে এর চেয়ে বেশি কী আর বুঝব।

কিন্তু আবার কি হল? জনাব মাসুদকে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হতেই হলো। এতদিন মনে হয়েছিল, সরকারের সিদ্ধান্তে কোনো প্রভাবই কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। পারছিল না। র‍্যাব সদস্যরা গ্লোব-জনকণ্ঠ পরিবারের চেয়ারম্যানকে নিশ্চয়ই নিজে নিজে আটক করতে যাননি। নিশ্চয়ই তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তারা এ দায়িত্ব পালন করতে এসেছিলেন। কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল সে কাজ। সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। সে দ্বন্দ্বে প্রভাবশালী টেলিফোনের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল সরকারেরই আর এক মহলকে। আবার ৭ মার্চ ৪ মার্চের প্রভাবশালী মহল নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলো। গ্রেফতার হলেন আতিকউল্লাহ খান মাসুদ। এ খবর পড়ে বাসে একজন সহযাত্রী মন্তব্য করলেন, 'যাক টেলিফোনে কাজ হতে শুরু করেছে। এখন নিশ্চয়ই র‍্যাংগস ভবন আর ভাঙতে হবে না।'

হ্যাঁ, র‍্যাংগস ভবন সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে। সাততলা বস্তি উচ্ছেদ হয়েছে, হচ্ছে, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হয়েছে, হচ্ছে। পান-দোকান, চা-দোকান, বিড়ি-সিগারেটের দোকান উচ্ছেদ হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু র‍্যাংগস ভবন দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় সরণি ধরে রামপুরা রোড পর্যন্ত যাওয়ার পথে প্রধান বাধা এই অবৈধ ভবন। কই, ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও এ ভবন উচ্ছেদের কোনো উদ্যোগ নেই কেন? এখানেও কি টেলিফোন কাজ করতে শুরু করেছে? একজন সাধারণ নগণ্য মানুষ হিসেবে অন্যসব নগণ্য মানুষের হয়ে এই প্রশ্ন কি আমি করতে পারি?

আর দুর্নীতি? ১১ জানুয়ারি যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তাদের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে প্রাথমিকভাবে স্বাগতই জানিয়েছে জনগণ। কিন্তু সেখানেও যেন কেন এক যাত্রায় দুই ফল ফলতে শুরু করেছে। আমরা সুশীল-বান্ধব পত্রিকায় প্রমাণহীন রিপোর্টে দেখেছি, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা শত শত কোটি টাকা দুর্নীতি করেছেন। কিন্তু অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তিনি একটি গাড়ির নম্বর জালিয়াতি করেছেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হলো দুর্নীতির অভিযোগে। কিন্তু ড.

www.pathagar.com

কামাল হোসেনের মাসিক আয় মাত্র ৬০ হাজার টাকা? সেভাবেই তিনি আয়কর দিয়েছেন। তার অ্যাকাউন্ট চালু আছে। সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহ্ছানুল হক মিলন ছিনতাই করতেন? তার বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে। এনটিভি-আরটিভির শেয়ার হোল্ডার সাবেক সংসদ সদস্য মোসাদ্দেক আলী ফালু বিরাট দুর্নীতিবাজ? তার বিরুদ্ধে ত্রাণের টিন আত্মসাতের মামলা হয়েছে। এ রকম ধারাই এখন চলছে। ফলে ধারণা করা যায়, অচিরেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে পারে অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সে অবস্থা কারো জন্য সুখকর হবে না। কেন এমন হচ্ছে? একজন উপদেষ্টা বলেছেন, পত্রিকার রিপোর্ট দেখে তারা দুর্নীতিবাজ শনাক্ত করছেন। পত্রিকাগুলো তাদের সহযোগী ভূমিকা পালন করছে। পত্রিকাই তাদের পার্লামেন্ট। এ এক ভয়াবহ শনাক্তকরণ পদ্ধতি। পত্রিকাগুলোতে প্রতিদিন অসংখ্য মতলবি রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে। তথ্য প্রমাণ ছাড়াই যার যা খুশি লিখছে। সেগুলোকে 'বেদবাক্য' ধরলে বড় ভুল হয়ে যাবে। এসব ভুল অ্যাকশন-রিঅ্যাকশনের জন্ম দেবে। যা দেশকে এক ভয়াবহ অরাজকতার দিকে ঠেলে নিতে পারে। পত্রিকায় কারো বিরুদ্ধে রিপোর্ট বের হলেই তাকে যেন দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত না করা হয়। বরং সেসব রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরই যেন কেবল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তা না হলে ন্যায়বিচারও নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ ছিল ৯০ দিনের মধ্যে একটি নির্বাচন করা। সে ৯০ দিন পার হয়ে গেছে। তারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ভাবছেনই না। কবে নির্বাচন হবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আইন প্রণয়ন করা তাদের কাজও নয়, এখতিয়ারও নেই। কিন্তু আইন প্রণয়নের ঘোষণা তারা দিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের রদকৃত কালো ধারা তারা পুনর্বহাল করছেন, এসব বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম।

হকার উচ্ছেদ আর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই বাড়ছে। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। ১০ টাকার ফুলকপি ২০ টাকা, ১০ টাকার আলু ১৮, ১৬ টাকার ডিম ২০ টাকা, ৭৫ টাকার মুরগি ১০৫ টাকা। একদিকে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস কিংবা ক্রয়ক্ষমতা লুপ্ত, অপরদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। কমে গেছে রাজস্ব আয়। আমদানি কমেছে। বিনিয়োগ কমেছে। আতঙ্ক বেড়েছে। এসব দিকেও নজর দিতে হবে সরকারকে।

বাংলাদেশে প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে মানুষের কর্মযজ্ঞ দেখে আমি অভিভূত ছিলাম। আমার সোনার দেশের সোনার মানুষ সব। সে কর্মযজ্ঞে এখন ধস নামছে। এ পরিস্থিতি আমাদের পেছনে ঠেলবে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ নির্বাচন। এখন নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির নামে যা চলছে, তাতে লোম বাছতে কম্বল উজাড় না হয়ে যায়।

যেভাবে শুরু হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ। এখন ঠিক সেভাবে চলছে না। প্রভাব ফিরে আসতে শুরু করেছে। পক্ষপাত দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ যত বাড়বে, ততই এসব প্রভাবের আওতা বাড়বে। সে অবস্থা কারো জন্য কল্যাণকর হবে না।

১১.০৩.২০০৭

www.pathagar.com

আ. লী. মহারাজ সাধু হলো আজ, বিএনপি চোর বটে

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গত ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'এখন চোর চোর মহাচোরদের ধরা হচ্ছে। এই চোরদের ধরতে হবে। যৌথ বাহিনী এই চোরদের ধরার জন্য যা করছে, সেগুলোতে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছে। তবে ব্যালান্স করার জন্য যাতে নিরীহ মানুষকে না ধরা হয়।' তিনি বলেন, 'ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা ক্ষমতায় গেলে সবকিছুর বৈধতা দেয়া হবে।'

চারদলীয় জোটের শাসনকালে (২০০১-২০০৬) আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ তার দলের নেতা-পাতি নেতাদের প্রধান স্লোগান ছিল– 'বিএনপি নেতারা সব চোর, মহাচোর।' তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই 'চুরি'র লম্বা লম্বা ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন তারা। সে 'চুরি'র অঙ্কও তারা বের করেছিলেন- ১,৮৬,৬৭৩ কোটি টাকা। আওয়ামীতোষক পত্রপত্রিকাগুলোও এ অঙ্ক বারবার তুলে ধরেছে। তারা আবার একটা বিভাজনও করেছিল– কোন মন্ত্রী কত টাকা 'চুরি' করেছে। কিন্তু সবই ছিল 'বাতকে বাত'। এর একটি দুর্নীতিরও প্রমাণ কেউ কোনো দিন তুলে ধরেননি। না আওয়ামী লীগ নেতারা, না তাদের ঢাকবাদক মিডিয়া। এসব কথা আওয়ামী নেতারা পত্রপত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেছেন। জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন। পথসভায় অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে বলেছেন। ফলে তারা সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা দিতে সক্ষম হন যে, বিএনপি নেতারা বহু টাকার দুর্নীতি করেছে!

আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব জনাব তারেক রহমানকে। শেখ হাসিনা যে 'মহাচোর মহাচোর' বলে রব তুলেছিলেন, তাও জনাব তারেককে লক্ষ্য করে। আর সেসব প্রমাণহীন অভিযোগের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত গত ৭ মার্চ অনির্বাচিত জবাবদিহিতাহীন সরকার তারেক রহমানকে গ্রেফতার করেছে। তার গ্রেফতারের পর বোঝা গেল, শোনা কথা ছাড়া জনাব তারেকের বিরুদ্ধে সরকারের হাতে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। আর তাই তার গ্রেফতারের পর ৮ মার্চ তার বিরুদ্ধে এক কোটি টাকা চাঁদাবাজির মামলা হলো। যে মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হলো, গ্রেফতারের দিন

www.pathagar.com

সে মামলা দায়েরই করা হয়নি। এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে তারেক রহমান কোনো রকম দুর্নীতি করেননি? ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি এক কোটি টাকা চাঁদাবাজি করেছেন? এও কি সম্ভব?

আবার মামলাটি দায়ের করলেন বাতিল ঘোষিত ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে মনোনীত আমিন আহমেদ ভূঁইয়া। অভিযোগে জনাব ভূঁইয়া বলেছেন, তারেক রহমান গত ৩০ ডিসেম্বর (বিএনপি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার দুই মাস পর) তাকে হাওয়া ভবনে ডেকে নিয়ে ১ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন। 'ওই টাকা না দিলে আমাকে ঠিকাদারি ব্যবসা করতে দেয়া হবে না বলে হুমকি দেয়। অনন্যোপায় হয়ে সে দিনই ১ কোটি টাকার চেক নিয়ে আমি তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে চেক গ্রহণ না করে নগদ টাকা দিতে বলেন। আমি ওই চেক ক্যাশ করে ৪ জানুয়ারি আমার ছোট ভাই আবদুল হাইয়ের মাধ্যমে দুটি ব্যাগে করে ১ কোটি টাকা হাওয়া ভবনে পাঠাই। তারেক রহমান সরাসরি টাকা গ্রহণ না করে পিএস অপুকে দিতে বললে আমার ছোট ভাই হাওয়া ভবনের বাইরে গিয়ে অপুকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এসে আমাকে জানিয়েছে।'

জনাব আমিন আহমেদ মামলাটি দায়ের করেন ৮ মার্চ বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে। গুলশান থানা কর্তৃপক্ষ সেদিনই মামলার এফআইআর দ্রুত বিচার আইনের ৩/১ ধারায় গ্রহণ করে এবং তাকে চার দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও বৈধ কি না, তা নিয়েও আদালতে রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৮৯৭ সালের পুলিশ রেগুলেশনের বিধান এবং হাইকোর্টের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে তাকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন একজন আইনজীবী। পুলিশ রেগুলেশনের ৪৫৮ ধারায় দুই রকমের আসামিকে রিমান্ডে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এই দুই শ্রেণীর আসামির মধ্যে রয়েছে, 'কেউ যদি সর্বনিম্ন তিন বছর সাজা ভোগ করে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার একই রকম অপরাধে লিপ্ত হয় এবং কোনো আসামীকে গ্রেফতারের পর যদি তার ঠিকানা অজ্ঞাত থাকে অথবা তার অতীত জীবনের ইতিহাস জানা না থাকে।' ওই দুই শ্রেণীর আসামির বাইরে অন্য কোনো আসামিকে রিমান্ডে নেয়ার এখতিয়ার পুলিশের নেই। এ ছাড়া হাইকোর্ট বিভাগের একটি রায়ে নির্দেশনা আছে যে, রিমান্ডে নেয়ার আগে আসামিকে ডাক্তারের পরীক্ষা করাতে হবে এবং রিমান্ড শেষে তাকে একই ডাক্তারের মাধ্যমে পরীক্ষা করাতে হবে। তারেক রহমান আগে কোনো অপরাধ করেননি এবং জেল খাটেননি। তা ছাড়া তার ঠিকানা ও অতীত ইতিহাস সবারই জানা। তা সত্ত্বেও তাকে কেন রিমান্ডে নেয়া হলো? সে কি শুধু আওয়ামী নেতাদের বাকোয়াজি ও পত্রপত্রিকার ভিত্তিহীন খবরের ওপর ভিত্তি করে? তা-ই যদি হয়, তাহলে সেটা খুবই দায়িত্বহীন সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিকে অভিযোগকারী জনাব ভূঁইয়া বলেছেন, তিনি চাঁদার টাকা দিতে নিজে যাননি। তারেক রহমান নিজে সে টাকা গ্রহণ করেননি। টাকার লেনদেন হাওয়া ভবনেও হয়নি।

www.pathagar.com

তা সত্ত্বেও তিনি দোষী হবেন? আমিন আহমেদ ভূঁইয়া যেদিন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা করেন, সেদিনই অর্থাৎ ৮ মার্চ কাফরুল থানা পুলিশ তারেক রহমানের বিরুদ্ধে একটি জিডি করেন। জিডিতে বলা হয়, 'তারেক রহমান বিগত জোট সরকারের আমলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মিলে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে মিডিয়ায় এসেছে। কাজেই এসব অপরাধের সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাকে আটক রাখা প্রয়োজন।' জনাব তারেকের বিরুদ্ধে এই সাধারণ অভিযোগ দায়েরের কথা পুলিশের মনে পড়ল বিএনপি ক্ষমতা থেকে যাওয়ার ৫ মাস পর তাকে গ্রেফতারের পরদিন। তার আগে মনে না পড়াটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

চাঁদাবাজির অভিযোগকারী আমিন আহমেদের বক্তব্যও খানিকটা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, তারেক রহমান গত ৩০ ডিসেম্বর তার কাছে চাঁদা দাবি করেছেন। কিন্তু গত বছর ২৮ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে আওয়ামী লীগ ও তার জোট (পরে মহাজোট) সারাদেশে চরম অরাজকতা সৃষ্টি করে। সেদিনই তারা প্রকাশ্য রাজপথে পিটিয়ে হত্যা করে সাতজন নিরীহ নাগরিককে। তার পর থেকেই চলতে থাকে আওয়ামী সহিংসতা। হত্যা, হরতাল, অবরোধ আর খিস্তিখেউড়ের রাজনীতি শুরু করে তারা। ফলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে দেশে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয়। লগি-বৈঠা-বন্দুক নিয়ে হামলা চালাতে শুরু করে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর। কোণঠাসা হয়ে পড়ে বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের নেতাকর্মীরা। আওয়ামী অচলাবস্থা সৃষ্টির সময় কার্যত বিএনপি নেতাকর্মীদের করার কিছুই ছিল না। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য তারা দাবি করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে। বিএনপি তখন ক্ষমতায় ছিল না। নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়াও সুনিশ্চিত ছিল না। বরং ১৪ দলের জোট নেতাদের ভাষায় তখন দেশ ওঠা-বসা করছিল শেখ হাসিনার কথায়। সে রকম একটি সময়ে হুমকি দিয়ে চাঁদা চাইলেন তারেক রহমান? আর আমিন আহমেদ সে সময় বিএনপি নেতা তারেক রহমানকে ১ কোটি টাকা চাঁদা দিতে গেলেন কেন? তখন তো তার চাঁদা দেয়ার কথা শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের কাউকে। ব্যাংকে অস্বাভাবিক লেনদেনের ওপর আগে থেকেই তো নজরদারি ছিল। তিনি ব্যাংকে চেক দিয়ে ১ কোটি টাকা তুলে আনলেন ৪ জানুয়ারি। ৮ মার্চ পর্যন্ত তারও কোনো খোঁজখবর হলো না? কিন্তু ব্যাংকে ১ কোটি টাকার চেক দিয়ে গিয়াসউদ্দিন আল মামুন ঠিকই ধরা পড়ে গেলেন। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল না?

ঘটনাটি ঘটেছে ৪ জানুয়ারি, তিনি অভিযোগ দায়ের করলেন ৮ মার্চ। কেন তিনি এত দিন বসে থাকলেন? আগেই বা কেন অভিযোগ দায়ের করলেন না? তার আগে ১১ জানুয়ারিই তো জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। নতুন ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বিএনপি'র লোকদের ধরপাকড় শুরু হয়েছে। তবু তিনি বসে

www.pathagar.com

থাকলেন দুই মাস? এবং তারেক রহমানকে গ্রেফতারের পরদিন, তাকে আদালতে হাজির করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি মামলাটি দায়ের করলেন? তিনি সজ্জন ব্যক্তি। বিএনপি আমলে ব্যবসা করে তিনি গুলশানে সুরম্য ভবন 'উদয় টাওয়ার' নির্মাণ করেছেন। কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তার এই বিশাল বিত্ত নিয়ে তো কেউ প্রশ্ন তুলল না। তার অর্থ, বিএনপি শাসনামলে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সৎ পথেও বিপুল বিত্তের মালিক হওয়া সম্ভব ছিল। শুধু দুর্নীতি করেই সবাই বিত্তবান হয়নি।

এদিকে পুলিশের জিডিতে অভিযোগ করা হয়েছে, তারেক রহমান এবং তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মিলে বিপুল বিত্তের মালিক হয়েছেন বলে মিডিয়ায় এসেছে। মতলবি মিডিয়া প্রমাণহীনভাবে বলল, অমুক দুর্নীতি করেছে। আর অমনি তিনি দুর্নীতিবাজ হয়ে গেলেন? অমনি তাকে আটক করতে হবে? কোনো তথ্য-প্রমাণ লাগবে না? বোঝা গেল, পুলিশের হাতেও কোনো অভিযোগ নেই। তথ্য-প্রমাণ নেই। 'মিডিয়ায় এসেছে' বলেই তিনি দোষী হয়ে গেলেন? তাকে আটক রাখার প্রয়োজন হলো? মিডিয়া কোনো বেদ-বাইবেল নয়। বরং কখনও কখনও সত্য উদঘাটন না করে তারা অনুমানভিত্তিক খবর প্রকাশ করে থাকে। তাদের খবরের সূত্র থাকে না। 'জানা যায়', 'শোনা যায়', 'ধারণা করা হয়' প্রভৃতি সূত্রে তারা খবর প্রকাশ করেন। তার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। ফলে মিডিয়ার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভারী বিপজ্জনক পদক্ষেপ। আমরা চাই, দুর্নীতিবাজদের শাস্তি হোক। সবাই এটা চায়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃতই দুর্নীতিবাজ কি না, সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে। তা না হলে এসব উদ্যোগ ভেস্তে যেতে বাধ্য।

শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, 'চোর চোর মহাচোরদের ধরা হচ্ছে।' এতে তিনি বিশেষভাবে আহ্লাদিত হয়েছেন। বিএনপি'র লোকেরা যে, 'চোর চোর মহাচোর', সে কথা গত পাঁচ বছরে তিনি অসংখ্যবার বলেছেন। এখনো বলে যাচ্ছেন। কিন্তু তার ভাষাতেই বোঝা গেল, কেবল বিএনপিতেই চোর বা মহাচোররা নেই। সে চোর-মহাচোররা আছে তার খুব ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যেও। ইতোমধ্যে চোর-মহাচোর হিসেবে গ্রেফতার হয়েছেন, তার দলের মোহাম্মদ নাসিম, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, চট্টগ্রাম মেয়র এ বি এম মহিউদ্দীন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, হাজী সেলিম, কামাল মজুমদার প্রমুখ। 'চোর-মহাচোরে'র তালিকায় আছেন তার তুলসীপাতা দলের শেখ হেলাল, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান বাহাউদ্দীন নাছিম, সাকো'র সৈয়দ আবুল হোসেন, জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, শেখ হাসিনার সাবেক এপিএস রবিউল মুক্তাদির, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শেখ মো: আবদুল্লাহ, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত শিকদার, আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সোনা রফিক, মহিবুর রহমান মানিক, হাবিবুর রহমান মোল্লা, যশোর আওয়ামী লীগ প্রধান আলী রেজা রাজু প্রমুখ।

www.pathagar.com

এরা সবাই গ্রেফতার হলে, ধারণা করি, শেখ হাসিনা আরও আহ্লাদিত হবেন। কিন্তু এত চোর-মহাচোরদের নিয়েই তো এত দিন তিনি রাজনীতি করেছেন। তাদের মন্ত্রী বানিয়েছেন, এমপি বানিয়েছেন, নেতা বানিয়েছেন। কাছে টেনেছেন। তিনি যদি জানতেনই যে, এরা সব চোর-মহাচোর, তাহলে তাদের নিয়ে রাজনীতি কিভাবে করলেন? কিভাবে প্রশ্রয় দিলেন? নাকি তিনি বলবেন, 'তৎকালীন পরিস্থিতিতে এসব চোর-মহাচোরকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিকই ছিল।' শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশাল গঠনকে সমর্থন করে তিনি বলেছিলেন, 'তৎকালীন পরিস্থিতিতে বাকশাল গঠন সঠিক হয়েছিল।'

দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র চলে যাওয়ার আগে তিনি যা বললেন, তাতে প্রমাণিত হলো– 'চোর-মহাচোর' শুধু বিএনপিতে নেই, তার দলেও রয়েছে বহুসংখ্যক 'চোর মহাচোর', যাদের তিনি দীর্ঘকাল আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। তিনি এখন নিশ্চয়ই এসব আওয়ামী 'চোর-মহাচোর'দের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাইছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় এর চমৎকার সাযুজ্য আছে। কবিতায় আছে, উপেনের ছিল দুই বিঘা জমি। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান বাগান করার জন্য মিথ্যা মামলা দিয়ে উপেনের কাছ থেকে সে জমি কেড়ে নিল জমিদার বাবু। ১৫-১৬ বছর বাইরে কাটিয়ে উপেন নিজের ভূমিতে ফিরে এল। দেখল তার আমলের একটা আমগাছ আছে শুধু। উপেন বসল তার নিচে। দুটি আম পড়লে সে কুড়িয়ে নিল। ভাবল, তার পুরানো জমি তাকে দয়া করেছে। আম দুটিকে সে শ্রদ্ধায় কপালে ছোঁয়াল কয়েকবার। তখন মালী এসে চোর বলে তাকে ধরে নিয়ে গেল বাবুর কাছে। মালী কিছুই শুনল না, বাবু চিনল না তাকে। বাবু মাছ ধরছিলেন। "শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন'।/বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ/আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়।'/বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।'/আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে–/তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।" এত সব 'চোর-মহাচোর' নিয়ে, মিগ কেলেঙ্কারি, শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি, যমুনা ব্রিজ কেলেঙ্কারি সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সাধুই থাকলেন। আর এখন পর্যন্ত প্রমাণহীন সব অভিযোগে বিএনপি হলো 'চোর-মহাচোর'।

২১.০৩.২০০৭

www.pathagar.com

....সবে দাও পাজিদের জাত মেরে

গত ১০ মার্চ 'প্রতিদিনই ২৪ পৃষ্ঠা'র এক সংবাদপত্র দারুণ এক খবর ছেপে ফেঁসে গেছে। এসব সংবাদপত্র পড়ে খবর আর কল্পকাহিনীর মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানা যায় না। প্রতিদিনই এ ধারার সংবাদপত্রগুলো যেসব কল্পকাহিনী ছাপছে, তাকে আর যা-ই হোক খবর বলা যায় না। চরিত্র হনন, শাসক শ্রেণীকে প্রভাবিতকরণ এবং অন্যায়- অযৌক্তিকভাবে কাউকে কাউকে সাজা দিতে আটক করতে উদ্বুদ্ধ করার মতো কাজ। আশ্চর্য, এরা যেসব কল্পকাহিনী ছাপছে, তার যৌক্তিকতা বিবেচনা না করেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিচ্ছে, তার ফলে ন্যায়বিচার এখন পরাস্ত হওয়ার উপক্রম।

দেশ থেকে জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতিকে নির্মূল করার জন্য এ যেন এক মরিয়া প্রয়াস। ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন, নাজমুল হুদা গ্রেফতার হয়েছেন, তরিকুল ইসলাম গ্রেফতার হয়েছেন, মির্জা আব্বাসসহ বহু বিএনপি নেতা গ্রেফতার হয়েছেন, তারেক রহমান গ্রেফতার হয়েছেন। তাহলে বিএনপির সাবেক এমপি সাইদ এস্কান্দার কেন গ্রেফতার হবেন না? সুতরাং, হে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করুন। এই যে আমরা তার কল্পকাহিনী ফেঁদে দিলাম। আর কি!

গত ১০ মার্চ 'সামরিক সরঞ্জাম কেনায় দুর্নীতি/সাইদ এস্কান্দারের অদৃশ্য হাত?' শিরোনামে পত্রিকাটি এক কাহিনী ফেঁদেছে। সে কাহিনীতে বলা হয়েছে, 'জোট সরকারের আমলে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েক শ' কোটি টাকার সামরিক সরঞ্জাম কেনা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, তৎকালীন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর আপন ভাই সাবেক সংসদ সদস্য অব: মেজর সাইদ এস্কান্দারের পৃষ্ঠপোষকতা ও অদৃশ্য প্রভাবের কারণেই এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে এত বিপুল অঙ্কের ব্যবসায় পেতে কোনো বেগ পেতে হয়নি।' কাহিনী শুরুটা এমনই। 'অভিযোগ রয়েছে'– এটাই হলো সংবাদের সূত্র। সংবাদপত্রের দায়িত্ব অভিযোগ তুলে ধরা নয়। অভিযোগ সত্য কি না সেটা যাচাই করে তুলে ধরা। আমি অভিযোগ করলাম যে, 'ওই পত্রিকার কর্তাব্যক্তি পত্রিকার প্রভাব খাটিয়ে ৫০০ কোটি টাকা চাঁদাবাজি করেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগটি সত্য হয়ে গেল? আমাকে সে অভিযোগের পক্ষে তথ্য প্রমাণ তুলে ধরতে হবে না? যদিও সম্প্রতি

www.pathagar.com

ওই প্রত্রিকার একাধিক 'সাংবাদিক' চাঁদাবাজির দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন। তারপরও কিন্তু প্রমাণিত হয় না, ওই চাঁদাবাজির ভাগ পত্রিকার কর্তাব্যক্তি গ্রহণ করতেন। 'অভিযোগ রয়েছে'। কিন্তু অভিযোগটি কে করল, তারও উল্লেখ নেই। তাহলে এ অভিযোগ কি হাওয়া থেকে এল? যে অভিযোগ হাওয়া থেকে সংগ্রহ করতে হয়, তা কেমন করে সংবাদের ভিত্তি হতে পারে?

গত ২৩ মার্চ ওই খবর সম্পর্কে সেনা সদর দফতর ও বিমান বাহিনী সদর দফতর থেকে পাঠানো খবর ছেপেছে পত্রিকাটি। আমরা এক এক করে অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

প্রথমত, "জানা গেছে, গত জোট সরকারের সময় কেনা বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে শুধু ১৬টি জঙ্গী বিমানেই ৬২ কোটি টাকা বাড়তি গুনতে হয়েছে সরকারকে। এই টাকা পরিবহন ও অন্যান্য খরচের নামে 'কমিশনভোগী' চক্রের পকেটে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।" আশ্চর্য, এর নাম খবর? 'জানা গেছে' দিয়ে প্যারা শুরু 'অভিযোগ রয়েছে' দিয়ে শেষ।

কাহিনীতে বলা হয়, 'সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর সঙ্গে কথা বলে এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জোট সরকারের আমলে ৮২৫ কোটি টাকায় চীন থেকে যে ১৬টি জঙ্গি বিমান কেনা হয়েছিল, তা নিয়ে তখনই অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল।' অভিযোগের আঙুল ছিল সরাসরি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভাই এবং বিএনপির সংসদ সদস্য মেজর অবঃ সাঈদ এস্কান্দারের দিকে। আবারো একই রকম হাওয়াই 'অভিযোগ'।

পত্রিকাটি লিখেছে, ১২টি যুদ্ধবিমান ও ৪টি প্রশিক্ষণ বিমান ক্রয়ের জন্য, 'দুইবার এ দরপত্রটি ডাকা হয়। প্রথমে বিজনেস সার্ভিসেস লিমিটেড নামে চীনের একটি সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে দরপত্রে অংশ নিয়ে নিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়। সে অনুযায়ী চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনের জন্য তারা সব ধরনের প্রস্তুতিও নেয়। কিন্তু এ সময় কয়েকটি শর্তে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে চীনের সংস্থাটির মতৈক্য না হওয়ায় চুক্তিটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। প্রথম দফায় যে শর্তগুলোর কারণে জঙ্গি বিমান কেনা চুক্তি সই হয়নি, দ্বিতীয় দফায় সে শর্তগুলো মেনে নিয়েই প্রতিটি বিমান ৫০ লাখ টাকা বেশি দামে চীনের ওই সংস্থাটির কাছ থেকে কেনা হয়। এভাবে শুরু থেকেই এ বিমানগুলো কেনায় দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ায় সরকারের ঘাড়ে বাড়তি প্রায় ৮ কোটি টাকার বোঝা চাপে।'

এ সম্পর্কে বিমান বাহিনী দফতর জানিয়েছে, প্রথম দরপত্রে বিজনেস সার্ভিসেস লিমিটেড নামে চীনের কোনো সংস্থারই স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে দরপত্রে অংশ নেয়নি। তাই ওই সংস্থার নিম্ন দরদাতা হওয়া বা তাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার কথা সত্য নয়। তাই বিমানপ্রতি ৫০ লাখ টাকা বেশি দাম দেয়া ও সরকারের ঘাড়ে বাড়তি প্রায় ৮ কোটি টাকার বোঝা চাপার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক ও বিভ্রান্তিকর। অর্থাৎ,

www.pathagar.com

বিজনেস সার্ভিসেস লিমিটেডের নামে দুর্নীতির 'তথ্য'টি সম্পূর্ণ অসত্য ও এক মতলবি কল্পকাহিনী।

বিমান বাহিনী সদর দফতর জানিয়েছে, "প্রকৃত সত্য হলো, বাংলাদেশ সরকার বিমান বাহিনীকে চীন সরকারের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে এফ-৭ বিজি/এফটি-৭ বিজি অথবা এর উন্নত সংস্করণ যুদ্ধবিমান ক্রয় করার অনুমোদন দেয়। সন্তোষজনক বিমান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিমানের মূল্য, পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোর আবশ্যকতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বিমান বাহিনী ১৬টি এফ-৭ বিজি/এফটি-৭ বিজি বিমান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং চীনা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কমিশন অব সায়েন্স, টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি ফর ন্যাশনাল ডিফেন্স (সিওএসটিআইএনডি)-এর সঙ্গে কারিগরি ও বিমানের মূল্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই দফায় ২৬টি আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। উল্লেখ্য, এই ক্রয়ে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে বিধায় সব মিলিয়ে এ প্রকল্পের জন্য খরচ দাঁড়ায় ১১ কোটি ৭৯ লাখ মার্কিন ডলার, যেখানে বাজেটারি প্রস্তাবে মূল্য দেখানো হয়েছিল ১২ কোটি ৪৯ লাখ মার্কিন ডলার। ফলে ওই ক্রয়ে সরকারি অর্থের অনেক সাশ্রয় হয়েছে। কাজেই এই ক্রয় পত্রিকায় উল্লিখিত কোনো 'দুর্নীতির আশ্রয়' নেয়া হয়নি বা 'সরকারের ঘাড়ে অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে বাড়তি কোনো বোঝাও' চাপানো হয়নি।"

তা হলে কী প্রমাণিত হলো? প্রমাণ হলো, এই খবরের 'জানা গেছে' সূত্রটি বানোয়াট ও অসত্য। বিজনেস সার্ভিসেস লিমিটেডের টেন্ডারে অংশ নেয়ার খবরটি অসত্য ও বানোয়াট, সরকারের ১২ কোটি টাকা ক্ষতি হওয়ার খবরটি অসত্য ও বানোয়াট, 'কমিশনভোগী চক্রের' টাকা হাতিয়ে নেয়ার খবরটিও অসত্য ও বানোয়াট। কী দাঁড়াল? পত্রিকাটি অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাইদ এস্কান্দার দুর্নীতি করেছেন বলে লাখ লাখ পাঠককে জানান দিতে চেয়েছিল।

পত্রিকার রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়, 'এ জঙ্গি বিমানগুলোর পরিবহন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ কোটি ৫৪ লাখ ডলার ধরা হয়েছিল। কিন্তু পরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে পেশ করা প্রতিবেদনে দেখা যায়, এ খরচ প্রায় ৯০ লাখ ডলার বেড়ে ২ কোটি ৪৩ লাখ ডলারে গিয়ে ঠেকেছে।' রিপোর্টের এ অংশও মতলবি।

বিমান বাহিনী সদর দফতর বলেছে, পত্রিকার এ বক্তব্যও সঠিক নয়। চুক্তিতে ১ কোটি ৫৪ লাখ ডলার বা ২ কোটি ৪৩ লাখ ডলার বলে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। এর যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মূল্য ২ কোটি ৩৭ লাখ ৬৫ হাজার ডলার লাগার কথা ছিল। পরিবহনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০ লাখ ৬০ হাজার ডলার। কিন্তু 'বিমানগুলো বাংলাদেশের বৈমানিকেরা চীন থেকে উড়িয়ে এনেছেন। ফলে সরকারের ৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার সাশ্রয় হয়েছে।' এ থেকে প্রমাণিত হলো, এ ক্ষেত্রেও পত্রিকাটির ভাষ্য অসত্য, উদ্দেশ্যমূলক, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট।

www.pathagar.com

পত্রিকাটি লিখেছে, "অনুসন্ধানে জানা যায়, বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে 'এভিয়া ট্রেড লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা সামরিক বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যবসায় করেছে। আর এই এভিয়া ট্রেড লিমিটেডের মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শোনা যায় সাইদ এস্কান্দারের নাম। কৌশলগত কারণে এভিয়া ট্রেড লিমিটেডের কাগজপত্রে সাইদ এস্কান্দারের নাম রাখা হয়নি। তবে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহে জড়িত ব্যবসায়ীদের অনেকেই প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন, গত জোট সরকারের আমলে এভিয়া ট্রেডের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছেন সাইদ এস্কান্দার। এ কারণে এভিয়া ট্রেড লিমিটেড জোট সরকারের আমলে সামরিক সরঞ্জাম কেনাকাটার দরপত্রে অংশ নিয়ে অনায়াসে একের পর এক কার্যাদেশ পেয়েছে। জঙ্গি বিমান ছাড়াও জোট সরকারের আমলে এভিয়া ট্রেড লিমিটেড সামরিক বাহিনীর জন্য ডিফেন্স রাডার, ৮০টি আর্মার্ড রিকভারি ভেহিকেল (এপিসি), নৌ বাহিনীর জন্য সারফেস টু এয়ার মিসাইল, ৫টি এমআই-১৭ মডেলের হেলিকপ্টার কেনার মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় এজেন্ট ছিল বলে জানা যায়।"

মধ্যস্থতাকারীরা কমিশন হিসেবে ১০০ কোটি টাকা আয় করে নিয়েছে বলে পত্রিকা যে তথ্য দিয়েছে, তাকে অসত্য বলে অভিহিত করে বিমান বাহিনী সদর দফতরের বক্তব্যে বলা হয়েছে, 'এভিয়া ট্রেডের মাধ্যমে ৫টি এমআই-১৭ মডেলের হেলিকপ্টার কেনার কথাও সঠিক নয়। ২০০৪ সালে ভিজিডিপি'র মাধ্যমে বিমান বাহিনীর জন্য তিনটি এমআই-১৭১ হেলিকপ্টার (এমআই-১৭ এর পরবর্তী ভার্সন) ক্রয় করা হয়েছিল রাশিয়ার এম/এস উলান-উদে এভিয়েশন প্লান্টের কাছ থেকে, যার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ছিল মেসার্স ডাকিভ করপোরেশন, ঢাকা। এ ছাড়া ২০০৫ সালে ভিজিডিপি'র মাধ্যমে আরও দুটি ভিআইপি হেপিকপ্টার এম/এস কাজানহেল জেএসসি রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা হয়েছিল, যার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ছিল মেসার্স এভিয়েশন সাপোর্ট লিমিটেড ঢাকা, এভিয়া ট্রেড নয়।' এখানেও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত কাহিনী সম্পূর্ণ অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এভিয়া ট্রেড নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকার কল্পকাহিনীর জবাব দিয়েছে সেনা সদর দফতরও। তারা বলেছেন, এভিয়া ট্রেড সেনাবাহিনীকে সর্বনিম্ন দরদাতা হয়ে ৬০টি এপিসি সরবরাহ করে (পত্রিকা লিখেছে ৮০টি)। চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করতে না পারায় ২০০৫-০৬ সালে এভিয়ার সঙ্গে দুটি চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এভিয়াকে সেনা সদরে সরবরাহের ব্যাপারে অবরোধ আরোপ করা হয়েছে। সেনা সদর ও বিমান সদরের এই বক্তব্যের সঙ্গে পত্রিকাটি নিজস্ব কোনো বক্তব্য ছাপেনি। অর্থাৎ তাদের রিপোর্টটি যে অসত্য সেটা তারা কবুল করে নিয়েছে। কিন্তু পাঠকের কাছে ও সাইদ এস্কান্দারের কাছে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। তারা তা করেনি।

www.pathagar.com

এই হলো ভালো সব কিছুর সঙ্গে থাকা পত্রিকাটির রিপোর্টের নমুনা। শুধু সাইদ এস্কান্দার নন, পত্রিকাটি প্রায় প্রতিদিন এ রকম কল্পকাহিনী ছাপছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, চাকরিজীবী প্রমুখের বিরুদ্ধে এমন সব আজগুবি কাহিনী ছাপছে। যারা এ দেশে জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাসী, পত্রিকাটি যেন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। তারা বলতে চান, জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী সব লোক অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ। ফলে বাংলাদেশে প্রশাসন থেকে শুরু করে সব পর্যায় থেকে এই ধারার লোকদের অপসারণ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, নির্দলীয় সরকার তাদের সেই ফাঁদে ধরা পড়ছে না তো? তারা যাকে অযোগ্য-দুর্নীতিবাজ বলছে, তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ধারার আদর্শে বিশ্বাসীদের হেয় করার এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ এনে তারা জাতীয়তাবাদী আদর্শের অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে। এদের রুখে দাঁড়াতে হবে। সত্য যেন জয়লাভ করে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এখন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, "মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে,/দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও 'পাজিটার' জাত মেরে।" এই জাত মারার কারবারে সরকার যত কম ধরা দেন, ততই মঙ্গল।

মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত মতলবি রিপোর্টের সত্যাসত্য যাচাই না করে সরকার যদি ব্যবস্থা নেয়, তাহলে সেটা হবে ভারি অবিচার। তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়াই ভালো।

•

০১.০৪.২০০৭

www.pathagar.com

চাই একই যাত্রায় অভিন্ন ফল

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জিহাদে কোথায় যেন ছেদ পড়ছে। মনে হচ্ছে, দুর্নীতি নিয়ে যত তর্জন-গর্জন হচ্ছিল, ততটা বর্ষণ যেন ঘটানো যাচ্ছে না। বিগত জোট সরকারের শাসনামলে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও তার আণুবীক্ষণিক দোসররা দুর্নীতির প্রমাণহীন অভিযোগের ঢাক পিটিয়ে অস্থির করে তুলেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আওয়ামী ঢাকবাদক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। এই দশচক্রে দুর্নীতির ভূত বনে গিয়েছিল বিএনপি। গত ১১ জানুয়ারি আসা নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কেউ কেউ বললেন, দুর্নীতির রোধের জন্য রুই-কাতলাদের ধরা হবে। তার ক'দিন পরই আর এক উপদেষ্টা বললেন, শুধু রাঘব বোয়াল না, চুনোপুটিদেরও ছাড়া হবে না। শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে ১০০ জন কথিত শীর্ষ দুর্নীতিবাজের তালিকা ছেপে দিলেন। বললেন, সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজদের তালিকা দফায় দফায় প্রকাশ করে সম্পদের হিসাব ও টাকার উৎস জানতে চাওয়া হবে। এর ক'দিন পর আর এক উপদেষ্টা বললেন, আর কোনো তালিকা প্রকাশ করা হবে না।

কথিত দুর্নীতির অভিযোগে যাদের আটক করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ দায়ের করা যায়নি। কারো কারো বিরুদ্ধে সদ্য দায়ের করা চাঁদাবাজির মামলা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রমাণহীনভাবে যাদের 'দুর্নীতির প্রতীক' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এখন পর্যন্ত তুলে ধরা যায়নি। এ থেকে বোঝা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারও শোনা কথার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। দুর্নীতির অভিযোগে আটক রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে এমন সব মামলা দায়ের করতে হচ্ছে, যাকে যৌক্তিক বলে মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবচেয়ে বড় জিহাদ শুধু রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, রাজনীতিকরাই শুধু দুর্নীতি করে, আমরা ব্যবসায়ীরা সব ধোয়া তুলসীপাতা। তা কী করে হয়? কিন্তু সে রকমই তো হচ্ছে। সরকার যেহেতু অতিমাত্রায় আমলানির্ভর, সে কারণে আমলারা সব 'লক্ষ্মী' আর রাজনীতিকরা 'পচা'– এ ধারণা ভালো নয়। দেশে আমলাতন্ত্রের বাইরেও শত শত যোগ্য, দক্ষ ও সৎ মানুষ আছেন। যেকোনো আদর্শের রাজনীতিতে তাদের সংশ্লিষ্টতা থাকলেই যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততা লোপ পেয়ে যায় না। ভিন্নভাবেও বিষয়গুলো দেখা যেতে পারে। ধরা যাক,

www.pathagar.com

বিএনপি'র আমলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন সমপদমর্যাদার দুই আমলা। তাদের একজনের চুক্তি বাতিল করে দেয়া হলো জোট সরকারের আমলে মনোনীত বলে। কিন্তু অপরজন হলেন উপদেষ্টা। এ থেকেও কি প্রমাণিত হয় না যে, বিএনপিও সৎ ও যোগ্য লোকদেরও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছিল? সুতরাং সব কিছু সরলীকরণ করা সঙ্গত হচ্ছে না।

যাক, অন্তত দুজন মানী ব্যক্তির মান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে। রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে তারা মানে বেঁচেছেন। তাদের একজন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। অপরজন পারটেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ হাশেম। আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বাসায় যৌথ বাহিনী হানা দিয়েছিল ৭ মার্চ। উদ্ধার করেছিল বিদেশী মদ ও কিছু টাকা। আর তেমন কিছু সেখানে পাওয়া যায়নি। তিনি প্রায় এক দশক ধরে যোগাযোগমন্ত্রী ছিলেন এরশাদ ও শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায়। বিরাট মন্ত্রণালয়। বিরাট বাজেট। ফলে ধরে নেয়া যায় তিনি একজন মহাচোর। তার বাসা তল্লাশির পর ধারণা করি আত্মগোপন করে ছিলেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। গত ২২ মার্চ তিনি হঠাৎ করেই এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নেয়ার কথা জানিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি রাজনীতি যেমন করছেন না, তেমনি নির্বাচনেও দাঁড়াচ্ছেন না। তিনি বলেছেন, আমার বয়স এখন ষাটের বেশি হয়ে গেছে। রাজনীতিও করেছি প্রায় ২২ বছর। অনেক তো হলো, আর কত। ওই দিনই তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপের সময় জানান, তাকে কেউ গ্রেফতারের জন্য যায়নি। তিনি নিয়মিত ইত্তেফাকে অফিস করছেন। মাত্র ১৫ দিন আগে যাকে গ্রেফতার করার জন্য তার বাসায় হানা দেয়া হলো, ১৫ দিন পর রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা দেয়ার পর তাকে আর কেউ গ্রেফতারের চেষ্টা করছেন না। ভালো খবর। তাহলে রাজনীতি করাটা খুব খারাপ? দেশে কেউ রাজনীতি করবে না? দল করবে না?

এরপর আবুল হাশেমের পালা। সরকারের ঘোষিত শীর্ষ দুর্নীতিবাজের তালিকায় নাম ওঠে আবুল হাশেমের। তখন কেউ কেউ বলছিল তিনি বিদেশে চলে গেছেন। কেউ বলছিল তিনি তিনি আত্মগোপন করে আছেন। এ রকম সময়ে গত ২৮ মার্চ পরিকল্পনা কমিশনে বস্ত্র উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রতিনিধিদল। সে দলে আসেন আবুল হাশেমও। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অনেক কথাই বলেন তিনি। আবুল হাশেম বলেন, 'জিন্দেগিতে আমি আর বিএনপি করব না। বিএনপি তো দূরের কথা, আওয়াম লীগও করব না। দেশের রাজনীতি পচে গেছে। আল্লাহ রহম করছে। দেশ এখন আল্লায় চালাচ্ছে। রাজনীতিতে আসতে চাই নাই আমি। আমাকে জোর কইরা রাজনীতিতে নামানো হইছে। বেগম খালেদা জিয়া জোর করে আমারে বিএনপিতে নামাইছে। বলেছেন, বিএনপিতে আপনার প্রয়োজন আছে। খোদার কসম, বিগত পাঁচ বছরে আমি কোনোরূপ দুর্নীতি বা সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।

www.pathagar.com

সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চিনির দাম আমি বাড়াই নাই। যারা এসব কথা বলছে, তাদের ওপর আল্লাহর গজব পড়ব। কোটি কোটি টাকা দিয়া আমি নমিনেশন পেপার কিনি নাই।' আবুল হাশেম তার যানবাহন সম্পর্কে বলেন, 'হ্যামারগাড়ি বাসায় আছে। বললে এখনই নিয়া আসতে পারি। আমার হ্যামার গাড়ি শুধু কেন, রোলসরয়েস, বিএমডব্লিউসহ বিভিন্ন গাড়ি আছে।'

আবুল হাশেমের এ ঘোষণার পর তাকে আর কেউ ডিসটার্ব করেনি। পরিস্থিতি কি এমন দাঁড়াল যে, কেউ রাজনীতি করবে না ঘোষণা দিলেই তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ বাদ হয়ে যাবে? রাজনীতিতে থাকলে দুর্নীতির অভিযোগে আটক করা হবে? কথিত 'শীর্ষ দুর্নীতিবাজদের কাউকে কাউকে ধরব, কাউকে কাউকে ছেড়ে দেব সেটা ন্যায় বিচার হতে পারে না। যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এখনো তুলে ধরা হয়নি। যাদের আটক করা হয়নি, তাদের বিরুদ্ধেও না। তাহলে খামোখা কেন তালিকায় নাম তুলে দেয়া হলো? এতে তাদের সম্মানের যে হানি হলো, সেটা পুষিয়ে দেয়ার তো কোনো বন্দোবস্ত নেই। তবে কি সরকার বলবে, দুর্নীতিবাজদের তালিকায় শিল্পপতি এম এ হাশেমের নাম দেয়াটা ভুল হয়েছে। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী? পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির যুগে যে কেউ বিত্তবান হতে পারে। দামি গাড়ি কিনতে পারে। দেখতে হবে সেখানে নিয়মকানুন মানা হচ্ছে কি না। নিয়ম মেনে দামি গাড়ি কেউ কিনলে তার গাড়িটি জব্দ করে বেচে দিয়ে কি হাসপাতাল বানানো যাবে? দেশের ভেতরে সে গাড়ি কিনবেই বা কে? যে কিনবে, তার কাছ থেকেও তো সে গাড়ি জব্দ করতে হবে।

এ উদাহরণগুলো টানা হচ্ছে অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজগুলো যাতে স্বচ্ছ, যৌক্তিক ও সুশৃঙ্খল হয়, সে ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এখনো প্রতিদিন হাটবাজারসহ অবৈধ স্থাপনা ভাঙা হচ্ছে। কিন্তু র‍্যাংগস ভবন দাঁড়িয়ে আছে। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বা শেখ হেলাল ধরা পড়ছেন না, কিন্তু ব্যারিস্টার আমিনুল হকের বিরুদ্ধে গাছ চুরির মামলা হচ্ছে। এসব বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে যারা দেখা করতে গিয়েছিলেন, তারা ওএসডি হয়েছেন। কিন্তু জনতার মঞ্চের কর্মকর্তারা আসছেন সামনে। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করতে পারে, নির্দলীয়করণের নামে কি আওয়ামীকরণ হচ্ছে?

রাজনীতি রাজনীতিবিদদেরই করার কথা। কিন্তু এমন যেন মনে না হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাউকে কাউকে ফাঁসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। রাজনীতি কেউ করলেই সে পচে যায় না। আর রাজনীতি করার অধিকার সবারই আছি। সে জন্য কোনো বয়সও নির্ধারিত নেই। সবচেয়ে বড় কথা সততা। এই যে ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জীবনে কোনো দিন রাজনীতি করেননি। কিন্তু ৬৫ বছর বয়সে তার মনে হয়েছে, তিনি রাজনীতি করবেন। বিএনপি-আওয়ামী লীগ বাদ দিয়ে নতুন দল গঠন করবেন। তার নামও তিনি ঠিক করলেন, নাগরিক শক্তি। সংক্ষেপে 'নাশ' পার্টি।

www.pathagar.com

অনেকেই একে ঠাট্টা করে বিনাশ পার্টিও বলেছেন। ই-মেইল, এসএমএস ও ফোন-ফ্যাক্স দিয়ে লোক বসিয়ে দিলেন। দল হয়ে গেল? দল হোক বা না হোক, তাকে তো বাধা দেয়া যাবে না। বলা যাবে না যে, আপনি রাজনীতি করতে পারবেন না। কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনি খানিকটা ঝিমিয়ে গেছেন, সেই তোড়জোর তার আর নেই। রাজনৈতিক দল করা সহজ কথা নয়। রাজনীতির ভেতর দিয়ে যারা আসেন, জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহি করতেই হয়। নইলে পরেরবার আর ভোট পাওয়া যায় না। যে ব্যবস্থা ছিল বলেই গত ১৫ বছরে শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও গড় জাতীয় উৎপাদন ৬ শতাংশের ওপরে ছিল। তাই রাজনীতি রাজনীতিবিদরাই করুন, তবে সে রাজনীতি যেন পরিশীলিত হয়, সেটাই কাম্য।

একইভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে, জাতির পিতা বা বঙ্গবন্ধু ইস্যু নিয়ে। শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা ঘোষণা করেছিল আওয়ামী লীগ। আইন করেছিল। কিন্তু জবরদস্তির সে আইন টেকেনি। আর এটা অনির্বাচিত সরকারের কাজ নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান। (দেখুন, নয়া দিগন্ত, ৪ এপ্রিল ২০০৭)।

আর এক উপদেষ্টা পড়েছেন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। পাঠ্যপুস্তকে শেখ মুজিবের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' নেই। কী সাংঘাতিক কথা। এসব বই সংশোধন করে শেখ মুজিবের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' যোগ করার কথা বলেছেন তিনি। শেখ মুজিবের নাম বঙ্গবন্ধু নয়। একটা চালু কথা। যেমন শেখ হাসিনার নামের আগে দেশরত্ন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নামের আগে পল্লীবন্ধু যোগ হয়েছে। এগুলো তাদের নামের অংশ নয়। আর বঙ্গবন্ধু কী? কোন্ বঙ্গের বন্ধু তিনি? পূর্ববঙ্গ এখন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি প্রদেশ। অভিন্ন বঙ্গ এক সময় ছিল। তার সঙ্গে আসামও ছিল। পশ্চিমবঙ্গের লোকদেরও বন্ধু কি শেখ মুজিবুর রহমান? অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের সঙ্গে শেখ মুজিবের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' যোগ করার কি সম্পর্ক?

এই সরকারের নাম 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। কিন্তু বর্তমান অনির্বাচিত সরকার যেন আওয়ামী এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করতে বসেছে। আর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এই সরকারকে মনে রাখতে হবে, আওয়ামী আন্দোলনের ফলেই তারা ক্ষমতায় এসেছে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের ধারণা হতে পারে, বর্তমান 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' আওয়ামী লীগের সে হুঁশিয়ারি ভালোই মনে রেখে কাজ করছেন। এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা থাকে না।

০৯.০৪.২০০৭

www.pathagar.com

নিজের রচা ওই কারাগারে আ'লীগ মরিছে ভুগে

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৩ কোটি টাকা চাঁদাবাজির মামলায় জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা স্থগিত করা হয়েছে। তার দেশে ফেরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করে নিয়েছে সরকার। মামলা নেই, তবু বেগম খালেদা জিয়াকে দেশত্যাগের জন্য চাপ অব্যাহত আছে বলেই মনে হয়।

গত ১৫ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দরে বর্তমান সরকারের সব কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, 'ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা ক্ষমতায় এলে সবকিছুর বৈধতা দেয়া হবে।' তখন চমকে উঠেছিলেন অনেকেই। এই ঘোষণা দেয়ার সময়ও আওয়ামী লীগের অনেক মন্ত্রী-এমপি আটক ছিলেন। আটক হয়ে গেছেন বিএনপি'র বহুসংখ্যক মন্ত্রী-এমপি-নেতা-কর্মী। যে ঘটনা ঘটেইনি, ভবিষ্যতে ঘটবে, সেগুলোরও বৈধতা দেয়া যাবে তো? পারবে তো আওয়ামী লীগ? এ প্রশ্ন মুখে মুখে ছিল সবার। দুষ্টু লোকরা তখনই প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাহলে কি শেখ হাসিনার সঙ্গে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গোপন কোনো সমঝোতা হয়েছে? সেরকম সমঝোতা ছাড়া একপক্ষীয়ভাবে এরকম ছাড় দেয়ার ঘোষণা কেন দিলেন শেখ হাসিনা? কট্টর আওয়ামী সমর্থক সুশীল-বান্ধব এক পত্রিকায় লিড হয়েছিল সরকার ও আওয়ামী লীগের সমঝোতার খবর।

কেন যে দিলেন, সে কথাই প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক নয়া দিগন্তে গত ২৪ এপ্রিল। 'দুই উপদেষ্টার সাথে কথা বলেই যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন শেখ হাসিনা' শিরোনামে প্রকাশিত হয় রিপোর্টটি। তাতে বলা হয়, 'সরকারের দুই উপদেষ্টার সাথে কথাবার্তা বলেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন। ভারতের একটি পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তা স্বীকারও করেছেন। এই সফরের নেপথ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল বলেই তিনি যাওয়ার আগে উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর দু'জন এবং সম্পাদকমণ্ডলীর দু'জন নেতা সফর সম্পর্কে সব জানতেন বলে জানা গেছে। এরপর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৩ কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা হয় পরে ১৮ এপ্রিল তার দেশে ফেরার ওপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।' এই চাঁদাবাজির মামলা ও পরে ২০০৬-এর ২৮

www.pathagar.com

অক্টোবরের পল্টন হত্যাযজ্ঞ মামলার চার্জশিটে তার নাম অন্তর্ভুক্তিতে তিনি সাংঘাতিক ক্ষেপে যান এবং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন থেকে নানা ধরনের বক্তব্য দিতে শুরু করেন।

গত ২১ এপ্রিল কলকাতার পত্রিকা স্টেটসম্যানে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, 'সরকার বলেছে, আমি নাকি প্ররোচনামূলক বিবৃতি দিয়েছি। এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।... আসলে আমি ঢাকায় ফিরলে তাদের ক্ষমতায় থাকা বিপন্ন হতে পারে। এতেই তারা ভয় পাচ্ছে। আমি যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে দু'জন শীর্ষ উপদেষ্টা আমাকে নিশ্চিন্তে মাসখানেক ঘুরে আসতে বলেছিলেন। তাদের কথায় বিশ্বাস করে ভুল করেছিলাম। তাদের উদ্দেশ্য আমার কাছে পানির মতো স্পষ্ট। আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। আমার ক্ষেত্রে এরা পাকিস্তান বা মিয়ানমারের কর্তাদের মতো আচরণ করেছেন। বর্তমান সরকারকে আমরা সমর্থন করেছিলাম সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাদের কর্মসূচি আলাদা। নিজেদের নিরপেক্ষ প্রমাণ করতে এরা আমাকে ও খালেদা জিয়াকে একই আসনে বসাতে চাইছেন।'

এদিকে গত ১৮ এপ্রিল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এক প্রেসনোট জারি করে। প্রেসনোটে বলা হয়, 'নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সরকার অবগত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র সফররত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ২৩ এপ্রিল ২০০৭ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বহীন লাগাতার আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতিতে দেশের জনশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত এবং নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে অনিবার্যভাবেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিদেশে অবস্থানকালেও বিভিন্ন সভা-সমাবেশ এবং দেশী ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া প্রদত্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্পর্কে উসকানি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রেখেছেন।

'এমতাবস্থায় শেখ হাসিনা এ সময় দেশে প্রত্যাবর্তন করলে আগের ন্যায় উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান এবং জনশৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালাতে পারেন। এতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটা এবং বিরাজমান স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত এবং জননিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

'আরও উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা নিজেও তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বিগ্ন এবং তার দলের মাধ্যমে সরকারের কাছে বিশেষ নিরাপত্তা সুবিধার আবেদন করেছেন। উল্লিখিত কারণে সরকার জনস্বার্থে বর্তমান অবস্থায় শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গৃহীত এই ব্যবস্থা সাময়িক।

www.pathagar.com

'দেশের সব বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে কর্মরত ইমিগ্রেশন বিভাগ, বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী সব এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অবহিত করা হয়েছে। এ ছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ এবং মহাপুলিশ পরিদর্শককেও এ বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

সরকারের প্রেসনোটটি পাঠকের স্মৃতিতে নাড়া দেয়ার জন্য আবারো তুলে ধরা হলো। এই প্রেসনোট জারির আগের দিন যোগাযোগ উপদেষ্টা অবঃ মেজর জেনারেল এম এ মতিন বলেছিলেন, খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। তাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এর মাত্র একদিনের মধ্যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা ও তার পরদিন খুনের মামলায় চার্জশিট দেয়া হলো। গৃহবন্দী হয়ে পড়লেন বেগম খালেদা জিয়া। তাকে এখনো পর্যন্ত জোর করে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করছে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'।

প্রথম প্রসঙ্গে আসা যাক। দেখা যাচ্ছে শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর আগে সরকারের সাথে তার একটা গোপন সমঝোতা হয়েছিল। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, সমঝোতা অনুযায়ী শেখ হাসিনা মাসখানেকের জন্য নিশ্চিন্তে ঘুরে আসবেন ব্রিটেন-আমেরিকা। এ সময়ের মধ্যে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে খালেদা জিয়াকে দেশান্তরিত করে দেয়া হবে সৌদি আরবে। তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিএনপি নেতাকর্মীদের দুর্নীতির মামলার চার্জশিট দেয়া শুরু হবে।

বিএনপি'র মেরুদণ্ড ভেঙে কিংবা দল ভেঙে তৈরি করা হবে পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জন্য অনুকূল পরিবেশ। আওয়ামী লীগকে সম্ভাব্য সে নির্বাচনে বিজয়ী করা হবে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। তখন আওয়ামী লীগ সংসদে বসে বর্তমান সরকারের সব কার্যক্রম বৈধ করে দিয়ে সুখে-শান্তিতে দেশ শাসন করতে থাকবে। শেখ হাসিনার ভাষ্য অনুযায়ী এমন সমঝোতা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও শেখ হাসিনার সাথে করে থাকে, তবে তা খুবই অনৈতিক কাজ হয়েছে। আর তা না হয়ে থাকলে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই অমন জোর গলায় 'বৈধতা' দেয়ার ঘোষণা দিতেন না। আর এ ধরনের কোনো সমঝোতা হয়ে থাকলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইতোমধ্যেই তো নির্দলীয়ত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কারণ, তারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর ব্যাপারে সমঝোতা করেছেন।

তবে এই ষড়যন্ত্রে শেখ হাসিনা বা উপদেষ্টাদ্বয় কেউই মুদ্রার অপর পিঠটা দেখতে চাননি বা দেখতে পাননি। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই এই সাজানো পট একেবারেই উল্টে গেল। সরকার বাংলাদেশে শেখ হাসিনার প্রবেশ নিষেধ করে দিলো। শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার পক্ষে যা বলা হয়েছে, সেগুলো একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। সেগুলো হলো : ০১. সাম্প্রতিক অতীতে হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও,

www.pathagar.com

লগি-বৈঠার যে আন্দোলন শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা করেছেন সেগুলো দায়িত্বহীন। ০২. তিনি দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন এবং এতে জনশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়েছে। ০৩. তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন উসকানি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রেখেছেন। ০৪. তিনি ভবিষ্যতেও উসকানি দিয়ে জনশৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি ছড়াতে পারেন। ০৫. তিনি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারেন। ০৬. তার কর্মকাণ্ডে দেশের বর্তমান স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে এবং জননিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হতে পারে। ০৭. শেখ হাসিনার এসব ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যই দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে।

অর্থাৎ শেখ হাসিনা যাকে আন্দোলন বলেছেন, বর্তমান সরকার তাকে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বলেছে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞ ও অনির্বাচিত সরকার আসার জন্য শেখ হাসিনাই দায়ী। বিএনপি নয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার 'আন্দোলনের ফসল' তত্ত্বাবধায়ক সরকারই আর দেশে ফিরতে দিচ্ছে না। তিনি তো সব আয়োজনই করে গিয়েছিলেন। কল্পনায় ক্ষমতার মসনদে বসে পড়েছিলেন। কিন্তু এমন এলোমেলো হয়ে গেল, যে তিনি তা ভাবতেই পারেননি। ফেরার অনুমতি পেলেও তার সাজানো বাগানে আবার কবে যে ফুল ফুটবে তাও অনিশ্চিত। তেমনিভাবে শেখ হাসিনা হয়তো সরকারের সাথে সমঝোতা করে গিয়েছিলেন, তার বিদেশে থাকার সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সৌদি আরবে দেশান্তরিতে পাঠানো হবে। শেখ হাসিনার ছেলেমেয়ে দু'জনের কেউই বাংলাদেশী নাগরিক নন। তার ছেলেমেয়েদের কেউ যদি আবেদন করে যে, তার মাকে (শেখ হাসিনা) সেখানে থাকতে দেয়া হোক, তাহলে অনুমোদন পাওয়া যাবে। সেদিক থেকে শেখ হাসিনা ভালো অবস্থানেই ছিলেন বা আছেন।

কিন্তু খালেদা জিয়াকে ওমরাহ করার নামে সৌদি আরবে পাঠালে সেখানে তার থাকা-খাওয়ার কি ব্যবস্থা? থাকবেন কোথায়? সৌদি আরবে ভিসার মেয়াদ শেষ হলে তিনি কোথায় যাবেন? এসব প্রশ্ন প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু এখন বেঁকে বসেছে সৌদি সরকার নিজেই। পত্রপত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, সৌদি সরকার বলেছে, খালেদা জিয়াকে যদি জোর করে পাঠানোর চেষ্টা করে সরকার, তবে তাকে ভিসা দেয়া হবে না এবং বেগম খালেদা জিয়াকে ভিসার জন্য নিজে যেতে হবে দূতাবাসে। বেগম জিয়া তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি যাবেন না দেশের বাইরে। কোনো দোষ করে থাকলে তার জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে রাজি তিনি। তা সত্ত্বেও এখন সরকার তাকে চাপ দিচ্ছে, তিনি নিজে সৌদি দূতাবাসে গিয়ে যেন ভিসা সংগ্রহ করে দেশ ছেড়ে চলে যান। এতেও রাজি নন খালেদা জিয়া।

www.pathagar.com

এখন বেগম খালেদা জিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য সরকার ভিসা সংগ্রহের চেষ্টা চালায়। পরিবারের মোট ১৪ জনের বিরুদ্ধে ভিসার আবেদন করা হলে সে দেশের দূতাবাস বেগম খালেদা জিয়া ছাড়া বাকি ১৩ জনের ভিসা দিয়েছে বলে জানা যায়।

শেখ হাসিনাকে দেশে আসতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত এবং বেগম খালেদা জিয়াকে দেশান্তরি করার চাপ সম্পর্কে দেশের ভেতরে-বাইরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নন, সে অর্থে জনবিচ্ছিন্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নন। বেগম খালেদা জিয়াকে ভিসা না দেয়া এবং ভিসা পেতে তাকে সশরীরে হাজির হতে বলার ভেতর দিয়ে বর্তমান সরকারের প্রতি সৌদি সরকারের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতও তাদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে সরকারকে, খালেদা জিয়ার ভিসা ইস্যু না করে। সরকারকে এসব বার্তা বিবেচনায় নিতে হবে। সৌদি আরবের সাথে সম্পর্কের অবনতির অর্থ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্কের অবনতি। যেসব দেশে বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ কাজ করে শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠায়। রাষ্ট্র তাতে চলে, অর্থনীতি এগোয়। দুর্নীতি রোধের নামে ইউটোপিয়ান সমাজ কায়েমের অলীক স্বপ্ন বাস্তবায়নের অর্থহীন প্রয়াসের চেয়ে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর দেয়া জরুরি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হবে। আমাদের মনে হয়, এখনো সময় আছে। তারা তাদের কাজ সীমিত করে আনতে পারেন। তাদের প্রধান কাজ নির্বাচন করা, টাটার সাথে বিনিয়োগ চুক্তি করা নয়। তারা যদি নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাতে দেশের কল্যাণ, তাদেরও কল্যাণ।

অদূরদর্শী ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করতে গিয়ে এখন মনে হয়, ফেঁসেই গেছেন শেখ হাসিনা। তার রাষ্ট্রধ্বংসী আন্দোলনের সময়ও এই কলামে বারবার লিখেছি, 'যুক্তির পথে আসুন, ধ্বংসের পথে কোনো সমাধান নেই।' কর্ণপাত করেননি কেউ। সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি, এই রাষ্ট্রঘাতী 'আন্দোলন' কারো জন্য সুখের হবে না। হয়ওনি। রাজনীতি নয়, যেভাবেই হোক ক্ষমতা আমার চাই-ই। সে কারণেই এবারো যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি জমানোর আগে আরেক দফা ষড়যন্ত্র করেছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু নিভে গেছে সে আশার আলো। 'সুখের লাগিয়া' কল্পনায় যে ঘর তিনি বেঁধেছিলেন, তা 'অনলে পুড়িয়া' গেছে। 'অমিয় (অমৃত) সাগরে সিনান' করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে অমৃতের সবই বিষে পরিণত হয়েছে। 'চোর চোর মহাচোর' বলে গালি দিতে দিতে তার কপালেই জুটেছে 'মহাচোরের রাজটীকা।' আর শুধু চোর নয়, এবার খুনির তালিকায়ও তার নাম উঠেছে।

www.pathagar.com

একে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসও বলা যায়। শেখ হাসিনা এ থেকে শিক্ষা নিলে ভালো হতো। বিএনপিকে যে ফাঁদে তিনি ফেলতে চেয়েছিলেন, সে ফাঁদে নিজেই পড়ে এখন কাৎরাচ্ছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম তার 'নারী' কবিতায় লিখেছেন, 'বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি/ কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি/ নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে/ আপনি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।' আওয়ামী লীগের প্রতি আহ্বান জানাই আসুন, এ যুগে কারো জন্য আর কারাগার তৈরি না করে সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করি। রাষ্ট্রের কল্যাণ ভাবি, জনগণের কল্যাণ ভাবি। তা না হলে নিজের রচা কারাগারে ভুগে মরা বিচিত্র নয়।

বিগত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন উপলব্ধি করেছিলেন, 'Nature prefers simplicity, avoids vacum' (প্রকৃতি সরলতা পছন্দ করে, শূন্যতা রাখে না)। আমরা সবাই কি সেই সরলতার পথ অনুসরণ করতে পারি না?

২৯.০৪.২০০৭

www.pathagar.com

এজেন্ডা কমিয়ে আনাই ভালো

অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের রাজনীতিকদের তাড়া করতে গিয়ে বাকি সব সরকারি দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না বলেই মনে হচ্ছে। যদিও এ কথা সত্য, বিশাল সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য মাত্র ১১ জন উপদেষ্টাকে যথেষ্ট চাপ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

পত্রপত্রিকার খবরে দেখা যাচ্ছে, এক একজন উপদেষ্টার হাতে ৪-৫টি করে মন্ত্রণালয় থাকার ফলে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বই এরা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছেন না। উপদেষ্টারা সাত দিনেও কোনো কোনো মন্ত্রণালয়ে যেতে পারছেন না। ফলে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়েই জমেছে ফাইলের স্তূপ। উপদেষ্টারা ফাইল পড়ার সময় পাচ্ছেন না। স্বাক্ষরের সময় পাচ্ছেন না। কাজ থেমে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমলারাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। নতুন করে আবার দুর্নীতি বিস্তারের পথ প্রসারিত হচ্ছে। কাজের কাজ তেমন কিছু হচ্ছে না।

খুব সংক্ষেপে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ের অবস্থার একটু পর্যালোচনা করা যেতে পারে। বর্তমান সরকার বিগত তিন মাসে বিভিন্ন অভিযোগে ১ লাখ ৪৩ হাজার লোককে গ্রেফতার করেছে। তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক নেতাকর্মী। এই বিপুলসংখ্যক আটক ব্যক্তি ক'জনকে চেনেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা? সাবেক মন্ত্রী-এমপি দু-চারজন ছাড়া খুব বেশি লোককে তাদের চেনার কথা নয়। তাহলে গ্রেফতার করছে কারা? পুলিশ বা যৌথ বাহিনী। এই গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কোনো অবিচার হচ্ছে না তো? তারা সবাই দোষী কি? 'গ্রেফতার বাণিজ্য' আবার শুরু হয়ে যায়নি তো? এসব প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। যদি ন্যায়বিচার না হয়, যদি অন্যায়-অন্যায্য কিছু হয়, তাতে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হবে। ১৯৭২-৭৫ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃশাসনকালে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল এ দেশের কোটি কোটি মানুষ। প্রতিবাদ বিক্ষোভের স্বাভাবিক পথও রুদ্ধ করে দিয়েছিল সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়গুলো স্মরণে রাখলে ভালো করবে।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাজনীতিবিদরা কেউ মাঠে নেই। এরা রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনার দায়িত্বেও নেই। তারা আর ঘুষ-দুর্নীতি করতে পারছেন না। চাঁদাবাজি করতে পারছেন না। বরং দৌড়ের ওপরে আছেন প্রায় সবাই। কিন্তু এখন দুর্নীতির দায়ে হাতেনাতে ধরা পড়ছে সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তারা। পুলিশের কর্মকর্তা ঘুষ নিতে গিয়ে 'হাতেনাতে' ধরা পড়ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি নিশ্চিত করে বলতে পারবে, জেলা বা থানা শহর কিংবা গ্রামাঞ্চলে গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে কেউ অর্থ আদায় করছে না? নিশ্চিত করে বলা কঠিন। আগে এসব সরকারি কর্মকর্তার দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের ওপর রাজনীতিকরা ছিলেন। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এমপিকে বলতেন, মন্ত্রীকে বলতেন। তাতে এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতো। এখন সে ভারসাম্য পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ঘুষ-দুর্নীতির লাগাম থাকার কথা নয়। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে রাজনীতিবিদের মতো স্তরে স্তরে লোক নেই। দুর্নীতি জবরদস্তি হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তা জানার কোনো পথও নেই। কেবল অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হলে অবিচার হতে বাধ্য। ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, পাওয়া হাজার হাজার অভিযোগ ভুয়া।

দ্রব্যমূল্য এভাবে বাড়ছে কেন? এখন তো আর পথে পথে চাঁদাবাজি নেই। তাহলে দাম বাড়ছে কেন কৃষিপণ্যের? এখনো প্রতিদিন বাড়ছে। চালের দাম বেড়েছে। আটার দাম বেড়েছে। আলুর দাম বেড়েছে। ডিমের দাম বেড়েছে। তরিতরকারির দাম বেড়েছে। গোশতের দাম বেড়েছে। ডালের দাম বেড়েছে। গুঁড়োদুধের দাম বেড়েছে। সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে। বেড়েছে পেট্রল-ডিজেলের দাম। চাষের মাঠে সেচের দাম বেড়েছে। বিদ্যুতের দাম বেড়েছে। উৎপাদন খরচ বেড়েছে। ছিনতাই-ডাকাতি-রাহাজানি-খুন বেড়েছে। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বেড়েছে। লোডশেডিং বেড়েছে। যা বাড়েনি, তা হলো সাধারণ মানুষের আয়। বরং কমেছে। এরকম পরিস্থিতিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর কথা ভাবতে হতো রাজনীতিকদের। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা ভাবছে বলে শুনিনি। হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। ৫০-৬০ লাখ পরিবার পথে। প্রতি পরিবারে পাঁচজন করে সদস্য ধরলে আড়াই কোটি মানুষ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নানা অভিযান ও সিদ্ধান্তে বন্ধ হয়ে গেছে নির্মাণ কাজ। তাতে দিনমজুরের কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ। পথে বসেছে লাখ লাখ মানুষ। দোকানপাট সন্ধ্যায় বন্ধ করে দিয়েও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি করা যায়নি। কিন্তু লাখ লাখ দোকান কর্মচারী হয়েছে বেকার। এরা কোথায় যাবে, কি খাবে? দোকান মালিকরা সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার সাথে কথা বলেছেন। এদের বক্তব্য, এরা আর পারছেন না। এরা সরকারকে চাবি দিয়ে দেবেন, সরকার চালাক দোকান।

আমদানিকারকরা থমকে গেছেন। এত টাকার আমদানি করতে যাচ্ছে? কোথায় পেলো টাকা? সব টাকা কি সৎ পথে আয় করেছে? প্রমাণ দাও। পণ্য কেনো গুদামে পড়ে

www.pathagar.com

আছে? গুদাম সিল করে দাও। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে আমদানি করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করা যাচ্ছে না। সুদ বাড়ছে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে ভয় পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। কোনো কোনো অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ৫০ হাজার টাকা জমা দিতে আগে ব্যাঙ্ক শাখায় ফোন করছেন। 'ভাই, ৫০ হাজার টাকা জমা দেব, দুদক আসবে না তো বাসায়?' কোথায় পেলে টাকা? এরকম পরিস্থিতি অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতিকে রুদ্ধ করতে বাধ্য। এসব বিষয় নিয়ে অর্থনীতিবিদরাও লিখতে শুরু করেছেন। টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে ভয়। এফডিআর করতে ভয়। সঞ্চয়পত্র কিনতে ভয়। বিনিয়োগ করতে ভয়। এত ভয় নিয়ে টাকার সদ্ব্যবহার অসম্ভব।

এদিকে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অসুবিধার পাশাপাশি সরকারের আর্থিক অবস্থাও ভালো যাচ্ছে না। পণ্যের গুদাম সিল করে দিয়ে আমদানিকারকদের যে ভয় দেখানো হয়েছে, সে ভয় এখনো কাটেনি। ফলে পণ্যের আমদানি কমেছে। পণ্য আমদানি কমে যাওয়ায় কমেছে রাজস্ব আয়। সরকার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ বা টিসিবি'র মাধ্যমে পণ্য আমদানি করে সে সঙ্কট মেটানোর কথা ঘোষণা করেছে। এ ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর হবে বলা মুশকিল। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয়, আমদানিনির্ভর পণ্যের সঙ্কট দেখা দিতে বাধ্য। তাতে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। শুধু জরুরি অবস্থার শক্তি দিয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে- এটা ভাবা ভুল হবে। নিয়ন্ত্রণ তো করা যাচ্ছে না। খুলনায় পাটকলের শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে বোমা হামলা হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জের চালু ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিরোধের মুখে ভাঙা যায়নি। ফিরে আসতে হয়েছে। 'জাদীদ আল কায়েদা'র সন্ধান অভিযানে ধর্মপ্রাণ প্রবীণ লোকরা অযথা নাজেহাল হচ্ছেন। এর ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়া বিচিত্র নয়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে যারা খুশি হয়েছিলেন, সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপে তাদের খুশি খুশি ভাব বেশি দিন ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

ইতোমধ্যেই আর্থিক সঙ্কটে পড়ে গেছে সরকার। একদিকে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি, অপরদিকে বৈদেশিক ঋণ কমে যাওয়ায় সরকার বিপাকে। সরকারকে চলতে হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে। ৫ মে দৈনিক নয়া দিগন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন উল্লেখ করে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরের নয় মাসে পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। এ সময় রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০ শতাংশ। কিন্তু হয়েছে মাত্র ৮.৫১ শতাংশ। ব্যয় মেটাতে গত নয় মাসে সরকার ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে ৩ হাজার ৯৯০ কোটি টাকা। তার আগের বছর একই সময়ে তৎকালীন রাজনৈতিক সরকার ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিল ১ হাজার ৭৪৮ কোটি টাকা। গত ৮ মাসে প্রকৃত বৈদেশিক ঋণ এসেছে ২০ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। কিন্তু তার আগের বছর একই সময়ে প্রকৃত বৈদেশিক ঋণ এসেছিল ৫৪ কোটি ৬৩ লাখ

www.pathagar.com

ডলার। এখন ঋণ যা পাওয়া যাচ্ছে, দায় পরিশোধ করতে হচ্ছে তার চেয়েও বেশি। ব্যাঙ্কব্যবস্থা থেকে সরকারের এই বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের ফলে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ কমে গেছে। অর্থাৎ ঋণ নিতে পারছেন না বেসরকারি উদ্যোক্তারা। তাতে স্থানীয় বিনিয়োগ কমবে। বিনিয়োগ না হলে উৎপাদন নেই, রফতানি কম। কর্মসংস্থান স্থবির।

অর্থাৎ রাজনীতিকদের তাড়া দিতে গিয়ে সরকার আর কোনোদিকেই তেমন মনোযোগ দিতে পারেনি। না রাজস্ব আদায়, না আমদানি, না বৈদেশিক ঋণ, না আইনশৃঙ্খলা, না নতুন কর্মসংস্থান। অথচ এগুলোও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। যেভাবেই দেখি, এই নয় মাস সময়ের ছয় মাসেরই দায়ভার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর বর্তায়। চালের কেজি ৩২, আলু ২০, তেল ৮০, ডাল ৭৮ টাকা, মুরগি খেতে ভয়, গরুর গোশতের কেজি ১৮০ টাকা, মাঝারি তেলাপিয়া ১৪০ টাকা হলে দুর্নীতি দমনের সাফল্য দিয়ে বেশি দিন চলা যাবে না।

এ কারণেই আমরা বারবার বলতে চেয়েছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত কম এজেন্ডা হাতে নেয়া। এত কম লোক এত বেশি কাজ হাতে নিয়েছেন যে, কোনোটাই সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি যে দুর্নীতি নিয়ে এত শোরগোল, গত চার মাসে সে দুর্নীতির একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগও দায়ের করতে পারেনি সরকার।

এসব সঙ্কটের সমাধান করবে নির্বাচিত সরকার। সে নির্বাচিত সরকার বিদেশীরা চাইছে কী চাইছে না সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের স্বার্থে, দেশের অর্থনীতির অগ্রসরতার স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিজের স্বার্থেই নির্বাচন হওয়া দরকার যত দ্রুত সম্ভব। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে পারে, তারা নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ করবে। সে নির্বাচনের ফল সবাইকে মেনে নিতে হবে। ভবিষ্যতে দেশে আর কেউ হরতাল-অবরোধের মতো রাষ্ট্রঘাতী কোনো কর্মসূচি দিলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটুকু পেলেই জনগণ খুশি হবে। আর জনগণের উন্নয়ন? উপযুক্ত পরিবেশ পেলে জনগণ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে নেবে।

১১.০৫.২০০৭

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা পারবেন, আর কেউ পারবে না?

সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি ক্রমেই অকার্যকর হয়ে পড়ছে? দেশের অগ্রগতির জন্য জনগণের যে ঐক্যের দরকার ছিল, বিভেদের যে অবসান প্রয়োজন ছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা তো করতেই পারছে। না, উপরন্তু সে বিরোধ আরও বাড়িয়ে তুলছে। দেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির জনসমর্থন যদি সমান সমানও ধরা যায়, তাহলে বিএনপি সমর্থকদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের বিরুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার হানাহানির আরও একটি পক্ষ হয়ে উঠছে। এ অবস্থা কিছুতেই কাম্য ছিল না।

সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার হওয়ার কথা ছিল নির্দলীয়, আর জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী হওয়ার কথা নিরপেক্ষ। এ দু'টি শর্তের একটিও পূরণ করতে পারছে না। তারা যে পারবে না, সেটা আগেই উপলব্ধি করেছিলাম। তাই বারবার লিখেছিলাম, সরকার দ্রুত নির্বাচন দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করুক। কিন্তু তারা তা করতে চাননি। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এসব লেখালেখি দেখে বন্ধুরা বলেন, লেখালেখি বন্ধ করো, নইলে কেউ আবার চাঁদাবাজির মামলা দিয়ে দেয় কি না।

দেশে ঘরোয়া রাজনীতিও নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী নেতৃবৃন্দ অবিরাম রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছেন। সেসব বক্তব্য মিডিয়ায় নিয়মিত প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। অথচ বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কার্যত অন্তরীণই আছেন এবং তাকে দেশের বাইরে পাঠানোর জন্য নানা ধরনের চাপ এখনো অব্যাহত। শেখ হাসিনার সাথে দেখা করার জন্য অবাধে সবাই যাতায়াত করতে পারছে সুধা সদনে। শেখ হাসিনা যেতে পারছেন তার দলীয় কার্যালয়ে। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে অনুমতি লাগছে। সে অনুমতি সহজে মিলছে না।

চাঁদাবাজির মামলাগুলো ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। বিএনপির চেয়ারপারসনের পক্ষে কথা বলার পরপরই অব: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হান্নান শাহ্ চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন সপুত্র। রিমান্ডে থেকেছেন। কিন্তু তারও আগে দায়ের করা চাঁদাবাজির মামলা আছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। চুপ কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার?

www.pathagar.com

দেশের স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে শেখ হাসিনাকে দেশে ঢুকতে দেয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছিল সরকার। কিন্তু শেখ হাসিনার এক ধমকে সে ঘোষণা থেকে সরে এসেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ঘোষণা প্রত্যাহার সম্পর্কে বলেছেন, এটা সরকারের একটা সাহসী পদক্ষেপ। ভালো। দেশে জরুরি অবস্থা। রাজনীতি সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ। এসব উপেক্ষা করে শেখ হাসিনার ঢাকায় ফেরার দিন বিমানবন্দরের পথে পথে আওয়ামী লীগের শত শত নেতাকর্মী আনন্দ মিছিল করেছে। সরকার মোটামুটি চুপচাপ। ঘরোয়া রাজনীতিও নেই। কিন্তু প্রতি দিন শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করছেন। চুপ করে শুনছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

এরই মধ্যে এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছেন শেখ হাসিনা। তিনি ভারতীয় টিভি চ্যানেল সিএনএন-আইবিএন-এর সাথে এক সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন, 'সেনা শাসন বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'অতীতে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের পর আমাদের দেশে সামরিক শাসন চলেছিল। সামরিক শাসকরা আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। এরা নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। সংস্কারের নামে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কালক্ষেপণ করা ঠিক হবে না। সরকারের উচিত জনগণকে তাদের মনের মতো সরকার গঠনের অনুমতি দেয়া।'

শেখ হাসিনার এ কথার সাথে একমত হওয়া যায়। দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এলোমেলো করে দিয়েছে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই এলোমেলো করে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরাই। জোট সরকারের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তারও উদ্দেশ্য ছিল দেশের সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া। তার সাথে সুর মিলিয়েছিল দেশের এক শ্রেণীর মিডিয়া। এরা সবাই মিলে বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সব কিছু ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়।

তখনই সতর্ক করেছিলাম। বলেছিলাম, দেশের এসব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ভাবমর্যাদা বহাল রাখা দেশের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের স্বার্থেই অতীব জরুরি। এগুলোকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করা দরকার। কিন্তু সেসব কথায় কেউ কান দেয়নি। সেনাবাহিনী সমর্থিত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেও সে ডামাডোলের ফাঁদেই পা দিল। এরাও আওয়ামী লীগ ও মতলবি মিডিয়ার প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে শুরু করল এবং সেগুলোকে ধ্বংসের দুয়ারে নিয়ে গেছে। এদের সিদ্ধান্ত দেখেও বোঝা গেল, এদের নিজস্ব কোনো চিন্তা নেই। মতলববাজ মিডিয়ার প্রচারণায় এরা বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি থেকে তারা বহু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে।

www.pathagar.com

বিচারপতি ফয়েজীর ট্যাবুলেশন শিটে ঘষামাজা। তাতে ফয়েজীর কী দোষ, সেটা বোঝা গেল না। কারণ, ট্যাবুলেশন শিট কোনো শিক্ষার্থীর নাগালে থাকে না। তবু দাবি ফয়েজীকে বিদায় নিতে হবে। তখনই বলেছিলাম, এটা অযৌক্তিক। কিন্তু একশ্রেণীর মিডিয়া অবিরাম প্রচার করে গেল সে কথা এবং জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াল। এই অবস্থা শেষমেশ এমন দাঁড়াল যে, বড় বড় আইনজীবী গিয়ে প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মারল, ভাঙচুর করল, জ্বালিয়ে দিল। তার বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া গেল না। বরং মনে হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা যেন নীরবে মেনেই নিল।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজকে বিদায় নিতেই হবে। কেন? কী তার দোষ? সে কথা কখনও জানা গেল না। তা হলে তাকে বিদায় নিতে হবে কেন? কারণ, যারা এ দাবি তুললেন, তারা ধ্বংস করতে চাইলেন নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে। শেষ পর্যন্ত এরা সফল হলেন। ধ্বংস হয়ে গেল এ রকম একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ভাবমর্যাদা।

সরকারি কর্মকমিশনকে বিদায় নিতে হবে। এই কমিশনও একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কী তাদের দোষ? তারা দলীয় লোক। তারা অনেক চাকরি দিয়েছে। কী এক অদ্ভূত কাহিনী। যেসব পত্রপত্রিকা পিএসসি চাকরি দিয়ে খারাপ কাজ করেছে বলে লিখেছে, তারাই এখন লিখছে, পিএসসি চাকরি দিতে পারছে না বলে হতাশা নেমে এসেছে চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে। আগের পিএসসি চাকরি দিয়েছে বলে দোষ করেছে। এখনকার পিএসসি চাকরি দিতে পারছে না বলে দোষ করেছে। কি অদ্ভূত দায়িত্বহীন এক পরিবেশ। এরও অন্তর্নিহিত লক্ষ্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদও এই ফাঁদে পা দিয়ে বসেছেন। অর্থাৎ কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেই নিরাপদ রাখেননি শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল সম্প্রতি বর্তমান নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অনাস্থার আঙুল তুলেছেন। নির্বাচন করতে ১৮ মাস লাগবে বলে কমিশন যে ঘোষণা দিয়েছে, আবদুল জলিল বলেছেন, এটা নির্বাচন কমিশনের জেদ ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ আবারো এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার উদ্যোগ। রাষ্ট্রের জন্য এ এক ভয়াবহ ও বিপজ্জনক খেলা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়, এরা প্রথমে ভেবেছিলেন বিএনপি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে তারা এক নতুন রাজনীতি আনবেন। নতুন দল করবেন। সে কারণেই মাঠে নেমেছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের ড. ইউনূস। কিন্তু মাঠে নেমে দেখলেন, রাজনীতি অত সহজ ব্যাপার নয়। এখনো অন্য সবার জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও ড. ইউনূসের জন্য নিষিদ্ধ ছিল না। তিনি দশ জন দশ জনের কী সব গ্রুপট্রুপ করে নতুন রাজনৈতিক 'নাগরিক শক্তি' গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তখনই বলেছিলাম, এ উদ্যোগ সফল হবে না। হয়ওনি। ড. ইউনূস সরে গেছেন রাজনৈতিক

www.pathagar.com

উচ্চাভিলাষ থেকে। এখন মনে হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনীতি করতে দেবে শুধু আওয়ামী লীগকে আর সব দলের রাজনীতি বন্ধ। এই প্রক্রিয়াও শেষ পর্যন্ত সফল হবে না।

পত্রপত্রিকার রিপোর্ট পড়ে মনে হয়েছিল, বিএনপি নেতারা হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করেছেন। দুর্নীতির একটা বড় খাত ছিল, মিডিয়ার ভাষায় বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ কয়েকটি প্রকল্প খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, সেখানে গুরুতর কোনো অনিয়ম হয়নি। অনিয়মের বাস্তব পরিস্থিতির এটি একটি উদাহরণ। তাই এখন বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন চাঁদাবাজির মামলা হচ্ছে। আর সেসব মামলায় দ্রুত তাদের গ্রেফতারও করা হচ্ছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো দুর্নীতির মামলা করা যায়নি।

তা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী চায়? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এরা আওয়ামী লীগকেই ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে চায়। আর এই প্রক্রিয়ায় ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে চায় বিএনপিকে। আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীরা স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে পারবেন, স্বাধীনভাবে যেকোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে পারবেন, বিএনপি নেতা-নেত্রীরা টুঁ শব্দটিও করতে পারবেন না। এটা চরম পক্ষপাত।

এই বিপজ্জনক খেলার আরও একটি ভয়াবহ দিক রয়েছে। তাহলো দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমর্যাদা। সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। একটি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান। যেহেতু বলা হচ্ছে, এই সরকার সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকার। সুতরাং এই সরকারের অদূরদর্শী কর্মকাণ্ডের দায় সেনাবাহিনীর ওপরও বর্তাবে। তাতে এই প্রতিষ্ঠানও সর্বনাশের মুখোমুখি হতে বাধ্য।

২৭.০৫.২০০৭

www.pathagar.com

আতঙ্কের মধ্যে উৎপাদন হয় না

দুর্নীতিহীন সাফসুতরো এক অলীক সমাজ গঠনের ধাক্কায় দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে বসেছে। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন করতে গিয়ে এখন গোটা জনপদ সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হতে বসেছে। গ্রামীণ অর্তনীতিতে নামছে ধস। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য প্রতিদিন বাড়ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। রাতে দোকানপাট বন্ধ রেখেও কমানো যাচ্ছে না লোডশেডিং। ব্যবসায়ী মহল আস্থায় নিতে পারছে না সরকারকে। সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী বিডিআর পণ্য আমদানি ও বিপণনের দায়িত্ব চাইছে। অর্থাৎ বেশ হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতিতেই পড়েছে সরকার। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ দানা বাঁধছে। রাজনৈতিক সরকারের আমলে পরিস্থিতি এমন হলে পত্রিকার পাতায় আর টিভি চ্যানেলে সারাদিন এই 'ব্যর্থতার' খবর প্রচার করা হতো। বিশালকায় রাজনীতিবিদ ও বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদরা বলতেন, এ সরকারকে এক্ষুণি বিদায় নিতে হবে। এ সরকার ব্যর্থ সরকার। এখন জরুরি আইন বলে কেউ সে কথা বলছে না। আর জনগণের কী হলো, তার জন্য বর্তমান সরকার কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

চারদলীয় জোট সরকারকে তাড়িয়ে বর্তমান জরুরি অবস্থার সরকারকে ক্ষমতায় আনার দাবিদার এক সুশীল পত্রিকা গত ২৮ মে লিড নিউজ করেছে। 'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম শিগগির কমার সম্ভাবনা নেই।' 'মিডিয়া ইনিশিয়েটিভ ফর পাবলিক পলিসি' নামের একটি সংগঠন ও বিডিআর মিলে 'দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের উপায়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তাদের কথা থেকে ওই সংবাদ প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি। তাতে ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান বলেন, 'গত পাঁচ বছরে পণ্যের দাম ধাপে ধাপে বেড়েছে। সরকারও এ ব্যাপারে ছিল নির্বিকার। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তেমন কোনো বিনিয়োগই হয়নি। ফলে খুব শিগগির নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমার সম্ভাবনাও নেই।' সেমিনারে বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ বলেন, 'বর্তমানে যে পরিস্থিতি তাতে বিডিআর'র একার পক্ষে জিনিসপত্রের দাম কমানো সম্ভব নয়।' সেমিনারে বক্তারা

www.pathagar.com

আগের সরকারের অদূরদর্শিতা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারদর, নজরদারির অভাব, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভয়ভীতি ও আস্থাহীনতা, প্রতিযোগিতার অভাব, বাজার অব্যবস্থাপনা, সঠিক সময়ে আমদানির ব্যবস্থা না করাকেই জিনিসপত্রের দামের ঊর্ধ্বগতির জন্য দায়ী করেন।

সুশীল পত্রিকাটির রিপোর্টে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এই দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে, তার সবই বর্তমান সরকারের দায়। তা হলে কেমন হবে। সে জন্য কোনো কোনো বক্তা আগের সরকারের অদূরদর্শিতার একটা নোখতা লাগাতে ছাড়েননি।

সেমিনারে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম আনিসুজ্জামান বলেন, যৌথ বাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণে ব্যবসায়ীরা এখনো ভয়ে আছেন। সরকার অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। সরবরাহ শৃঙ্খলাও ভেঙে পড়বে। ব্যবসায়ীরা আমদানি কমিয়ে দেয়ায় ব্যাংকের ব্যবসায় কমে গেছে। ফলে ব্যাংকে নগদ অর্থ বেড়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা বলেন, আগামী দুই বছর তাদের ব্যবসায় না করলেও চলবে। কিন্তু এখন আর কোনো ঝামেলায় তারা যেতে চান না।

ছিচকে অর্থনীতিবিদরা বর্তমান যেকোনো পরিস্থিতির জন্য জোট সরকারের অদূরদর্শিতার দিকে আঙ্গুল তুলতে কখনও কুণ্ঠিত নন। কিন্তু গত ২৮ মে নয়া দিগন্তে প্রকাশিত মাসুমুর রহমান খলিলীর রিপোর্ট থেকে আমরা ভিন্ন চিত্র পাই। তাতে দেখা যায়, 'তিন মাসে গ্রামীণ অর্থনীতির কৃষিখাত থেকে টাকা চলে এসেছে ২০ শতাংশের মতো। গ্রামে কর্মসংস্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এলেও মূল্যস্ফীতি দেশের পল্লী অঞ্চলেই বেশি বাড়ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থবিরতার প্রভাবও পড়ছে গ্রামীণ বাংলাদেশে। চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে কৃষিঋণ বিতরণ ৫ শতাংশ কমে গিয়ে ৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। এর আগের বছর একই সময় কৃষিঋণ বিতরণ বেড়ে গিয়েছিল ১৬ শতাংশের মতো। এই হিসাবে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বিবেচ্য ৯ মাসে ২০ শতাংশের বেশি কৃষিঋণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কম বিনিয়োগ হয়েছে।'

এ চিত্র থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে, বর্তমান সরকারের তুলনায় আগের সরকার গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে অধিকতর মনোযোগী ছিল। তবু কেন বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার দায় আগের সরকারের ঘাড়ে চাপাতে হবে?

দেশের অর্থনীতির করুণ দশার খবর আছে ২৯ নভেম্বরের নয়া দিগন্তে 'অর্থনীতিতে দুর্নীতি দমন অভিযানের প্রভাব' শীর্ষক রিপোর্টে ফুটে উঠেছে ভয়াবহ চিত্র। এই অভিযানের ফলে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখছে কম। ব্যাংকের ঋণ বিতরণও কমেছে

www.pathagar.com

অনেকাংশে। জানুয়ারি থেকে ব্যাংকের আমানত কেবলই নিম্নমুখী হচ্ছে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে শহর-গ্রামে লাখ লাখ লোক বেকার হয়ে পড়েছে। ফ্ল্যাট-জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নজরদারির ফলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে চরম মন্দা দেখা দিয়েছে। নির্মাণ কাজের সাথে জড়িত হাজার হাজার লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। অর্থ অবমুক্ত না করায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন শ্লথ হয়ে গেছে। গত পাঁচ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ৭ শতাংশ। এতে কর্মসংস্থানের গতিও বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্নীতিগ্রস্ততার অভিযোগে স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান মেম্বার ও বিভিন্ন স্থানে অসাধু সন্দেহে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। এতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ ইত্যাদি কর্মসূচি অনেকটাই বন্ধ হয়ে আছে। এ পদক্ষেপে অতিদরিদ্রদের মধ্যে অভাব চরম আকার ধারণ করছে। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে আকালে মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে।

গুদাম সিল করে ব্যবসায়ী আমদানিকারক ও আড়ৎদারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দ্রব্যমূল্য কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে বড় আমদানিকারকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বড় ধরনের আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। এতে আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে। ফলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। বস্তি উচ্ছেদের ফলে হতদরিদ্র মানুষ আশ্রয়চ্যুত হয়েছে। ফলে ছিনতাই দস্যুতা বেড়েছে।

গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি দুই মাসে অভ্যন্তরীণ ঋণপ্রবাহ বেড়েছে মাত্র দশমিক ৯ শতাংশ। অথচ আগের বছর এই সময়ে ঋণপ্রবাহ ছিল ৪ শতাংশ। গত বছর জানুয়ারি-মার্চের তুলনায় এ বছর জানুয়ারি-মার্চে শিল্পোৎপাদন কমেছে ১০ শতাংশ। এ ছাড়া জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬ সময়ে শিল্প উৎপাদন বেড়েছিল ১৬ শতাংশ।

অর্থনীতির এ চিত্র ভয়াবহ। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে দেশের অর্থনীতিতে যে বিরাট বিপর্যয় নেমে আসবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর সে বিপর্যয়ের প্রধান শিকার হবে স্থির আয়ের মানুষ ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী কোটি কোটি সাধারণ মানুষ।

অর্থনীতির এই চিত্রের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। খুন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধ দিন দিন বাড়ছে। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী গত বছর এপ্রিল মাসে খুন হয়েছিল ৩২৮ জন, এ বছর ৩৪৮। গত বছর ওই সময়ে ডাকাতি হয়েছিল ৫১টি, এবার ডাকাতি হয়েছে ৯৬টি। গত বছর এপ্রিলে গৃহ ডাকাতি হয়েছিল ৩৩টি, এ বছর ৬৬টি। গত বছর এপ্রিলে দস্যুতা হয়েছিল ৪৯টি, এ বছর ১১৫টি। গত বছর এপ্রিলে নারী নির্যাতনের ঘটনা ছিল ৯৮৪টি, এ বছর ১ হাজার ৩৮৮টি। এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ৩৪৮। এ বছর মে মাসে প্রতিদিন গড়ে ১০ জন খুন হয়েছে।

www.pathagar.com

ব্যাংকে টাকা রাখতে গেলে সরকারের ভয়, ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বের হতে গেলে ছিনতাইকারীর ভয় এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। এই শতাব্দীর উৎপাদন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আতঙ্ক নয়, চাই উৎসাহ-উদ্দীপনা। কেউ বিত্তবান হলেই সে চোর বা দুর্নীতিবাজ, আমরা যেন এ রকম মনে না করি। একজন মানুষ যদি খুব সাধারণ অবস্থা থেকে বিত্তবান হয়, তবে যেন তাকে সন্দেহের চোখে না দেখি। শ্রম ও বুদ্ধি দিয়েও কেউ হতে পারেন বিত্তের মালিক। জাপানের হোন্ডা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা সইচিরো হোন্ডার চার ভাই-বোন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর না খেয়ে মারা গিয়েছিল। তিনি ছিলেন একটি মোটরসাইকেল মেরামত কারখানার ফালতু। তিনি বেঁচে যান। নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টা দিয়ে গড়ে তোলেন হোন্ডা কোম্পানি। তার জীবদ্দশায়ই হোন্ডা কোম্পানি বিশ্বের অন্যতম ধনী কোম্পানিতে পরিণত হয়। এটা একজন মানুষের সাফল্যের কাহিনী। আমরা কি সইচিরো হোন্ডাকে চোর বলব?

সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত দারিদ্র্য দূরীকরণ। কেউ যদি সৎ পথে দারিদ্র্য জয় করে উদাহরণ স্থাপন করতে পারে, তাকে উৎসাহিত করা। যাতে তার দেখাদেখি আরও অনেকে দারিদ্র্য জয়ে উৎসাহী হয়।

সে উৎসাহেও ভাটা পড়েছে। ১২ জানুয়ারি থেকে ২২ মে পর্যন্ত জরুরি ক্ষমতার সরকারের ১৩০ দিনে সারাদেশে গ্রেফতার হয়েছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৩২৯ জন লোক। কেউ হলপ করে বলতে পারবে না। এরা সবাই দুর্নীতিবাজ বা অসৎ লোক। এক গ্রামে যদি একজন রাজনৈতিক কর্মী অকারণে গ্রেফতার হয়, তবে বাকি ৫০ জন গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে যায়। এতেও সে এলাকায় উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়।

এসব আলোচনার উদ্দেশ্য একটাই– এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের ফলে কৃষি, শিল্প, আইনশৃঙ্খলা– সব ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। উৎপাদনশীলতা কমছে, ক্রয়ক্ষমতা কমছে, দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। কোনো কিছুই স্বাভাবিক করে তোলা যাচ্ছে না। কিন্তু স্বাভাবিক শুধু নয়, আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যই সরকারের দরকার কর্মপরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সব স্বাভাবিক পথ উন্মুক্ত করে দেয়া, আতঙ্কের পরিস্থিতির অবসান ঘটানো। কারণ আতঙ্কের মধ্যে উৎপাদন হয় না।

০৭.০৬.২০০৭

www.pathagar.com

রাজনীতির টোকাইয়েরা লাফঝাঁপ দিচ্ছে

রাজনীতির 'ঠগ' হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরার জন্য বহুবিধ আয়োজন চলছে। প্রতিদিনই গ্রেফতার হচ্ছেন রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা। গত পাঁচ মাসে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় ২ লাখ রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে। বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা গ্রেফতার হয়েছেন। পলাতক তার বহু গুণ। বহু সংসারে হাহাকার উঠেছে। প্রথম দিকে এ দলের কেউ গ্রেফতার হলে ও দল খুশি হয়েছে। এখন আর সে পরিস্থিতি নেই। শেখ হাসিনা তার দলের নেতাকর্মী গ্রেফতারের পরও বিএনপির নেতাদের নাম ধরে বলেছেন, 'ওরা কেন এখনো বাইরে থাকবে? ওদেরও গ্রেফতার করা হোক।' কিন্তু একে একে ঢাল-তলোয়ার হারিয়ে তিনি এখন কিছুটা খামোশ। বেগম খালেদা জিয়া এমনিতেই কম কথা বলেন। এখনো তেমনি আছেন। এদিকে রাজনীতির 'টোকাই'রা নতুন দল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠছেন। তারা 'সৎ মানুষের দল' করবেন। তাদের জন্য খেলার মাঠ তৈরি হচ্ছে। এসব চুনোপুঁটি খেলোয়াড় জাম্বুরা নিয়ে প্র্যাকটিস করছেন। রাজনীতির দারুণ ম্যাচ হবে! কী মজা!

ইতোমধ্যে চরিত্র হননের অমানবিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যারা প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা থাকবেন ধরাছোঁয়ার বাইরে, তারাও একে একে গ্রেফতার হয়েছেন, হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ হাসিনার শাসনামলে রাশিয়ার অচল মিগ ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির বহুল আলোচিত ব্যবসায়ী নূর আলী, ব্যবসায়ী আবদুল আউয়াল মিন্টু প্রমুখ আটক হয়েছেন। তাদের বরাত দিয়ে হত্যাকাণ্ড, দুর্নীতি, প্রভৃতি বিষয়ে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তেমনি সম্প্রতি আটক হয়েছেন জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। বনখাদক ওসমান গনিও দিচ্ছেন নানা তথ্য। তাতে জড়ানো হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও জোট সরকারের শাসনামলের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকে। এসব খবরও প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকায়। তাদের কথিত ভাষ্য অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগ থেকে বাদ পড়ছেন না খালেদা-হাসিনার কেউই। পত্রপত্রিকা অফিসে জাঁদরেল অভিযুক্তদের জেরার সিডি আসছে। কিংবা আসছে লিখিত

www.pathagar.com

ভাষ্য। কোনো কোনো পত্রিকায় তা রমরমা খবর হিসেবে ছাপাও হচ্ছে। কিন্তু তাদের জেরার এসব ভাষ্যের সূত্র কী, বোঝা যাচ্ছে না। এসব রাজনৈতিক নেতা যখন কারাগারের বাইরে ছিলেন, তখন কোনোদিন যেসব কথা বলবেন বলে কল্পনাও করা যায়নি, এখন সেসব কথাই অবলীলায় বলে দিচ্ছেন। তাদের এসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করা যাচ্ছে না।

এসব সিডি কোত্থেকে আসে, ইংরেজি দৈনিক নিউএজ সে কথা জানতে চেয়েছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ অধিদফতরের (আইএসপিআর) পরিচালক লে. জে. কাজী দবিরুল ইসলাম তাদের জানিয়েছেন, সিডি ও লিখিত ভাষ্য সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। র‍্যাবের মহাপরিচালক হাসান মাহমুদ খন্দকারও জানান, তিনি এ সম্পর্কে কিছু জানেন না। তিনি সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারকে বলেন, 'আপনার মতো আমিও এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে এসব কথা জানতে পেরেছি।' পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) নূর মোহাম্মদ জানান, রাজনৈতিক নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের সিডি সম্পর্কে 'আমি কিছু জানি না'। তারপরও বলব, সংবাদপত্রগুলো নিশ্চয়ই তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়েই এসব সিডির ভাষ্য প্রকাশ করছে।

কী বলছেন আটককৃত নেতারা? জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, তিনি যেসব দুর্নীতি করেছেন, তা তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোসহ বিভিন্ন নেতার চাপে পড়ে করেছেন। সে কারণে তারেক ও কোকোর নামে আলাদা ফাইল করে রেখেছিলেন গোপনে, যাতে ভবিষ্যতে তাদের ফাঁসানো যায় এবং তিনি আবারো মন্ত্রী হতে পারেন অন্য কোনো সরকারের। তিনি নাকি বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান সম্পর্কে দুটি বড় ধরনের অভিযোগ করেছেন। প্রথমটি হলো, বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক সাব্বির হত্যা মামলা থেকে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমদ আকবর সোবহান শাহ্ আলমের ছেলে সাফায়েত সোবহানকে রেহাই দেয়ার জন্য তাকে চাপ দিয়েছিলেন তারেক রহমান। শাহ্ আলমের কাছে এ জন্য ১০০ কোটি টাকা দাবি করা হয়। বাবর বলেছেন, এই টাকা দাবি করার কথা খালেদা জিয়াও জানতেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ৫০ কোটি টাকায় রফা হয়। এর মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা বাবর নিজে রাখেন। আর ১৫ কোটি টাকা তিনি প্রাইম ব্যাংকের মাধ্যমে ইকোনো গ্রুপের কাজী কামালের কাছে জমা রেখেছেন। তবে বাকি ৩০ কোটি টাকা আর পাননি। গোয়েন্দারা তাকে বলেন, 'সাফায়াতকে বাঁচাতে তারেক আপনাকে চাপ দিল, আর কনট্রাক্টের ২০ কোটি টাকা পেলেন আপনি, এটা কীভাবে সম্ভব?' পরে নাকি তিনি স্বীকার করেন যে, বসুন্ধরার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান তানভীরের কাছ থেকে তিনি নিজেই ২০ কোটি টাকা গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

বাবরের দ্বিতীয় অভিযোগ প্রধানত আরাফাত রহমান কোকোর বিরুদ্ধে। ধাবি গ্রুপের মোবাইল ফোন কোম্পানি ওয়ারিদ টেলিকমকে বাংলাদেশে ব্যবসা করার সুবিধা দেয়ার জন্য এক কোটি ডলার (প্রায় ৭০ কোটি টাকা) চাঁদা নেয়া হয়। এর ৯০ লাখ ডলার কোকো ও ১০ লাখ ডলার আলী আসগর লবী পেয়েছেন। তিনিও কিছু সুবিধা পেয়েছেন। ওয়ারিদ টেলিকমের প্রতিনিধির কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিল নিউএজ পত্রিকা। জবাবে মুখপাত্র বলেন, 'ব্যবসা করার জন্য তারা এ ধরনের কোনো অসৎ পথ অবলম্বন করেননি।' আরাফাত রহমান কোকো ও আলী আসগর লবীর এ ধরনের টাকার কোনো হদিস এখনো পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে বেগম খালেদা জিয়া ৭ জুন বলেছেন, এসব খবর বানোয়াট, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বিএনপি সরকারবিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেছেন। প্রথম ষড়যন্ত্র ছিল ১৯৯৬ সালে 'জনতার মঞ্চ' গঠন। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে সরকারের পতন ঘটানোই ছিল এর লক্ষ্য। সে সময় হরতাল-অবরোধের পাশাপাশি প্রেস ক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চ গঠন করে সরকারি জাতীয় কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। এর নেতৃত্ব দেন বর্তমানে গ্রেফতারকৃত, আওয়ামী লীগ নেতা ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর। আবদুল জলিল জানান, 'জনতার মঞ্চ' আন্দোলন শুরু করার আগে মহিউদ্দিন খান আলমগীর সুধা সদনে গিয়ে এ বিষয়ে শেখ হাসিনার সাথে আলোচনা করেছেন। ড. আলমগীরকে জনতার মঞ্চ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেন সচিব সফিউর রহমান ও ড. সা'দত হুসাইনসহ কয়েকজন শীর্ষ পর্যায়ের আমলা। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এলে সফিউর রহমানকে সাংবিধানিক পদে নির্বাচন কমিশনার করা হয় এবং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ড. সা'দত হুসাইনকে সাংবিধানিক পদ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ক'দিন আগে নিয়োগ দিয়েছেন। ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর শেখ হাসিনার শাসনামলে হয়েছিলেন প্রতিমন্ত্রী। যেভাবেই হোক, আওয়ামী লীগের এসব ষড়যন্ত্র সফল হয়েছিল, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তারা ক্ষমতা পেয়েছিল।

কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে আবারো হেরে গিয়ে আওয়ামী লীগ সেই ষড়যন্ত্রের পথেই অগ্রসর হয়। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই ২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিল সরকার পতনের ঘোষণা দেন আবদুল জলিল। আগের দিন ২৯ এপ্রিলও তিনি বলেন, '৩০ তারিখের মধ্যে জোট সরকারের পতন ঘটবেই।' শেখ হাসিনা তখন বলেছিলেন, 'আমার সাধারণ সম্পাদকের ঘোষণাতেই সরকারের হাঁটু কাঁপতে শুরু করেছে। আমি তো এখনো কিছু বলিইনি।'

গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে আবদুল জলিল বলেন, ৩০ এপ্রিল সরকার পতনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে ছিলেন সাবের হোসেন চৌধুরী ও আসাদুজ্জামান নূর। প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন আবদুল জলিল নিজেই। আর ১০ লাখ লোক ঢাকায়

www.pathagar.com

এনে তাদের দিয়ে অবরোধ সৃষ্টি, সরকারি সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখল করে নেয়া এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন এনজিও প্রশিকার কাজী ফারুক আহমেদ। তাকে সরাসরি সহায়তা করেছেন সাবের হোসেন চৌধুরী।

কী ছিল সেই পরিকল্পনা? সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ছেলে মাহী বি চৌধুরী ও বিএনপির এমপি আবু হেনা কথা দিয়েছিলেন, ৭০ কোটি টাকা দিলে তারা বিএনপি থেকে ৭০ জন এমপি ভাগিয়ে আনতে পারবেন। তাতে ঘোষণা অনুযায়ী, ৩০ এপ্রিলই সরকারের পতন ঘটানো যাবে। তখন টাকার যোগান দেন আবদুল আউয়াল মিন্টু ও ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুনসহ অনেকে। শেখ হাসিনা এই টাকা জোগাড়ের প্রক্রিয়ায় ছিলেন। ফলে শেখ হাসিনার নির্দেশেই আবদুল জলিল এই ঘোষণা দিয়ে যেতে থাকেন। একদিকে বিএনপির ৭০ এমপি দল ছেড়ে আওয়ামী লীগে চলে আসবে, অন্যদিকে প্রশিকাও ১০ লাখ লোক দিয়ে ঠেলা দেবে সরকারকে। তার মধ্য দিয়েই জোট সরকারের পতন ঘটবে। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা।

সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর নানা অজুহাতে আওয়ামী লীগের হরতাল-অবরোধ চলতে থাকে। জেরায় শেখ সেলিম বলেছেন, ২০০৪ সালেই আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালের আগের রাতে যুবলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সাধারণ সম্পাদক মীর্জা আজম শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে বাসে আগুন দেয়ার পরিকল্পনা করেন। যুবলীগ কার্যালয়ে বসে নানক-আজম এই পরিকল্পনা করেছিলেন। এর পরই শেরাটন হোটেলের সামনে বাসে আগুন দেয়া হয়। যুবলীগ কর্মীরা এই আগুন দিয়েছে। ফলে পুড়ে ১১ জন নিহত হয়। সেলিম বলেছেন, বাসে আগুন দেয়ার ব্যাপারে তিনি শেখ হাসিনাকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তার নিষেধের তোয়াক্কা করেনি কেউ।

আবদুল জলিল ও শেখ সেলিম শেখ হাসিনার দুর্নীতির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ুর কাছ থেকে ফ্রিগেট কিনতে শেখ হেলালের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে দেয়া হয়েছিল ১ কোটি টাকা। রাশিয়ার অচল মিগ কিনতে হাসিনা বিরাট দুর্নীতির আশ্রয় নেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা নিতেন তিনি। টাকা নিতেন নিজ হাতেই। পার্টি ফান্ডে প্রচুর টাকা আসত। শেখ হাসিনা নিজে তা খরচ করতেন।

এদিকে যৌথ বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদে আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিভিন্ন ব্যর্থতার জন্য শেখ হাসিনাকে দায়ী করে দেশব্যাপী আন্দোলনে শেখ হাসিনার ইন্ধনের কথা জানান। ওই আন্দোলনে দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় গার্মেন্টস শিল্প জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়ার পরিকল্পনা করেন শেখ হাসিনা। তা ছাড়া ওবায়দুল কাদের জানান, এক একটি ব্যাংক অনুমোদন দেয়ার জন্য শেখ হাসিনা ৫ কোটি করে টাকা নিতেন।

www.pathagar.com

এসব স্বীকারোক্তি ও তথ্য শেষ পর্যন্ত কতটুকু প্রমাণিত হবে, বলা কঠিন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী– সবাই দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত। ষড়যন্ত্র আর টাকাকড়ি কামানোই যেন রাজনীতির অংশ হয়ে গেছে। এখন আটককৃতরা গোপন জিজ্ঞাসাবাদে যা বলছেন, সুযোগ পেলে মুক্ত আদালতে তা বলবেন কি?

দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে শাস্তি তো হতেই হবে। কিন্তু প্রমাণের আগেই রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে এসব কথা প্রচার করা সঙ্গত হচ্ছে কি না, ভেবে দেখা দরকার। আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজনীতির বিরুদ্ধেই যেন দাঁড়িয়ে না যাই। বাংলাদেশে নিঃরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু রাজনীতি যে লাগবেই; শাসক গোষ্ঠী সে সত্য অনুধাবন করেছেন। আর সে জন্যই রাজনৈতিক দল করার জন্য লোক খুঁজছেন। তারা দল করবেন। সে দলকে নির্বাচনে জিততে হবে। জিতে তারা দেশ শাসন করবেন। এমন ইচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েই সে দলের জন্য লোক খোঁজা হচ্ছে। এদের মধ্যে রাজনীতি করবেন বলে যারা মাথা বের করছেন, জনগণ রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের 'টোকাই' বলেই জানেন। তারা না পাবেন জনগণের ভোট, না পারবেন দেশ শাসন করতে। রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ উপদেষ্টারাও আশা করি ইতোমধ্যে উপলব্ধি করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার কাজটা তত সহজ নয়। নতুন রাজনৈতিক দল করার জন্য যারা মাথা বের করছেন, তারা নির্বাচনে গেলে জনগণের প্রতিরোধের মুখে পড়বেন বলেই ধারণা করি।

তাই বলতে চাই, এমন কিছু যেন আমরা না করি, যাতে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়। ঠগ বাছার দরকার আছে, কিন্তু গাঁয়ে যেন চাষাবাদ, কাজকর্ম, গৃহস্থালি করার লোক থাকে। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের ধরার নামে রাজনীতিই শেষ হয়ে গেলে চলবে না।

১৫.০৬.২০০৭

www.pathagar.com

সংস্কার কাকে বলে?

দ্রব্যমূল্যের অপ্রতিরোধ্য ঊর্ধ্বগতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির মধ্যেও একটি বিষয় নিয়ে মানুষের দৃষ্টি কিছুটা ভিন্নদিকে ফেরানো গেছে। সেটি হলো, রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামোতে সংস্কার। আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সময়ে সময়ে এ সংস্কারের রূপরেখা ঘোষণা করছেন। কখনো বলছেন, রাজনৈতিক দলের কোনো নেতা দু'বছরের বেশি একই পদে থাকতে পারবেন না এমন বিধান করতে হবে। কখনো বলছেন, যিনি দলীয় পদে থাকবেন, তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না; এমন বিধান করতে হবে। কখনো বলছেন, একক নয়, যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কখনো বলছেন, দলে পরিবারতন্ত্র চলবে না। অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীর পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, বাবা-মা রাজনীতি করতে করতে পারবেন না। এর কোনটায় রাজনৈতিক অধিকার খর্ব হলো, কোনটায় মৌলিক অধিকার খর্ব হলো, সে বিষয়ে কেউ কোনো চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে মনে হয় না। যার যেমন খুশি, যা খুশি বলে যাচ্ছেন।

তবে, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে সংস্কারের আকাঙ্খা যে প্রবলভাবেই বিদ্যমান, এই সংস্কার আন্দোলন সে কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। দলীয় প্রধান যা বলবেন, সেটিই অবনত মস্তকে মেনে নেয়া হচ্ছিল এতদিন ধরে। কিন্তু অনেকেই যে তা মেনে নিতে কখনো প্রস্তুত ছিলেন না, তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নেতারা এখন দাবি তুলতে পারছেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সন্দেহ নেই, এ দাবি যৌক্তিক। কিন্তু এ দাবি তোলার সাহসও এ পর্যন্ত করো ছিল না। এখন তারা সে সাহস পাচ্ছেন।

কেনো এরা এমন সহস পেলেন? কারণ, শীর্ষ নেতৃত্বের দুর্বলতার দিকগুলো এখন ক্রমেই উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এখন সরাসরি কোনো চাঁদাবাজি বা অর্থ আত্মসাতের মামলা দায়ের করা হয়নি। দায়ের করা হয়নি কোনো খুনের মামলাও। কিন্তু তার দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা এখন জেলে। একেকজনের বিরুদ্ধে একেক ধরনের মামলা। কোনো কোনো মামলা যে কেবল সম্মান নষ্ট করে দেয়ার জন্য, তা-ও স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্থ আত্মসাৎ করেননি ভালো কথা। কিন্তু মদ পাওয়া গেল কেন আপনার বাসায়? অতএব জেলের ঘানি টেনে আসুন।

www.pathagar.com

গত ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনী সমর্থিত নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে যখন বিএনপি'র নেতা-মন্ত্রীদের আটক করা শুরু করল, তখন আনন্দে বগল বাজিয়েছে আওয়ামী লীগ। 'ওরা চোর চোর মহাচোর, ওদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দাও। আর এমনভাবে নির্বাচন করো, যাতে আমরা ক্ষমতার গদিতে বসতে পারি। সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুড়ে' ছড়ার মতো এক বিএনপি চেয়েছিল আওয়ামী লীগ। কেমন হবে সে বিএনপি? সেটি হবে ছড়ার সাপের মতো। 'যে সাপের চোখ নেই/ শিং নেই, নোখ নেই/ ছোটে নাকি হাঁটে না/কাউকে যে কাটে না/ করে নাকো ফোঁস-ফাঁস/মারে নাকো ঢুসঢাস/নেই কোনো উৎপাত/খায় শুধু দুধ ভাত/সেই সাপ জ্যান্ত/গোটা দুই আনত/তেড়ে মেরে ডাণ্ডা/করে দেই ঠাণ্ডা।' না, আওয়ামী লীগের জন্য তেমন কোনো পরিবেশ তৈরি করে দেয়নি ১/১১-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কেন সে রকম করল না আওয়ামী লীগের 'আন্দোলনের ফসল' তত্ত্বাবধায়ক সরকার, তা নিয়ে শেখ হাসিনার গোস্যার শেষ নেই।

বিএনপি'র বিরুদ্ধে মহাচোরের অপবাদ তুলে সারাদেশে শোরগোল বাধিয়ে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা একেবারে অঙ্ক করে বলে দিয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে বিএনপি'র মন্ত্রী-এমপিরা ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। শেখ হাসিনা বা তার দলের নেতানেত্রীরা একবারও ভেবে দেখেননি যে, ওই টাকা বাংলাদেশের তিন বছরের বাজেটের টাকার চেয়েও বেশি। পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে তিন বছরের পুরো বাজেট খেয়ে ফেলেছে বিএনপি তথা চারদলীয় জোট সরকার? আওয়ামী লীগের শিক্ষিত ভদ্র গোছের নেতারা এই অঙ্কের 'চুরি'র কথা রাজপথে হাজারবার বলে 'নেত্রী'র বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তখন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেছে। নেত্রী বললেই কি অযৌক্তিক কথা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে হবে? তারপরও আওয়ামী লীগ নেতারা এসব অভিযোগ বা শোরগোল তোলার আগে আয়নায় একবার নিজের মুখ কি দেখে নিতে পারতেন না? তারা যে এক-একজন কত বড় দুর্নীতিবাজ, সেটি মনে রাখতে পারতেন এরা। না, রাখেননি। এখন এক এক করে সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও চাঁদাবাজি, দুর্নীতির মামলা দায়ের হয়েছে। তার বেশ কতগুলোর অব্যর্থ প্রমাণও রয়েছে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল যৌথ বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন শেখ হাসিনার চাঁদাবাজির কথা। তিনি নিজেও মার্কেন্টাইল ব্যাংকের অনুমোদন করিয়ে দেয়ার জন্য নিয়েছেন ৮০ লাখ টাকা। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিম জানিয়েছেন, প্রতিটি ব্যাংকের অনুমোদন দিতে শেখ হাসিনা ৫ কোটি করে টাকা চাঁদা নিয়েছেন। বিদ্যুৎ প্লান্টের অনুমোদন দিতে কোটি কোটি টাকা চাঁদা নিয়েছেন। পার্টি ফান্ডে কোটি কোটি টাকা চাঁদা নিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা নিয়েছেন। তিনি নিজেও একটি প্রকল্প থেকে ৬ কোটি টাকা নিয়ে শেখ হাসিনার বখরা ৫০ লাখ টাকা শেখ

www.pathagar.com

রেহানাকে দিয়ে বাকি সাড়ে ৫ কোটি নিজে ভোগ করেছেন। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন, শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ খাতের ছোট প্রকল্প থেকেও বিরাট অঙ্কের চাঁদা নিয়েছেন। আর এসব অবৈধ টাকা তিনি নিতেন নিজে। অন্য কাউকে বিশ্বাস করতেন না শেখ হাসিনা। ওবায়দুল কাদেরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিকভাবে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। কাদের জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেখ হাসিনার প্রচুর অর্থ-সম্পদ রয়েছে। সেটি অবশ্য দেখাও যায়। কারণ, শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় সেখানে সামান্য চাকরি করতেন, কিন্তু সম্প্রতি তিনি ৪২০ কোটি টাকার ব্যবসায় শুরু করেছেন। এত টাকা কোথায় পেলেন জয়? নির্বাচন বাণিজ্য থেকে শেখ হাসিনা কয়েকশ' কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন। ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন, ব্যবসায়ী আবদুল আউয়াল মিন্টু শেখ হাসিনাকে দিয়েছেন ২০ কোটি টাকা। ব্যবসায়ী নূর আলী আওয়ামী লীগের মনোনয়নের জন্য শেখ হাসিনাকে নিজে দিয়েছেন ১৫ কোটি টাকা। যমুনা গ্রুপ (যুগান্তর পত্রিকার মালিক) নুরুল ইসলাম বাবুল দিতে চেয়েছিলেন ৫০ কোটি টাকা।

আজম জে চৌধুরী সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার প্লান্টের কাজের জন্য শেখ সেলিমের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ২ কোটি ৯৯ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা চেকের মাধ্যমে ঘুষ দিয়েছেন। আবার নূর আলী বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজের জন্য চেকের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ঘুষ দিয়েছেন ৫ কোটি টাকা। আর একই কাজের জন্য শেখ হেলালকে ঘুষ দিয়েছেন কোটি টাকা মূল্যের দু'টি ফ্লাট। ওই ফ্লাটেই এখন এরা বসবাস করেন। এ ছাড়া মিগ-২৯ অচল বিমান ক্রয়ে নূর আলী শেখ হাসিনাকে ঘুষ দিয়েছেন ৫ কোটি টাকার। এরকম একটি দুর্নীতির কাচের ঘরে বসে শেখ হাসিনা অবিরাম ঢিল ছুড়ে গেছেন বিএনপি'র নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে। হায় রাজনীতি! হায় দুর্নীতি।

শেখ হাসিনা ও তার দলের নেতাদের এ রকম দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। শুরুতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসিনার এই দুর্নীতির খবর যখন ফাঁস করতে থাকেন, তখন যাতে আরো খবর ফাঁস না হয়, সেজন্য শেখ হাসিনা স্বাস্থ্যগত কারণে আবদুল জলিলের মুক্তি দাবি করেন। আওয়ামী পেটোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি দল কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে বিবৃতি দিয়ে আবদুল জলিলের মুক্তি দাবি করেন ওই স্বাস্থ্যগত কারণেই। এরা বুদ্ধিজীবী, এরাই সুশীল সমাজ। বুদ্ধিজীবী বা 'সুশীল' যদি হয়েই থাকেন, তা হলে দলমত নির্বিশেষে সব অসুস্থ নেতারই মুক্তি দাবি করলেন না কেন? কথা সেই একটাই– অভিযোগ অভিন্ন হলেও বিএনপি'র দাঁত ভেঙে দাও, আওয়ামী লীগকে ছুঁয়ো না। দারুণ এক মামা বাড়ির আবদার! কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা যে দুর্নীতির মহাসম্রাজ্ঞী সে কথা বলে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল নেতারাই।

www.pathagar.com

এরকম 'দেশরত্ন' নেত্রীর সুবিশাল দুর্নীতির কথা যখন ফাঁস হয়েই গেছে, তখন সংস্কারের কথা উচ্চারণ করতে সাহস পেয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। তাদের মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুকুল বোস। তারা ইতোমধ্যে দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে ২১ দফা প্রস্তাব তৈরি করেছেন। এগুলো অনুমোদনের জন্য শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো হবে। এসব সংস্কারের মধ্যে আছে শেখ হাসিনার একক ক্ষমতা রদ, দলের তহবিলে স্বচ্ছতা, গণতন্ত্রায়ন, জবাবদিহিতা, একই ব্যক্তির দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী না হওয়া প্রভৃতি বিষয়। এর বিপরীতে শেখ হাসিনা নিজেও একটি সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করছেন। তাতে বর্তমান সংস্কারপন্থীদের আরো গুরুত্বহীন পদে ঠেলে দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

সংস্কার নিয়ে ভাবছেন বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এ জন্য তিনি সাত সদস্যের একটি কমিটি করে দিয়েছেন। সে কমিটিতে আছেন, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ, এম কে আনোয়ার, অব: মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদ, ড. মঈন খান, মোফাজ্জল করিম ও যুগ্ম সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেছেন, এই কমিটি সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। সেটিই সম্ভবত স্বাভাবিক। কারণ, কমিটিতে বেগম খালেদা জিয়া আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে রাখেননি। এ দিকে সংস্কারের বিষয়টি সামনে নিয়ে বহু দিন পর আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সাংগঠনিকভাবে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছেন। তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন দলের অনেক নেতাকর্মী। আর আইন ও তথ্য উপদেষ্টা মইনুল হোসেন বলেছেন, সংস্কারপন্থীদের সময় দেয়ার জন্য ঘরোয়া রাজনীতি চালু করতে বিলম্ব হবে। তবে আমরা বলতে চাই, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কারো পক্ষ না নিলেই ভালো করবে।

আসলে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ বা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোকেই। কারণ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই সুনির্দিষ্ট আদর্শ, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য থাকে। তার ভিত্তিতেই এরা সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। যে রাজনৈতিক দলের আদর্শ গণতন্ত্র, তার দলীয় কাঠামো যা হবে, যে রাজনৈতিক দলের আদর্শ গণতন্ত্র, তার দলীয় কাঠামো যা হবে, যে রাজনৈতিক দলের আদর্শ সমাজতন্ত্র, তার দলীয় কাঠামো ভিন্ন রকম হতে পারে। দলীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কি পারবেন না, সে সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দলই বিবেচনা করবে। দলের ভেতর গণতন্ত্র নেই, সে দল কেন করে লোকে? কেন দল ছেড়ে চলে যায় না, কেন সে রকম রাজনীতি থেকে সরে যায় না এরা। তার কারণও বুঝতে হবে। সে গণতন্ত্রায়নের উদ্যোগ নিতে হবে দলের ভেতর থেকেই। আর তা নেবেন দলের নেতাকর্মীরাই। এখন সে সুযোগ অনেকখানি অবারিত হয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু সরকারও যদি চায় যে, দলগুলোর ভেতরে সংস্কার হোক, তাহলে আর দেরি না করে এখনই ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া দরকার। কার্যত প্রধান দুই দলের সংস্কারপন্থীরা তো ঘরোয়া রাজনীতি শুরুই করে দিয়েছেন। সরকার দেখেও দেখছে না। তার চেয়ে স্বচ্ছতার স্বার্থে ঘরোয়া রাজনীতি করতে দেয়াই ভালো। এরা আলাপ-আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে আসুক।

এদিকে ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর নেতৃত্বে দল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। তিনিও কার্যত ঘরোয়া রাজনীতি শুরু করে দিয়েছেন। নেতাকর্মীদের দলে টানার চেষ্টা করছেন। তার সাথে দেখা করতে আসছেন বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা। তাদের মধ্যে উল্লেখ করার মতো কেউ নেই। সরকার যদি মনে করে, তারা নতুন রাজনৈতিক দল করবে এবং আগামী নির্বাচনে তাদের জিতিয়ে এনে নতুন সরকার গঠন করাবে- তাহলে সেটি সম্ভব। কিন্তু সে ব্যবস্থা এতই ঠুনকো ও ভঙ্গুর হবে যে, তাকে কোনোমতেই স্থায়িত্ব দেয়া যাবে না। রাজনৈতিক দল গঠন ও তার বিস্তার ঘটানো সহজ কথা নয়। সেটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আলাদীনের চেরাগ দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন সম্ভব হবে না। যে কারণে বড় দুই দলকে রেখেই চিন্তা-ভাবনা করা ভালো। আইন নিজস্ব গতিতে চলুক। সেখানে বল প্রয়োগ ভালো হবে না। ন্যায়বিচারের মাধ্যমে যদি পুরনো নেতৃত্বের অবসান ঘটে, ঘটবে। নতুন নেতৃত্ব পুরনো দলগুলোতে আসীন হয়, হোক। তাতে দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা কম।

একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ করছি। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুকুল বোস সংস্কার প্রশ্নে সম্প্রতি বলেছেন, 'দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ হলে আমরা শেখ হাসিনাকে নিয়ে দল করব না।' শেখ হাসিনা বলেছেন, দল চালাতে শুভানুধ্যায়ীদের দান নেয়া হয়ে থাকে। মুকুল বোস সুধা সদনে শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন ১৮ জুন। শেখ হাসিনা মুকুল বোসের কাছে দলের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের বেতন চান। তিনি বলেন, 'মুকুল তুমি তো এখন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। স্টাফদের বেতনাদি দাও।' উত্তরে মুকুল বোস বলেন, 'আমি বেতন দেব কোথা থেকে? আমার কাছে কি দলের কোনো টাকা আছে?' পরে মুকুল বোস শেখ হাসিনার কাছে তার আগের বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সংস্কার প্রসঙ্গ আজ এই পর্যন্তই।

২১.০৬.২০০৭

www.pathagar.com

হায় ব্রুটাস, অবশেষে তুমিও!

উইলিয়াম শেক্সপিয়রের কালজয়ী নাটক 'জুলিয়াস সিজার'। বিরাট দিগ্বিজয়ী বীর এই সিজার। সিজার যখন রাজ্য বিজয় করে রোমে ফিরছিলেন, তখন রোমের মানুষ তাকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য তৈরি। তাদের কণ্ঠে আনন্দ-উল্লাসের ধ্বনি। জুলিয়াস সিজারকে সেদিন সংবর্ধনা দেয়ার জন্য তৈরি সবাই। সেদিন থেকেই ষড়যন্ত্রও শুরু হয়, তাকে উচ্ছেদ করার। তাকে হত্যা করার। সে ষড়যন্ত্রে যত না সিজারের শত্রুরা ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, তার আপন জনেরা। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তারও আগে আসা যাক বিএনপি'র মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সংস্কার প্রস্তাবে। গত ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা সমেত যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হয়, এরা বিএনপি'র শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের গ্রেফতার অভিযানে নামে। একে একে প্রায় সব মন্ত্রী, বহু এমপি ও স্থানীয় নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাইরে আছেন মান্নান ভূঁইয়া, সাইফুর রহমানসহ মাত্র কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী। আওয়ামী লীগ এই সরকারকে তাদের 'আন্দোলনের ফসল' বলে দাবি করলেও তাদেরও বেশ ক'জন সাবেক মন্ত্রীসহ গ্রেফতার হয়েছেন বেশ কিছু নেতাকর্মী। যৌথ বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদে এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যেসব তথ্য দিয়েছেন, তা এক কথায় ভয়াবহ। চাঁদাবাজি, অর্থ আত্মসাৎ, বিদেশে টাকা জমানো, ঘুষ-দুর্নীতির এক বিশাল ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন এরা। জিজ্ঞাসাবাদে বিএনপি'র কোনো কোনো নেতা যেমন সব দুর্নীতির জন্য তারেক রহমনাকে দায়ী করেছেন, তেমনি আওয়ামী লীগের সব নেতা এক বাক্যে সব দুর্নীতির জন্য দায়ী করেছেন শেখ হাসিনাকে। আটক শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এরা রাজনীতিবিদদের কিভাবে, কত টাকা ঘুষ দিয়েছেন, কাদের দিয়েছেন নিয়মিত চাঁদা। এসব বিষয় বেশ লজ্জারও। যেন রাজনীতি হয়ে উঠেছিল টাকা বানানোর হাতিয়ার। তেমনিভাবে সরকার হঠানো ও ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনীতিবিদরা কিভাবে ষড়যন্ত্র করেছেন, তার বর্ণনাও দিয়েছেন আওয়ামী লীগের আটক নেতারা। সে ক্ষমতা দখলের অর্থনীতি ধ্বংস, নরহত্যা এবং শিল্পকারখানা জ্বালিয়ে দেয়ার মতো দেশধ্বংসী কাজ করতেও পিছ পা হননি রাজনীতিবিদরা। অর্থাৎ জনগণের শক্তি নয়, অর্থ আর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের কৌশল করেছিলেন রাজনীতিবিদরা। একইভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের ব্রুটাস ও তার সহযোগীরা।

www.pathagar.com

এরকম একটি পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের প্রশ্ন সামনে আসে। সে সংস্কার নিয়ে মাসখানেক ধরে নানা ধরনের আলোচনা আছে দুই প্রধান দলেই। তাতে দলীয় প্রধানের একক ক্ষমতা হরণ করা, যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, দলীয় তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা প্রভৃতি বিষয় স্থান পায়।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলেই এখন দুই ধারা। এক ধারার লোকেরা এখন 'সংস্কারপন্থী' বলে চিহ্নিত। অপর ধারার লোকেরা স্থিতাবস্থার পক্ষে। কিন্তু সংস্কারের কথা বলছেন সবাই। সংস্কারপন্থী যাদের বলা হচ্ছে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গ্রেফতার অভিযানে বাইরে আছেন তারা। এরা আছেন জেলের বাইরে। জেলের ভেতরে যারা আছেন, তাদের অনেকেও সংস্কারপন্থীদের সাথে একমত প্রকাশ করেছেন, অনেকের কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি। তবে উভয় দলের সংস্কারপন্থীদের মূল লক্ষ্য দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে সরিয়ে দেয়া। বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, গুটিকয়েক লোক মিলে সংস্কারের প্রস্তাব দিলে হবে না। সংস্কারের সিদ্ধান্ত হবে দলীয় কাউন্সিলে। শেখ হাসিনা সংস্কার প্রশ্নে একই কথা বলেছেন। সেই সাথে তিনি বলেছেন, ৬০ বছরের বেশি যাদের বয়স, তারা থাকতে পারবে না ওয়ার্কিং কমিটিতে। তাদের যেতে হবে উপদেষ্টামণ্ডলীতে। এটি যদি বাস্তবায়ন হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থী কোনো নেতাই আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারবেন না। অর্থাৎ দলের মধ্যে তারা হয়ে যাবেন ঠুঁটো জগন্নাথ। ফলে আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থীরা এখন খানিকটা খামোশ হয়ে আছেন।

কিন্তু খামোশ নেই বিএনপি'র সংস্কারপন্থীরা। এই সংস্কারের নেতা খোদ দলীয় মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। দলের সংস্কারের প্রশ্ন দলীয় ফোরামে আলোচনা না করে তিনি সংবাদ সম্মেলন করে দলের ১৫ দফা সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন। এই সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য তাকে তো দলীয় ফোরামে যেতেই হবে। সেখানে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করে সিদ্ধান্ত নিয়েও তিনি বলতে পারতেন, বিএনপি'র ভেতরে এসব সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু তা না করে সাংবাদিকদের সামনে সেটি উত্থাপন করা কেন যে তার প্রয়োজন হলো, বোঝা মুশকিল।

মান্নান ভূঁইয়ার সংস্কার প্রস্তাবের মূল কথা হলো, বিএনপি'র নেতৃত্ব থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে সরে যেতে হবে। তার প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'একই ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি কিংবা ছয় বছরের বেশি সময় চেয়ারম্যান পদে থাকতে পারবেন না। যারা ইতোমধ্যেই দুই মেয়াদের সময় বা ছয় বছরের বেশি সময় উল্লিখিত পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে।' মান্নান ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, 'দুই মেয়াদে কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকলে তিনি আর প্রধানমন্ত্রী কিংবা দলের চেয়ারম্যান হতে পারবেন না। দলের চেয়ারম্যান যদি প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, তবে তাকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে।' তার সংস্কার প্রস্তাবের মূল বিষয় এটি। তা ছাড়া আছে, চেয়ারম্যানের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে স্থায়ী কমিটির অনুমোদন নিয়ে, আর্থিক ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও তহবিলে আয়-ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনা, দলে পরিবারতন্ত্রকে নিরুৎসাহিত করা প্রভৃতি।

www.pathagar.com

মান্নান ভূঁইয়ার এই সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে বেগম খালেদা জিয়া কী কী পারবেন না, সেগুলো বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, বেগম খালেদা জিয়া যদি বিএনপিতে থাকতে চান, তবে তাকে থাকতে হবে উপদেষ্টা হিসেবে। কিংবা সাধারণ কর্মী হিসেবে এবং তাকে সেবা করে যেতে হবে আবদুল মান্নান ভূঁইয়াদের মতো মহান সংস্কারবাদী নেতাদের। দারুণ প্রস্তাব।

কিন্তু, এটি শুধু চেয়ারপারসনের বেলায় কেন হবে। কেন মহাসচিবের বেলায়ও একই শর্ত প্রযোজ্য হবে না? প্রস্তাবে এমন থাকলে ভালো হতো যে, কেউ যদি দুই মেয়াদে বা ছয় বছর মহাসচিব থাকেন, তবে তিনি আর মহাসচিব থাকতে পারবেন না। দুই মেয়াদে কেউ মন্ত্রী থাকলে তিনি আর মহাসচিব থাকতে পারবেন না। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলে তাকে মহাসচিবের পদ ছাড়তে হবে। তা হলে বুঝতাম, মান্নান ভূঁইয়া সংস্কার প্রস্তাবে সত্যি সত্যি আন্তরিকতা আছে, মতলব নেই।

বিএনপি মহাসচিব বোদ্ধা মানুষ। তবু বলি, ইন্দিরা গান্ধী, মার্গারেট থ্যাচার, মাহাথির মোহাম্মদ কিংবা জ্যোতি বসু কারো বেলায়ই এসব শর্তের প্রয়োজন হয়নি। আবার এ কথা অস্বীকার করারও উপায় নেই যে, মাহাথির মোহাম্মদ যদি এত দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন না করতেন তা হলে দরিদ্র মালয়েশিয়া বর্তমান উন্নত পর্যায়ে উপনীত হতে পারত না। মান্নান ভূঁইয়া আশা করি বোঝেন, ভারতীয় কংগ্রেসের ঐক্য ধরে রাখতে এখনো কেন বিদেশী বংশোদ্ভূত সোনিয়া গান্ধীকে কংগ্রেস প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

মান্নান ভূঁইয়ার সংস্কার প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'দলের মন্ত্রী, এমপি, স্থায়ী কমিটির সদস্য, নির্বাহী কমিটির সদস্য ও থানা কমিটির সদস্যদের প্রতি বছর জাতীয় নির্বাহী কমিটির কাছে তাদের সম্পদের হিসাব দিতে হবে।' মন্ত্রী-এমপি পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু কমিটির সদস্য কেন প্রতি বছর তার সম্পদের হিসাব দেবে দলের কাছে। সে কি জাতীয় নির্বাহী কমিটির চাকরি করে, না কি বিএনপি না করলে তার সমূহ ক্ষতি হয়ে যাবে? এগুলো বাতকে বাত। ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মান্নান ভূঁইয়া বিএনপি মহাসচিব পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। দল সংগঠনের জন্য কোথায় কোথায় গেছেন তিনি, কী তার ভূমিকা– সে প্রশ্ন কর্মীরা করতে পারেন। তার জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকাই ভালো।

সংস্কার প্রস্তাবে মান্নান ভূঁইয়া যা বলেছেন, তার অর্থ দাঁড়ায়, বিএনপি মহাসচিব পদে তিনি আজীবন থাকতে পারবেন, কিন্তু খালেদা জিয়াকে বিএনপি'র রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ বিএনপিতে ভাঙন প্রক্রিয়া তিনি চূড়ান্ত করলেন। অনিবার্যভাবেই বেগম খালেদা জিয়ার অনুসারীরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন আর নিশ্চিত করেই বলা যায়। বিএনপিতে মান্নান ভূঁইয়ার অনুসারীদের চেয়ে খালেদা জিয়ার অনুসারীর সংখ্যা অনেক বেশি। মান্নান ভূঁইয়া বিএনপিতে যোগ দেয়ার আগে কাজী জাফর আহমদের সাথে ইউনাইটেড পিপলস পার্টির (ইউপিপি) রাজনীতি করতেন। তখন জনসভা ডাকলে তার ডাকে দু-একশ' লোকও জমায়েত হতো না। বিএনপিতে

www.pathagar.com

এসে তিনি বিশাল জনসমুদ্র দেখেছেন, মন্ত্রী হতে পেরেছেন, এত বড় দলের মহাসচিব হতে পেরেছেন। সে দল ভেঙে তাকে আবার তেমনই সমুদ্র থেকে কুয়ায় ফিরে যেতে হবে। এর চেয়ে বেশি কোনো লাভ হবে না।

গত ২৫ জুন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া প্রেস কনফারেন্স করে সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপনের আগে তার বাসায় গিয়েছিলেন সাইফুর রহমান, আশরাফ হোসেন, অবঃ লে. জে. মাহবুবুর রহমান, অবঃ মে. জে. জেড এ খান, মোফাজ্জল করিম, সেলিমা রহমান, অবঃ মেজর হাফিজ উদ্দীন আহমদ, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, ড. ওসমান ফারুক, অবঃ মে. জে. মাহমুদুল হাসান, এনাম আহমেদ চৌধুরী, আবদুল আলীম, মোশারেফ হোসেন শাজাহান, এহছানুল হক মিলন, শহীদুজ্জামান বেল্টু প্রমুখ। তবে সাংবাদিক সম্মেলনের সময় মান্নান ভূঁইয়ার পাশে ছিলেন সাবেক হুইপ আশরাফ হোসেন, আর কেউ নয়। উপস্থিত সবাই কোনো না কোনোভাবে বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে কিছু পেয়েছেন। এ ক'দিন ধরে যারা সংস্কার নিয়ে মিডিয়ায় সোচ্চার তারাও বেগম জিয়ার কাছ থেকে কিছু পেয়েছেন। যে লুৎফুজ্জামান বাবরকে তিনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছিলেন, তিনি বেগম জিয়া ও তার পরিবারকে ফাঁসানোর নানা কসরত করেছেন।

শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তার ঘনিষ্ঠ লোকেরাই। যারা প্রকৃতই তাকে ভালোবাসত, তাদের সতর্ক বাণীতে কান দেননি সিজার। সিজার হত্যার দৃশ্যটি এভাবে বর্ণান করার যায় :

'দেখছ না, কুচক্রীর দল তার বক্ষ চুম্বনকালে স্পর্শ করে দেখে নিচ্ছে সিজারের বক্ষে কোনো বর্ম আছে কি না। আঘাতকালে যদি তা প্রতিরোধ করে। দেখো, সিজার অস্থির হয়ে পড়েছেন। দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন সবাইকে। ওই দেখো, কে একজন সিজারের পোশাক ধরে টান দিল। দেখতে পাচ্ছ, সিজারের সুবিশাল বুক, অসম সাহস আর দৃঢ়তায় ভরা। রোমের ভবিষ্যৎ আশা ও প্রগতি যার মধ্যে নিবন্ধ। হঠাৎ উদ্ধত কৃপাণ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাসকা। তার আঘাতের শব্দ উঠল মস্তকে। সিজার বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলেন কাসকার হাত। মুহূর্তে অন্য কুচক্রীরা গেল এগিয়ে। শাণিত ছোরার পুনঃপুন আঘাতে রক্তাপ্লুত হলো সিজারের দেহ। সিজারের দেহ নিস্তেজ হয়ে আসছে। সভাগৃহে বিশৃঙ্খলা। অবশেষে ব্রুটাস এল সিজারের সামনে। তার হাতে খোলা কৃপাণ। সিজার বিস্ময়ে হতবাক। হতাশার সুরে তিনি বলে উঠছেন, 'হায় ব্রুটাস, অবশেষে তুমিও।' ব্রুটাস ক্ষণিকের জন্য বিচলিত। এক মুহূর্ত। সব দ্বিধা ছুড়ে ফেলে তার কৃপাণ বিদ্ধ করল সিজারের বুক। শেষ আঘাত। সিজারের গর্বিত প্রাণবায়ু বিলীন হয়ে গেল। রোমের বাতাসে সিজার লুটিয়ে পড়লেন।' অন্তিম মুহূর্তে সিজার ব্রুটাসকে চিনতে পেরেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া কি তার ব্রুটসদের চিনতে পেরেছেন? তবে আশার কথা, নাটকে ব্রুটাস ও তার সহযোগীদের সবারই অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। রোমবাসী সিজারের বিরুদ্ধে আনীত সব অপপ্রচার বুঝে ফেলেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত জনগণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

২৮.০৬.২০০৭

www.pathagar.com

এসব সিদ্ধান্ত নতুন দুর্নীতির জন্ম দিতে পারে

গুরুতর অপরাধ ও দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী লে. জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী গত শনিবার দুর্নীতি সংক্রান্ত এক সেমিনারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তৈরি বিশ্বের দুর্নীতিবাজদের তালিকার শীর্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান। কিন্তু সত্যি কথা বলতে প্রশাসনের সহায়তা ছাড়া রাজনৈতিক দল এত দুর্নীতি করতে পারে না। প্রশাসনিক পদ্ধতির যদি যথাযথ উন্নতি না হয়, তা হলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি ব্যাপকতা পায়। তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন সোজা কাজ নয়। তবে শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে একটি কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন সব স্তরে দুর্নীতি কমাতে পারে। প্রসঙ্গত তিনি মনে রাখার পরামর্শ দেন যে, সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতি মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তার পরও দুর্নীতি নিম্নতম পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য আমাদের চেষ্টা থাকা দরকার। মূল কথা প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া রাজনীতিকদের পক্ষে এত দুর্নীতি সম্ভব হতো না।

অর্থাৎ রাজনীতিকদের দুর্নীতির সাথে প্রশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এ পর্যন্ত দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে আটক করা হয়েছে শুধু রাজনীতিকদেরই। সে দুর্নীতিরও কোনো কিনারা করা যায়নি। কিন্তু এ অভিযানে কোনো আমলার টিকিটিও স্পর্শ করা হয়নি। অনেক ইলেকট্রনিক মিডিয়া ফ্রেন্ডলি সাবেক আমলার একজন যিনি বিপুল সম্পত্তির মালিক, আলিশান বাড়িতে থাকেন। মিডিয়াকে ড্রইংরুমে সাক্ষাৎকার দেন না। সাক্ষাৎকার দেন স্টাডি রুমে। কেন? কেউ তাদের জিজ্ঞাসা করেনি। কারণ তার বিত্তবৈভবের সব জৌলুশ আছে তার ড্রইং রুমেই।

দুর্নীতি বলি, আর জনকল্যাণই বলি, রাজনীতিকদের যে দায়বদ্ধতা আছে জনগণের কাছে, জাতীয় সংসদের কাছে, আমলাদের তা নেই। ফলে সেখানে নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ছোট একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। গত রোববার বাংলাদেশে প্রবাসীদের অর্থ পাঠানো বিষয়ে এক সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ৩ হাজার

www.pathagar.com

কোটি ডলারের রেমিট্যান্স আহরণ করতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন নতুন বাজার সৃষ্টি। বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করা, মন্ত্রণালয় ও এজেন্সিগুলোর সমন্বয়, ব্যাংকিং সুবিধা বাড়ানো প্রভৃতি ব্যবস্থা। এই খবরের পাশাপাশি সেদিনই আরো একটা খবর বেরিয়েছে। এর শিরোনাম, বহির্গমন ছাড়পত্র দেয়া হচ্ছে না। ১ হাজার লোকের কুয়েতের ভিসা শেষ পর্যন্ত বাতিল হবে? ওই খবরে বলা হয়েছে, 'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বহির্গমন ছাড়পত্র না দেয়ায় প্রায় ১ হাজার বাংলাদেশীর চাকরি নিয়ে কুয়েত যাওয়া আটকে আছে ১০ মাস ধরে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ছাড়পত্র না মিললে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।' খবরে বলা হয়েছে, কোনো ভিসা বাংলাদেশ দূতাবাসের সত্যায়িত না হলে বহির্গমন ছাড়পত্র দেয়া যাবে না, সরকার সম্প্রতি এ রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরা ভিসা জোগাড় করেছেন এই সিদ্ধান্তের আগে। ফলে তাদের ভিসা সত্যায়িত নয়। তা ছাড়া সত্যায়িতের বিধান করেছে আমাদের আমলাতন্ত্র। কুয়েত সরকার সত্যায়িত ছাড়পত্রের এসব ভিসা শ্রমিকদের সে দেশে গ্রহণ করে। এক-একটি ভিসা জোগাড় করতে তাদের দেড় থেকে দুই লাখ টাকা খরচ হয়েছে। 'এখন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ভিসা বাতিল হয়ে গেলে তাদের পথে বসতে হবে।'

এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সব দোষ গিয়ে চাপে রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর। কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সি বিমান টিকিটের ব্যবস্থা করে দিনক্ষণ দিয়ে বসে আছে। বহির্গমন ছাড়পত্র পাওয়া যাচ্ছে না জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কাছ থেকে। কারণ? কারণ 'আমলাতান্ত্রিক জটিলতা'। তা হলে ২০১৫ সালের মধ্যে ৩ হাজার কোটি ডলারের রেমিট্যান্স লক্ষ্যমাত্রার কী হবে। কী হবে জায়গাজমি বিক্রি করে বিদেশে যেতে প্রস্তুত এই এক হাজার শ্রমিকের? সে জবাব আমলাতন্ত্র দেয় না, রাজনীতিকরা দেন।

গত ৩০ জুন এমন একটি খবর বেরিয়েছে দৈনিক 'নয়া দিগন্ত'-এ। শিরোনাম 'মালয়েশিয়াগামী ৩০ হাজার শ্রমিকের নিয়োগ অনুমতির ফাইল মন্ত্রণালয়ে আটকে আছে।' ওই খবরে বলা হয়েছে, 'প্রায় ৩০ হাজার মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকের নিয়োগ অনুমতির ফাইল এক মাস ধরে আটকে রয়েছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। ফাইল ছাড়ানোর জন্য প্রতিদিন ৪০-৪৫ জন রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক সংশ্লিষ্টদের এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে গিয়ে ধরণা দিচ্ছেন। ভুক্তভোগী রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকরা বলছেন, ফাইল ছাড়াতে না পারায় শুধু এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, বিদেশগামী হাজার হাজার শ্রমিকের বিদেশ যাত্রাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।' রিক্রুটিং এজেন্সি মালিক মালয়েশিয়া থেকে কাজ কিনে আনার পর তাকে চার মাসের মধ্যে ওই কোম্পানিতে লোক পাঠাতে হয়। এ সময়ের পর শ্রমিকদের নামে ডিমান্ড ভিসা আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যায়। মালিকরা এসব ওয়ার্ক অর্ডার প্রকাশ করে মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা দেন। নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ অনুমতি পাওয়ার

www.pathagar.com

পর সেগুলো ফিঙ্গার প্রিন্ট করতে বায়রা অফিসে পাঠানো হয়। সেখান থেকে অনলাইনে পাঠানো হয় মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। ইমিগ্রেশন প্রসেসিং হয়ে আসার পর শ্রমিকদের নামে কলিং ভিসা আসতে আসতে এক থেকে দেড় মাস চলে যায়। আবার এসব শ্রমিকের নামে আসা কলিং ভিসা (অর্থাৎ এই শ্রমিককে এখন পাঠাও) বহির্গমন ছাড়পত্র করানোর জন্য পাঠানো হয় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। এই প্রক্রিয়ায় দুই থেকে তিন মাস লাগে। শ্রমিক পাঠানোর জন্য সময় পাওয়া যায় মাসখানেক। সেই এক মাস আগেই খেয়ে ফেলেছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মতিন চৌধুরী।

ধারণা করি, রাজনৈতিক সরকার থাকলে এমন একটা গোঁ ধরে থাকতে পারতেন না সচিব। তার এই খামখেয়ালিপনা রাজনৈতিক মন্ত্রীর সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই দূর হতো। কিন্তু এখন রাজনৈতিক সরকার নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টার হাতে অনেক মন্ত্রণালয়, অনেক কাজ। আর তাদের কাছে পৌঁছানোর কোনো পথ নেই রিক্রুটিং এজেন্টদের। ফলে সচিবই সর্বময় কর্তা হয়ে বসেছেন।

সচিবের এই সিদ্ধান্তের ফলে ফলাফল কী দাঁড়ালো? ফলাফল দাঁড়ালো এই, হয়তো মালয়েশিয়ায় এই ৩০ হাজার শ্রমিক পাঠানো গেল না। ৩০ হাজার যুবক কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। রিক্রুটিং এজেন্টরা কোটি কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। আর দেশ বঞ্চিত হলো বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে। কিংবা দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে লিপ্ত সরকারের আমলেই এই আমলানির্ভরতা ব্যাপক দুর্নীতির জন্ম দিতে পারে এ পথে। এই পরিস্থিতিতে দিশেহারা জনশক্তি রফতানিকারকরাও ফাইল ছাড়ানোর জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারেন। নিঃসন্দেহে সে পথ হবে অসাধু পথ। সুতরাং অতিমাত্রায় আমলানির্ভরতা দেশে অতিমাত্রায় দুর্নীতির জন্ম দেবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি সম্পর্কে সরকার শুধু বন বিভাগে হাত দিয়েছে। তাতেই বেরিয়ে এসেছে ডজন ডজন বনখাদক, যারা কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জন করেছে, বিনাশ করেছে বন, ধ্বংস করেছে পরিবেশ। এই জট উদ্ঘাটন করতে গিয়ে কেবল বন সংরক্ষণ প্রধানই নয়, পুরো সিস্টেমই কিভাবে লুটেরা, সেটাও উত্থাপিত হয়েছে। রাজনীতিকদের দুর্নীতির সাথে আমলা-সংশ্লিষ্টতার এটাও এক বড় প্রমাণ। সুতরাং শুধু রাজনীতিক নয়, আমলাদের ক্ষেত্রেও বিষয়গুলো তদন্ত করা দরকার। পরস্পর মিলে দুর্নীতি করেছে। এক পক্ষ সরকার অপরপক্ষ একেবারে পাক-সাফ। এটা ন্যায়বিচার নয়। আর যা ন্যায়বিচার নয়, তাকে গ্রহণযোগ্য করা মুশকিল।

গত ২ জুলাই সুশীলবান্ধব এক পত্রিকা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক খবর দিয়েছে। 'কাজে গতি আনতে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা পাচ্ছেন সচিবরা' শিরোনামে প্রকাশিত ওই খবরে বলা হয়েছে : সচিবরা ১০ কোটি টাকার প্রশাসনিক অনুমতি

www.pathagar.com

দেবেন। নিয়োগ-বদলি-পদোন্নতিসহ নিয়মিত কাজের দায়িত্ব পালন করবেন সচিবরাই। খবরে বলা হয়, সরকারের উপদেষ্টারা এত মন্ত্রণালয়ের কাজ সামাল দিতে পারছেন না বলে কিছু দায়িত্ব সচিবদের হাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সচিবরা এসব দায়িত্ব লিখিতভাবে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। যদিও প্রায় সব উপদেষ্টা তাদের সচিবদের এই দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার জন্য বলে দিয়েছেন। যেসব দায়িত্ব সচিবদের হাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেগুলো হলো রুটিন ওয়ার্ক ছাড়াও নিয়োগ-বদলি-পদোন্নতি, নির্মাণকাজ, ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন, ছুটি এবং সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা খরচের ক্ষমতা।

রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, ইতোমধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে একজন বা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অবসান ঘটানো হয়েছে। এখন প্রধান উপদেষ্টার কাছে পাঠানো নথি সচিবরা সরাসরি তার কাছে নিয়ে যাবেন। শুধু যাওয়ার আগে প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিবের কাছ থেকে সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে। আগের মতো পরিচালক, মহাপরিচালক বা মুখ্য সচিবের মাধ্যমে নথি নিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।' রিপোর্টের এই অংশ পড়ে মনে হতে পারে, বিপ্লব ঘটে গেছে বাংলাদেশের প্রশাসনে। বাস্তবে পরিস্থিতি কোনোমতেই তেমন নয়। কারণ রাজনৈতিক সরকারগুলোর আমলেও সব ফাইল পরিচালক, মহাপরিচালক, মুখ্য সচিবদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টার কাছে যেত না। বহু মন্ত্রী-সচিব ফাইল সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে সই করিয়ে আনতেন। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদেরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ের রুটিন ওয়ার্ক করার জন্য। এখন কি তা হলে ধরে নিতে হবে যে, সে দায়িত্ব পালনে তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন? কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে এমনটা ঘটেছে, সে কথা তো আগে উল্লেখ করা দু'টি ঘটনা থেকেই প্রমাণিত। যদি এসব দায়িত্ব সচিবদের দিয়ে পালন করানো যেত, তা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ উপদেষ্টার নিয়োগের কোনো প্রয়োজন হতো না। শুধু একজন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান করলেই হতো। তিনি অন্যসব রুটিন ওয়ার্ক সচিবদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারতেন।

নিয়োগ-বদলি-পদোন্নতি যদি সচিবদের হাত দিয়ে হয়, তা হলে ন্যায়বিচার সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে এবং প্রশাসনে আরো স্থবিরতা নেমে আসবে। নিয়োগ-বদলি-পদোন্নতির ক্ষেত্রে এখানে সচিবরা তাদের পছন্দমতো লোককে মনোনীত করতে পারেন। উপসচিবের বার্ষিক গোপন রিপোর্ট (এসিআর) লেখেন যুগ্মসচিব। যুগ্মসচিবেরও পদোন্নতি নির্ভর করবে সচিবের মর্জিতে। ব্যক্তিগত-গোষ্ঠীগত বিবেচনায় তিনি যদি যুগ্মসচিবকে কোনো একজন উপসচিবের এসিআর খুব ভালো বা মন্দ দিতে বলেন, সে ক্ষেত্রে যুগ্মসচিবের আর কিছু করার থাকবে না। তেমনি ভালো পোস্টিং বা মন্দ পোস্টিংও নির্ভর করবে সচিবের মার্জির ওপর। তার খেয়াল-খুশির ওপর।

www.pathagar.com

যোগ্যতার বিবেচনা পরাভূত হতে থাকবে। সব সচিবের ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে একই ঘটনা ঘটবে সে কথা বলি না। কিন্তু মন্দের আশঙ্কাই বেশি। সেক্ষেত্রে গোটা প্রশাসন সচিবদের কর্তৃত্বে চলে যাবে এবং গোটা প্রশাসন, জি সচিব হুজুরে পরিণত হবে। প্রশাসনের কার্জকর্মের পরিবর্তে সবাই সচিব হুজুরের খেদমতে লেগে যাবে। একই রকম বিপজ্জনক হবে নির্মাণকাজের দায়-দায়িত্ব সচিবদের হাতে দেয়া।

এরপর আসে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা খরচের ক্ষমতা, টাকা খরচ করতে গিয়ে ফেঁসেছেন রাজনীতিকরা। কিন্তু সচিবরা শত শত কোটি টাকা খরচ করবেন, কোনো দুর্নীতি হবে না- এটা ধারণা করা সঙ্গত নয়। তদুপরি রাজনীতিকরা জানেন, আগামী নির্বাচনে তারা ক্ষমতায় না-ও আসতে পারেন। কিন্তু সচিবরা জানেন, ৫৭/৬০ বছর তারা আছেন। তাদের টিকিটি কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তার ক্ষমতা রাজনীতিকদের চেয়েও একচ্ছত্র হবে। এমনই হয়েছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের ক্ষেত্রে। আমি আবারো বলতে চাই, সব মন্ত্রী-এমপিই যেমন দুর্নীতিবাজ নন তেমনি সব আমলাই এ কাতারে পড়েন না। বেশিরভাগ পড়তে পারেন। তাতে রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়েরই অকল্যাণ। একচ্ছত্র ক্ষমতা একচ্ছত্র দুর্নীতির জন্ম দিতে বাধ্য। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নিলেই ভালো করবেন।

০৭.০৭.২০০৭

www.pathagar.com

আমাদের মূল্যবোধ যেন আহত না হয়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে সভ্য মানুষের জনপদ বাংলাদেশ। আমাদের রয়েছে আড়াই হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস। আড়াই হাজার বছর আগে আমার পূর্বপুরুষেরা নদী-বন্দরে যাওয়ার জন্য তৈরি করেছিলেন পাকা সড়ক। নরসিংদীর ওয়ারি বটেশ্বর প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সে সড়ক আবিষ্কার করেছেন। আমার পূর্ব পুরুষেরা শুধু বাণিজ্যিক লাভালাভের কথা বিবেচনা করে পাকা রাস্তাই নির্মাণ করেননি, তারা উদ্ভাবন করেছিলেন বাংলালিপি। সেও প্রায় ২২০০ বছর আগে। আর আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন যে নিদর্শন চর্যাপদ, তারও বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর। আমাদের দেশে প্রাচীন যে বৌদ্ধ বিহারগুলো আছে, সেগুলো ছিল এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এখানে আসতেন জ্ঞানার্জনের জন্য। সেও ১৩০০-১৪০০ বছর আগের কথা। কিন্তু মানুষ হিসেবে জার্মানদের মতো আমরা অহঙ্কারী নই। এ দেশ প্রাচীন যুগ থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। কারণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে বহু আগে এ দেশে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো, দায় হতো টিকে থাকা।

আমাদের এই সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি, এখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ, নদী আমাদের দিয়েছে অনুকরণীয় মূল্যবোধ। আচার-আচরণে করেছে পরিশীলিত, আদব-কায়দায় করেছে বিশিষ্ট। তা হলে আমরা কি ঝগড়া-ফ্যাসাদ করিনি? করেছি। চর দখলের লড়াই করেছি, জমি রক্ষার লড়াই করেছি, সাম্রাজ্যবাদ হঠানোর লড়াই করেছি, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। নিজেরা হানাহানি বেশি করিনি। যতটা লড়েছি শত্রুর বিরুদ্ধে। নিজেদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া-বিবাদ যাই করি না কেন, অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

কিন্তু কলঙ্ক কি কিছুই তৈরি করিনি? তাও করেছি। আমরা গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছি। আমরা প্রতিবাদী কণ্ঠ রক্ষীবাহিনী দিয়ে পিটিয়ে তুষ বানিয়ে দিয়েছি। আমরা কয়েকটি সংবাদপত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছি। সৃষ্টিশীলতা ধ্বংস করার জন্য আইন করেছি। আমরা ব্যাপক চোরাচালানের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে বিশ্বের দরবারে হেট হয়েছি। আমরা অসম পানি চুক্তি করে

www.pathagar.com

দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কারা করেছি এসব কাজ? এক কথায় জবাব : যারা দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েছি।

আমাদের এসব কেলেঙ্কারির প্রতিবিধান কী হয়েছে? প্রতিবিধান হয়েছে। তা হয়েছে ভয়াবহ পন্থায়। যারা এই কেলেঙ্কারির অধ্যায় রচনা করেছিল, তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ দেশের মানুষ তাদের বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। মানুষ যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে এসব কলঙ্ক মোচন করে নিয়ে সামনে এগোনোর পথ খুঁজেছে এবং পথ তারা করেও নিয়েছে। এটাই ইতিহাস এবং এটাই সম্ভবত ইতিহাসের শিক্ষা।

দীর্ঘ সভ্যতা আর ঐতিহ্যের কারণেই আমাদের গড়ে উঠেছে সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ। আমরা কিছু কিছু জিনিস, আচরণ দেখে অভ্যস্ত। কিছু কিছু বিষয়ে অভ্যস্ত নই। আমাদের মূল্যবোধ তাতে আহত হয়। তেমন দু'টি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম ঘটনাটি ৭-৮ বছর আগের। আওয়ামী লীগ শাসনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদল কর্মীদের ধরে এনে রমনার পুলিশ ক্যাম্পে খালি গায়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল রোদের মধ্যে। শত শত ছাত্র। মনে হচ্ছিল যেন হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী এরা। সে ছবি খবরের কাগজে ছাপা হলে শিউরে উঠেছিল সারা দেশের মানুষ। না আওয়ামী সমর্থকরাও খুশি হয়নি। শুধু তাই নয়, এ ছবি প্রকাশিত প্রচারিত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী। সারা পৃথিবীতে ছি-ছি রব উঠেছিল। এতে যে শুধু সরকারের ভাবমর্যাদা বিনাশ হয়েছিল তাই নয়, গোটা বাংলাদেশের ইমেজই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। যেন বাংলাদেশ পৃথিবীর এক বর্বর দেশ।

সম্প্রতি দ্বিতীয় বর্বরতম ঘটনা ঘটেছে গতবছর ২৮ অক্টোবর। শেখ হাসিনার লগি-বৈঠা আন্দোলনের সময়। গত বছর ২৭ অক্টোবর জোট সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। সে সময়ই শেখ হাসিনা লগি-বৈঠা নিয়ে ঢাকায় এসে জোট সরকারের সমর্থকদের মিছিল করে ধাওয়া করার আহ্বান জানান। তার সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সন্ত্রাসী সমর্থকরা পল্টনে পিটিয়ে-পাড়িয়ে পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করে। শত শত স্টিল ক্যামেরা, ডজন ডজন মুভি ক্যামেরার সামনে এই ঘাতকেরা ওই হত্যাযজ্ঞে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এই পৈশাচিক বর্বরতায় আওয়ামী লীগের যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েছেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের। পৃথিবীতে বাংলাদেশ একটি বর্বর জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশের এই কলঙ্ক মোচন করতে সময় লাগবে।

সাম্প্রতিক সময়েও তেমনি আহত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। সাবেক প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানের স্ত্রী ক্যান্সারে আক্রান্ত। বলা হয়েছে, আমানের কথিত দুর্নীতির সহযোগী তার স্ত্রী। সে কারণে তার অসুস্থ স্ত্রীকে স্ট্রেচারে করে আদালতের সামনে হাজির করা হয় এবং আদালত এ অবস্থাতেই তাকে সাজা দিয়ে দিয়েছেন। দোষী ব্যক্তি সাজা পাবে এটাই স্বাভাবিক। তা সে নারী কি পুরুষ তাতে কোনো ভেদাভেদ

www.pathagar.com

থাকার কথা নয়। কিন্তু একজন সম্মানিতাকে এভাবে আদালতে এনে হাজির করার দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত নয় এ দেশের মানুষ। আবার একইভাবে নিয়ে আসা হলো মানবাধিকার সংগঠক ও ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার স্ত্রী সিগমা হুদাকে। এখনো তাকে হুইল চেয়ারে করেই আদালতে আনা হচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত নয় বাংলাদেশের মানুষ। তবে এর চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের ক্ষেত্রে। মাহমুদের কথিত দুর্নীতির দায়ে আটক করা হয়েছে একযোগে তার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে। আসলে তাদের কি দোষ সেটা স্পষ্ট হয়নি কারো কাছে। ফলে এসব আচরণকে নিষ্ঠুর ও অমানবিকই মনে হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

এদিকে তথ্য ও আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, এক কৌতূহলোদ্দীপক কথা। চাঁদাবাজির মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেছেন, সাধারণ কারো বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা আর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা এক কথা নয়। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, বিরোধীদলীয় নেত্রী ছিলেন। সুতরাং লোক বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি ব্যারিস্টার মানুষ। কিন্তু আমরা সাধারণেরা যা জেনে এসেছি, তা হলো আইন সবার জন্য সমান। কিন্তু মইনুল হোসেন যদি মনে করেন, ব্যক্তিভেদে আইনের প্রয়োগ ভিন্ন হবে, তা হলে মিসেস আমান, সিগমা হুদা বা ইকবাল হাসান মাহমুদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ক্ষেত্রে তা হবে না কেন? পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রতিনিয়ত দুর্নীতির মামলায় শাস্তি পেয়েছেন হাজার হাজার কোটি ডলারের মালিকরা। এখনো পাচ্ছেন। কিন্তু কোথায়ও শুনিনি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দুর্নীতির দায়ে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও আসামি হিসেবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। না দাঁড়ানোটাই সভ্যতা। আমরা সেই সভ্যতার ব্যত্যয় ঘটাচ্ছি।

এসব বিষয়ে যোগাযোগ উপদেষ্টা অব. মেজর জেনারেল এম এ মতিন বলেছেন, দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে গেলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তো ঘটতেই পারে। তার অর্থ কি এই যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কি তা হলে ঘটতেই থাকবে? এও এক ভয়ঙ্কর কথা। আসলে সরকারের দায় মানবাধিকার সংরক্ষণ করা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের লাইসেন্স দেয়া নয়।

মানাবাধিকারের প্রশ্ন শুধু এখানেই নয়, মানবাধিকারের প্রশ্ন আছে আটক কারাবন্দী নেতাদের নিয়েও। বিএনপি চেয়ারপারসনের সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের স্বাস্থ্যের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে গরু চুরির মামলা। আবদুল জলিলের বিরুদ্ধে কি মামলা তা জানি না। তবে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের অনুমোদন করিয়ে দেয়ার বিনিময়ে তিনি ৮০ লাখ টাকার শেয়ার উপহার নিয়েছিলেন বলে তার কথিত ভাষ্যে জানা যায়। আদালতের রায়ে এরা কেউই দোষী সাব্যস্ত হননি। তাদের বিদেশে উন্নত চিকিৎসা দরকার। সে চিকিৎসা না পাওয়াও মানবাধিকার লঙ্ঘন। একইভাবে কারাবন্দী তরিকুল ইসলাম, মির্জা আব্বাস, নাজমুল হুদা,

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মোহাম্মদ নাসিম, নাসিরউদ্দিন পিন্টুসহ অনেকেই গুরুতর অসুস্থ। আমরা বলেছি, নিঃসংশয়ে প্রমাণিত দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি পাক তাতে কেউ আপত্তি তুলবে না। কিন্তু যতক্ষণ না তার দোষ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের মানবাধিকার যেন লঙ্ঘিত না হয়।

তবে দায়ের করা মামলার প্রকৃতিও কখনো কখনো জনমনে প্রশ্ন উঠছেই। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে গরু চুরির মামলা কিংবা ব্যারিস্টার আমিনুল হকের বিরুদ্ধে গাছ চুরির মামলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সাধারণ মানুষ। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের বিরুদ্ধে এ ধরনের দুর্নীতির মামলাই দেয়া যায়নি। যে মামলা দেয়া হয়েছে, তা হলো, তার বাসায় মদ পাওয়া গেছে। এ মদ পাওয়া গেছে না রাখা হয়েছে, সে প্রশ্নও তুলতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। আমি খুব সাধারণ বাসযাত্রীদের মধ্যেই ত্রাণের টিন নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে দেখেছি। তারা ঠাট্টা করে বলেছেন, ভাই রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলে টিনের ঘরে বসবাস করাই বিপদ। কখন পুলিশ গিয়ে আপনার টিনের বেড়ায় ত্রাণের টিনের সিল মেরে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের বাসযাত্রীদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এ বার্তা তাদের কাছে কখনো পৌঁছবে না। কিন্তু মানুষের এই মনোভাব তাদের জানা থাকা দরকার আছে।

তেমনিভাবে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের বিরুদ্ধে যে মামলা দেয়া হয়েছে, তাতে অভিযোগ করা হয়েছে, মওদুদ আহমদ মদ বিক্রি করতেন। এ মামলার শুনানির সময় হাইকোর্টে বিচারপতিরা অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল সালাহউদ্দিন আহমদকে জিজ্ঞাসা করেন, এ দেশে মদ নিষিদ্ধ কি না? আর মদ নিষিদ্ধ হলে লাইসেন্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কেন? জবাবে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, দেশে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয়। ব্যবহারের কিছু নিয়মকানুন আছে তা মেনে চলতে হয়। মওদুদ তা মেনে চলেননি। আদালত জানতে চান, মওদুদ কি মদ বিক্রি করতেন? জবাবে রাষ্ট্রপক্ষ বলেন, বিক্রি না করলেও তা তার দখলে ছিল। আদালতে মওদুদ আহমদের আইনজীবীরা বলেন, মওদুদের বাসা থেকে কোনো মদই উদ্ধার হয়নি। এ মামলা সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আদালত মামলার কার্যক্রম তিন মাসের জন্য স্থগিত করে দেন।

তবে এই ধারায় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে তা যে আদালত ও সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না সেটা সরকারকে বুঝতে হবে। এতে ন্যায়সঙ্গত দুর্নীতির মামলাও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

আর একটি কথা বলেই শেষ করতে চাই, যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের ছোট বড় রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালিত হচ্ছে শুভানুধ্যায়ীদের দান বা চাঁদায়। আর এই অর্থদাতা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি। বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রসরতা তার সবটুকুই বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সাফল্যের কারণেই হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে

www.pathagar.com

বসুন্ধরার শাহ আলম, পারটেক্সের আবুল হাশেম, এফবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু, ট্রান্সকমের লতিফুর রহমান, স্কয়ারের স্যামসন চৌধুরী, অ্যাপেক্সের মঞ্জুর এলাহী প্রমুখ। এরা এ দেশে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের পণ্যের গুণমানও প্রসংশিত। এসব শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্দীপনা যেন নষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থাও জরুরি। এদের মধ্যে আবদুল আউয়াল মিন্টু অনেকদিন ধরেই রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়নসহ পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেছেন, টিভি'র টক শোতে কথা বলেছেন। তিনি এখন কারাবন্দী আছেন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে সহযোগিতার অভিযোগে। এদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করতে প্যারলে ভালো। বিচারে যদি এরা দোষী সাব্যস্ত হন, তা হলে যা শাস্তি হওয়ার হোক। সে ক্ষেত্রে তাদের উত্তরাধিকারীরা যেন ভয়ে ভয়ে না থাকেন। তারা যেন পূর্ণোদ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারেন। প্রশ্নটা এ কারণে উত্থাপন করলাম, কারাবন্দী শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারো কারো কথা বলে মনে হয়েছে, তারা গভীর হতাশা ও আতঙ্কের মধ্যে আছেন। মালিকরা অপরাধের জন্য শাস্তি পাবেন, আতঙ্ক বা অনিশ্চয়তা সে জন্য নয়। তাদের চিন্তা রুটি-রুজির পথ বন্ধ হয়ে যাবে না তো! এ কথা বড় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, ছোট বা মাঝারি ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য।

রাজনৈতিক দল সারা দুনিয়াতেই দান-অনুদানের ভিত্তিতেই চলে। ব্রিটেন-আমেরিকায়ও সে জন্য ফান্ড রেইজিং ডিনারের আয়োজন করা হয়। কিন্তু ওই অর্থ কী খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের অ্যাকাউন্ট স্বচ্ছ কি না, তার জবাবদিহিতা চাইতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে। আর যে বিরাট অঙ্কের চাঁদা দিল তার সে টাকাটা হোয়াইট কি না, সেটা দেখা যেতে পারে। শুধু স্বেচ্ছায় চাঁদা দেয়া কোনো অপরাধ হতে পারে না। জোর করে বা ফাঁদে ফেলে চাঁদা আদায় অপরাধ, কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের দান গ্রহণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে বলে মনে হয় না।

১৩.০৭.২০০৭

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হয় জনগণের ওপর

শেষ পর্যন্ত চাঁদাবাজির মামলায় গত ১৬ জুলাই গ্রেফতার হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। যে যত কথাই বলুক, শেখ হাসিনা সম্ভবত বিশ্বাসই করেননি যে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাকে গ্রেফতার করতে পারে। সম্ভবত শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তারা তার হয়ে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করবে, যাতে তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না বর্তমান সরকার। আর সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি ১১ জানুয়ারির সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছিলেন, যেমন সমর্থন দিয়েছিলেন ১৯৮২ সালে এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানকে। তখনো তিনি আশা করেছিলেন, এরশাদ একসময় তাকে ক্ষমতার গদিতে বসিয়ে দেবেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাথে অর্থকড়ির ব্যাপারে তার ফয়সালা হলেও ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যাপারে কোনো ফয়সালা হয়নি। ক্ষমতা দখল করে ৯ বছর এরশাদ ক্ষমতা ভোগ করেছেন। এ সময় বারবার শেখ হাসিনা তাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েও তেমন কোনো সুফল অর্জন করতে পারেননি। নিজের ও তার দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে হাত মেলাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এরশাদ সরকারের পতন ঘটেছিল। বুর্জোয়া রাজনীতির লক্ষ্যই ক্ষমতার মসনদে আরোহন। সেটা শেখ হাসিনা পেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা ছিল বলেই।

বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রধ্বংসী আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনা বারবার গিয়ে ধরণা দিয়েছেন বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের কাছে। সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলেছেন, জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে বলেছেন, দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের পক্ষে বলেছেন, মানুষ হত্যায় ইন্ধন জুগিয়েছেন, গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। অবরোধের নামে গোটা দেশবাসীকে জিম্মি করেছেন। সাধারণ মানুষের আয়-রোজগারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। কৃষিপণ্য পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করে সাধারণ কৃষকের শত শত কোটি টাকার পণ্য পচিয়েছেন। দেশবাসীকে এক

www.pathagar.com

অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন। তার সমর্থকদের দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কুৎসিত-অশ্লীল ভাষায় গান গাইয়েছেন। আর শেষ পর্যন্ত লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে গণহত্যার প্ররোচনা দিয়ে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মুখ ম্লান করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য ক্ষমতার গদিতে বসা।

বিদেশীদের কাছে আওয়ামী লীগের নির্লজ্জ ধরণা দেখে বারবার মনে হয়েছে, এ দেশ যেন বিদেশীদের। আমরা সেই উপনিবেশের প্রজামাত্র। কিন্তু এ দেশের মালিক-মোক্তার যে এ দেশের জনগণ, সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। এই কলামে বারবার সে কথা লিখেছি। সতর্ক করার চেষ্টা করেছি, শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করেছি। বিবেক জাগ্রত করার চেষ্টা করেছি। কোনো ফলোদয় হয়নি। ফলে বাংলাদেশকে নিয়ে, বাংলাদেশের সম্পদ দখল নিয়ে বিদেশীদের ষড়যন্ত্র দানা বাঁধার সুযোগ পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সে ষড়যন্ত্রেরই জয় হয়েছে। জেনে বা না জেনে এই ষড়যন্ত্রে ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন শেখ হাসিনা। কিন্তু এখন পড়েছেন স্বখাত সলিলে।

'নয়া দিগন্ত'-এর উপসম্পাদকীয় কলামে যারা ফরহাদ মজহার ও মাহমুদুর রহমান বা এই লেখকের লেখা নিয়মিত পড়েছেন, তাদের কাছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশ নিয়ে ভারত, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অভিন্ন। সেই স্বার্থ সংরক্ষণ ও ফায়দা হাসিলের জন্যই এরা একযোগে কাজ করে গেছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। আর সেই স্বার্থ হাসিলের জন্য এই তিন শেয়াল একযোগে 'রা' করেছে, 'বাংলাদেশে জঙ্গিবাদীদের ঘাঁটি আছে, এখানে আল-কায়েদা আছে, এখানে সন্ত্রাসবাদ লালন-পালন করা হচ্ছে। জোট সরকারের অন্তর্ভুক্ত জামায়াত হলো জঙ্গিদের প্রধান 'আশ্রয়স্থল' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অপপ্রচারে হাততালি দিয়ে বাহবা দিয়েছেন শেখ হাসিনা ও তার সাথীরা। একবারও ভেবে দেখেননি, রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য তার এই হাততালি কী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কী বিপর্যয় আসতে পারে তার নিজের জন্যও।

শেখ হাসিনা নিঃসঙ্গ সেলে বসে এখন বিষয়গুলো ভেবে দেখতে পারেন, কী চেয়েছিল ভারত-ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র? এরা শেখ হাসিনাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, যেয়ো না ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে। খালেদা জিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, কোরো না ২২ জানুয়ারির নির্বাচন। বিশ্বের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ? কারণ ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশের তেল-গ্যাসসহ সব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব, ভারতের ট্রানজিট আর বাণিজ্য চাই সে কারণে দরকার দুর্বল মেরুদণ্ডহীন জবাবদিহিতাহীন এক সরকার, যে সরকার তাদের স্বার্থ না দেখে পারবে না। আর সে ফাঁদেই পা দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। এক দাবি মেটে তো নতুন দাবি আসে। সে দাবি

www.pathagar.com

মেটে তো আরেক দাবি। যখন তার মন্ত্রিসভার সদস্য ও ঘনিষ্টজনেরা আটক হতে শুরু করল, তখনো তিনি আশায় বুক বেঁধেছিলেন। এসব বোধ করি সামান্য বিপর্যয়। ক্ষমতা তিনি হাতে পাবেনই। সবাই মিলে বোধ করি সে ব্যবস্থাই করছে। তাই তিনি বিএনপি'র যারা গ্রেফতার হয়নি, তাদের সবাইকে গ্রেফতার করার দাবি তুললেন জোরেশোরে। কেন? কারণ, তাহলে তার ক্ষমতায় যাওয়ার পথ আরো বেশি মসৃণ হবে। প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ক্ষমতা একেবারে হাতের মুঠোয়।

শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা বছর ধরে কেবলই হল্লা-চিল্লা করলেন জোট সরকার 'চোর চোর মহাচোর', মহাদুর্নীতিবাজ। এরা কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই বললেন, জোট সরকার ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে। আর বিদেশী স্বার্থের তল্পিবাহক কয়েকটি পত্রিকাও তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই অবিরাম লিখে যেতে থাকল জোট সরকারের দুর্নীতির কাহিনী। এসব অভিযোগ তোলার আগে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা একবারও ভেবে দেখলেন না যে, তারাও ক্ষমতায় ছিলেন। দুর্নীতির সুযোগ তাদেরও ছিল। দুর্নীতির অভিযোগ যদি ওঠে, উঠতে পারে তাদের বিরুদ্ধেও। অপর এক রাষ্ট্রঘাতী আত্মমর্যাদাহীন এক বৃদ্ধ বিদেশী মদদে ঢাক পেটাতে থাকলেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে দুর্নীতিবাজ দেশ। তাতে ওই বুড়োর কী আমোদ সেটা এখনো স্পষ্ট হলো না। কিন্তু সেনাবাহিনী সমর্থিত বর্তমান গণপ্রতিনিধিত্বহীন জাববিদিহিতাহীন সরকার কী দুর্নীতি উদ্ঘাটন করল? এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেল, তা হলো ত্রাণের টিন ও চাঁদাবাজি। শেখ হাসিনা নিজে দাবি করেছেন, চাঁদাবাজি দুর্নীতি নয়। কারণ শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদায় দল চলে। দল চালাতে টাকার দরকার হয়। তাহলে বিএনপি নেতাদের চাঁদাবাজির মামলায় তিনি কেনো এত উৎফুল্ল হলেন? যখন তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হলো, তখন বললেন, এ মামলা ষড়যন্ত্রমূলক। কিন্তু বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে যখন চাঁদাবাজির মামলা হলো, তখন সেটা খাঁটি? এই দ্বৈত অবস্থান তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শেখ হাসিনা যদি অভিন্ন অবস্থানে দাঁড়াতে পারতেন, তাহলে জাতিকে এই বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হতো না।

এদিকে সম্প্রতি আরো কিছু তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটেছে। শেখ হাসিনা সম্ভবত লক্ষ করেছেন বিএনপি বা আওয়ামী লীগে সংস্কারের বিষয় নিয়ে এখন নানা মেরুকরণ চলছে। যারা তার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো দিন কথা বলার সাহস পাননি, তারা এখন অনেক বড় বড় কথা বলতে শুরু করেছেন। এমনকি রাজনীতি থেকে তাকে নির্বাসনে পাঠানোর প্রস্তাবও করেছেন কেউ কেউ। মুকুল বোস আওয়ামী লীগের তৃতীয় সারির নেতা। সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল আটক হওয়ার পর শেখ হাসিনাই মুকুল বোসকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করেছেন। কিন্তু তিনিও জোরেশোরে এখন শেখ হাসিনামুক্ত আওয়ামী লীগ চাইছেন। ভবিষ্যতে যদি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়,

www.pathagar.com

সেখানে যদি ঐক্যের দরকার হয় তাহলে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা যাতে একও না হতে পারেন, তার জন্যও আগেভাগে হুমকি দিয়েছেন তোফায়েল আহমেদ। আর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কার কার যোগাযোগ আছে, সে কথা বলেছেন আবদুল জলিল ও শেখ ফজলুল করিম সেলিম। অর্থাৎ ভারতীয়দের গুডবুক থেকেও বাদ পড়ে গেছেন শেখ হাসিনা। তাহলে কী দাঁড়াল? ভারতীয়দের কাছেও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে শেখ হাসিনার। ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাহলে তার থাকল কে? যদি কেউ থেকে থাকে, তারা বাংলাদেশের গরিব সাধারণ মানুষই। ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করতে গিয়ে যিনি বারবার জিম্মি করেছেন এই সাধারণ মানুষকেই। আশা করি, রাজনীতিতে থাকলে ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা তার কাজে লাগবে।

এখন সরকার আর কথিত ব্যাপক দুর্নীতির ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারছে বলে মনে হয় না। আর তাই কাউকে ধরার জন্য গণহারে দায়ের করা হচ্ছে চাঁদাবাজির মামলা। এ মামলাগুলোও প্রশ্নহীন নয়। বিএনপি'র 'বিপ্লবী' মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরপরই চাঁদাবাজির মামলা দায়ের হলো অবঃ ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহর বিরুদ্ধে। তিনি গ্রেফতার হলেন পুত্রসহ। কিন্তু পরিস্থিতি দাঁড়াল কী? উচ্চতর আদালত এই মামলায় তাকে জামিন দিয়েছে। না, চাঁদাবাজি হয়নি, এমন কথা আমি বলছি না। জবরদস্তি চাঁদা আদায়, ফাইল আটকে চাঁদা আদায়, এগুলো অপরাধ সন্দেহ নেই। কিন্তু দান গ্রহণ অপরাধ হতে পারে না। ফলে চাঁদাবাজির জন্য গণহারে আটক করা শেষ পর্যন্ত কোনো ফল দেবে বলে মনে হয় না।

এদিকে ঘরোয়া রাজনীতি বন্ধ আছে। কিন্তু রাজনীতি করছেন অনেকেই। রাজনীতি করতে পারছেন না কেউ কেউ। দেশে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু শেখ হাসিনা গ্রেফতার হওয়ার পর নতুন দল গঠনের উদ্যোক্তা সাদেক সিদ্দিকী ও আজম খানের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল হয়েছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। প্রশাসন নীরব। এ অবস্থা সরকারের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেই।

একটা বিষয় শেখ হাসিনা যেমন উপলব্ধি করতে চাননি, তেমনি উপলব্ধি করতে পারছেন না বর্তমান সরকার। ১৯৮২ সালে এ দেশে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটি। শিক্ষিত লোক ছিল মাত্র আড়াই কোটি। এখন লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ১০ কোটি। তার ওপর আছে ডজনখানেক বেসরকারি টিভি চ্যানেল। ফলে সাধারণ মানুষের চোখ-কান খুলে গেছে। তাই পুরনো কায়দায় নতুন করে খেলা জমে উঠবে বলে মনে হয় না। মানুষ এখন অনেক কৌশলই উপলব্ধি করতে পারেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে জোর করে বাদ দিয়ে রাজনীতি কঠিন বিষয়। এদের বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি কোনো দলেই। এটাই বাংলাদেশের বাস্তবতা। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সরকার যদি আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র ক্ষুদ্র গ্রুপ নিয়ে একটি অনুগত কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে চান, তাহলে সে সরকার স্থায়িত্ব পাবে বলে মনে হয় না। তাতে দেশে নতুন করে হানাহানির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নেয়া হয়েছে। তার ক্ষমতায় যাওয়ার আকাঙ্খা আপাতত শেষ। ধারণা করা হচ্ছে, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকেও আটক করা হবে। সে রকম প্রস্তুতিও চলছে। কিন্তু চেষ্টা করে এই দুই নেত্রীকে মাইনাস করার উদ্যোগ কতটা সম্ভব হবে, বলা দুষ্কর। তবে দলীয় নেতা ও বিদেশী বন্ধুদের হারিয়ে শেখ হাসিনার নিশ্চয়ই উপলব্ধি হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত ভরসা করতে হবে জনগণের ওপর। কৌশল বা ষড়যন্ত্র নয়, জনগণের শক্তির ওপরই তাকে নির্ভর করতে হবে।

গত ডিসেম্বরে কিছু রাজনৈতিক সহযোগী দেখা করতে গিয়েছিলেন শেখ হাসিনার সাথে। তারা শেখ হাসিনাকে বলেছিলেন, কিছু একটা আপস না করলে সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারে। এ কথা শুনে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা হাতে ডাক দেয়ার মুদ্রা তুলে ছড়া পাঠের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'আয় আয় আয় বাঘ, আগে সাদাটারে খা।' অর্থাৎ মিলিটারি এলে আসুক। এসে খালেদা জিয়াকে আগে ধরুক। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! বাঘে আগে তাকেই ধরেছে। রাজনীতিতে সত্য, ন্যায় ও স্বচ্ছতা থাকাই ভালো। কারো যাত্রা ভঙ্গের অপচেষ্টায় নিজের নাক যেন কাটা না যায়, সেটাও ভেবে দেখা উত্তম।

২২.০৭.২০০৭

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র-বিশ্বব্যাংক-ভারত কেন ফুলায়

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে খুব কম সময়ে সাক্ষাৎ দিয়ে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশে বর্তমানে দুর্নীতিবিরোধী যে অভিযান চলছে, তার প্রতিও অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। তা ছাড়া তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে গোপন কিছু কথা বলেছেন, যে কথা সরকারকে জানানোর জন্য রাষ্ট্রদূত ঢাকায় ফিরেছেন। কিন্তু কী সে গোপন কথা, তা আমরা এখনো জানতে পারিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের আজ্ঞাবাহী বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ বলেছে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার। বাংলাদেশের মুদ্রানীতিও চলছে তাদের পরামর্শেই। তাতে বিকাশমান অর্থনীতির কী হবে, মূল্যস্ফীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর এর কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই কারো।

অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ভারত জোরেশোরে চায় টাটার তথাকথিত বিপুল বিনিয়োগের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত, ট্রানজিট সুবিধা, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ব্যবহারের সুযোগ, ত্রিপুরা ও মিজোরামে নতুন শুল্কবন্দর আর বিদ্যুৎ খাতে যৌথ বিনিয়োগ। সবার ওপরে তারা চায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের খুশি হওয়া, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ'র খবরদারি আর ভারতের এই দাদাগিরি সবই এক সুতায় গাঁথা।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে রকম সরকার, এরকম একটি সরকারের উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল। এ সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিতও নয়, জনগণের কাছে জবাবদিহি করতেও বাধ্য নয়। এমন একটি সরকারই দরকার ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোর। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের মাধ্যমে এসব ষড়যন্ত্রকারী অনেক কিছুই হাসিল করতে পারছিল না। ফলে তারা মওকা খুঁজছিল এমন একটি অবস্থা সৃষ্টির জন্য। সে মওকা তারা পেয়েও গেছে।

সন্দেহ নেই, এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য রাজনীতিকরাই দায়ী। জনপ্রতিনিধিত্বহীন অনির্বাচিত কিছু লোকের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার তুলে দেয়ার দাবি তুলেছিলেন

www.pathagar.com

রাজনীতিকরাই। এই দাবির মধ্য দিয়ে তারা যেমন অবিশ্বাস করেছিলেন তৎকালীন সরকারকে ১৯৯৬ সালে, তেমনি তারা নিজেদের প্রতিও অনাস্থা ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তারা কবুল করে নিয়েছিলেন যে, তারাও ভবিষ্যতে একটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন না। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিও বিশ্বে নজিরবিহীন ঘটনা। রাজনীতিকরা এরকম একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যখন নিতে যাচ্ছিলেন, তখনো আমরা তার বিরোধিতা করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, আস্থা রাখুন জনগণের শক্তির ওপর। কূটকৌশলের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছাকে খুব বেশি দিন পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। তখন এসব কথায় কেউ কর্ণপাত করেননি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছিলেন, তখন না বুঝেই এসব রাজনীতিক টিটকারি দিতেন যে, জিয়াউর রহমান খাল কেটে কুমির আনবেন। আমরা দেখেছি, খননকৃত খাল দিয়ে কোনো কুমির আসেনি, পানি এসেছিল। ফসলে ফসলে হেসে উঠেছিল ঊষর জমিন। কিন্তু অপরিণামদর্শী রাজনীতিকরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে খাল খনন করেছিলেন, তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত কুমিরই এসে গেছে।

রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে মহাজোট যে হত্যা-উল্লাসের আন্দোলন শুরু করেছিল, তাতে জরুরি অবস্থার সম্ভবত কোনো বিকল্প ছিল না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, মহাজোট নেতাদের সম্ভাব্য নির্বাচনে জিতিয়েই দিতে হবে। যত দিন সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি না হবে, তত দিন মানুষ, অর্থনীতি, কলকারখানা, কৃষির ওপর তাদের হত্যাযজ্ঞ চলবেই। এখানেও উদ্দেশ্য সুষ্ঠু নির্বাচন, দেশের অগ্রগতি- এসব বিষয় ছিল না; ছিল ক্ষমতার গদিতে বসা। আর সেসব কারণেই বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান সরকারের উপদেষ্টারা শপথ নিয়েছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে। সে সরকারের মেয়াদ ছিল তিন মাস। তাদের দায়িত্ব ছিল ওই সময়ের মধ্যে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা এবং ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেয়া। কিন্তু তারা সে রকম কোনো কাজে ব্যস্ত নেই। তা ছাড়া সংবিধান অনুযায়ী এই সরকারের কেবল দৈনন্দিন কাজ করার কথা। নীতিনির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা নয়। কিন্তু তারা বহু নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। তারা ভারতের সাথে ট্রেন চলাচল, মিয়ানমারের সাথে সড়ক যোগাযোগসহ আরো অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রচলিত আইনকানুনে পরিবর্তন আনছেন। নির্বাচিত সরকার হলে এ জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হতো। বর্তমান সরকারের কোনো জবাবদিহিতা নেই। ফলে তারা যা খুশি করতে পারছেন। আর তাদের এই অসীম ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এ দেশে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে বিদেশীরা।

প্রথম প্রথম সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের অনুকূল প্রভাব পড়েছিল জনমনে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি,

www.pathagar.com

ছাঁটাই, বস্তি উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির ফলে মানুষের সে উৎফুল্ল ভাব আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে বলা দুষ্কর। এ ছাড়া আইএমএফ'র পরামর্শ অনুযায়ী সরকার যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছে তাতেও সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না সাধারণ মানুষ। বিমান কোম্পানি হবে কি না, জুটমিল বন্ধ করে দেয়া হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকার নিলেই ভালো হতো। এর ভেতরে একটা জবরদস্তি যে আছে, সরকারের কর্মকাণ্ডে তা উপলব্ধি করা যায়। সরকার বড় বড় রাজনৈতিক দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে বলেও সাধারণ মানুষের ধারণা। মানুষ মনে করছে, বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তগুলোকে বৈধতা দিতে হবে জাতীয় সংসদে। সে সংসদে পছন্দমতো লোক নিয়ে এসে তারা তাদের কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিতে চান। তার জন্যই দরকার অনুকূল রাজনৈতিক দল। সে জন্য প্রথমে চেষ্টা হয়েছিল গ্রামীণ ব্যাংকের ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার। ভেস্তে গেছে সে চেষ্টা। পরে চেষ্টা ছিল ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে দল গঠন করা যায় কি না। সে চেষ্টাও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। সে কারণেই গঠন করতে হচ্ছে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল। সদ্যঘোষিত এক দলের সমন্বয়ক বলেই ফেলেছেন তিনি সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন। আবার একই কারণে ভেঙে দিতে হচ্ছে বড় বড় রাজনৈতিক দল। মানুষের মধ্য থেকে এই বিশ্বাস দূর করা কঠিন হবে।

প্রথম প্রথম নিরপেক্ষ ভাবলেও বর্তমান সরকারকে এখন আর নিরপেক্ষ ভাবতে পারছেন না অনেকেই। তাদের রাজনৈতিক অভিলাষ এখন আর আড়াল করা সম্ভব হচ্ছে না। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে খুব শিগগিরই জনগণের গরিষ্ঠ অংশ তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে শুরু করবে। সেটা কারো জন্য মঙ্গলজনক হবে না।

সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে যেমন সর্বাত্মক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি আতঙ্ক ছড়িয়েছে সর্বত্র। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বিনিয়োগে ব্যাপক ধস নেমেছে। ব্যাংকে আমানত প্রবৃদ্ধি কমে গেছে। কেউ হয়তো সারা জীবন ধরে জমিয়েছেন কয়েক লাখ টাকা। ব্যাংকের হিসাব দেখে দুদক যাবে নাকি বাসায়। কোন্ ঝামেলায় পড়ি। অতএব, ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন অনেকেই। একই কারণে সঞ্চয়পত্রও ভাঙিয়ে ফেলছেন বহু মানুষ। এরকম অবস্থায় বিনিয়োগে ভাটা পড়েছে। সরকার এই সাত মাসেই ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। দাতাদের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। বিদেশী বিনিয়োগ আসছে না। বিনিয়োগকারীরা বলছেন, বিনিয়োগ করবেন নির্বাচিত সরকার আসার পর। ফলে সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাংকের ঋণ পেতে। বাগে পেয়ে বিশ্বব্যাংক দিয়েছে কঠোর শর্ত যার একটি হলো, আমদানি শুল্ক আরো হ্রাস করা। আমদানি শুল্ক হ্রাস করলে দেশে উৎপাদিত পণ্য হুমকির মুখে পড়বে। বন্ধ হয়ে যাবে অনেক শিল্পকারখানা। আবার বেকার হবে হাজার হাজার লোক। এতে আয়ও কমে যাবে সরকারের। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের কথায় একবার আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে।

www.pathagar.com

টাকা নেই সরকারের। ফলে বিশ্বব্যাংকের কাছে সে কি নির্লজ্জ ধরনা। মন্ত্রী পদমর্যাদার অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. এ বিএম মির্জ্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম হোটেল র‍্যাডিসনে বিশ্ব্যাংকের সভায় নিজেই গিয়ে হাজির হয়ে সেখানকার কর্মকর্তাদের কাছে টাকা কর্জ দেয়ার জন্য আবেদন জানান। এ ধরনের লজ্জাকর ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা প্রথম। তা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ কান্ট্রি ডিরেক্টর শিয়েন জু কোনো কথা দেননি উপদেষ্টাকে।

ধারণা করি, যেভাবে চলছে, তাতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ধস আরো ভয়াবহ হবে। বিশ্বব্যাংকের যেকোনো শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হবে সরকার দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও। বাংলাদেশে সেই পরিস্থিতির সৃষ্টিই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথে। কারণ ইতোমধ্যে আইএমএফ বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে সরকার অবাধ আমদানি থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য সেইফ গার্ড ব্যবস্থা তুলে নিয়েছে। তার ওপর আমদানি শুল্ক আরো কমানো হলে দেশীয় শিল্প চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমদানি শুল্ক কমালে বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ'র কী লাভ? জ্বালানি বিদ্যুতের দাম বাড়ালে তাদের কী লাভ? আমদানি বাড়লে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) যারা চালায়, তাদের দেশের পণ্য বিক্রি বাংলাদেশে বাড়বে। সেটা লাভ। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ালেও দেশে উৎপাদন মূল্য বাড়বে। ফলে আমদানি করতে হবে বিশ্বব্যাংকের মুরুব্বিদের কাছ থেকে। তা ছাড়া তেলের ব্যবসাও ওই মুরব্বিদের হাতে। সেটা লাভ। এর ফলে সরকারের শুল্ক আদায়ে ঘাটতি দেখা দেবে। তখন সরকার দৌড়াবে বিশ্বব্যাংকের পেটি অফিসারদের বাসায় টাকা ধার করার জন্য। তখনো আবার তারা এমন শর্ত দেবে যে, বাংলাদেশ যেন আমদানিনির্ভর দেশই থেকে যায়। বেনিয়া রাষ্ট্রগুলোর বাজার বিস্তৃত হয়।

ভারতও বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের ওপর খুব সন্তুষ্ট। তাদের মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা ঘন ঘন বাংলাদেশ সফর করে নানা ছবক দিতে শুরু করেছেন। প্রকাশ্যে এর আগে তারা কখনো এরকম ছবক দিতে সাহস পাননি। যুক্তরাষ্ট্র তো ভারতকে লাইসেন্স দিয়েই দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে 'সন্ত্রাস' নির্মূলে ওয়াশিংটন-দিল্লি একযোগে কাজ করে যাবে। ফলে ওয়াশিংটন ও দিল্লির স্বার্থ একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এসব বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। নিজেদের স্বার্থের জন্য ভারত যেমন বাংলাদেশে তাদের বহু দিনের পুরনো মিত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করেনি, তেমনি পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফকেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এটাই নিয়ম। ফায়দা হাসিল হয়ে গেছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ফেলে দাও আবর্জনা। সরকারকে বুঝতে হবে, জনগণ বোকা নেই। তারাও এখন বহু ব্যাপার সহজে বুঝতে পারেন। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ আর নিজেদের ভাগ্য বদলানোর লড়াইয়ে শত্রুদের তারা ঠিকই চিনে নেবেন এবং এক সময় প্রতিরোধ করবেন।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে দেশ বিদেশের বিভিন্ন নেতার নামে গেট করা হয়েছিল। তাতে ব্রিটিশবিরোধী ভারতীয় নেতারাও ছিলেন। এর কঠোর সমালোচনা করে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মুসাফির নামে তার রাজনৈতিক কলামে লিখেছিলেন '...ভারত কাগমারীর ওই সকল অনুষ্ঠানকে তদীয় স্বার্থে ব্যবহার করিতে ছাড়ে নাই। জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধি কাগমারীর অনুষ্ঠানাদি পয়সা খরচ করিয়া বুলেটিন আকারে ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করাইয়াছে। ভারতীয় পত্রিকাগুলো পুরোদমে উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। মওলানা ভাসানীর উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, ভারত সরকার পাকিস্তান অর্জনের পরও তাহাকে ধুবড়ীতে গ্রেফতার করিয়া জেলে আটক রাখিয়া পরে মুক্তি দিয়া আসাম হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভারতের সংবাদপত্রগুলো আজ কেন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেন তারা তাহাকে পূর্ব পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা আখ্যা দিয়া ফুলায় এবং সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে প্রতিদিন জঘন্য কুৎসা রটায় ও তার রক্ত পান করিতে উদ্যত।'

ভারত কেন ফুলায় মানিক মিয়া তা উপলব্ধি করেছিলেন। ৫০ বছর পর তার সুযোগ্য পুত্র মইনুল হোসেনসহ উপদেষ্টারাও আশা করি উপলব্ধি করতে পারেন যে, কেন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ– ভারত বর্তমান সরকারকে এত ফুলায়।

০৬.০৮.২০০৮

www.pathagar.com

সরকার যেন জনগণের প্রতিপক্ষ না হয়

অনিয়ম-দুর্নীতি করে অর্জিত ৭৫২ কোটি টাকা সরকারের কাছে জমা পড়েছে– এমন 'সাফল্যে'র খবর এখন আর নাড়া দিতে পারছে না সাধারণ মানুষকে। তাদের প্রশ্ন, তাতে কি চালের দাম কমবে? ভোজ্য তেলের দাম কমবে? মাছের দাম কমবে? বিদ্যুতের দাম কমবে? গ্যাসের দাম কমবে? ট্যাক্সি-সিএনজি কি মিটারে যাবে? আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কি উন্নতি হবে? চট্টগ্রাম বন্দরের অলস হয়ে পড়া জেটিগুলো কি আবারো কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে? উচ্ছেদকৃত ৫০-৬০ লাখ হকারের কি কর্মসংস্থান হবে? পাটকলগুলো কি সচল থাকবে? শ্রমিক ছাঁটাই কি বন্ধ হয়ে যাবে? এমনি হাজারো প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোর সদুত্তর কারো জানা নেই।

এ কথা অস্বীকার করি না যে, এক-এগারোর সরকার ক্ষমতা নেয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল এ দেশের মানুষ। কারণ, তার আগে একের পর এক যুক্তিহীন দাবি উত্থাপন করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের সন্ত্রাসী-মাস্তানি গোটা দেশের মানুষকে একেবারে গৃহবন্দী করে ফেলেছিল। অবরোধের নামে তারা সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা অচল করে দিয়েছিল ভয়-ভীতির মাধ্যমে। তার পর বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশীর মদদে জ্বালিয়ে দিতে শুরু করেছিল একের পর এক তৈরি পোশাক কারখানা। সে ধ্বংসাত্মক, অবরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। তারা চেয়েছিলেন, নিরাপদে যে যার কাজ করে যাবেন। তাদের জীবিকার পথ সুগম হবে। নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাবেন ভাগ্য বদলের লড়াই। সে লড়াই চলছিল পুরোদমে। প্রতি বছর ৯ শতাংশেরও বেশি মানুষ উঠে আসছিলেন দারিদ্র্যসীমা পেরিয়ে। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বাড়াচ্ছিলেন কর্মনিষ্ঠ মানুষ। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই তারা উৎফুল্ল হয়েছিলেন এক-এগারোর সরকার নিয়ে। এটাকে তাদের আশীর্বাদ হিসেবে মনে করেছিলেন তারা।

কিন্তু তাদের সে আশা মিইয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। লাখ লাখ হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলো। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নামে ভেঙে দেয়া হলো হাজার হাজার

www.pathagar.com

স্থাপনা। শত বছরের পুরনো হাটবাজার ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হলো। গুদামে পণ্য পাওয়া গেলেই আটক করা হয় ব্যবসায়ীদের। জব্দ বা বাজেয়াপ্ত করা হল তাদের পণ্য। ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের উপায় থাকল না। তখন মানুষ দেখতে পেল, যে জীবিকা নিশ্চিত হওয়ার আশা করেছিল তারা বর্তমান সরকারের কাছে, সে জীবিকাই কেড়ে নেয়া হলো। পথে বসল লাখ লাখ পরিবার। হাহাকার নেমে এলো দেশজুড়ে। শুধু তাই নয়, যারা সারা জীবনের সঞ্চয় জমিয়ে কিনতে গেছেন মাথা গোঁজার আশ্রয় একটি ফ্ল্যাট, তারাও পড়লেন বিপাকে। বন্ধ হওয়ার উপক্রম রিয়েল অ্যাস্টেট ব্যবসা। সেই সাথে বেকার হয়ে পড়েছেন লাখ লাখ নির্মাণ শ্রমিক। যারা ব্যাংকে রেখেছিলেন দু-এক লাখ টাকা, কিংবা কিনেছিলেন সঞ্চয়পত্র, চুনোপুঁটি ধরার নামে তাদের সে টাকার উৎস নিয়ে টানাটানি। আতঙ্কের মধ্যে পড়েছেন নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ। আর যারা উচ্চবিত্ত, তাদের আতঙ্কেরও শেষ নেই।

টাকা এলো কোথেকে? এ কারখানা দিলেন কিভাবে? ব্যবসা করছেন কিভাবে? ট্যাক্স দিয়েছেন তো? তাদের অনেককেই পোরা হলো জেলে। অন্যরা পলাতক। ফলে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লাখ লাখ লোকও এখন আতঙ্কগ্রস্ত। তাহলে বাকি থাকল কারা? শুধুই অবুঝ শিশুরা। কিন্তু তারাও তাদের পিতামাতার অর্থনৈতিক কষ্টের শিকার হতে বাধ্য। আর আছে সরকারি আমলারা যেন ধোয়া তুলসীপাতা। সরকারের দুর্নীতিবিরোধী সর্বাত্মক অভিযানে তারা নেই। অথচ আছে গ্রামের একজন সামান্য ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যও। আর কারা আছে? আছে বিদেশী অর্থের মদদপুষ্ট পরজীবী কিছু সুবেশধারী। তথাকথিত সুশীল সমাজ, যাদের কুপরামর্শে সরকার এতটা বেকায়দায় পড়েছে। এতগুলো অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছে। যার পরিণতিতে এক অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ এখন সম্ভাবনাহীন শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে।

একদিকে মানুষের আয়-রোজগারের পথ রুদ্ধ বা সঙ্কুচিত, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে ন্যুব্জ সাধারণ মানুষ। উপদেষ্টারা বড় বড় কথার তুবড়ি ছড়াচ্ছেন। এক উপদেষ্টা বলেছেন, এ সরকার ব্যর্থও হতে পারে। অপর এক উপদেষ্টা বুক চিতিয়ে বলেন, এই সরকার গত ছয় মাসে যত কাজ করেছে, আর কোনো সরকার তা করতে পারেনি। এসব কথায় মানুষ এখন ম্লান মুখে হাসে। এসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে কখনো ভাষা ফুটবে না তা ভাবা ঠিক নয়।

রাজনীতিক-ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি ধরার নামে বর্তমান সরকারের অপরিণামদর্শী সব কার্যকলাপের ফলে দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। প্রবৃদ্ধির যে ধারা তৈরি হয়েছিল গত ১৫ বছরে, এক উপদেষ্টা বললেন, সে ধারা অব্যাহত নাও থাকতে পারে। কমে যেতে পারে প্রবৃদ্ধির হার। তবে রাজনীতিক, ব্যবসায়ীদের তাড়া করতে গিয়ে,

www.pathagar.com

রাষ্ট্র পরিচালনার আর সব দায়িত্বের কথা ভুলেই গেছে বর্তমান সরকার। আর ভুলেছে বলেই সব ক্ষেত্রে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি তাদের বিশ্বাস করতে পারছে না অনেকেই।

এবারের বন্যা সেই ব্যর্থতাকে একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল। বাংলাদেশে বন্যা স্বাভাবিক ঘটনা। বন্যার আগাম পূর্বাভাসও ছিল। কিন্তু সরকার ভাবার সুযোগ পায়নি যে, বন্যা হলে কৃষি পুনর্বাসনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে? লাগবে বীজ, সার। লাগবে কীটনাশক, ধানের চারা। এমনকি গড়ে তুলতে হবে খাদ্য মজুদ। আমদানি করতে হবে বহুবিধ পণ্য। সরকার চট্টগ্রাম বন্দরকে দুর্নীতিমুক্ত করে দিয়েছে। ভালো কথা। কিন্তু আমদানিই যে বন্ধ হয়ে গেল, তার উপায় কী? টিসিবি দিয়ে সব ভোগ্যপণ্য আমদানি করে বিডিআর দিয়ে সরবরাহ করবে? সেটা এক অসম্ভব কল্পনা মাত্র। কেন বন্ধ হলো পণ্য আমদানি? আমদানিকারকরা পণ্য এনে রাখবেন কোথায়? গুদামে এনে রাখলে সরকার সিলগালা করে দেবে না তো? তাহলে ব্যাংক ঋণ শেষ হবে কিভাবে? সরকারের অপরিণামদর্শী অভিযানে এই আস্থাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সরকারকে বিশ্বাস করতে পারছেন না আমদানিকারকরাও।

সরকারের পরামর্শক সুশীল বান্ধবদের মুখপাত্র সম্প্রতি লিখেছে, দেশে খাদ্য মজুদের পরিমাণ প্রতিদিনই কমছে। বিদেশ থেকে সরকারিভাবে খাদ্য আমদানি করতে না পারা এবং পরিকল্পনা অনুসারে স্থানীয়ভাবে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সফল না হওয়ায় মজুদ কমে গেছে। ব্যবসায়ীরা এবার বিভিন্ন কারণে (কী এই বিভিন্ন কারণ?) সরকারিভাবে চাল আমদানিতে তেমন কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। একাধিক সূত্র বলেছে, আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে সরকার কমপক্ষে ৪ লাখ টন খাদ্য আমদানি করতে না পারলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করতে পারে। কমপক্ষে ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য সরকারি খাদ্য গুদামে থাকাকে নিরাপদ খাদ্য মজুদ হিসেবে ধরা হয়। সে লক্ষ্য নিয়ে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও তা সফল হয়নি। ক্রয়মূল্য কম থাকা এবং বন্যার কারণেই এবারের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এ মৌসুমে ১২ লাখ টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ৬ লাখ ৫০ হাজার ৫১৫ টন চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। খাদ্য বিতরণ, বন্যাত্রাণে খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি কারণে খাদ্য মজুদ শিগগিরই শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। ফলে দাম বাড়বে। ক্রয়ক্ষমতাহীন মানুষ খাদ্য সঙ্কটে পড়বে।

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথাবার্তাও তুচ্ছ বাকোয়াজিতে পরিণত হচ্ছে। বন্যা যখন ভয়াবহ রূপ নিল, তখন পূর্বাপর চিন্তা না করেই একজন উপদেষ্টা বলে বসলেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের কোনো বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সপ্তাহ না ঘুরতেই গোঁফ নামাতে হলো। গত রোববার উন্নয়ন সহযোগী

www.pathagar.com

সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের কাছে জরুরি ভিত্তিতে ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা সাহায্য চেয়েছে সরকার। তেমনিভাবে খাদ্য সহায়তার জন্যও সরকার আহ্বান জানিয়েছে। শুরুতে সরকার মনে করেছিল, বন্যায় তেমন কোনো ক্ষতিই হয়নি। বন্যা-পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনেও তাদের কোনো চিন্তাভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। ফলে বীজ নেই। টেলিভিশনে একজন কৃষি কর্মকর্তাকে বলতে শুনলাম, যে পরিমাণ বীজ দরকার, তার ১০ হাজার ভাগের এক ভাগও সংরক্ষিত নেই।

অর্থনীতিতে বন্যা কী প্রভাব ফেলবে, সে সম্পর্কে ক্রমেই টনক নড়তে শুরু করেছে। সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে যে প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন, তাতে বলা হয়েছে, বন্যার কারণে বাজেট ঘাটতি বাড়বে, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বাড়বে। মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমবে। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে।

সরকারের আবেদনকৃত হাজার কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যাবে কি না, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি। তাদের প্রতিনিধি বলেছেন, তারা নিজেরাও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করবেন। তারপর ঘোষণা দেবেন, কতটা ঋণ দেয়া যাবে সরকারকে। ১৮ আগস্ট পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বন্যায় ৩৯ জেলায় ১ কোটি ৫ লাখ ৭২ হাজার ১৪৫ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মারা গেছে ৫৫৪ জন। ৭ লাখ ৫৫ হাজার ৪৭ একর জমির ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। ৭ লাখ ৬২ হাজার ৬৫৩ একর জমির ফসল আংশিক নষ্ট হয়েছে। ২ হাজার ৮৬৯ কিলোমিটার রাস্তা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আংশিক ক্ষতি হয়েছে ২২ লাখ ৯৭০ কিলোমিটার রাস্তা। ৭২টি সেতু-কালভার্ট একেবারে নষ্ট হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে ১ হাজার ৬৯২টি সেতু-কালভার্ট। এ ছাড়া ৫১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭ হাজার ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দরকার ছিল সর্বাত্মক উন্নয়ন ও উৎপাদনের পরিবেশ। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সে পরিবেশ একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। আইএমএফ'র পরামর্শে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে একের পর এক মিল-কারখানা। বেকারত্ব বাড়ছে নতুন করে। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ কমছে। তাতে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে না। এর ওপর মূল্যস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়তেই থাকবে। জনগণ দাঁড়াবে কোথায়?

না, ভাবেননি সরকারের কেউ। ভাবছেন বলেও মনে হয় না। বাংলাদেশবিরোধী যে চক্রটি দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশ 'ব্যর্থ রাষ্ট্র', 'মৌলবাদী রাষ্ট্র', 'সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি' ইত্যাদি বলে প্রচার করে আসছিল, অনির্বাচিত বলে এই সরকারের ওপর তাদের ভর

www.pathagar.com

করা সহজ হতে পারে। ইতোমধ্যে আইএমএফ'র সাথে দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তি করতে যাচ্ছে সরকার। দুর্বল ও জবাবদিহিতাহীন হলে এ ধরনের চাপ প্রয়োগ করা সহজ।

এ সরকারকে ক্ষমতায় আনার দাবিদার এবং বিভিন্ন ভুল পরামর্শ দানকারী তথাকথিত সুশীল সমাজ জনরোষের ভয়ে মই সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। তাদের কণ্ঠেও এখন ভিন্ন সুর। গত রোববার এ রকম এক সুশীল বলেছেন, 'সার্বিকভাবে অর্থনীতির গতি থমকে গেছে। গত অর্থবছরে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন কম হয়েছে। আমদানি কমছে। খাদ্যের মজুদও কম ছিল। বর্তমান অর্থবছরের শুরুতে ওই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমে গেছে। আমদানিতেও গতি আসছে না। চলতি অর্থবছরে জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে হবে। এর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দেশের এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্কোচনমূলক মুদ্রানীতি নেয়া উচিত হয়নি। এখন ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে আসার অনুরোধ করতে হবে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে তাদের অনুরোধ জানাতে হবে। এতদিনে তারাও সরকারের ক্রটিগুলো দেখতে পেতে শুরু করেছেন।

কিন্তু সরকারের তাড়া খেয়ে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী মহল একেবারে থমকে গেছে। সরকারের ওপর থেকে তাদের যে আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে, সে আস্থা ফিরিয়ে আনা একেবারে দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। বর্তমান শাসনধারা অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষ সরকারকে প্রতিপক্ষই ভাবতে শুরু করবে। সে অবস্থা কারো জন্য সুখকর হবে না। এ অবস্থা থেকে বেরুনোর পথ হচ্ছে– যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। এর সম্ভবত আর কোনো বিকল্প নেই।

২৩.০৮.২০০৭

www.pathagar.com

তিনি একথা বলার কে?

গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের অনভিপ্রেত ঘটনাবলি নিয়ে পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ছাত্রদের সাথে সেনাসদস্যদের হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই দিন রাতভর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়েছে। ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে বহু ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। ছাত্রদের দাবি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিক্ষোভ-সংঘর্ষ থেমে থাকেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা মহানগরীর প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং শেষ পর্যন্ত সারাদেশে। এর পরিণতিতে শত শত ছাত্র এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য আহত হয়েছেন। শত শত যানবাহন ও স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঢাকাসহ সব বিভাগীয় শহরে কারফিউ জারি করতে হয়েছে। সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাগাও বিভাগীয় শহরের সব কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একথা সত্য, টানা তিন দিনের বিক্ষোভ-ভাঙচুরে দেশের মানুষ বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

এদিকে সাম্প্রতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় ঢাকার ১১টি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ২৮টি। ২৬ আগস্ট প্রকাশিত সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যায়, এই ২৮টি মামলায় ৮২ হাজার লোককে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। বাকি সবাই অজ্ঞাতনামা। মামলাকারী তাদের দেখলে কি চিনবেন? ৮২ হাজার লোককে দেখলেই প্রত্যেককে চিনে ফেলবেন, কে ঢিল মেরেছিল বা আগুন দিয়েছিল? এটা একেবারেই অসম্ভব। শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষও এখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, তাকে দেখে পুলিশের মনে হবে না তো তিনি ভাঙচুর ও ঢিলাঢিলিতে অংশ নিয়েছেন? এমন সংশয়ের উদ্রেক হয় যে, পুলিশ এই মামলায় যাকে খুশি তাকে গ্রেফতার করতে পারবে বা করতে চায়। তবে শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, কাজটি ভালো হয়নি। তাই মহানগর পুলিশ কমিশনার ২৬ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া কাউকে অযথা হয়রানি করা হবে না। ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হবে। তিনি বলেন, প্রকৃত আসামি হিসেবে ব্যক্তির

www.pathagar.com

সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি হবে না। তবে একই ব্যক্তি ঘুরেফিরে একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কারণে আসামির সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই ঘোষণায়ও ছাত্র-অভিভাবকদের মনে যে আতঙ্ক কমবে তা বলা যায় না। শুধু ঢাকায়ই নয়, সারাদেশেই হাজার হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত এই সংঘর্ষের পর আবারো বিদেশী মুরুব্বিরা কথা বলতে শুরু করেছেন। মার্কিন দূতাবাস সংঘর্ষে আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। ব্রিটিশ হাইকমিশন সব পক্ষকে সংযত থেকে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তেমনি সমর্থন ঘোষণা করেছেন ইউরোপীয় কমিশনের রাষ্ট্রদূত ড. স্টিফেন ফ্রয়েন। তিনি বলেছেন, 'আমরা চাই সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসুক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ লক্ষ্য সামনে রেখেই কাজ করছে। সরকারের এ পদক্ষেপকে আমরা সমর্থন করি।' আমরা বারবার বলেছি, দেশের ভেতরে যা কিছু ঘটছে, তা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সেখানে কোনো অবস্থাতেই বিদেশীদের নাক গলানো উচিত নয়। তাদের নাক গলাতে দেয়াও উচিত নয়। এ কালচার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ। কিছু একটা ঘটলেই দৌড় দিয়ে গিয়ে তারা পড়তেন রাষ্ট্রদূতদের বাসায়। তাদের কাছে নালিশ করতেন। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশকে যেন বিদেশীরা ঋণ-সাহায্য না দেয়, তার তদবির করতেন। 'কফি মর্নিং' করে তাদের কাছে দেশের বদনাম করতেন। ফলে বিদেশী কূটনীতিকরা বড় বেশি লাই পেয়ে যান বাংলাদেশে। তারা মুরুব্বি সেজে বসে গেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতার ঘটনায় ইন্ধন যোগানোর অভিযোগে ঢাকা ও রাজশাহীর পাঁচ শিক্ষককে আটক করেছে সরকার। তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী প্রধান অভিযোগ করেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি মহল সরকারের ভাবমর্যাদা নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সরকার সতর্ক থাকায় তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। একটি অশুভ শক্তি ওই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। রাজপথে অরাজকতা সৃষ্টি করতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে।' সেনাবাহিনী প্রধান মইন উ আহমেদ এ অভিযোগে কারো নাম উল্লেখ করেননি। আমার দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি একথা বলেছেন। বলতে পারেন, আমার দেশ সম্পর্কে আমি বলব। কিন্তু আমি মনে করি, হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী সীমা লঙ্ঘন করে বসেছেন। তিনি সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে ২৬ আগস্ট বলেছেন, 'সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের প্রথম কয়েক ঘণ্টা ছিল প্রকৃত ও স্বতঃস্ফূর্ত। এরপর এতে ইন্ধন যোগানো হয় এবং প্রচুর টাকা ঢালা হয়।' তিনি কেমন করে জানলেন যে, টাকা ঢালা হয়েছে? টাকা কারা ঢেলেছে, সেটা আমরাই খুঁজে বের করব। আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তারা রাজনীতিবিদ হতে পারেন, ব্যবসায়ী হতে পারেন, চোরাকারবারি হতে পারেন। হ্যাঁ, বিভিন্ন দেশে গোলযোগ

www.pathagar.com

পাকানোর জন্য প্রভাবশালী দেশগুলোও টাকা ঢালে। 'আনোয়ার চৌধুরী সেই ষড়যন্ত্রের অংশ নন তো?' এ প্রশ্ন যেকোনো মানুষ করতে পারে। তখন তার জবাব কী হবে? পৃথিবীর আর কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে এরকম মন্তব্য করলে জনাব চৌধুরীকে অবশ্যই ইতোমধ্যে নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হতো।

ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতির পর্যালোচনা দরকার

আগস্টের ২০ থেকে ২২ তারিখে দেশব্যাপী যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পর্যালোচনার দাবি রাখে। কেউ ইন্ধন দিয়েছে, কেউ টাকা ঢেলেছে সেটাও সত্য হওয়া সম্ভব। কিন্তু এখনো তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন দ্রুত দাবানলের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল? কেন ছাত্রদের এই আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে অংশ নিল হকার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ?

আমরা বারবার বলার চেষ্টা করেছি, এক-এগারো'র তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তারা এই সরকারের কার্যক্রমে সমর্থন যুগিয়েছে। সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে প্রথমদিকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির মামলাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ জনগণ জানতে পারেনি। তার ওপর যে ২ লাখ ৮৫ হাজার লোককে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের সবাই দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী কি না, সেটাও অস্পষ্টই রয়েছে। আটককৃত এই বিপুলসংখ্যক মানুষের পরিবার-পরিজন আছেন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়। তাদের মধ্যে যে কোনো ক্ষোভ নেই, তাও বলা যাবে না। রাজনৈতিক কারণে যদি একজন কর্মীকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়, তবে একই ধারার রাজনীতি যারা করেন, তারা গ্রেফতার এড়াতে পালিয়ে যান, এটাই স্বাভাবিক। সেভাবেও হাজার হাজার পরিবারে ভীতি-ক্ষোভ জমাট বাঁধা বিচিত্র নয়।

দেশব্যাপী হকার উচ্ছেদ, হাট-বাজার উচ্ছেদের ফলে লাখ লাখ সাধারণ মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের সংসারে অভাব বেড়েছে। তার ওপর দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি তাদের জীবনযাপনকে মানবেতর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। যেটুকু সচ্ছলতা তারা শ্রম দিয়ে ঘাম দিয়ে অর্জন করেছিলেন, তা শেষ হয়ে গেছে। ফলে সমাজের এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

বর্তমান শাসকদের সমাজের একেবারে নিম্নশ্রেণীর সাথে যে কোনো যোগাযোগ নেই, সে কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। তাদের দুঃখ-দুর্দশা জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই উপদেষ্টাদেরও। তাই পাটকল বন্ধ করা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এক উপদেষ্টা বলেছিলেন, 'বন্ধ হয়েছে, টাকা পাবে শ্রমিকরা। আমরা তো তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছি না।' একজন পাটকল শ্রমিক যদি চাকরি হারান, তার আবার চাকরি জোগাড় করা যে কী কঠিন সেটা ওই শ্রমিক বোঝেন, উপদেষ্টার না বোঝারই কথা। তাকে পেশা পরিবর্তন করতে হবে। যিনি লুমের পাশে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে পাট গুঁজে দিতেন মেশিনে, তাকে হয়তো দিনমজুর হতে হবে, যে কাজটা তিনি ভালো করে জানেন না। তা ছাড়া রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় মন্দা সৃষ্টি হওয়ায় শহরাঞ্চলে দিনমজুররাও বেকার হয়ে পড়েছেন। এসব মজুরের হারানোর আর কিছু নেই। ফলে সমাজের এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

দ্রব্যমূল্য নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ফেলেছে। বাজারে নতুন শিম উঠলে ১০০/১৫০ টাকা কেজি বিক্রি হয়। তা নিয়ে পত্রপত্রিকায় মাতম তুলি আমরা। তখন কেউ কেউ বলি, 'শিম এখন না খেলে কী হয়? কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। দাম কমবে। তখন শিম খাবেন।' কিন্তু এখন সব জিনিসের দামই বেড়েছে অস্বাভাবিক। এখন তো আর বলা যাচ্ছে না, আলু-বেগুন-পটল-বরবটি-মিষ্টি কুমড়া, লাউ, শাক-সবজি না খেলে কী হয়? তেল-ডাল-চাল না খেলে কী হয়? এই পরিস্থিতিতে মধ্য শ্রেণী বড় অসহায় হয়ে পড়েছে।

গত ২১ আগস্ট বাচ্চা স্কুলে দিয়ে ফিরছিলাম। সিটি কলেজের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ছাত্রদের বিক্ষোভ-ভাঙচুরের দৃশ্য। পাশে প্রবীণ শ্মশ্রুমতি, সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোকও দাঁড়িয়ে ছিলেন। আফসোসের সুরে বললাম, আহা, এরা গাড়ি ভাঙছে কেন, রিকশা ভাঙছে কেন? ভেবেছিলাম, ভদ্রলোকও একই কথা বলবেন। কিন্তু তিনি, 'না ভাই, সকল আন্দোলনই তো এভাবেই শুরু হয়। প্রথমদিকে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি হয়ই।' বলে তিনি আলগোছে সরে গেলেন।

আর উচ্চবিত্ত? ব্যবসায়ী-শিল্পপতি তারাও হয় আটক আছেন, নইলে আছেন দৌড়ের ওপর। যদি দেশের কেউ অর্থ ঢালার ক্ষমতা রাখেন, তবে সে ক্ষমতা তাদের আছে। তাদের বিলাসী জীবনে যবনিকা পড়েছে। তাদের মধ্যেও ন্যায্য হোক অন্যায্য হোক, ক্ষোভ জমা হয়েছে।

বিশটা টাকা দিয়ে কেউ কারো মাথায় বাড়ি দিতে বললেই যে কেউ দৌড়ে গিয়ে বাড়ি দেয় না। দেশের লাখ লাখ মানুষকে অর্থ দিয়ে একযোগে বিক্ষোভে আনা অসম্ভব ব্যাপার। যে এত সহজে বিক্ষোভে অংশ নেয়, টাকা পাক বা না পাক, তার ভেতরেও ক্ষোভ থাকতে হয়। এই আন্দোলনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কি না, সেটা পর্যালোচনা করা দরকার।

আমরা বিনীতভাবে বলতে চাই, বিক্ষোভের দায়ে নতুন করে আরো লাখ লাখ মানুষকে গ্রেফতার শুরু করার আগে এই বিষয়গুলো ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পর্যালোচনা করে দেখা এবং মানুষের এই ক্ষোভের কারণগুলো নিরসনের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ, অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না।

০১.০৯.২০০৭

www.pathagar.com

খালেদা জিয়ার বিপর্যয়ে সুশীলরা কাঁদছে

বিএনপি'র চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সোমবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, টেন্ডারের শর্ত ভঙ্গ করে তিনি একটি ইন্ডেন্টিং ফার্মকে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের কাজ পেতে সহায়তা করেছেন। এই অভিযোগে তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোসহ ১১ জনকে আসামি করা হয়েছে। সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থিত স্পিকারের বাসভবনকে সাব জেল হিসেবে ঘোষণা করে সে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বেগম জিয়াকে। আর অসুস্থ কোকোকে সাত দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। ঘটনা আকস্মিক কিছু নয়। কার্যত কয়েক মাস ধরে তিনি একরকম গৃহবন্দীই ছিলেন। সরকার তাকে যতটুকু নড়াচড়া করতে দিত, তিনি কেবল ততটুকুই চলাফেরা করতে পারতেন। আর তার হাতে টেলিফোন ছিল। তিনি ফোনে আলাপ করতে পারতেন তার দলের দেশ-বিদেশের নেতাকর্মীদের সাথে। এমনকি 'মুক্ত' থাকলেও গত ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার ঘোষক, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারেও যেতে পারেননি। তাকে যেতে দেয়া হয়নি।

গত ১৬ জুলাই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও আর এক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই জোর গুজব ছিল, যেকোনো সময় গ্রেফতার করা হতে পারে বেগম খালেদা জিয়াকে। সরকার তাকে গ্রেফতার করেছে। এই গ্রেফতার প্রসঙ্গে তথ্য ও আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, 'তাকে গ্রেফতার করতে দেরি হয়েছে। কারণ সরকার খোলা মন নিয়ে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে।' তিনি বলেন, তবে চ্যালেঞ্জ করার জন্য খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়নি, দুর্নীতি দমন কমিশনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

www.pathagar.com

প্রথমত, ১/১১'র পরের সরকার চেয়েছিল, দেশ ছেড়ে চলে যাক বেগম খালেদা জিয়া। মাসখানেক ধরে তাকে বিদেশের পাঠিয়ে দেয়ার জন্য নানা তোড়জোড় চলে। কিন্তু তখন রাজি হননি বেগম খালেদা জিয়া। কেন যাবেন তিনি? যাননি যে, সেটা তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়। বিদেশে তার কোথাও থাকার জায়গা নেই। ঘরবাড়ি কেনেননি তিনি। কোথায় যাবেন, কেন যাবেন? আর তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে পারলে ক্ষমতাসীনদের বলতে সুবিধা হতো যে, তিনি বিপুল অর্থ দুর্নীতির মাধ্যমে বানিয়েছেন। আর তাই আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি দেশ ছেড়ে ভেগে গেছেন। সে দায় নিতে চাননি বেগম খালেদা জিয়া। বরং তিনি তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য দুর্নীতির অভিযোগ মোকাবেলা করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি গত সোমবার গ্রেফতারের পর আদালতে হাজির করা হলেও তিনি একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশকে নিয়ে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই বিএনপি ভাঙার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এবং আমাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা হচ্ছে। ইতোপূর্বে আমাকে দেশকে থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এখন আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি বাইরে চলে গেলে আজ আমাকে এভাবে গ্রেফতার হতে হতো না। আমি বলতে চাই, এই দেশের মাটি ছাড়া আমি ও আমার পরিবারের কোনো ঠিকানা নেই। এই দেশ আমার ঠিকানা। এখানেই আমি মরতে চাই।'

এর আগে বিদেশ থেকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়া হয়েছিল শেখ হাসিনাকে। কিন্তু তিনি তা মানেননি। দেশে ফিরে এসেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি যেকোনো অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত আছেন। শেষ পর্যন্ত সরকার তাকে দেশে ফেরার আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় আনার দাবিদার এক ইংরেজি মতলববাজ সুশীল কাগজের সম্পাদক গতকাল ইংরেজি জানা লোকদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপিকে খালেদা জিয়া ধ্বংস করে দিয়েছেন– এই অভিযোগ তুলে ভদ্রলোকের সে যে কী আফসোস! বিএনপি'র লোকদের চোখে পানি আসার জোগাড়! আর কী বিপুল সম্ভাবনা যে খালেদা জিয়া নষ্ট করেছেন! আহ হা!

জাতীয় সংসদে বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার যে ন্যায্যভাবে ৩০০ আসনের মধ্যে ২১৭টি আসন পেয়েছিলেন, পত্রিকাটি সঠিকভাবে এই প্রথম সে কথা স্বীকার করেছে। তিনি কবুল করেছেন, ২০০১ সালে বেগম খালেদা জিয়াকে জনগণ যে ধরনের ম্যান্ডেট দিয়েছিল, সংসদীয় গণতন্ত্রে সেটা বড় একটা দেখা যায় না।

www.pathagar.com

বস্তুতপক্ষে খালেদা জিয়াই একমাত্র নেত্রী যিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে দু-দু'বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি অবশ্য ১৯৯৬ সালের বিতর্কিত নির্বাচনেও যে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেটাকে হিসাবে নিতে চাননি। কেন নিতে চাননি? তা হলে এই যে, তত্ত্বাবধায়ক নামের বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন এক অদ্ভূত সরকার যাকে তিনি ক্ষমতায় আনার দাবিদার, সেই কিম্ভূত সরকার কীভাবে আসত? ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হয়েছিল বলেই তো ওই সম্পাদকের মতো সুশীলরা এরকম একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে পেরেছেন। সে ক্ষেত্রে অন্য দুই টার্ম বাদ দিয়ে শুধু ১৯৯৬ সালের খালেদা জিয়ার সরকারকে তার সাবাশই দেয়া উচিত ছিল। কারণ, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই সুশীলদের মত অনুযায়ী নজিরবিহীন অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। সুশীলদের ভুল বা শঠতা এখানেই।

সুশীল সম্পাদক বলেছেন, খালেদা জিয়ার প্রতি জনগণের ম্যান্ডেট এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে উচ্চ আসনে তার অবস্থানের কারণেই তিনি পারতেন আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি থেকে রক্ষা করতে। যে দুর্নীতির কারণে গণতন্ত্র এখন লাইনচ্যুত হয়ে পড়েছে। খালেদা জিয়া যদি সঠিকভাবে চলতেন, তবে দেশে বিদেশী ঋণ প্রবাহ বাড়ত এবং আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কমপক্ষে ৭ থেকে ৮ শতাংশ হতো। ভালো কথা। বাংলাদেশে দুর্নীতি কে কতটুকু করেছে, তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। এখনো তা অভিযোগের পর্যায়েই রয়েছে। তা ছাড়া এই সুশীলের লেখা থেকে মনে হতে পারে, দুর্নীতি শুধু বেগম খালেদা জিয়ার আমলেই হয়েছে এবং তার দলের নেতাকর্মীরাই দুর্নীতি করেছেন। আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনাসহ বাকি সব ফেরেশতারা দেশ চালিয়েছেন। শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যসহ নেতাকর্মীদেরও দুর্নীতির বিশাল ফিরিস্তি বের হয়েছে। এ জন্য আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপি-নেতাকর্মীদের অনেকেই জেলে আছেন। যদিও এ ক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, তাদের দুর্নীতিও প্রমাণিত হয়নি। এসব দুর্নীতির খবর এখন পর্যন্ত অভিযোগের পর্যায়েই আছে। আর ঢালাওভাবে এ অভিযোগগুলো গোয়েবলসীয় কায়দায় অবিরাম প্রচার করে প্রায় প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে কিছু সুশীল ও তাদের সংবাদপত্র। উদ্দেশ্য, উত্থানরত অর্থনৈতিক শক্তি বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা বিশ্বের কাছে ম্লান করে দেয়া এবং একে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করা। এই কাকান্ধ সুশীল বলেছেন, যদি দুর্নীতি না হতো তাহলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে ৮ শতাংশ হতো। বিএনপি'র শাসনামলে যদি এত দুর্নীতি হতো তাহলে প্রবৃদ্ধি কেমন করে ৬.৭ শতাংশ হলো? কতটুকু বাকি ছিল ৭ শতাংশ হতে? কিন্তু এই সুশীলরাই দুর্নীতি দুর্নীতি বলে রাষ্ট্রঘাতীদের অবিরাম মদদ দিয়ে সে ধারার যবনিকা টেনেছেন। সে ক্ষেত্রে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত এদেরকেই।

www.pathagar.com

আওয়ামী দরদি (?) এই সুশীল লিখেছেন, বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদে বিরোধী দলকে কোনো কথাই বলতে দেননি। বিএনপি বারবার হিসাব করে দেখিয়েছে, জাতীয় সংসদের ভেতরে যতক্ষণ আওয়ামী লীগ ছিল, তার বেশিরভাগ সময়ই কথা বলেছেন তারাই। কিন্তু সংসদ বর্জন করলে কথা বলবেন কেমন করে? তখন সুশীলবান্ধব কলম লেখকরাও বারবার আওয়ামী লীগের উদ্দেশে বলেছেন, তাদের যেতে হবে সংসদের ভেতরে। সংসদে গিয়েই তাদের কথা বলতে হবে। বাইরে হইচই করার চেয়ে ভেতরে গিয়ে কথা বলা উচিত।

এরপর হাওয়া ভবনের ওপর এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন এই সুশীল। লিখেছেন, হাওয়া ভবন ধ্বংস করেছে সরকারকে আর বেগম খালেদা জিয়া ধ্বংস করেছেন বিএনপিকে। আহা, বিএনপিকে ধ্বংস করে ফেললেন? এমন চমৎকার জনসমর্থনধন্য পার্টিকে শেষ করে দিলেন বেগম জিয়া? বিএনপি যে এত ভালো একটা দল ছিল, সুশীলের কথায় তা এই প্রথমবার বোঝা গেল। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে হেন কোনো গালি নেই যা দেননি এই সুশীলরা। কিন্তু হঠাৎ করেই বি. চৌধুরীর জন্য বড় মমতা দেখিয়েছেন তিনি। কেন তাকে প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দিতে হলো? সে কি শুধু খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য? সুশীল লিখেছেন, বি. চৌধুরীকে কেন চলে যেতে হলো, তা তিনি জানেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান দেখাতে অস্বীকার করাই তাকে প্রায় অপসারণের মুখে পড়তে হয়েছিল। ফলে তিনি মানে মানে কেটে পড়েছেন।

এই সুশীল সম্পাদক লিখেছেন, বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতি করেছেন কি না, তা আদালতেই প্রমাণিত হবে। কিন্তু তার আমলে আত্মসাতের নজির চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোথায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সে প্রমাণ কোথাও নেই। এগুলো কেবলই অভিযোগ। আর সে অভিযোগ উত্থাপন করে অবিরাম দুর্নীতি দুর্নীতি বলে চেঁচিয়ে গেছে এই সুশীলরা এবং সুশীলবান্ধব পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলো। আর এটিকে প্রমাণ হিসেবে ধরে প্রায় অশীতিপর এক বৃদ্ধ বাংলাদেশকে বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে সে কী আত্মতৃপ্তি! বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ এক বিশাল চক্রান্ত। এই যোগসূত্রের অন্যতম পুরোধা এ বৃদ্ধ তখন বলেছিলেন, বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয় হলো স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। কিন্তু যেই মাত্র এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, বিএনপি'র বহিষ্কৃত মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া এদের টোপ গিলে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, অমনি মুখে কুলুপ এঁটে বসে গেলেন সব সুশীল। খেল খতম, পয়সা হজম।

www.pathagar.com

বেগম খালেদা জিয়া আর তাঁর দু'ছেলে যে 'মহাদুর্নীতিবাজ' তার প্রমাণ হিসেবে এই সুশীল পত্রিকা কারাগারে বন্দী বাবরের উক্তি ব্যবহার করেছে। সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর যখন এসব কথা বলেছেন, তখন সেখানে নিশ্চয়ই সুশীলদের কেউ হাজির ছিলেন না। তিনি যে এসব কথা বলেছেন, তারই বা প্রমাণ কী? এরকম প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশ করা তো সাংবাদিকতার নীতিমালাবিরোধী। ছাপলেন তো বটেই, আবার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করলেন, অপ্রমাণিত বক্তব্যকে। তাহলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আটক অবস্থায় আবদুল জলিল, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ওবায়দুল কাদের, নূর আলী, আজম জে চৌধুরী যা বলেছেন, তাও কি সত্য? সুশীল সম্পাদক সে সম্পর্কে টুঁ-শব্দটিও যে করলেন না!

তবু এই সুশীলকে সাবাশই দেই। কারণ তিনি বলেছেন, একমাত্র খালেদা জিয়াই পারতেন দেশের উন্নতি করতে, দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে, অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত করতে। তিনি পারছিলেন। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি প্রতি বছর বাড়ছিল, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছিল, প্রতি বছর নয় শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে যাচ্ছিল, শিক্ষার হার বাড়ছিল, শিল্প-কারখানা বাড়ছিল। কিন্তু এই সুশীলরা সমস্বরে না-হক অভিযোগের ঢেঁড়া পিটিয়ে তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এখন বিএনপি ধ্বংস হয়ে গেল বলে চোখের জল ফেলছেন। একে কি ভঁড়ামি বলা যায় না?

গোপাল ভাঁড়ের একটি গল্প দিয়ে আজকের লেখা শেষ করতে চাই। গোপালের বাবার প্রতিবেশী সারাজীবন গোপালের বাবাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত-বিরক্ত করে আসছিল। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন গোপালের বাবা। এক সময় গোপাল ভাঁড়ের বাবা মারা গেলেন। তখন ওই প্রতিবেশীর যে কী কান্না। তার কান্না দেখে গোপাল ভাঁড় বলল, 'কাকা, বাবা দেখছি মৃত্যুর আগে আমাকে সঠিক কথাই বলে গিয়েছিলেন।' প্রতিবেশী কাঁদতে কাঁদতে জানতে চাইলেন, 'কী কী বলে গেছেন তোমার বাবা?' গোপাল বলল, 'মরার আগে বাবা বলে গেছেন, দেখিস আমার মৃত্যুর পর শিয়াল-কুকুর কাঁদবে।'

০৬.০৯.২০০৭

www.pathagar.com

খাস দিলে ফিরছি তো?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ গত ৯ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণে তিনি ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলেছেন পরদিন থেকেই। তিনি জানিয়েছেন, সরকার দুর্নীতিবাজদের আর কোনো তালিকা প্রকাশ করবে না। যে ৮৭ হাজার ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় মামলা করা হয়েছিল, তাদের ৩৬ জন বাদে বাকি সবাইকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ওই ঘটনার জন্য আর কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কিংবা আর কাউকে হয়রানি করা হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এতদিন কি তাহলে সরকার বিভিন্ন জনকে হয়রানিও করেছে? যাক, দেরিতে হলেও সরকারের বোধোদয় হয়েছে। আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। কিন্তু একদিনের মধ্যেই যা ঘটল, তাতে সরকারের সদিচ্ছা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেল। আবারো সরকারকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দিনই আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টি নেতাকর্মীরা স্ব-স্ব অফিসে যেতে পারলেন, আলাপ-আলোচনা করতে পারলেন, মিলাদ-মাহফিল, দোয়া-খায়ের করতে পারলেন। কিন্তু বিএনপি মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে বিএনপি অফিসে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। তালাও খুলতে দেয়নি। এর কী কারণ? তার কোনো ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি সরকারের তরফ থেকে। এতে সংশয় ঘনীভূত হলো। এতদিন ধরে সাধারণ মানুষের মনে গুঞ্জন ছিল, বিএনপি'র তথাকথিত সংস্কারপন্থীরা মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে যে লম্ফ-ঝম্প করছেন, তার পেছনে সরকারের মদদ রয়েছে। খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের অফিসে ঢুকতে না দিয়ে সরকার কি সে কথাই আবার প্রমাণ করল? মান্নান ভূঁইয়াকে দলের মহাসচিব পদ থেকে বহিষ্কার করেছেন দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। দলের গঠনতন্ত্র সে ক্ষমতা তাকে দিয়েছে। এভাবেই, এই ক্ষমতা বলেই মান্নান ভূঁইয়াকে বেগম খালেদা জিয়া ১১ বছর আগে দলের মহাসচিব করেছিলেন। তা ছাড়া মান্নান ভূঁইয়া ও তার সমর্থকরা ১০ সেপ্টেম্বর দলের নয়াপল্টন অফিসের ধারে-কাছেও যাননি। ১ সেপ্টেম্বর জিয়ার মাজারে বিএনপি'র সাধারণ

www.pathagar.com

সমর্থকদের ধাওয়া খেয়ে তিনি ঘরে ঢুকে গেছেন। কার্যত জনরোষের ভয়েই জনাব ভূইয়া বা তার সহযোগীদের কেউ বিএনপি'র কেন্দ্রীয় অফিসে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। মান্নান ভূঁইয়া এখন বিএনপি'র মহাসচিব তো দূরের কথা, দলের প্রাথমিক সদস্যও নন। তাহলে বিএনপি'র নবনিযুক্ত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে কেন ঢুকতে দেয়া হলো না বিএনপি অফিসে? এই আচরণের মধ্যদিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর যাই হোক, নিজেদের 'নিরপেক্ষ' বলার নৈতিক অধিকার অনেকখানি ক্ষুণ্ন করে ফেলেছে। আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম, শওকত হোসেন নীলু, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী বা মান্নান ভূঁইয়ারা এ দেশের রাজনীতির প্রধান শক্তি নন। সরকার কি তাদের ওপর ভর করে 'গাঙ পার হওয়া'র পথ খোঁজেন, তাহলে বড় ভুল হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এঁরা খড়-কুটো মাত্র, প্রধান শক্তি নন। কিন্তু বিএনপি মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ারসহ অন্য নেতাদের বিএনপি অফিসে ঢুকতে না দিয়ে সরকার আর একবার প্রমাণ করল, তারা শেষ পর্যন্ত এই খড়-কুটোদের ওপরই নির্ভর করতে চাইছেন।

কিন্তু এর চেয়েও বিপজ্জনক দিক রয়েছে ভিন্ন স্থানে। সেটা বাংলাদেশের ওপর বাইরের শক্তির শ্যেন দৃষ্টি ও প্রভাব বিস্তার। ৮৫ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করে গত ১৫ বছরের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বের খ্যাতনামা বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে বিশ্বের সম্ভাব্য নতুন ১১টি ধনী দেশের তালিকায় তুলে এনেছিল। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছিল দ্রুত। আমদানি-নির্ভরতা কমে আসছিল, মাথাপিছু আয় বাড়ছিল, প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে বাংলাদেশের তারুণ্যদীপ্ত বিনিয়োগকারীরা জয়লাভ করছিলেন। মানুষের উদ্যমের ফলে বিদেশী ঋণ গ্রহণ ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছিল দেশ। শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছিল, গণশিক্ষা বিস্তার লাভ করছিল, স্বাস্থ্যখাতেও বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশ যদি শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে কেবল কলকারখানার ভারী যন্ত্রপাতি আমদানি করে, তবে ওরা খাবে কি? ওদের ভগ্নাংশ প্রবৃদ্ধির কী হবে? ফলে এ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর থেকেই এ দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। দেশের রাজনীতিবিদরাও ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে বসেন, জেনে কিংবা না জেনে। তার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাদের খেলার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। সেটাই ওই সব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী চেয়েছিল। আমরা তাদের সহায়তা করেছি।

সে অভিযান শুরু হয়েছিল মৌলবাদ ও ইসলামি জঙ্গিবাদ দিয়ে। আর তা শুরুও করেছিল পরাশক্তি ও আঞ্চলিক শক্তি মিলে। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদীদের ঘাঁটি রয়েছে, সরকার তাতে মদদ দিচ্ছে- এমন সব কথা। আমরা কিছু মানুষ অবিরাম এসবকে ষড়যন্ত্র বলে প্রতিবাদ করে গেলেও কোনো

www.pathagar.com

কোনো রাজনৈতিক দল সেই ঢেঁড়া পেটানোতে অংশ নিয়েছে। নিজের নাক কাটা যাচ্ছে কি না খেয়াল করেনি। অপরের যাত্রা ভঙ্গ করা যায় কি না সেদিকেই বেশি মনোনিবেশ করেছে। ষড়যন্ত্রকারী তখন আরো জোরেশোরে সে ঢাক পিটিয়ে গেছে।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অপরিণামদর্শী রাজনীতিবিদরা বিরোধী দলকে ঘায়েল করার জন্য সরকারিভাবে বই প্রকাশ করে দেখালেন, বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের কত বড় ঘাঁটি। আর সে জঙ্গিবাদের প্রধান মদতদাতা রাজনীতিতে তাদের বিরোধীরা। তখন ওই ষড়যন্ত্রকারীরা মহাউৎসাহে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকল। আমাদের রাজনীতিতে কূটকৌশলের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে এলেন বিদেশী কূটনীতিকরা। দেশের চলমান রাজনৈতিক জটিলতা দূর করতে এক ধরনের অভিভাবক হিসেবে খাড়া হলেন তারা। আমরাও তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নিলাম। বড় ভুলটা হয়ে গেল ওখানেই। আমরা নির্বাচিত লোকরা যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের অনির্বাচিত ও বিশ্বে নজিরবিহীন এক অদ্ভুত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে নিজেদেরকেই হেয় করেছিলাম, তেমনিভাবে কূটনীতিকদের লাই দিয়ে আমরা আরো এক দফায় নিজেদের এবং এ দেশের জনগণকে হেয়প্রতিপন্ন করলাম।

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসঙ্ঘ। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস তাদের বিবৃতিতে বলেছে, 'সংস্কার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোকে অবদান রাখার সুযোগ করে দিতে সরকারের নেয়া ইতিবাচক পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। একটি বাধাহীন গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে সব পক্ষের এক সাথে কাজ করা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' ব্রিটিশ দূতাবাস বলেছে, 'প্রধান উপদেষ্টার ভাষণকে আমরা স্বাগত জানাই। ব্রিটেন পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমর্থক এবং বিশ্বাস করে, ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে সীমিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালুর অনুমোদনকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণ অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। আর জাতিসঙ্ঘ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে এক চিঠি দিয়ে বলেছেন, 'আমি আনন্দের সাথে লক্ষ করছি যে, সুশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।' তিনি আশা করেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করে যাবে।

এসবও আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের শামিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিক, এটা রাজনৈতিক দল ও সর্বস্তরের মানুষের দাবি। সরকার সে দাবি মেনেছেন, তাতে স্বাগত জানাবে এ দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো। এখানে হঠাৎ করে ওই সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও

www.pathagar.com

তাদের এজেন্টদের স্বাগত জানানোর প্রয়োজন হলো কেন? আর সবার বিবৃতিতেই জনগণের কথা আছে। যেন এ দেশের জনগণের জন্য তাদের প্রাণটা ভারি পোড়ায়। আসলে এসব ছদ্মাবরণে তারা আমাদের দেশের ওপর তাদের কর্তৃত্ব নিঃসংশয় করতে চায়। এই সত্য জনগণ এখন উপলব্ধি করেছে।

আর জাতিসঙ্ঘ? জাতিসঙ্ঘের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সবচেয়ে বেশি। আগেও ছিল, এখনো আছে। দুই মেরুর বিশ্ব যখন ছিল, তখন তবু কিছুটা ভারসাম্য ছিল। এখন সে ভারসাম্য আর নেই। এখন পৃথিবী একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। মিথ্যা, ষড়যন্ত্র, কূটচক্র তার ভরসা। জাতিসঙ্ঘ এখন যুক্তরাষ্ট্রের নির্লজ্জ লেজুড়ে পরিণত হয়েছে এবং এই সাম্রাজ্যবাদীদের কথামতো উঠবস করছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে এসে সে নির্লজ্জতা চরম রূপ নিয়েছে। জাতিসঙ্ঘও যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে নগ্ন দালালি করেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। কার্যত ১/১১'র তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েমের জন্য তাদের চাপ স্তম্ভিত হওয়ার মতো। তাদের কঠোর পরামর্শ ছিল, সামরিক আইন জারি করা যাবে না। আর ২২ জানুয়ারির নির্বাচনেও সেনাবাহিনী সহায়তা করতে পারবে না। তাহলে কী করতে হবে? ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র যে পরামর্শ দেয়, তাই করতে হবে। এমন বেহায়া প্রকাশ্য দালালি জাতিসঙ্ঘের ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। সেই জাতিসঙ্ঘ বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ নিয়ে বড়ই চিন্তিত আছে। কী সাঙ্ঘাতিক!

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন আর বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অতিমাত্রায় ভালোবাসার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এ দেশের স্বার্থবিরোধী এক চুক্তি সই করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে এই সরকারকে দিয়ে। এসব চুক্তি বাস্তবায়ন করা হলে আইএমএফ'র অনুমোদন ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারবে না বাংলাদেশ। সে এক কঠিন নিগড়। তা ছাড়া তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়াও, কাঁচামালে ট্যাক্স বাড়াও, আমদানি পণ্যে কর কমাও– এসবও আইএমএফ'র পরামর্শ এবং সরকার তা মেনেও নিয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবিজ্ঞজিনোচিত সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতি এখন পেছনমুখী। সব খাতেই নেমেছে ধস। ভারী যন্ত্রপাতির আমদানি কমেছে, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ কমেছে, কমেছে রফতানিও। সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে তৈরি পোশাক শিল্পে। আমাদের রফতানির সবচেয়ে বড় খাত ছিল এই পোশাক শিল্প। ২০০৪ সালে কোটা পদ্ধতি বিলুপ্ত হওয়ার পর অনেকেই আশঙ্কা করেছিল, রুগ্ন হয়ে পড়বে পোশাক শিল্প। প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে। কিন্তু আমাদের উদ্যোক্তারা সেটা মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছিলেন। জয়ী হয়েছিলেন সে প্রতিযোগিতায়। কিন্তু বর্তমান সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ধস নেমেছে এই শিল্পে। গত এক বছরে বন্ধ হয়ে গেছে ৪০০ কারখানা। নিটওয়্যারের প্রবৃদ্ধি ৪২ শতাংশ থেকে মাত্র ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এতে এই খাতে নতুন করে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে কোটামুক্ত বাজারের প্রতিযোগিতা করতে পারছিল যে

www.pathagar.com

শিল্প, তাকে চক্রান্তের বলি হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হচ্ছে সরকারের ভুল নীতির কারণে। আর বাংলাদেশের এই পিছিয়ে পড়ার সবটুকু সুবিধা নিচ্ছে প্রতিযোগী ভারত। বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের এটাও একটা লক্ষ্য।

এ রকম একটি পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে তার ভাষণে বলেছেন, 'ক্ষমতা ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ অতীতে হাজার হাজার কোটি টাকা নামে-বেনামে লুটপাট করেছে। এর বোঝা জনগণ বহন করলেও সুফল ভোগ করেছে হাতেগোনা কিছু লোক। সরকার তাই দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করেছে। আমাদের সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দুর্নীতি করে ও অসাধু উপায়ে অর্জিত ৮২০ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যক্তি এখন পর্যন্ত সরকারকে ফেরত দিয়েছে।' তার এ বক্তব্য অনেকটা টিআইবি মার্কা। অনুমাননির্ভর দুর্নীতি হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার। শেখ হাসিনা তো অঙ্ক করে বলেছিলেন, ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা কত হাজার কোটি টাকা, তার কিন্তু হিসাব নেই। অর্থাৎ এই অভিযোগও অনুমানভিত্তিক। কোনো সরকারপ্রধান এ রকম অনুমানভিত্তিক কথা যত কম বলেন, ততই ভালো। সরকার এ পর্যন্ত প্রায় যে ৩ লাখ লোককে আটক করেছে, তাদের সবাইকে দুর্নীতির জন্য আটক করা হয়নি। হাতেগোনা কিছু লোক দুর্নীতি করেছে বলে প্রধান উপদেষ্টা অভিযোগ করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত দুর্নীতির যেসব অপ্রমাণিত অভিযোগ এনে রাজনীতিকদের আটক করা হয়েছে, তার অঙ্ক ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে কি না সন্দেহ। সুতরাং এই অভিযোগগুলো শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবে বলে মনে হয় না। ৮৭ হাজার ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে শুমার করে শেষ পর্যন্ত ৩৬ জন পাওয়া গেছে। তেমনি হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির গল্প শেষ পর্যন্ত ১০০ কোটি ছোঁবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েই গেল।

তবে প্রধান উপদেষ্টা ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার যে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সে রাজনীতি নিয়ে যদি কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয় এবং যদি 'সৎ ও ত্যাগী' নেতা-কর্মীর নামে পছন্দের লোকদের জিতিয়ে এনে সরকার বেরিয়ে যাওয়ার পথ খোঁজে, তা হলে সেটা সরকারের জন্য এবং তাদের পছন্দের লোকদের জন্যও মঙ্গলকজনক হবে না। মান্নান ভূঁইয়া কেন ১০ সেপ্টেম্বর বিএনপি অফিসে যাওয়ার সাহস করলেন না, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। মান্নান ভূঁইয়াকে জিয়ার মাজার থেকে কেন পুলিশ প্রহরায় পালাতে হয়েছিল, সেটাও উপলব্ধি করতে হবে। যদি পুলিশ বা যৌথ বাহিনীর পাহারায় তাকে বিএনপি অফিসে পৌঁছে দিতে হয় বা দখল বুঝিয়ে দিতে হয় তার পরিণতিও কারো জন্য সুখকর হবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে গত আশির দশকেও যা সম্ভব ছিল, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তা আর সম্ভব নয়। সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান গত ৫ সেপ্টেম্বর নয়া দিগন্তে 'তুরস্ক থেকে শিক্ষা' শিরোনামে যে উপসম্পাদকীয় লিখেছেন, এটি প্রণিধানযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি

www.pathagar.com

১৯৯১ সালে আলজেরিয়ায় ইসলামপন্থী সরকার উচ্ছেদে যা পেরেছিল, ২০০৭ সালে ইসলামপন্থী সরকার উচ্ছেদে তুরস্কে তা পারেনি। এটাও উপলব্ধি করা দরকার। সে ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতাও একটি বড় ফ্যাক্টর হয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকারের এটা বোঝা উচিত।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ছিল না। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানও তাদের দায়িত্ব ছিল না। কেউ বলতে পারেন, এটা তত্ত্বাবধায়ক নয়, এটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিন্তু সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্য উপদেষ্টারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেই শপথ নিয়েছেন। ফলে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করাই তাদের প্রধান কাজ ছিল। সেদিক থেকে তারা সীমানা লঙ্ঘনই করেছেন। যত বড় মুখেই তারা দুর্নীতি দমনের কথা বলুন না কেন, সীমানা লঙ্ঘনের দায় শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারবেন কি না, সন্দেহ আছে।

বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যে বলি, সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীসহ শত শত এমপি-মন্ত্রী-রাজনৈতিক নেতাকে অমীমাংসিত অপ্রমাণিত অভিযোগে বন্দী রেখে নির্বাচন করার চেষ্টা দেশে নতুন সংঘাতের জন্ম দিতে বাধ্য। সে সংঘাত সামাল দেয়ার ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই। তা দেশের জন্য কল্যাণকরও নয়। সুতরাং যারাই পেছন থেকে সরকারকে উৎসাহ দিচ্ছে, বিভিন্ন পদক্ষেপে স্বাগত জানিয়ে ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করছে, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। রাজনীতি যাতে রাজনীতিবিদরাই করতে পারেন, সেটা খাস দিলে বলে দিতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে। দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সে যে অবস্থানেই থাকুক, শাস্তি পাক। তাতে কেউ বাঁধ সাধবে না। কিন্তু সে বিচার যেন সুষ্ঠু হয়। জনগণ যেন প্রমাণাদিতে নিশ্চিত হতে পারে যে, সে সত্যি সত্যি দুর্নীতি করেছে। কিন্তু যখনই এখানে অস্বচ্ছতা থাকবে তখন প্রতিবাদ উঠবে। সে প্রতিবাদ সংঘাতে রূপ নিতে পারে।

সুতরাং সরকারকে প্রিয় হয়ে উঠতে হবে জনগণের কাছে। অন্য কোনো দেশের পরামর্শকদের কাছে নয়। সে পরামর্শ গ্রহণ করলে ক্ষতি হবে আমাদের, লাভ হবে পরামর্শকদেরই। সে লাভের জন্যই তারা ফাঁদে ফেলে কোনো কোনো দেশের সরকারকে একেবারে অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত করে। তারপর ফায়দা হাসিল হয়ে গেলে ময়লা ন্যাকড়ার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমরা সবাই নিশ্চয়ই আমাদের দেশ ও জনগণের জন্যই কাজ করে যাচ্ছি। ভিনদেশীদের স্বার্থের জন্য নয়। নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সহায়ক।

১৩.০৯.২০০৭

www.pathagar.com

ঋণ নেবে না, সুদ দেবে না, তা হবে না

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনসহ পশ্চিমা অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর তল্পিবাহক বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পৃথিবীর গরিব দেশের অর্থ ঋণদানের জন্য দিনরাত ব্যস্ত আছে। পৃথিবীতে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে যে অর্থ এসব দেশ আর নিজ দেশে বিনেয়াগ করতে পারে না, সে অর্থ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এরা বিদেশে, বিশেষ করে পৃথিবীর দরিদ্র দেশে সুদে খাটায়। দরিদ্র দেশগুলোর যেহেতু টাকা প্রয়োজন, তাই এরা টাকা ধার চায়। তখন আইএমএফসহ এসব অর্থপ্রতিষ্ঠান গরিব দেশগুলোর ওপর ঋণ দিতে এমন সব শর্ত চাপায় যে, এরা যেনো বর্তমান ও ভবিষ্যতেও ঋণ নিতে থাকে। ঋণ যদি না নেয়, তাহলে ধনী দেশগুলোর জিডিপিতে খুব বেশি কিছু যুক্ত হয় না।

ব্রিটেন উডস কনফারেন্সে ১৯৪৪ সালে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। শুরুতে কথা ছিল, আইএমএফ বিভিন্ন দেশের মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখার জন্য কাজ করে যাবে। তখন থেকেই মুদ্রামানের সূচক নির্ধারিত হতে শুরু করে স্বর্ণ বা মার্কিন ডলারের ভিত্তিতে। এরপর আইএমএফ বিশ্ব বাণিজ্য বাড়ানোর দায়িত্ব নেয়। উন্নত বিশ্বে আইএমএফ-এর কোনো কাজ নেই। তার কাজ মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঘিরেই। সেভাবেই এর প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া শুরু থেকেই এসব ব্যবস্থা রাখা হয় যে, কোনো দেশ যদি আইএমএফ-এর সদস্য না হয়, তাহলে সে বিশ্বব্যাংকেরও ঋণ পাবে না। কিন্তু প্রতিষ্ঠালগ্নে একেবারে শুরুতেই পৃথিবীর অনেক সচেতন দেশ এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিল। তাদের সন্দেহ ছিল, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সম্পদের ওপর নিজস্ব কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। আজ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সে পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছে।

সেসব গরিব দেশ বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ-এর ঋণ পেতে আগ্রহী, তাদের আইএমএফ-এর শর্ত মানতে হবে। সে শর্ত প্রায় সব সময়ই তার অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী এবং দেশের ও জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। কোনো দেশ যদি ধারাবাহিকভাবে এসব ঋণনির্ভরতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করে, তখন আইএমএফ এসে হাজির হয়। যেটুকু ঋণ দরকার, তার জন্য কঠোর শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করে। কোথায় সে পরামর্শ বা শর্ত না দেয়। কোনো শিল্প বন্ধ করে দেয়ার তাগিদ থেকে শুরু

www.pathagar.com

করে সঞ্চয়ের ওপর সুদ কমানো পর্যন্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই আইএমএফ-এর হাত। যদি দেখা যায়, কোনো সরকার আইএমএফ-কে বাদ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তা হলেই বিপদ।

বিগত সরকারের অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান মার্কিন দালাল এসব অর্থপ্রতিষ্ঠানকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তোমাদের শর্তযুক্ত ঋণ না নিয়েও আমরা এগিয়ে যেতে পারি। ২০০১-০৬ সময়ে বিএনপি শাসনকালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ক্রমেই বিদেশনির্ভরতা কমিয়ে আনছিল। আইএমএফ ও তার মুরব্বিরা সেটা পছন্দ করছিল না। শর্তযুক্ত ঋণ নেবে না, অথচ এগিয়ে যাবে– এটা কেমন করে হতে দেবে আইএমএফ? ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল।

সে ষড়যন্ত্র তো বাস্তবায়ন করতে পারে না আইএমএফ একা। ফলে তাদের মুরব্বিরা এগিয়ে এলো। সে মুরব্বি ছিল প্রধানত মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া এ বিউটেনিস আর ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী। তাদের সাথে অভিন্ন স্বার্থে যোগ দিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ ১০-২০ টাকা সাহায্য দানকারী ইউরোপীয় দেশগুলো। আর তাদের মদদে সেই ফাঁদে পা দিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও তার বাম দোসররা। এরা বারবার বাংলাদেশের অগ্রসরতাবিরোধীদের কাছে যেচে পা দিয়ে দেশকে কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছিলেন! জেনে কিংবা না জেনে? শেখ হাসিনা পাঁচ বছর দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তার তো জানার কথা কোথা থেকে কি চাপ আসে। কে কার স্বার্থে অযৌক্তিক শর্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি ও তার সহযোগীরা বিএনপি'র মুখ ম্লান করে দেয়ার জন্য দেশের স্বার্থের দিকে ফিরেও তাকালেন না। কী আশ্চর্য রাজনীতি! কী আশ্চর্য জিঘাংসা! কী আশ্চর্য দেশবিরোধিতা!

বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি ব্যর্থ করে দিয়ে কেমন করে তাকে পরনির্ভর করা যায়, কিভাবে তাকে মুরব্বিদের ইচ্ছায় আইএমএফ-এর পরামর্শে চালানো যায়? কিভাবে তার বিকাশমান শিল্প ধ্বংস করা যায়, কিভাবে মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে দরিদ্রতর করে তোলা যায়, সে ষড়যন্ত্র পাকানো হলো। বিউটেনিস-আনোয়ার চৌধুরী নামে দুই রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অভিভাবকে পরিণত হলেন। আওয়ামী লীগ তাদের আদর করে আসন দেয়, বিএনপি'র কাছে এরা বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে যায়। চেষ্টা করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি মীমাংসা করে দেয়ার দায়িত্ব নেয়। রাজনীতিবিদরা হাসিমুখে সে পরিস্থিতি মেনে নেয়। উঃ! সে কী দেউলিয়াপনা!

আওয়ামী লীগ হয়তো আশা করেছিল, রাষ্ট্রঘাতী আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে হঠিয়ে দিতে পারলে ক্ষমতায় যাওয়া তাদের জন্য নিশ্চিত হবে। আর সে পথ সুগম করে দেবে বাংলাদেশবিরোধী বিদেশী চক্রান্তকারীরা। ফলে প্রাথমিকভাবে ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মেনে নিলেও কিছুকাল পর থেকে রাষ্ট্রপতির সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আবারো এরা অবরোধ, জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচি পালন করতে শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ড. ইয়াজউদ্দিন

www.pathagar.com

আহম্মেদ তখন সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেনাবাহিনী মোতায়েনের কাজ শুরুও হয়ে যায়। কিন্তু এর বিরোধিতা করতে শুরু করে আওয়ামী লীগ। এরা ছুটে যান বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কাছেই। যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতরা বলতে শুরু করেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করুন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিন। ততক্ষণে আওয়ামী লীগ এমনকি গণভবন ঘেরাও কর্মসূচি দিয়ে রাষ্ট্রপতির জন্য ভাত-পান এমনকি 'অক্সিজেন' সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেয়। সে কী অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।

এ ষড়যন্ত্রকারীরা যে সরকার হিসেবে আওয়ামী লীগকেও চায়নি, সেটা বুঝতে শেখ হাসিনাকে সাব জেলে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কারণ শেখ হাসিনার সরকারও যতটা খামখেয়ালি হোক, তাদেরও ন্যূনতম জবাবদিহিতা ছিল। বিরোধী দলকে পরোয়া না করলেও পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানোর আগে তাদের ভাবতে হতো। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কোনো না কোনো ব্যবস্থা তাদের নিতেই হতো। কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহারের আগে ভাবতে হতো। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের নামে কোটি মানুষকে পথে বসিয়ে দিয়ে তাদের রুটি-রুজির পথ বন্ধ করার আগে তাদের ভাবতে হতো। কিন্তু বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের তো এমন সরকার চাই না– যারা প্রশ্ন করবে, যারা গড়িমসি করবে। যারা বিদেশীদের স্বার্থরক্ষায় দেশের জনগণের কথা ভাববে। শেখ হাসিনা ও তার সাল্লু-পাল্লুরা শেষ পর্যন্ত যদি বিষয়টা বুঝতে পারতেন, তাহলে দেশ আজ এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতো না।

ফলে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে নতুন এক সরকার ক্ষমতাসীন হলো। সে সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি ততটা মজবুত না হলেও তাদের প্রতি সমর্থন মিলল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের। এরা তার আগের পাঁচ বছরে ভিত্তিভূমি তৈরি করে রেখেছিল তাদের অন্যান্য তল্পিবাহক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি ও তথাকথিত সুশীল সমাজের মাধ্যমে।

বিদেশী অর্থে পরিচালিত ট্রান্সপারেন্সি অনুমানের ভিত্তিতে জরিপ দিয়ে অবিরাম বলে যেতে থাকল, বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পৃথিবীর শীর্ষে। কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না, বাংলাদেশে বাজেটের আকার কী, এর রাষ্ট্রীয় সম্পদ কতটুকু। এরা কেবল বলেই গেলেন। ভেবে দেখছেন না, দেশ ও জনগণের কত বড় ক্ষতি করার পথ তারা তৈরি করে দিলেন। এই ট্রান্সপারেন্সির সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে করতাল বাজাতে থাকল 'সুশীল সমাজ' নামের কতকগুলো লোক। এরা ট্রান্সপারেন্সিতেও আছে, তথাকথিত সুশীল সমাজেও আছে। বা-বাঃ!

সেই পথ ধরে এসেছে বর্তমান সরকার। আর এ সরকার ক্ষমতায় বসেই নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিতে বসে গেল। শহরগুলো থেকে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করা দিয়ে শুরু হলো তাদের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া। এরা দুর্নীতিবাজ ধরার নামে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, রাজনীতিবিদ সবাইকে ধরে জেলে পুরে দিলেন।

www.pathagar.com

কেবলই অভিযোগ! অপ্রমাণিত দুর্নীতির দায়ে এরা জেলে আছেন। শিল্প ধ্বংসের মুখে। নতুন শিল্প গড়ে ওঠার পথ রুদ্ধ। আমদানি-রফতানি স্থবির। যারা বাইরে আছেন, সেসব ব্যবসায়ী সরকারের প্রতি আস্থাহীন। মুদ্রাস্ফীতি ১০ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে। সারাদেশের মানুষের ত্রাহি অবস্থা। তারই ফাঁক দিয়ে বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা যা যা করার করিয়ে নিচ্ছে। তাদের চাপেই পেট্রল-ডিজেলের দাম বেড়েছে। তাদের চাপেই বিদ্যুতের দাম বেড়েছে, তাদের 'পরামর্শেই' মুদ্রা সঙ্কোচন নীতি নেয়া হয়েছে। আয় নেই, রাজস্ব নেই, শুল্ক নেই, সরকারের চলার পথ নেই। তাহলে সরকার চলবে কিভাবে? সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে। যে অর্থ বিনিয়োগ ও ব্যবসায় খাটার কথা, সে অর্থ সরকার পরিচালনায় ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে গত সাত মাসেই দেশের প্রায় সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি হার নেমে এসেছে পাঁচ শতাংশে। এখন অর্থ উপদেষ্টা বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কেরানিদের মিটিংয়ে গিয়ে ঋণের জন্য হাত পাতছেন! কী মর্মান্তিক ঘটনা! কী অসম্মান কর্মিষ্ঠ বাংলাদেশী মানুষের!

কিন্তু কোথায় না নেমেছে বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধি আইএমএফ? এরা এবার সঞ্চয়পত্রের ওপর সুদের হার কমানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। বাংলাদেশে সম্প্রতি সফররত আইএমএফ মিশন অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাকালে এ ব্যাপারে চাপ দিয়েছে। যেন নিম্নমধ্যবিত্ত বা অবসরভোগী সঞ্চয়পত্রনির্ভর লোকদের ওপর এমন খড়গ চালাতে হবে। কারণ, সঞ্চয়পত্রে সুদ কমালে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা সঞ্চয়পত্রে আগ্রহ হারাবে। সরকারের অর্থের যোগান কমবে। বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় সরকার তখন আইএমএফ-এর কাছে যাবে ঋণের জন্য। তখন আবার বাংলাদেশবিরোধী নতুন শর্ত দেবে তারা। শর্তের জালে আটকা পড়বে বাংলাদেশ ও তার জনগণ। কিন্তু আগের অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই আইএমএফ-এর চাপে সব ধরনের সঞ্চয়পত্রের ওপর সুদের হার কমিয়ে দেয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে যে ২০ কোটি ডলার দিতে চেয়েছিল তা না পাওয়া এবং আইএমএফ যে সাড়ে ৭ কোটি ডলার দিতে চেয়েছিল তা না পাওয়ার কারণে সরকার বাধ্য হয়ে ২০০৫ সালে আবার সঞ্চয়পত্রের ওপর সুদ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে সঞ্চয়ে উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ঋণ নিয়ে সরকার তার চাহিদা মেটায়।

দেশ ও জাতির স্বার্থে এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে আমাদের অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। আর তার জন্য কালবিলম্ব না করে, কোনোরকম কৌশল না করে অবিলম্বে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দরকার। এর কোনো বিকল্প নেই। আশা করি, বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে সে প্রয়াস চালাবে।

২০.০৯.২০০৭

www.pathagar.com

তাহলে ড. মোজাফফর বাদ যাবেন কেন?

বিশ্বের সামনে বাংলাদেশকে ব্যর্থ, অকার্যকর, মৌলবাদী ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করার লড়াইয়ে এক বড় সিপাহ্‌সালার শেষ পর্যন্ত সরকারের বরমাল্য পেয়েছেন। জেনেভায় চুক্তি ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে তাকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বাংলাদেশের ইতিহাসে পেশাদার কূটনীতিক ছাড়া এই পদে আর কখনো কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি বলে পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া কিছু ভাগ্যবানের একজন এই সিপাহ্‌সালার ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। কূটনীতি বিষয়ে তার যোগ্যতার কোনো প্রমাণ নেই। তিনি রাজনীতিকও নন। অর্থনীতি বিষয়ে মৌলিক বিদ্যা অর্জন করেছেন রাশিয়ায়। পরে পশ্চিমে সে বিদ্যা ঝালাই করেছেন।

'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' নামের বিদেশী অর্থে পরিচালিত সংগঠনের তিনি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক। তাদের প্রধান কাজ ছিল বাংলাদেশকে ব্যর্থ, অকার্যকর, মহাদুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। তা ছাড়া দেশকে রাজনীতিশূন্য করার জন্য তারা শুরু করেছিলেন 'সৎ ও যোগ্য' প্রার্থী আন্দোলন। অর্থাৎ প্রচলিত ধারায় যারা দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করে আসছিলেন, তারা বাদ। নতুন লোকরা আসবেন, যারা সৎ ও যোগ্য। তাদের সততা বা যোগ্যতার পরিমাপ করবে কে? পরজীবী সিপিডি? নাকি এই পরজীবীরা যাদের সার্টিফিকেট দেবে, তারাই হবে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী? ব্যাপারটা অনেকটা সে রকমই ছিল। এরা 'সৎ ও যোগ্য'দের একটা দল খোলারও চেষ্টা করেছিল নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যাংকার ড. ইউনূসকে দিয়ে। বুঝে হোক, না বুঝে হোক, হুজুগে হোক কিংবা পরজীবীদের প্ররোচনায়ই হোক তিনি 'নাগরিক শক্তি' নামক 'সৎ ও যোগ্য' লোকদের নিয়ে একটি দল খোলার চেষ্টা করেছিলেন। একেবারে অফিস-টফিস খুলে লোকজন লাগিয়ে, মোবাইল ফোনের ব্যবসায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আরো বিরাট অঙ্কের অর্থ টেলিনর ফোন কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বোধোদয় হয়েছিল যে, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসায় যত সহজ, রাজনীতি তত সহজ কাজ নয়। তিনি তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাৎপসারণ করেন।

www.pathagar.com

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন করতে গিয়ে এসব পরজীবী ধাওয়া খেয়ে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও পরজীবী সিপিডি ও তথাকথিত সুশীলেরা প্রেসক্রিপশন দিতেই থাকেন। সেখানে জনগণের কোনো কথা থাকবে না। তারা ওপর থেকে বলে দেবেন, অমুক সৎ, তিনি সৎ হয়ে যাবেন। তারা যাকে বলবেন অসৎ, তিনি অসৎ হয়ে যাবেন। তাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী লোকেরা নির্বাচনে দাঁড়াবেন। জিতে এসে তাদের মতো করে কথা বলবেন। এরা যেমনি পরজীবী, তেমনি আরেক পরজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটবে, যারা হবেন রাজনীতিক। যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এদের যারা পোষক, তাদের কথায় ওঠবস করবেন, নীতিনির্ধারণ করবেন।

এমনি নিঃরাজনীতিকরণের লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন পরজীবী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশে। এখানে যারা দীর্ঘদিন ধরে জনসম্পৃক্তির রাজনীতি করেন, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসে আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন, তারা ভাসা পানা নন। আমাদের পরজীবী সুশীলদের সে সত্য উপলব্ধির অভাব আছে। এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-চেতনা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, চাওয়া-পাওয়ার সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই বলেই তারা বিদেশী অর্থে পরিচালিত হয়ে বিদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের নানা কৌশল নিয়ে গত এক দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে এরাই জনবিচ্ছিন্ন ভাসা পানা। দু'হাত দিয়ে সামান্য ঢেউ তুললেই যারা বাংলাদেশের নদী-খাল থেকে বিতাড়িত হয়ে অথৈ পানিতে হাবুডুবু খেতে খেতে হারিয়ে যাবে। বড় বড় কথা বলছেন যারা, তাদের চ্যালেঞ্জও করা যায়। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এতসব দুর্নীতির অভিযোগ। তারপরও তার টুঙ্গিপাড়ার আসনে যদি সৎ ও যোগ্যদের পালের গোদাও ভোটে দাঁড়ান, নির্দ্বিধায় বলা যায়, জামানত তো দূরের কথা ভোটের কোঠা হাজার পার হবে না। একই কথা বেগম খালেদা জিয়া, ড. খন্দকার মোশাররফ, আমানউল্লাহ আমান প্রমুখের ক্ষেত্রেও সত্য।

তাহলে পরজীবী সুশীলদের মতলব বাস্তবায়নের উপায় কী? তারা কী জবাব দেবেন তাদের বিদেশী প্রভুদের কাছে? সে জবাবের নির্দেশনা প্রভুরাই দিয়েছে। তারা দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের নামে প্রমাণহীন অভিযোগ দায়ের করছেন। ধারণা করা যায়, প্রত্যেকে এমন শাস্তি পাবেন, যাতে করে এরা আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন। এসব বিদেশী প্রভু চায়, বাংলাদেশে একটি ঠুঁটো জগন্নাথ সরকার। যে সরকার আফগানিস্তান বা আলজেরিয়ার মুসলমানপ্রধান দেশের সরকারদের মতো প্রভুদের কথা মেনে চলবে। যাদের কাছে দেশ বা জনগণের স্বার্থের কোনো মূল্য থাকবে না।

সে প্রক্রিয়া এখন সম্পন্নপ্রায়। দেশকে রাজনীতিশূন্য করার বিদেশী চক্রান্তের পদলেহী সুশীলরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। যারা ড. দেবপ্রিয়র সিপিডিতে আছে, তাদের অনেকেই আছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবিতে। তথাকথিত সুশীলদের মধ্যে ঘুরেফিরে একই লোকদের অবস্থান। বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করে এর মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার বিদেশী চক্রান্তকারী শক্তির এ দেশীয় দোসরদের এখন

www.pathagar.com

পোয়াবারো। শুনেছি, বর্তমান সরকার সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকার। বলেছেন তথ্য ও আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। কিন্তু মার্কিন ঘেটু জাতিসঙ্ঘের এক কর্মকর্তা ঢাকায় এসে বললেন, তারা মনে করেন না যে, বর্তমান সরকার সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকার। যদি সেনাবাহিনীর সমর্থন না থাকে তাহলে বর্তমান সরকারের ক্ষমতার কোনো ভিত্তি নেই। সেনাবাহিনীর সমর্থন ছাড়া এ সরকার কোনো সরকারই নয়। এ এক ভয়বহ পরিস্থিতি। এতে যা দাঁড়াচ্ছে, তা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। এই সরকার ক্রমেই ব্যর্থ সরকারে পরিণত হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, উৎপাদন উন্নয়ন চালিয়ে নিতে ব্যর্থ, জাতীয় প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, বিদেশী বিনিয়োগ আনতে ব্যর্থ, গার্মেন্টস শিল্পের রফতানির ধারা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ ড. ফখরুদ্দীনের সরকার। কিন্তু সেনাবাহিনী সমর্থিত বলে কথিত এই সরকারের ব্যর্থতার দায় গিয়ে পড়বে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর। সেটা এ দেশের কোনো মানুষই চায় না।

দেশে সামরিক শাসন জারি হয়নি। বেসরকারি প্রশাসন ডাকলে সেনাবাহিনী সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে এটা স্বাভাবিক। এখন পর্যন্ত দৃশ্যত সেটাই করছে সশস্ত্র বাহিনী। কিন্তু এই সীমানা পেরিয়ে এরা যদি আরো এগিয়ে যান, তাহলে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক সেনাবাহিনী বিতর্কিত হতে বাধ্য। আর সেই বিতর্ক সশস্ত্র বাহিনীকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। সেটা বাংলাদেশবিরোধী দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য আনন্দের হলেও, দেশের জন্য হবে বিরাট বেদনাদায়ক ঘটনা।

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের যে যুদ্ধ, বাংলাদেশ সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জ্বালানি স্বার্থ যেমন আছে, তেমনি আছে মুসলমানদের পদানত করার ইচ্ছাও। ইরাক-ইরানে তেল-গ্যাস আছে। তা আয়তনে ও পরিমাণে বিপুল। কিন্তু আফগানিস্তান বা লেবাননে কী আছে? কী আছে আলজেরিয়া বা তুরস্কে? মিথ্যা অজুহাত তুলে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক দখল করে নিয়েছে। ইরানেও হামলা চালাই চালাই করছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য তেলসমৃদ্ধ দেশও মার্কিন স্বার্থের বাইরে নেই। অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বের জ্বালানি তেলের ওপর মার্কিন স্বার্থ ষোলো আনা প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপরও আফগানিস্তানে কেন হামলা চালানো হলো পোড়ামাটি নীতি নিয়ে? কেন আলজেরিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় দোসররা। সেটা মুসলমানদের দমনের জন্যই। ওসামা বিন লাদেনের ধুয়া যে কতটা পাতানো, তা মার্কিন সাংবাদিক নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'ফারেনহাইট নাইন-ইলেভেনে' স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। ১৫ কোটি মুসলমানের দেশ বাংলাদেশও তাই সাম্রাজ্যবাদীদের এই বলয়ের বাইরে নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা মালয়েশিয়ার উত্থানপর্বে একইভাবে সে দেশকে তছনছ করে দেয়ার হীন ষড়যন্ত্র করেছিল। ড. মাহাথির মোহাম্মদের যোগ্য নেতৃত্বে মালয়েশিয়া সে ষড়যন্ত্র

www.pathagar.com

নস্যাৎ করতে পেরেছিল। তুরস্কের জনগণ এবার বিজয় অর্জন করেছে, তাদের নির্বাচিত ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় বসাতে পেরেছে। বাংলাদেশ কি তা পারবে না? আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে চাই, পারব।

বাংলাদেশকে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণ করার জন্য স্টার-প্রথম আলো গ্রুপ, বিদেশী অর্থে পরিচালিত দেবপ্রিয় বাবুর সিপিডি আর বিদেশী অর্থে পরিচালিত ড. মোজাফফর আহমদের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ তথা টিআইবি আর তথাকথিত সুশীল সমাজ আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এদের খপ্পরে পড়েছে বলেই দেখা যাচ্ছে। প্রথম আলো-স্টার গ্রুপ প্রতিদিন কোনো না কোনো রাজনীতিকের জাত মেরে দেয়ার জন্য প্রমাণহীন দুর্নীতির অভিযোগ ছাপছে, সেটাকে ভিত্তি করে অশীতিপর মোজাফফর আহমদের বিদেশী অর্থে পরিচালিত টিআইবি বলছে, বাংলাদেশ দুর্নীতির শীর্ষ স্থানে পৌঁছেছে। সরকারও ওই সব কল্পকাহিনীকে আমলে নিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে। আর তথাকথিত সুশীলরা এর ঢাক পেটাচ্ছে। এর সবই মার্কিন ও ইহুদিবাদীদের মুসলমানবিরোধী পরিকল্পনার অংশ। ড. দেবপ্রিয়ও এর বাইরে নন। তাহলে সেই দেবপ্রিয় কেমন করে জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির নিয়োগ পেলেন?

এই সরকার ক্ষমতায় এসে পূর্ববর্তী জোট সরকারের আমলে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত সব কর্মকর্তার নিয়োগ প্রত্যাহার করে নেন। এরা ঘোষণা দেন, চুক্তি ভিত্তিতে আর কোনো নিয়োগ দেয়া হবে না। এই সিদ্ধান্ত সঠিক কি বেঠিক, সে কথা বলছি না। বলছি, তবু নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকারের সুবিধাভোগী ড. ফখরুদ্দীন আহমদ থেকে শুরু করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বেশিরভাগ উপদেষ্টা এবং পিএসসি'র বর্তমান চেয়ারম্যানসহ অনেকেই। এরা সব ধোয়া তুলসী পাতা। আর এদের বাইরে যারা নিয়োগ পেয়েছিলেন, তা গন্ধবাদালি, তা তো হতে পারে না। পিএসসি'র সাবেক চেয়ারম্যান ড. তাহমিদা নিয়োগ পেয়েছিলেন জোট সরকারের আমলে। ড. ফখরুদ্দীনও এই পিএসসি'র বিরুদ্ধে বলেছেন বেশ কয়েকবার অকারণেই, প্রমাণহীনভাবে। কিন্তু বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে ড. সা'দত হুসেইনকে পিএসসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিলেন তাকেও বেগম খালেদা জিয়া কয়েক দফা এক্সটেনশন দিয়ে চাকরিতে রেখেছিলেন। ড. তাহমিদা পচে গেলেন, আর সা'দত হুসেইন ভালো থাকলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ কেমন দু'মুখো নীতি!

জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে এমন একজনকে নিয়োগ দেয়া হলো, বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করার জন্য যার অবদান 'বিরাট'। সাধারণ মানুষ কিন্তু সরলভাবে বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে পারে। তা হলো এসব 'সুশীল' দিয়ে প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদিবাদীরা দেশকে রাজনীতিশূন্য করেছে। তারপর তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য। এরা এখন বাংলাদেশের স্বার্থ যত না দেখবে– তার চেয়ে বেশি দেখবে তাদের অর্থদাতা প্রভুদের

www.pathagar.com

স্বার্থ। সে বিবেচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সরকার পরিচালনাকারী কারো জন্যই আনন্দ সংবাদ নয়।

তাহলে টিআইবি'র ড. মোজাফফর আহমদ কেন পুরস্কৃত হবেন না? রাশিয়ান পিএইচডিধারী ড. দেবপ্রিয় যদি জেনেভায় জাতিসঙ্ঘ মিশনে স্থায়ী প্রতিনিধির নিয়োগ পান, তাহলে ড. মোজাফফর আহমদের তো আরো বড় পুরস্কার প্রাপ্য। কারণ, বিদেশী অর্থে পরিচালিত তার টিআইবি গত ছয়-সাত বছর ধরে প্রথম আলো-স্টারের মতলবি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণের জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করেছে! তার জন্য কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা না করলে বড় অবিচার হয়ে যায়! তার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু করতে পেরেছেন এবং দেশকে রাজনীতিশূন্য করার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রতিদিন রাজনীতিকদের নামে অভিযোগ আসছে সুশীল পত্রিকায়। ৩০-৩১ বছর করে জেল দিয়ে তাদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। ড. মোজাফফর বিরাট অর্থনীতিবিদ! কিন্তু তিনি যেন জানেনই না যে, পুঁজি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে টাকা কিভাবে আসে। দুর্নীতিই বলি, আর অনিয়মই বলি, টাকা সাদা করার ব্যবস্থা কেন রাখা হয় অর্থনীতিতে, সেটা না বোঝার মতো অবোধ তিনি নন। এসব টাকা যাতে পাচার না হয়ে যায়, যাতে দেশী শিল্পে বিনিয়োগ হয়, তার জন্যই কালো টাকা সাদা করার ব্যবস্থা। টাকা যখন শিল্পে বিনিয়োজিত হয়, তখন তা হিসাবের মধ্যে আসে। সেভাবেই আসতে দিতে হয়। পুঁজি গঠন ও বিকাশের এটাও অন্যতম পথ। তাহলে বাংলাদেশে পুঁজি গঠনের এই প্রাথমিক পর্যায়ে বিদেশীদের টাকায় পরিচালিত হয়ে তিনি কোন দেশ উদ্ধারে উঠেপড়ে লাগলেন?

আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী লেখক ফ্রাঞ্জ ফ্যানন তার 'দি কলোনাইজার অ্যান্ড দি কলোনাইজড' গ্রন্থে খুব স্পষ্ট করে তার দেশের সঙ্কট তুলে ধরেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আলজেরীয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী/সুশীলরা কেমন করে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পিবাহকে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের সুশীলরাও একই কাজ করে বসেছে। তাই সরকারকে বলি, ড. মোজাফফর আহমদকে 'কি মাল্য দেবে, দাও'। তার মিশন সফল হয়েছে। ফলে যেসব মন্ত্রণালয় তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ ছিল, তার মন্ত্রীরা যেহেতু সরকারকে সহযোগিতা করছে, অতএব একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে বসে গেছেন তিনি। ওই সব মন্ত্রণালয় নিয়ে রা করছেন না। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন।

এদিকে জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কে কোথায় বসে আছে, সে খবর দিত সুশীল প্রথম আলো ও স্টার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার নিয়োগ বাতিল করত সে খবর পড়ে। কিন্তু এখন যে স্টারের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ফাহিম মুনেম চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন, চুপ কেন? এই ফাহিম মুনেম তো বিএনপি সরকারের সুবিধাভোগী ছিলেন। ১৯৯১-৯৬ সালে জাপানে চুক্তি ভিত্তিতে কাউন্সিলর নিয়োজিত ছিলেন বিএনপি সরকারের কৃপায়। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

www.pathagar.com

পেলেন, চুপ মেরে গেল কেন সুশীল-বান্ধব পত্রিকা। এমনকি মান্নান ভূঁইয়ার স্ত্রী যে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন, চুপ কেন সুশীল পত্রিকা? এ থেকে তাদের সমন্বিত মতলবের প্রমাণ মেলে।

তাহলে উপায়? উপায় জনগণ। জনগণের শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে দেশের মানুষ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিগত ১৫ বছরের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এ দেশের মানুষ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেছিল। তারা শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে অগ্রসর হচ্ছিল, মাথাপিছু আয় বাড়াচ্ছিল, উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই মানুষকে পদানত করা দুঃসাধ্য বলেই মনে করি। যে দেশের মানুষ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, যেকোনো মূল্যে সেই মানুষরা নিজ কষ্টার্জিত স্বাধীনতা সংরক্ষণেও নিশ্চয়ই সফল হবে। এখন সেই শক্তির উন্মেষের অপেক্ষা।

পাদটীকা : হল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ (আইএসএস)-এ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে গিয়েছিলাম ১৯৯০-৯১ সালে। তখন ওই বিভাগের প্রধান ছিলেন জেফরি হ্যারোড। তিনি একদিন আমাকে বললেন, 'সিদ্দিকী, তুমি কি জানো আমরা উন্নয়শীল দেশে এনজিওগুলোকে কেন এত পয়সা দেই?' জানতে চাইলাম, কেন? তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'এনজিওর জাল দিয়ে দেশটাকে ঢেকে দেয়ার জন্য। এই জালের ভেতর থেকে আমরা যাকে তুলে আনব, সেই হবে তোমাদের জনপ্রতিনিধি। আর সে তার দেশের জনগণের নয়, আমাদের স্বার্থই দেখবে। তোমরা কাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে সেটা বড় কথা নয়, আমরা কাকে গ্রহণ করলাম সেটাই বড় কথা।' হ্যারোডের কথায় সেদিন অত গুরুত্ব দেইনি। আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, কি নির্মম সত্য কথাই না তিনি বলেছিলেন!

২৭.০৯.২০০৭

www.pathagar.com

এবার কাউকে অবিলম্বে আটক করতে বলবেন না?

গত ২৭ সেপ্টেম্বর গুরুতর অপরাধ দমন জাতীয় সমন্বয় কমিটি আরো ৮০ জন সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজের নাম প্রকাশ করেছে। ২৭ তারিখেই তা দেশের টিভি চ্যানেলগুলো দিনরাত প্রচার করেছে। ২৮ সেপ্টেম্বর দেশের সংবাদপত্রগুলোতে সে নামের তালিকা ছাপা হয়েছে। এবারের তালিকাটি বেশ মজার। রাজনীতিতে যারা পিঠ বাঁচানোর জন্য সংস্কারপন্থীদের খাতায় নাম লিখিয়ে খালেদা-হাসিনাকে রাজনীতি থেকে নির্বাসনে পাঠানোর অলীক কল্পনায় বিভোর ছিলেন, এবারের তালিকা তাদের নামে আলোকিত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাবেক মন্ত্রী ও ঢাকার মেয়র সংস্কারবাদী সাদেক হোসেন খোকা, আওয়ামী লীগ আমলের সাবেক শিল্পমন্ত্রী সংস্কারবাদী তোফায়েল আহমেদ। বিএনপি-আওয়ামী লীগের আরো মন্ত্রী ও নেতার নাম আছে এ তালিকায়। সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী সনাতনপন্থী সাজেদা চৌধুরী, বিএনপি আমলের সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী কারাবন্দী এ কে এম মোশাররফ হোসেনও আছেন তালিকায়।

শুধু তা-ই নয়, প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে উপদেষ্টামণ্ডলীর একাধিক সদস্য ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিরতা দূর করার বারবার ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, ব্যবসায়ীরা নির্ভয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করুক, তাদের কোনো রকম হয়রানি আর করা হবে না। এক উপদেষ্টা তো স্বীকারই করেছেন যে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থার সঙ্কট তৈরি হয়েছে। এ সঙ্কট দূর করতে হবে। ব্যবসায়ীরা বোধ করি খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন। হয়তো আর তারা হয়রানির শিকার হবেন না। কিন্তু এবারের তালিকায়ও নতুন করে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের নাম এসেছে। এই তালিকায় যেসব ব্যবসায়ীর নাম এসেছে, তাদের মধ্যে আছেন প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার মালিক ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান লতিফুর রহমান, বেঙ্গল গ্রুপের আবুল খায়ের লিটু ও ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান মীর কাসেম আলী, র‍্যাংগস গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুর রউফ চৌধুরী (যিনি প্রথম আলো-ডেইলি স্টার গ্রুপের স্বত্বাধিকারীদের একজনও বটে), নিটল গ্রুপের প্রধান আবদুল মাতলুব আহমাদ প্রমুখ। ২৮ সেপ্টেম্বর পত্রিকাগুলো এই তালিকা প্রকাশ করে। পত্রিকার খবরে বলা হয়েছিল, 'সূত্র জানায়, এই তালিকার পর আর কোনো নতুন তালিকা প্রকাশ করা হবে না।' কিন্তু ৩০

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর যোগাযোগ উপদেষ্টা অব: মে. জে. এম এ মতিন বলেছেন, 'সন্দেহভাজন দুর্নীতিগ্রস্তদের প্রকাশিত তালিকা চূড়ান্ত নয়। মানে তালিকা আরো আসছে। তাহলে সরকার কে চালাচ্ছে? গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা যদি বলতেন যে, আর কোনো তালিকা প্রকাশিত হবে না- তাহলে তার কোনো মন্ত্রী কি বলার ধৃষ্টতা রাখতেন যে, তালিকা প্রকাশিত হবে? এ থেকে সংশয় জাগে, প্রধান উপদেষ্টা কি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছেন? না যদি পেরে থাকেন, তাহলে কেউ কখনো তাকে আস্থায় নেবে না, বিশ্বাসও করবে না। এ পরিস্থিতি কারো জন্য কাম্য হতে পারে না।

আজকের আলোচনার প্রসঙ্গ সেটা নয়। দৈনিক যায়যায়দিন সম্পাদক শফিক রেহমান লিখেছেন, 'কিন্তু এরা সবাই কি দুর্নীতিবাজ? মানুষ বুঝতে পারবে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। যেমনটা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে এর আগে সন্দেহভাজন ১৪২ জনের বিষয়ে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় প্রথম সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজের লিস্ট। এর পর ৫১, ৩৯, ১ এবং ১ মিলিয়ে মোট ১৪২ সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজের লিস্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এ বিশেষ কার্যক্রমটি কেন যেন থমকে দাঁড়ায়। হতে পারে অভাবিত বন্যা (সিরিয়াস), অপ্রত্যাশিত ছাত্র বিক্ষোভ (ভেরি সিরিয়াস), অবারিত মূল্যবৃদ্ধি ভেরি ভেরি সিরিয়াস প্রভৃতি ইস্যু মোকাবেলায় দুর্নীতিবাজদের লিস্ট তৈরির কাজটি আলীবাবা পেনডিং রেখেছিলেন।... সে যা-ই হোক, কেন যে দুর্নীতিবাজ লিস্ট প্রণয়ন ও প্রকাশ প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত ছিল সেটা সাধারণ মানুষ কোনো দিনই জানবে না। যেমন তারা জানবে না বাংলাদেশী আলীবাবার প্রকৃত পরিচয়। না, জানা যাবে না কে আলীবাবা। কিন্তু ৪০-এর জায়গায় ২২০ 'চোরে'র তালিকা এখন সবাই জানতে পেরেছে। তার পরও আরো কত 'চোর' যে আছে, তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে।

সমাজের ভেতরে এই চরম অস্থিরতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে দেশকে স্থবির করে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে প্রথম আলো-ডেইলি স্টার গ্রুপ। আজম জে চৌধুরী ও নূর আলীর মামলায় শেখ হাসিনা গ্রেফতার হওয়ার পর পাগল হয়ে গিয়েছিল এই দু'টি পত্রিকার কর্তাব্যক্তিরা। প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান গত ১২ আগস্ট তার সম্পাদিত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখলেন এক মন্তব্য প্রতিবেদন। শিরোনাম : 'দুই নেত্রী, উপদেষ্টাদের সম্পদের হিসাব এবং জনগণের প্রত্যাশা'। তাতে তিনি লেখেন যে, 'বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গত ৩৫ বছরের মধ্যে ১০ বছরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এর মধ্যে তার নেতৃত্বাধীন বিগত শাসনামলে দুর্নীতি ও লুটপাট কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্নীতিবিরোধী বর্তমান সরকারের অভিযান, তার কথায় 'সংস্কারের নামে ষড়যন্ত্র'। বেগম জিয়া নানাভাবে দলের কর্মী-সমর্থক ও মানুষকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট রয়েছেন।' মতিউর রহমান লিখেছেন, 'শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের পর যে বিষয়টি

www.pathagar.com

বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে, তা হলো সর্বশেষ ক্ষমতায় ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমন্বয়ে গঠিত জোট সরকারের বিগত পাঁচ বছর শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, এটি ছিল এক অভাবনীয় লুটেরা শাসন।... সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দুই ছেলে তারেক আর আরাফাত, দুই রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও মোসাদ্দেক আলী ফালু, দুই ভাই সাঈদ ও শামীম এস্কান্দর, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও মন্ত্রী-সংসদ সদস্যরা শত শত কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন। জমি, বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক কেনা এবং টিভি চ্যানেল ও পত্রিকা প্রকাশ ও ধনসম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। শত শত কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। শোনা যায়, এসব লুটপাটের টাকা থেকে এ পর্যন্ত ৭ শতাধিক কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা পড়েছে এবং এর সাথে জড়িত অধিকাংশ ব্যক্তিই বেগম খালেদা জিয়ার আশীর্বাদপুষ্ট। দেশব্যাপী কার্যত এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বেগম জিয়ার নেতৃত্বে। তার শাসনামলে যে রকম বেপরোয়া দুর্নীতি হয়েছে, তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।'

জানা যায়, শোনা যায়ভিত্তিক রচনাকার সম্পাদক লিখেছেন, 'আমরা জানি, একবার দুই নেত্রীকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছিল– সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এতে করে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। পরে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হলেও বেগম খালেদা জিয়াকে এখনো গ্রেফতার করা হয়নি, তার বিরুদ্ধে এখনো কোনো মামলা দেয়া হয়নি। তার বিরুদ্ধে এখনো কোনো আইনি ব্যবস্থা না নেয়ায় সেনাবাহিনী সমর্থিত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে, তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ-অবিশ্বাস বাড়ছে। খালেদা জিয়ার প্রতি কোথাও কোনো ধরনের বিশেষ সহানুভূতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। কারণ, অনেকেই জানেন, বর্তমানে যারা দেশ পরিচালনা করছেন, তাদের কারো কারো অতীতে খালেদা জিয়ার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ছিল। সাধারণ মানুষের মনে তাই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়, যখন তারা দেখে যে, খালেদা জিয়া প্রায়ই টেলিসংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন দেশে ও বিদেশে। পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। যদিও বর্তমানে ঘরোয়া রাজনীতি নিষিদ্ধ। মতিউর রহমান এ রচনার উপসংহারে লিখেছেন, 'সার্বিক বিচারে তাই বলা যায়, বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি বর্তমান প্রশাসনের এ ধরনের আচরণগত বৈপরীত্য সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি শুরুতে মানুষের যে আস্থা ছিল, তাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাই দেশবাসী আজ গভীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে, করে আছে, বর্তমান সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি কী পদক্ষেপ নেয়, তা দেখার জন্য।'

মতিউর রহমান খালেদা জিয়ার শাসনামলকে যে অভাবনীয় লুটেরা শাসন বলেছেন সেও শোনা কথা। সেসব 'শোনা কথা' প্রচার করেছেন তারাই। তারা নিজেরাও এর কোনো প্রমাণ যেমন তুলে ধরতে পারেননি, তেমনি তুলে ধরতে পারেনি মামলাকারী

www.pathagar.com

সরকার। ফলে সরকারের মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে একজনের টিন আত্মসাৎ, খাদ্য চুরি, গম চুরি, গাড়ির নম্বর প্লেট পরিবর্তন প্রভৃতি মামলা দায়ের করতে হয়েছে। এটা মতিউর রহমানের কল্পনার ধারে-কাছেও নয়। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কেন মামলা দেয়া যাবে না- এই নিয়ে মতিউর রহমানের গায়ে ফোসকা পড়ার উপক্রম। মামলা থাক বা না থাক, তাকে শোনা কথা অনুযায়ী তাকে গ্রেফতার না করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমই সব ভুল হয়ে যাবে। মতিউর রহমানের কথা অনুযায়ী তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানের বিশাল দুর্নীতি এখন প্রমাণিক নয় বা সে রকম কোনো তথ্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি দুর্নীতি দমন কমিশন। সাঈদ এস্কান্দারের বিরুদ্ধে শোনা যায়, জানা যায়, এ জাতীয় এক বিশাল রিপোর্ট ফেঁদেছিল মতিউর রহমানের প্রথম আলো। তিনি নাকি সশস্ত্র বাহিনীর সাজসরঞ্জাম কেনার সময় বিশাল দুর্নীতি করেছেন। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর তরফ থেকে যখন তা অস্বীকার করা হলো, একেবারে লেজ গুটিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন মতিউর রহমান। মতিউর রহমানের বক্তব্য অনুযায়ী টিভি চ্যানেল ও পত্রিকা প্রকাশ করেছেন খালেদা জিয়ার আশীর্বাদপুষ্টরা। এ কথা লেখার আগে সম্পাদক একবারো ভেবে দেখেননি, লতিফুর রহমান কেমন করে পত্রিকা প্রকাশ করলেন এবং তিনি সে পত্রিকার সম্পাদক হলেন।

খালেদা জিয়া বা তার মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রমাণহীন দুর্নীতির অভিযোগ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে গেছে এই পত্রিকা। যাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তার প্রতিবাদ দিতে পারেননি, কারণ তার আগেই তারা গ্রেফতার হয়েছেন। তাদের গ্রেফতারের জন্য কী না করেছে প্রথম আলো-স্টার গ্রুপ। আমরা বারবার বলার চেষ্টা করেছি, দুর্নীতি বা দোষের অভিযোগ আনা হলেই তিনি দুর্নীতিবাজ হন বলে চিহ্নিত হতে পারেন না। সে অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হতে হয়। সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুযায়ী বলা উচিত, দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত দুর্নীতিবাজ বলা উচিত নয়। মতিউর রহমানরা এসব এথিকসের ধারে কাছেও কখনো যাননি।

কিন্তু এবার কী করবেন মতিউর রহমান গং? সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজদের তালিকায় এবার নাম প্রদর্শিত হয়েছে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার গ্রুপের মালিক ও ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নাম। কেউ যদি বলে, শোনা যায়, দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থবিত্ত বানিয়ে ট্রান্সকম ফিলিপস কিনেছে, পত্রিকা প্রকাশ করেছে এখন টিভি চ্যানেল করার চেষ্টায় আছে, এই লতিফুর রহমান কেন এখন বাইরে থাকবেন। তাকে কেন গ্রেফতার করা হয় না? এটা সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ও তাদের ওপর আস্থা নষ্ট করে দিচ্ছে। তাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। কী বলবেন মতিউর রহমান। এখন তো আমরা আশা করি, তিনি জোরালো এক কলাম লিখবেন পত্রিকার প্রথম পাতায়, লতিফুর রহমানকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। নাকি এই দুর্নীতিবাজের পত্রিকার সম্পাদকগিরি তিনি ছেড়ে দেবেন?

সঙ্কট আসলে এখানেই। এ রকম অভিযোগেই দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী শিল্পপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বসুন্ধরা গ্রুপ, পারটেক্স গ্রুপ, যমুনা গ্রুপ, গ্লোব, মাল্টিমোড,

www.pathagar.com

বেক্সিমকো গ্রুপ প্রভৃতি শিল্প গ্রুপের প্রধানরা যখন আটক হয়েছেন, তখন বগল বাজিয়েছে প্রথম আলো-ডেইলি স্টার। তা হলে আজ। ওইসব বড় শিল্প বা বাণিজ্য গউসের দুর্নীতির বিষয়গুলো এখনো মীমাংসিত নয়। কিন্তু আটক আছেন তারা। লতিফুর রহমানের দুর্নীতিও প্রমাণিত বা মীমাংসিত নয়, তাহলে তিনি কেন আটক হবেন না? লিখুন মতিউর রহমান। আটক করিয়ে ছাড়ুন লতিফুর রহমানকে। তা না হলে আপনারা সেনাসমর্থিত যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন বলে দাবি করছেন, তাদের 'আচরণগত বৈপরীত্য' যে প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তা না হলে লতিফুর রহমানের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ পাবে। যা কিছু ভালোর সঙ্গে থাকা প্রথম আলো সে কি হতে দিতে পারে?

কিন্তু না, এই কলামে লতিফুর রহমানসহ আরো শিল্পপতি ব্যবসায়ীর নাম উল্লেখ করে আমরা লিখেছিলাম, এও সংশয়ে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এদের কাউকে যেন আটক বা অযথা হয়রানি করা না হয়। তাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি, কর্মসংস্থান সবকিছু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরকার আস্থার সঙ্কটে পড়বে, বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। তখন মতিউর রহমান সাহেবরা উল্লম্ফনে ব্যস্ত ছিলেন।

আবার এটাই তো সত্য, আগে যেসব কথিত দুর্নীতিবাজকে ধরা হলো, তাদের নাম প্রকাশ করেই বা করার আগেই আটক করে ফেলল সরকার। এবার বলছে, নাম প্রকাশ করা হলো বটে, তবে এখনই গ্রেফতার করা হবে না। এটা কি পক্ষপাত নয়? কেন এই পক্ষপাত? কেন এই আচরণগত বৈপরীত্য। না, আমরা প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতারের পক্ষপাতী নই। সেই বিবেচনায় এফবিসিআই'র দাবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই, আটক যেসব শিল্পপতি, ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা যায়নি, তাদের মুক্তি দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের সুযোগ দেয়া হোক। বাংলাদেশ ব্যাংক যা-ই বলুক, শিল্প-বাণিজ্য বিকাশে উদ্যোক্তাই প্রধান শক্তি, ব্যাংক নয়। যেখানে উদ্যোক্তাই আটক আছে, সেখানে নতুন ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসায়-শিল্প চালু রাখবে কে? কোনো কর্মকর্তা সাহস পাবে তার মালিকের নামে ঋণ নিতে?

তাই মতিউর রহমান সাহেবদের কাছে অনুরোধ, দেশের স্বার্থে সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকুন। কাউকে ফাঁসিয়ে দিতে গিয়ে নিজেরাই যেন ফেঁসে না যান।

০৫.১০.২০০৭

www.pathagar.com

পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন

জরুরি অবস্থার ঢাল দিয়ে সংরক্ষিত বর্তমান সরকার গত ৯ মাসে অবিরাম ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ায় সর্বক্ষেত্রে দেশে এক চরম তালগোল পাকানো অবস্থা বিরাজ করছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, আমদানি-রফতানি, বিদ্যুৎ, আইনশৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতিসহ হেন কোনো খাত নেই, যে খাত এই সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কোনো কিছুই যেনো সামাল দিতে পারছে না সরকার। আবার এই ব্যর্থতা ঢাকতে এমন সব কথা বলছেন কোনো কোনো উপদেষ্টা, যেটা শুনলে সরকারের দুর্বল অবস্থানটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পূর্বাপর চিন্তা না করেই এ সরকার অবাস্তব উপায়ে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু করল ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই। নিশ্চয়ই গত ৯ মাসে এরা হাজার হাজার মামলা দায়ের করেছেন, তা না হলে প্রায় ৩ লাখ লোককে এরা গ্রেফতার করলেন কী হিসেবে? সরকারের এই মামলার হিড়িক দেখে কেউ কেউ এখন বাংলাদেশকে মামলাদেশ বলেও অভিহিত করছেন। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান কেন? দুর্নীতি দূর করা তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল না। তাদের কাজ ছিল ক্ষমতা গ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যাওয়া। আর সে রকম একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা করা। যখন তখন নানা ধরনের অধ্যাদেশ জারি করে নানা খোর-নলচে বদলে ফেলার ম্যান্ডেট সংবিধান তাদের দেয়নি, জনগণ তো নয়ই। তা ছাড়া সংবিধান তো বলেছে, তারা দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করবেন, তা হলে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কেন? এর পক্ষে যুক্তি দেখানো হলো, নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্যই দরকার দুর্নীতির অবসান ঘটানো। ব্যস, শুরু হয়ে গেল। দুর্নীতি দমনের জন্য রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, 'রাঘববোয়াল-চুনোপুঁটি'দের পাইকারি হারে ধরে জেলে পুরে দেয়া হলো। রাজনীতিবিদরা তো আছেনই, দেশের বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকদের আটক করে জেলে ঢোকানো হলো। অনেকেই জেল-জুলুমের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তার পরিণতি দাঁড়াল ভয়াবহ। ইতোমধ্যেই এসব ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিনিয়োগ প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে নেমে এসেছে

www.pathagar.com

হতাশা ও অনিশ্চয়তা। অনেক প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মীরা অন্যত্র চাকরির সন্ধান করছেন। এ ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগও হচ্ছে না। বিনিয়োগ করবে কে? সরকার ব্যাংকগুলোকে বলেছে এসব প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে। কিন্তু মালিকের পক্ষ হয়ে অন্য কোনো কর্মকর্তা কেন ব্যাংক ঋণ নিতে যাবেন? তার সাথে যদি মালিকের যোগাযোগ থেকে থাকে, তাহলে সে মালিকই বা কেন তার কর্মকর্তাকে তার প্রতিষ্ঠানের ঋণ নেয়ার অনুমতি দিয়ে নতুন করে ঋণগ্রস্ত হবেন? তিনি তো জানেন না ইতোমধ্যে তার যে সম্পত্তি রয়েছে, সেটুকুই রক্ষা বা ভোগদখল করতে পারবেন কি না। তাহলে নতুন ব্যাংকঋণ নিয়ে বিনিয়োগ কেন করবেন? এসব কলকারখানা, শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কি তাহলে সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে? প্রশাসক দিয়ে চালাবে? বিক্রি করে দেবে? তবে শুধু বাজেয়াপ্ত করাই সম্ভব। বাকি দু'টি অপশন সম্ভব নয়। প্রশাসক দিয়ে চালানোর চিন্তা করা হলে তা '৭২ সালের জাতীয়করণ করা শিল্প-কারখানার ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য।

শিল্পপতিরা কাঁচামাল, কারখানার যন্ত্রাংশ বা ভারী মেশিনপত্র কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, আমদানিকারকরা ব্যাংক থেকে ঋণ নেন আমদানি করার জন্য, রফতানিকারকরা ব্যাংক থেকে ঋণ নেন পণ্য উৎপাদন করে তা রফতানির জন্য, মধ্যবিত্ত ঋণ নেয় ফ্ল্যাট বাড়ি, জায়গা-জমি বা গাড়ি কেনার জন্য। এদের প্রায় সবাইকেই সরকার তাড়া করেছে। ফলে ব্যাংকে জমেছে ১৪ হাজার কোটি অলস টাকার পাহাড়। ব্যাংক যদি অর্থ বিনিয়োগ করতে না পারে, তাহলে আমানতকারীদের এরা সুদ দেবে কোত্থেকে? অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আমানতকারীদেরও সরকার তাড়া করতে শুরু করেছে। ফলে নতুন আমানতও কমে যেতে বাধ্য। এখন ব্যাংকে যা জমছে, তা পুরনো ঋণগ্রহীতাদের কিস্তি বা ঋণ পরিশোধের টাকা। সে টাকা পুনর্বিনিয়োগ না হলে ব্যাংক ব্যবসায়ও মন্দা দেখা দেবে। দেবে কেনো, দিতে শুরু করেছে। আর এই অবস্থা চলতে থাকলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা যেমন গড়ে উঠবে না, তেমনি পুরনো শিল্প-কারখানাগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান হবে না, বরং পুরনো কর্মীদেরই বাদ দিয়ে ব্যবসায় গুটিয়ে আনতে হবে। তাহলে দেশে কর্মসংস্থানের কী হবে?

এদিকে সরকার নিজেই নিজেদের করিৎকর্মা দেখাতে ক্ষমতায় এসেই হকার ও হাটবাজার উচ্ছেদ করে লাখ লাখ লোককে কর্মহীন করে ফেলে। ফলে এই মধ্যবিত্ত লোকেরা নিম্নবিত্তে নেমে গেছে। মানুষের আয়-রোজগারের পথ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। তার ওপর দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় বেড়ে যাওয়ার ফলে কোটি কোটি মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। আর এর অপরিহার্য পরিণতিতে সারাদেশে আইনশৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। কোনো কিছুর দোহাই দিয়েই এ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো যাচ্ছে না।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সরকার আমদানি বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করতে অভয় দিয়েছেন বারবার। কিন্তু সে আশ্বাসে কোনো ফল হয়নি। প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, সেপ্টেম্বরের পর আর কোনো কথিত 'দুর্নীতিবাজের' তালিকা প্রকাশ করা

www.pathagar.com

হবে না। ব্যবসায়ীরা যেন সরকারের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে এবং নির্ভয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়ে যান। কিন্তু এই অক্টোবরে শোনা গেল ভিন্ন খবর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৪৮ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। এদেরও প্রায় সবাই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। তাহলে এরা সরকারের ওপর আস্থা রাখবেন কেমন করে?

দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়া মোকাবেলায় এক উপদেষ্টা চরম এক পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কম খেতে। এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানি আর পেটের এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। বিদ্যুৎ সঙ্কট সম্পর্কে আর এক উপদেষ্টা প্রায় একই রকম বক্তব্য দিয়েছেন। তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের নানা দোষারোপ করে নিজেরাও বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেননি। পারবেন যে, এমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। উপদেষ্টা বলেছেন, এ বছরের শেষ নাগাদ বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। কেমন করে? তা তিনি বলেননি। তবে বছরের শেষটা শীতকাল। শীতকালে বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকবে। ফলে সঙ্কট এতটা প্রকট হবে না। কী সহজ সমাধান!

সরকারকে একটা বিষয় স্পষ্ট করে বুঝতে হবে, দুর্নীতি কখনো নির্মূল করা যায় না; সে চেষ্টা করাও বৃথা। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সে চেষ্টাই করা উচিত। সরকার যদি জানেই যে, অমুক অত টাকার কর ফাঁকি দিয়েছে, তাহলে তাকে গিয়ে কাগজপত্র দেখিয়ে বললেই হতো, তিনি সে কর দিয়েও দিতেন এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যও ঠিকমতো চলত। দেশের এত বিপুল ও বিরাট ক্ষতি হয়ে যেত না। এর জন্য সংবাদপত্রে এত ঢাকঢোল পেটানোরও দরকার ছিল না। এভাবে তো সরকার ৭ শতাধিক কোটি টাকা পেয়েছেও। কিন্তু কাদের কাছ থেকে সে টাকা পাওয়া গেল, সরকার তা প্রকাশ করেনি। বেশ, সে ব্যবস্থা সবার জন্য করা গেল না কেন?

সেখানে ষড়যন্ত্রের আভাস মেলে। প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম, বাংলাদেশে অর্থনীতির যে বিকাশ ঘটিয়েছেন আমাদের নবপ্রজন্মের উদ্যোক্তারা, তা বিস্ময়কর। পৃথিবীর অনেক পণ্ডিত বলেছিলেন, কোটা পদ্ধতি উঠে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প। কিন্তু বাংলাদেশের মেধাবী, সৃষ্টিশীল ও সৎ ব্যবসায়ীরা সে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ প্রমাণ করে দিয়ে এ শিল্পকে আরো প্রসারিত করেছেন। প্রতিযোগিতায় অন্যদের হারিয়ে দিয়ে শিল্প বিকাশের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এ ঘটনা অন্য অনেক শিল্পেই ঘটেছে। কিন্তু 'দুর্নীতিবাজ' বলে যদি এদের তাড়া করা হয়, সামাজিক সম্মান বিনাশ করা হয়, তাতে শিল্প বিকাশের এ ধারা ব্যাহত হতে বাধ্য। তৈরি পোশাক শিল্পেও রফতানি কমছে। গত এক মাসেই কমেছে ২৩ শতাংশ। ক্রেতারা নানা শর্ত জুড়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। গত এক বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দুই শতাংশ কমেছে, আর রফতানির অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের প্রবৃদ্ধি দুই শতাংশ বেড়েছে। এটা কি নিতান্তই কাকতালীয়? বাংলাদেশে শিল্প বিকাশের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করার দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র চলছে। এরা চায়, বাংলাদেশ তাদের দেশ থেকে শুধু পণ্যই কিনবে, তার পণ্য উৎপাদন করার

www.pathagar.com

দরকার নেই। সে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই সরকার প্ররোচিত হতে যাচ্ছে না তো? তাহলে সরকারের ভুল সিদ্ধান্তে আমাদের প্রতিযোগীরাই লাভবান হবে; হচ্ছেও তাই।

যখন এসব ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসা দরকার, তখন আবার আসছে ট্রুথ কমিশন। প্রথমে বলা হলো, এর সুবিধা শুধু ব্যবসায়ীরা পাবেন। ব্যবসায়ীরা যতটুকু দুর্নীতি করেছেন বা কর ফাঁকি দিয়েছেন, সেটা দিয়ে দিলে তাদের আর জেল-জুলুম ভোগ করতে হবে না। প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু শুধু ব্যবসায়ীরা কেন? এ প্রশ্ন যখন উঠল, তখন বলা হলো, রাজনীতিবিদরাও পাবেন সে সুবিধা। ভালো। ব্যবসায়ীরা এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমিও স্বাগত জানাই। ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রেই পর্দার আড়ালে থাকেন। তাদের পণ্যের নাম লোকে যত জানে, তাদের ততটা চেনে না। আর নাম প্রকাশ না করলে, তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করলে, তারা এগিয়ে আসবেও। কিন্তু রাজনীতিবিদরা? তারা কি জনসমক্ষে ঘোষণা দেবেন যে, তিনি অত টাকার দুর্নীতি করেছিলেন, সেটা সরকারকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার রাজনীতিতে এলেন? পারলে ভালো। না পারলে ন্যায়-বিচারে যা হওয়ার হবে।

আমাদের বক্তব্য, এ সিদ্ধান্তও অতি দ্রুত নিয়ে দ্রুত বাস্তবায়ন করুন। অমুকে দুর্নীতি করেছে, বলা যত সহজ, সেটা প্রমাণ করা তত সহজ নয়। প্রমাণিত হলে সাজা পায়। কিন্তু প্রমাণিত না হলে তাকে যেনো জেলে পুরে রাখা না হয়। কারণ, সব অ্যাকশনেরই একটা রিঅ্যাকশন আছে। সে ধাক্কাও কম শক্তিশালী হয় না।

রাজনীতি রাজনীতিবিদরাই করবেন। তাদের শুদ্ধতা ও সততা প্রয়োজন। কিন্তু সে শুদ্ধতা ও সততা একদিনে আসে না। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আসে।

কিন্তু উপদেষ্টাদের কেউই যে সম্পত্তির হিসাব দিলেন না? তারা আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে কত সম্পদ ভোগ করছেন আর সারা জীবনে কতটা আয় করছেন, তার হিসাব দিয়ে তার পর অন্যদের সম্পদের হিসাব চাইলে সেটা অনেক বেশি যৌক্তিক হতো!

১২.১০.২০০৭

www.pathagar.com

নেমে যাচ্ছি পিছিয়ে পড়াদের দলে

এমন চিত্র তো এ দেশের ছিল না। গত ১৫ বছর ধরে এ দেশের মানুষের যা কিছু অর্জন, তা ছিল বিস্ময়কর। কিন্তু গত ৯ মাসে এমন কী ঘটল যে, সবকিছু একেবারে পেছনের দিকে রওনা হলো। শুধুই নেতির ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল। এ কথা সত্য মানি, প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষিত ২২ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারত না। আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা যে হত্যা, ধ্বংস আর দেশঘাতী রাজনীতি শুরু করেছিল তাতে দেশের অবস্থা আরো খারাপ হতে পারত। ফলে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন দিয়ে নির্বাচন করা যায়নি। এ ক্ষেত্রে যুক্তির পথে অগ্রসর হয়নি, কোনো যুক্তি মানতে চায়নি আওয়ামী মহাজোট। 'বিচার মানি, তালগাছ আমার'– এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রতিদিন নতুন নতুন দাবি উত্থাপন করে কার্যত এক অরাজক পরিবেশই এরা সৃষ্টি করেছিল। সে পরিস্থিতির অবসানের জন্যই জরুরি অবস্থা এলো। আর জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে যে ১১ জন ক্ষমতায় এলেন, এরা কারো কাছেই চেনা মানুষ নন। তাদের অতীত বর্তমান সম্পর্কে জনগণের কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু সবারই আশা ছিল, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা করা দরকার, এরা সেটুকুই করবেন। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন উপহার দিয়ে এরা আগেও যেমন অন্তরালে ছিলেন, তেমনি অন্তরালেই চলে যাবেন। কিন্তু তা হয়নি, এরা সারাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা এলোমেলো করে দিলেন। এটা তো কেউ আশা করেনি। এটা তো তাদের কাছে কেউ দাবি করেনি। তারা দেশের রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী সবাইকে দুর্নীতিবাজ বলে ধরে ধরে জেলে পুরে দুর্নীতিমুক্ত এক ইউটোপীয় সমাজ গঠনের জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। পরিস্থিতি শেষে এমন দাঁড়াল যে, যার টাকা আছে, সেই দুর্নীতিবাজ।

অনুমান করা যায়, এখন যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, তারা সবাই সুনীতির ধারক-বাহক। ফলে দেশের তো শনৈঃ শনৈ উন্নতি হওয়ার কথা। আগে যেখানে

www.pathagar.com

'দুর্নীতিবাজ'দের আমলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল বছরে প্রায় ৭ শতাংশ, এখন তা বেড়ে ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। দেশ 'দুর্নীতিবাজ'দের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার হওয়ার কথা। উৎপাদন রফতানি দ্রুত বেড়ে যাওয়ার কথা। দেশে ব্যাপক হারে শিল্পায়ন হওয়ার কথা। কর্মসংস্থানের হিড়িক লেগে যাওয়ার কথা। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে দেশ সয়লাব হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোথায়ও থেকে সে ধরনের কোনো সুসংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

এসব কথার জবাব কেউ দিতে পারবেন না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় যারা যুক্ত আছেন, এরা তাদের সাফল্য প্রমাণের জন্য যেসব কথা বলেন, তাতে দ্রব্যমূল্যের চাপে নাভিশ্বাস ওঠা সাধারণ মানুষ না হাসবে, না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। এরা তাদের সাফল্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে আগে একটি জাহাজের মাল খালাস করে যেতে ১৩ দিন লাগত, এখন সেখানে লাগে তিন দিন। বন্দরের ব্যয় কমেছে, দক্ষতা বেড়েছে। একটা সাফল্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদেশে পাচার হওয়া ১২ কোটি ৯০ লাখ ডলার ফিরিয়ে এনেছে। আরো আনবে। আর একটা সাফল্য। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ২ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট থেকে ৪ হাজার মেগাওয়াট হয়েছে। (হয়েছে তো? আমরা গ্রাহকরা খুব একটা বুঝতে পারছি না) এটা একটা সাফল্য। দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীন হয়েছে। তারা গত ছয় মাসে ২৮ জনকে বিচারের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করেছে ও ৭৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। এটাও একটা বিরাট সাফল্য। এ ছাড়া আরো সাফল্য আছে। তা হলো গত ৯ মাসে সরকার প্রায় ৩ লাখ লোককে গ্রেফতার করে জেলে পুরেছে। এটাও কম বড় সাফল্য নয়।

কিন্তু এর কোনো 'সাফল্য'ই সাধারণ মানুষের কল্যাণে আসছে না। হকার উচ্ছেদ, হাটবাজার উচ্ছেদের মাধ্যমে সরকার লাখ লাখ মানুষকে বেকার করে দিয়েছে। লাখ লাখ পরিবার অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে। তাদের আয়-রোজগার কমে গেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে তিন দিনের মধ্যে জাহাজের মাল খালাস হয়েছে কি না, তাতে তাদের উদরপূর্তির কোনো সুরাহা হবে না। হচ্ছেও না।

এত সাফল্যের মধ্যেও একের পর এক শুধু দুঃসংবাদই তৈরি হচ্ছে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়ে। কৃষিতে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, শিল্পে উৎপাদন খরচ বেড়েছে। ফলে কৃষি-শিল্প পণ্যের দাম বাড়তে বাধ্য। বেড়েছে। মানুষের আয় যদি সমানতালে বাড়িয়ে দেয়া

www.pathagar.com

যেত, তা এই দাম বেড়ে ওঠা তাদের স্পর্শ করত না। কিন্তু আয় তাদের কমেছে। আমদানি কম হওয়ায়ও পণ্যের দাম বেড়েছে। আমদানি কেন কম হলো? ব্যবসায়ীরা বলেছেন, আমদানি করতে গেলে যদি সরকারের চার-পাঁচটা সংস্থা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, টাকা কোথায় পেলে আমদানির; কোথা থেকে এলো টাকা, এ টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কি না, তাহলে তারা আমদানি করবে কেন? আমদানি কমলে বন্দরে জাহাজজট থাকবে না, ১৩ দিনের জাহাজ তিন দিনেই খালাস হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। ফলে সরকার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনী দিয়ে খুচরা বাজার খাড়া করা হয়েছে। এরা সেমিপাকা ঘর তুলে দোকান সাজিয়ে বসেছেন। সেখানে ন্যায্যমূল্য। কিন্তু সেই সরবরাহ ব্যবস্থা কিছুতেই আমদানিকারকদের সরবরাহের বিকল্প হতে পারে না। পারেওনি। ফলে বাজারে যে হাহাকার তা দূর করা সম্ভব হয়নি। সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় সময়ে সময়ে ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছে, নির্ভয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য করুন, কিন্তু তারপরই দেখা গেছে, ব্যবসায়ীদের তাড়া করার জন্য নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে আরো ঘাবড়ে গেছেন এরা। ফলে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এখনো আতঙ্কের মধ্যে আছেন প্রায় প্রতিটি ব্যবসায়ী।

বিগত এক মাসেই তৈরি পোশাক শিল্পে রফতানি কমেছে ২৩ শতাংশ। যে শিল্প কোটামুক্ত বিশ্বে প্রতিযোগিতা করে টিকে থেকেছে এবং বাজার সম্প্রসারণ করেছে, সে শিল্পের ওপর বিদেশী ক্রেতারা এই সুনীতির সরকারের আমলে কেনো আস্থা রাখতে পারছে না? তারা কেন যাচ্ছে অন্যত্র পণ্য খুঁজতে? এর পেছনে কাজ করছে দেশের বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতি। কারণ, তারা মনে করছে, বাংলাদেশের যে অনিশ্চিত অবস্থা, তাতে বাংলাদেশ যথাসময়ে পোশাক সরবরাহ করতে পারবে তো? সেটা যদি না পারে, তাহলে ক্রেতাদেরও ব্যবসায় মার খায়। এরা অন্যত্র নিশ্চিত বাজার খুঁজলে দোষের কী আছে? কিন্তু এই শিল্পে এখন কাজ করছে ২২ লাখেরও বেশি শ্রমিক। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, রফতানি কমায় অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার হচ্ছে পোশাক শিল্পের শ্রমিক। কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন। যে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার কোনো চিন্তাভাবনা সরকারের আছে বলে মনে হয় না।

পত্রপত্রিকার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকে অলস পড়ে আছে হাজার হাজার কোটি টাকা। শিল্পপতিরা ঋণ নিয়ে আনছে না ভারী যন্ত্রপাতি। ব্যবসায়ীরা ঋণ নিচ্ছে না।

www.pathagar.com

তাহলে এই টাকা দিয়ে কী করবে ব্যাংকগুলো? এরা আমানতকারীদের সুদই বা দেবে কোত্থেকে? এখানেই সেই আস্থার সঙ্কট। সরকারকে কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। আজ সরকার যে কথা বলছে, কাল সে কথা রাখবে তো? নাকি কাল কোনো উল্টো কথা বলবে? ফলে বিনিয়োগ হচ্ছে না। বিনিয়োগ না হলে উৎপাদন নেই, কর্মসংস্থান নেই। প্রতিদিন বেকারের খাতায় যুক্ত হবে নতুন করে হাজার হাজার নাম।

এই সরকার যে শুধু দেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থাই হারিয়েছে তা নয়, বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও এ সরকারের ওপর ভরসা করতে পারছে না। সেটাই প্রকাশিত হয়েছে ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত আঙ্কটাডের বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্ট ২০০৭-এ। ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আঙ্কটাড) প্রকাশিত ওই রিপোর্টে বর্তমান দুর্নীতিহীন সরকারের আমলে বাংলাদেশের অবস্থা আরো নাজুক হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশেও বিনিয়োগ বেড়ে ছিল গত জোট সরকারের আমলে প্রতি বছর। কিন্তু এই সরকারের আমলে গত বছরের তুলনায় বিনিয়োগ কমেছে ৩০ শতাংশেরও বেশি। আর বিদেশী বিনিয়োগ কমে গেছে ৬ শতাংশ। কেন এমন হলো? বিনিয়োগ বোর্ড প্রধানও বলেছেন, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। হ্যাঁ, আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। যে আস্থা কথিত 'দুর্নীতিবাজ' সরকারের আমলেও ছিল, সে আস্থা দুর্নীতিবাজ সরকারের সময় নষ্ট হবে কেন?

এর দায়িত্ব তো বর্তমান সরকারকে নিতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ জাতিসঙ্ঘে গিয়ে ভাষণ দিয়ে এলেন যে, বাংলাদেশ এক মহাদুর্নীতির দেশ। গত ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গত দুই দশকে বাংলাদেশে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক দুর্বৃত্তায়নের কারণে গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা না থাকায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। গণতন্ত্রকে অবাধ ও টেকসই করার লক্ষ্যে রাজনীতিকে দুর্নীতি ও সহিংসতামুক্ত করতে হবে।'

নিজের দেশ সম্পর্কে এমন আত্মঘাতী ভাষণ এর আগে জাতিসঙ্ঘে আর কোনো সরকারপ্রধান দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। দুর্নীতির এক হাওয়াই ধারণার ওপর ভর করে জাতিসঙ্ঘে দাঁড়িয়ে সরকারপ্রধান এমন কথা বললে সে দেশে বিনিয়োগপ্রবাহ তো কমবেই। তার দায়িত্ব কারাবন্দী কথিত 'দুর্নীতিবাজ' রাজনীতিকরা নেবেন, না তার দায়িত্ব ফখরুদ্দীন সাহেব নেবেন?

www.pathagar.com

বর্তমান সরকারের আমলে বেকারত্ব বেড়েছে, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, উৎপাদন খরচ বেড়েছে, বিদেশীদের খবরদারি বেড়েছে, সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশী হত্যা বেড়েছে, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে, ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বেড়েছে, গ্রেফতার বেড়েছে, লোডশেডিং বেড়েছে, জ্বালানির দাম বেড়েছে। কমেছে প্রবৃদ্ধির হার, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ আর দেশী-বিদেশীদের আস্থা। মালয়েশিয়ায় ২ লাখ বাংলাদেশী নিয়োগের সোনালি সম্ভাবনা কমেছে। যা কমেনি তা হলো দুর্নীতি। বিদেশী অর্থে পরিচালিত টিআইবি নামক প্রতিষ্ঠানের হাওয়াই ও ধারণাভিত্তিক রিপোর্টের ওপর ভর করে বাংলাদেশ সেরা দুর্নীতিবাজ আখ্যা দেয়া হয়েছে। সে প্রতিষ্ঠানের হিসাব অনুযায়ীই ২০০৩ সালে বাংলাদেশ দুর্নীতির সূচকে পেয়েছিল ১.৩ নম্বর। ২০০৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৫ নম্বর। অর্থাৎ দুর্নীতি পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ২০০৫ সালে তা দাঁড়ায় ১.৭-এ। অর্থাৎ দুর্নীতি আরো কিছু কমেছে। ২০০৬ সালে তা দাঁড়ায় ২.০-এ। অর্থাৎ দুর্নীতি আরো কমেছে। আর দুর্নীতির এই মাত্রা কমাতে পেরেছিল কথিত 'দুর্নীতিবাজ' সরকারই। কিন্তু ২০০৭ সালে দেখা গেল সূচক ২.০তেই আছে। অর্থাৎ বর্তমান দুর্নীতিবাজ সরকারের সময় দুর্নীতি পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি।

আসলে কতগুলো লোকের দূরদৃষ্টিহীন বোলচালে আর হটকারী সিদ্ধান্তে আমরা শুধুই নেমে যাচ্ছি পিছিয়ে পড়াদের দলে। নিশ্চয়ই জনগণ এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে নেবে।

১৯.১০.২০০৭

www.pathagar.com

২৮ অক্টোবর : বর্বরতার একটি দিন

আজ ২৮ অক্টোবর। সুসভ্য, গৌরবমণ্ডিত, স্বাধীনচেতা বাংলাদেশী মানুষের জন্য বিশাল কলঙ্কের কালিমালিপ্ত এক দিন। ২০০৬ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো ঢাকার রাজপথে যে নরমেধযজ্ঞ পরিচালনা করেছিল পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে সে নরহত্যার দৃশ্য প্রায় পুরোটাই দেখানো হয়েছে ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সে দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছে দেশের সব শ্রেণীর মানুষ। মায়েরা অশ্রুসজল নয়নে শিশুদের চোখ চেপে ধরেছেন। বিবেকবান মানুষেরা হায় হায় করে উঠেছেন। আর সারা পৃথিবীর মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেছে– এও সম্ভব কোনো সভ্য দেশে শত শত ভিডিও ও স্টিল ক্যামেরা, হাজার হাজার মানুষের সামনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তার খুনি বাহিনী পল্টন মোড়ে প্রকাশ্য রাজপথে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে কয়েকজন নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের খুনিরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে পালিয়েও যায়নি। তারা সেই লাশের ওপর উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে উল্লাস করেছে। হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টায় মানুষের অর্জিত সভ্যতার প্রতি সে কি বিদ্রূপ। মানবিকতার সে কী অপমান। বর্বরতার সে কী হৃদয়বিদারক উদাহরণ।

আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের মদদে অনুষ্ঠিত সেই নরহত্যার উল্লাস দেখে যখন আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল সারা দেশের মানুষ, যখন সারাদেশে বইছিল নিন্দা আর প্রতিবাদের ঝড়, তখনো এই নরহত্যাকে যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলেন শেখ হাসিনা ও তার দোসররা। তারা বললেন, যে তরুণকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হলো, যার লাশের ওপর উঠে উল্লাস প্রকাশ করল আওয়ামী নেতাকর্মীরা, সে না কি পিস্তল দিয়ে গুলি করছিল আওয়ামী লীগের মিছিলের ওপর। কিন্তু সেও ছিল নির্জলা ডাহা মিথ্যা কথা। বিভিন্ন টেলিভিশন ক্যামেরার ভিডিও চিত্রে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। নিরীহ সে যুবক হেঁটে আসছিল নিরস্ত্র। অনেকটা দর্শকের মতো, কী ঘটছে সেটা দেখাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সে কাউকে কটাক্ষ করেনি, কোনো শ্লোগান দেয়নি, কিংবা সে কোনো মিছিলেও ছিল না। এ সময় হঠাৎ করেই শেখ

www.pathagar.com

হাসিনার লগি-বৈঠাধারী কর্মীরা রা রা করে এগিয়ে এসে হাজার হাজার মানুষের সামনে তাকে পিটাতে শুরু করল। সে পড়ে গেল মাটিতে। পিটুনি চলতে থাকল। এর মধ্যেই সে উঠে দাঁড়াল একবার। আবারো লগি-বৈঠার আঘাতে সে পড়ে গেল। পিটানো অব্যাহত রাখল খুনিরা এবং মৃত্যু নিশ্চিত হলে তার লাশের ওপর উঠে হত্যাকারীরা নাচতে শুরু করল। ভিডিও ক্যামেরা আর স্থির চিত্র গ্রাহকরা সে ছবি তুললেন। পরোয়া করেনি খুনিরা। একাধিক টিভি চ্যানেল যে দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচারও করেছে। একজন রিপোর্টার এ ঘটনার ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে আতঙ্কে বেদনায় কেঁদে ফেলেছিলেন। বলছিলেন, ১৪ দলীয় জোটের কর্মীরা যেভাবে লোকটাকে পিটিয়ে হত্যা করল, তাতে মনে হলো যেন তারা সাপ মারছে পিটিয়ে।

আর গুলি? ভিডিও ফুটেজেও দেখা গেল, আওয়ামী লগি-বৈঠার মিছিলের মাঝে পিস্তল হাতে এগিয়ে যাচ্ছে এক খুনি। সে গিয়ে প্রতিপক্ষের মিছিলে গুলি করে আবার পিছিয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পর একইভাবে সামনে এগিয়ে গিয়ে গুলি চালাল সে খুনি। এই খুনিদের পক্ষেই দাঁড়ালেন শেখ হাসিনা। তাদের সমর্থন করলেন, তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। সে অপচেষ্টা মিথ্যা কল্পকাহিনী বলতে তার একটুও বাধেনি। একটুও কেঁপে ওঠেনি তার কণ্ঠস্বর।

২৮ অক্টোবরের সেই কলঙ্কজনক ঘটনার আজ এক বছর পূর্ণ হলো। আওয়ামী হত্যা উল্লাসে যেসব মায়ের বুক খালি হয়েছে তাদের মার আহাজারি হাহাকারে আবারো বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, আবারো এই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষের মনে ধিক্কার উঠেছে। কিন্তু কেন রাজনীতির নামে আওয়ামী লীগের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ? এর মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাইল আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা? সে বিষয়টি এখনো পর্যালোচনার দাবি রাখে।

এ কথা মানি, ২৮ অক্টোবরের পর অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ তার নষ্ট ও নরঘাতী রাজনীতির জন্য একেবারে কোনো খেসারত দিচ্ছে না তাও নয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের রাজনীতির ধারাবাহিকতা এই জোরজবরদস্তি, বল প্রয়োগ হুমকি হত্যারই রাজনীতি। ইতিহাসের কোনো পর্যায় থেকে কোনো উত্থান-পতন থেকেই আওয়ামী লীগ কখনো শিক্ষা নেয়নি। ফলে জোর করে দখলে নেয়ার প্রবৃত্তি থেকে তারা কখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি।

স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবের শাসনকাল থেকেই এই জবরদস্তির রাজনীতি শুরু। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমানকে ফোলানোর জন্য 'মুজিববাদ' নামের এক অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার শুরু করেন আওয়ামী নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, 'মহান মার্কিন নেতা আব্রাহাম লিঙ্কন জনগণকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু সমাজতন্ত্র দিতে পারেননি। জার্মান কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের প্রচার করেন, কিন্তু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিতে পারেননি। মুজিববাদের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিধৃত

www.pathagar.com

হয়েছে। সুতরাং এ হচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নানা ধরনের বাহিনীও তৈরি করেন। সরকারের রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন তো ছিলই, তার ওপর তারা লালবাহিনী, নীলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দিয়ে বিরোধী মতাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন চালাতে শুরু করেন। তারা ঘোষণা করেন, যারা এই মতবাদের বিরোধিতা করবেন, তাদের 'মুজিববাদের নিড়ানি দিয়ে উপড়ে ফেলা হবে।' মুজিববাদ না মেনে মেজর জলিল, আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র দল (জাসদ)। জাসদের ওপর শেখ মুজিব সরকারের বিভিন্ন নির্যাতনের ঘটনা এখনো মনে করলে গা শিউরে ওঠে। এ সময় আওয়ামী লীগের বি-টিম বলে নিন্দিত অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (মস্কোপন্থী ন্যাপ) পর্যন্ত এসব কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে বাধ্য হন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, কোনো কোনো দলের স্বেচ্ছাসেবক বা অন্যান্য বাহিনী বেআইনি কার্যকলাপ ও নানা রকম দুষ্কর্মে লিপ্ত রয়েছে। ক্ষমতাসীন দল ও তার সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িত এসব বাহিনী দলীয় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখছে না। তারা সরকারি প্রশাসনে হস্তক্ষেপ, কোথায়ও আবার সান্ধ্য আইন জারি করে তল্লাশি চালায়। আদালত প্রতিষ্ঠা করে বিচার প্রহসন, নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার ও জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি পুলিশ ও প্রশাসনব্যবস্থা উপরোল্লিখিত বেআইনি কার্যকলাপের সামনে রহস্যজনকভাবে নিশ্চুপ রয়েছে।

এ তো কেবল শুরু। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী সরকারি-বেসরকারি বাহিনীর নির্যাতন এখনো লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বিরোধী দলকে, বিরোধী মতাবলম্বীদের দমন-পীড়নের এমন উদাহরণ সাম্প্রতিক ইতিহাসে কমই আছে। (বিস্তারিত দেখুন এই লেখকের বই 'কথামালার রাজনীতি ১৯৭২-৭৯)। কিন্তু জনমত কি স্তব্ধ করা গেছে? স্তব্দ করার জন্য সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হলো, জারি রইল শুধু শেখ মুজিবের দল বাকশাল। বন্ধ করে দেয়া হলো সব সংবাদপত্র। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হলো। বিচার বিভাগ শেখ মুজিবের পদানত করা হলো। না, বিরোধিতা চলবে না। শেখ মুজিবের কথা মতোই সবাইকে উঠবস করতে হবে। তাতেও শেখ মুজিবের শেষ রক্ষা হয়নি। তাকে অত্যন্ত করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা থেকে কোনোই শিক্ষা নেয়নি। আর সে কারণেই ১৯৭৫ সালের পর ২১ বছর তারা আর কোনোদিন ক্ষমতায় যেতে পারেনি।

১৯৯৬ সালে মাথায় হিজাব পরে জায়নামাজের ওপর বসে তসবিহ হাতে শেখ হাসিনা করজোড়ে জনগণের কাছে আবেদন করেছিলেন, শুধু আর একটিবারের জন্য জনগণ যেন তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ করে দেন। শুধু একটিবার। পিতা-মাতা ভাইদের

www.pathagar.com

হারিয়ে তিনি নিঃস্ব। তাই শুধু একটিবারের জন্য জনগণ যেন তাকে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ করে দেন। জনগণ সম্ভবত শেখ হাসিনার সে আর্তিতে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় গিয়েছিল আওয়ামী লীগ। আর ক্ষমতায় গিয়েই ধারণ করেছিল তাদের চিরাচরিত রুদ্ররূপ। আবারো মত্ত হয়ে উঠেছিল জমি দখল, বাড়ি দখল, লুটপাট আর নির্যাতনের মহোৎসবে। তৈরি করা হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের বেআইনি বাহিনী। গণনির্যাতনে সেসব বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল আওয়ামী লীগের খুনি ক্যাডাররাও। তারও যা অনিবার্য পরিণতি হওয়ার কথা, তাই হয়েছে। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ। ভরাডুবি হয়েছে তাদের।

২০০১ সালের নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আওয়ামী লীগ ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। তারা সরকারকে নাজেহাল করার জন্য একের পর এক রাষ্ট্রঘাতী কর্মসূচি নিতে শুরু করে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর জোট সরকারের শাসনকালে আওয়ামী লীগ প্রায় এক বছর হরতাল কর্মসূচি পালন করতে থাকে। যদিও ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গেলেও আর কোনো দিন হরতাল করবে না। কিন্তু বিরোধী দলে যাওয়ার পর সে কথা তারা রাখেননি। আর এই রাষ্ট্রঘাতী, অর্থনীতিঘাতী কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাধারণ মানুষের ওপর আওয়ামী লীগের নির্যাতনের কাহিনী এখনো পুরানো হয়ে যায়নি। কথায় কথায় হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও আওয়ামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এসব কর্মসূচি পালনে জনগণকে বাধ্য করার জন্য হেন অপকর্ম নেই, যা আওয়ামী লীগ করেনি। সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির পথ বন্ধ করেছে, রফতানি বন্ধ করেছে, উৎপাদন বন্ধ করেছে, কলকারখানা জ্বালিয়ে দিতে আওয়ামী নেতারা ইন্ধন জুগিয়েছে। তাদের রাজনীতি শুধুই ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে এনেছে।

২০০৬ সালের বাতিল নির্বাচনের আগে, আওয়ামী লীগ স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিল, নির্বাচনে জনগণের ভোটে তার সরকার গঠনের সম্ভাবনা নেই। বিরোধী দলে থেকেও পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে জনগণের ওপর তারা যে নির্যাতন করেছে, জনগণই ভোটের মাধ্যমে তার প্রতিশোধ নেবে। তা হলে ক্ষমতায় যাওয়ার উপায় কী? উপায় জবরদস্তি, বল প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাসী, মাস্তান, খুনি বাহিনীর ব্যবহার। ১৯৯৬ সালে ধর্মের লেবাস পরে জনগণকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছিল। ২০০৬ সালে যে তা সম্ভব হবে না, সেটা উপলব্ধি করেছিল আওয়ামী লীগ। ফলে তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে।

সে কৌশলের অংশ হিসেবে গত বছর সেপ্টেম্বর থেকেই তারা দেশব্যাপী হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি দিতে শুরু করে। বন্ধ করে দেয় বন্দর। অচল করে দেয় জনজীবন, বন্ধ করে দেয় কলকারখানা। বাসে গান পাউডার দিয়ে আগুন ধরিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে মানুষ। বন্ধ করে দেয় মানুষের আয়-রোজগারের পথ। দূরপাল্লার যানবাহন

www.pathagar.com

চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে সাধারণ কৃষকের পচনশীল পণ্য ক্ষেতেই পচতে থাকে। নাভিশ্বাস ওঠে মানুষের। তারা একের পর এক দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে। এক দাবি পূরণ হয় তো নতুন দাবি নিয়ে মাঠে নামে। আর সে দাবি আদায়ে আলাপ-আলোচনা হয়, জবরদস্তির পথে এগোতে থাকে আওয়ামী লীগ। ১৯৯৬ সালে জনগণের কাছে কাতর আহ্বান করে। অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্ষমতায় গিয়েছিলেন তারা। কিন্তু সে পদ্ধতি কাজে দেবে না জেনে ২০০৬ সালে তারা জানান দেয়ার চেষ্টা করে যে, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় না বসালে কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। কী মাশুল গুনতে হবে জনগণকে! আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করলে যেন কাউকে জানে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। হুঁশিয়ার!

বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর। ২৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেন। কিন্তু তার আগে থেকেই আওয়ামী লীগ তাদের জবরদস্তির রাজনীতি চালু করে দেয়। লেলিয়ে দেয় তার ঘাতক বাহিনী। এরা চালু করে 'মানি না'র রাজনীতি। সংবিধান অনুযায়ী সদ্য অবসর নেয়া প্রধান বিচারপতিকে মানি না প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে। আপিল বিভাগের অবসর নেয়া বিচারপতিকে মানি না প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মানি না বিচারপতি এম এ আজিজকে। অমুককে মানি না নির্বাচন কমিশনার হিসেবে। অমুকদেরকে মানি না নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসেবে। মানি না, মানি না, মানি না। তাদের সব দাবি পূরণ করে দিতে হবে ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে। তাদের কথায় উঠতে হবে, বসতে হবে দেশের সব মানুষকে।

তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার আগেই এরা নানা দাবিতে প্রায় অচল করে দেয় দেশ। নামিয়ে দেয় তাদের ঘাতক বাহিনী। এরা ঘোষণা দেন তাদের দাবি না মানা হলে এরা বঙ্গভবনে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেবেন। এমনকি বন্ধ করে দেবেন সেখানে অক্সিজেনের সরবরাহ। তাদের সন্ত্রাসী, মাস্তান, খুনে বাহিনী যেন খোদার ওপর খোদগারি করার ক্ষমতা রাখে। যেন এরা আল্লাহর আসমানে প্রবাহিত বায়ুম ল থেকে অক্সিজেন পৃথক করে ফেলতে পারেন। কী সীমাহীন ঔদ্ধত্য, কী নষ্ট চেতনার দম্ভ!

তথাকথিত আন্দোলনের এই পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার ঘাতক বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান, এরা যেন ২৮ অক্টোবর হাতিয়ার হিসেবে লগি-বৈঠা নিয়ে এসে সমবেত হন। ঘেরাও করা হবে বঙ্গভবন। আর তাদের দাবি যারা সমর্থন করেন না, তাদের লাগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে শায়েস্তা করে দেয়া হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর এই ঘোষণার পর সুতারের দোকানগুলো বৈঠা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর তৈরি হয় লগি নামের বাঁশের কাঠের লাঠি। আওয়ামী লীগের ঘাতক বাহিনী

www.pathagar.com

অবস্থান নেয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে। বিএনপি অবস্থান নেয় নয়া পল্টন এলাকায় আর জামায়াতে ইসলামী অবস্থান নেয় পুরানা পল্টন এলাকায়। সদ্য ক্ষমতা ছেড়ে আসা বিএনপি ও জামায়াত নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই সেদিন রাজপথে অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের লাঠি-বৈঠার ভয়ে তারা যদি ঘরে থাকতেন, তা হলে হয়তো লগি-বৈঠাধারীরা ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের পিটিয়ে হত্যা করত। পুরানা পল্টন বা নয়া পল্টনে কোনো উসকানি ছিল না। কিন্তু লগি-বৈঠাধারীরা গুলিস্তান এলাকায় যাকে ইচ্ছা তাকেই তাড়া করছিল।

এ রকম একটা পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার নির্দেশে ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠাধারী খুনিরা পুরানা পল্টনে খুন করে ওই নিরীহ নিরস্ত্র তরুণকে। আওয়ামী লীগ জানিয়ে দিতে চাইল যে, জানে বাঁচতে চাইলে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিতে হবে। আওয়ামী লীগের কথামত চলতে হবে, তা না হলে কারো নিস্তার নেই।

এরপর আরো আড়াই মাস ধরে আওয়ামী লীগের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চলে সারাদেশে। তারপর আসে ১-১১'র পরিবর্তন। সে পরিবর্তন আওয়ামী লীগের জন্যও খুব একটা সুখকর হয়নি। ক্ষমতার গদি বরং আরো অনেকখানি দূরেই সরে গেছে। এ থেকেও যদি তারা কিছুটা শিক্ষা নেয়, তবে সেটা হবে তাদের জন্যই কল্যাণকর।

২৮.১০.২০০৭

www.pathagar.com

সাইফুর রহমান আর ফ্লাইং ডাচম্যানের গল্প

অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন রাজনীতি বোধহয় ছেড়েই দেবেন বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘকালের অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। সাম্প্রতিককালে খুব একটা দেখাও যাচ্ছিল না জনসমক্ষে। যাও বা দু-একবার দেখা গেছে তাও দেখা গেছে হুইল চেয়ারে। ক্লান্ত, বিষণ্ন। টিভি ক্যামেরাও ঢের হয়েছে তার জীবনে। সে লোভও তার নেই। ফলে আলোচনায় ছিলেন না তিনি। তবে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় আনার দাবিদার এক পত্রিকা অবিরাম সাইফুর রহমানের কুকীর্তির খবর প্রচার করেছে। বলা যায় করেই যাচ্ছে। ভাবখানা এমন যে, সাইফুর রহমানকে কেন গ্রেফতার করছে না বর্তমান অনির্বাচিত সরকার। সাইফুর রহমান সরকারের পয়সায় কোথায় রাস্তা করেছেন। সরকারি নার্সারি থেকে গাছের চারা নিয়ে নিজের জমিতে লাগিয়েছেন, কোনখানে একটা পুকুর করেছেন, সরকারি অর্থে সেতু বানিয়ে নিজে কেন নামফলক লাগিয়েছেন, তার বাড়িতে পাখি কেন পোষা হয়, এমনি ডজন ডজন রিপোর্ট ছেপেছে দুর্নীতিবাজ ওই পত্রিকা। জনগণ উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করেছে, কখন গ্রেফতার হন সাইফুর রহমান। কথিত দুর্নীতির অভিযোগে তার এক ছেলে কারাগারে, আরেক ছেলে পলাতক। এসব নিয়েও মিডিয়ার সামনে কখনো কথা বলেননি সাইফুর রহমান। এসব যন্ত্রণার মধ্যে প্রায় ৮০ বছর ছুঁই ছুঁই এই রাজনীতিক একবার অবসরে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ করে কী যে হলো, এই প্রবীণ রাজনীতিক বিএনপি'র গঠনতন্ত্রের ধার না ধেরেই নিজেই নিজেকে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বানিয়ে বসলেন। সাইফুর রহমানের বাসায় সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিএনপি'র স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক বসল। যদিও বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক ডাকার একমাত্র এখতিয়ার বিএনপি চেয়ারপারসনের, অন্য কারো নয়। কেউ সভা ডাকুন বা না ডাকুন, গত ২৯ অক্টোবর সাইফুর রহমানের বাসায় সমবেত হয়েছিলেন বিএনপি'র ১১ সদস্যবিশিষ্ট স্থায়ী কমিটির ছয় সদস্য। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত আবদুল মান্নান ভূঁইয়াও ছিলেন। আর ছিলেন সাইফুর রহমান, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ, তিনি আবার খালেদা জিয়ার উকিল হিসেবে লড়তে রাজি হননি, ড. আর এ গনি, এম শামসুল ইসলাম, বেগম খালেদা জিয়া কারাবন্দী হওয়ার মাত্র কিছু দিন আগে

www.pathagar.com

নিয়োজিত স্ট্যান্ডিং কমিটির নব্য সদস্য অব. লে. জে. মাহবুবুর রহমান সংস্কারপন্থী। উপস্থিত ছিলেন না গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়োজিত দলের মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ও আবদুল মতিন চৌধুরী। অন্য সদস্যরা অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কারাগারে। ফলে তারাও উপস্থিত ছিলেন না।

এ রহস্যজনক বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়েছে সাইফুর রহমানকে, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হয়েছেন সংস্কারপন্থী অবঃ মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক বহিষ্কৃত আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আশরাফ হোসেন ও সফিকুল হাসান তৃপ্তিকে পুনর্বহাল করা হলো। তবে আবদুল মান্নান ভূঁইয়া তার মহাসচিব পদ হারিয়েছেন। টিভিতে তার হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখে মনে হলো, এতে তিনি আহত হননি, ফলে শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়েছে। সংস্কারবাদীরাই এখন বিএনপি নিয়ন্ত্রণ করবেন। মাঝখানে বয়োবৃদ্ধ ক্লান্ত সাইফুর রহমান শুধু ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। ব্যস, এক দারুণ ব্যাপার! তবে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, 'বর্তমানে কারারুদ্ধ বিএনপি চেয়ারপারসন মুক্তিলাভের পর এ ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেবেন, স্থায়ী কমিটি সেটা একবাক্যে মেনে নেবে।'

বেগম খালেদা যদি কোনোদিন ফিরে আসতে পারেন, তবে তার কথা সবাই একবাক্যে মেনে নেবেন। বেগম খালেদা জিয়াকে সুনীতিবাজ সরকার আটক করেছে গ্যাটকো দুর্নীতি মামলায়। সে কাজ দেয়া হয়েছিল সাইফুর রহমানের ছেলেকে। তা হলে সেখানে যদি কোনো দুর্নীতি হয়ে থাকে, সাইফুর রহমান কি তা জানেন না? যদি ওখানে কোনো দুর্নীতি থেকে থাকে, তার সাথে কি সাইফুর রহমানের কোনো সম্পর্ক নেই? নাকি সাইফুর রহমানের পরামর্শেই এ কাজ দেয়া হয়েছিল তার ছেলেকে? সাইফুর রহমান কি ওই দায় থেকে বাইরে থাকতে পারবেন? সেটা থাকা কি তার নৈতিকভাবে উচিত? নিজের আত্মাকে কি সাইফুর রহমান প্রশ্ন করতে পারেন না?

সাইফুর রহমান গং ধরেই নিলেন বা তাদের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হলো যে, বেগম খালেদা জিয়া অবশ্যই সাজাপ্রাপ্ত হবেন এবং শিগগিরই জেল থেকে বের হতে পারবেন না। সুতরাং তার দলের 'ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন' হতে কোনো অসুবিধা নেই। আদালতে যেভাবে বিচার চলছে তাতে বেগম খালেদা জিয়ার ১০০ বছর কারাদণ্ড হলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। সুতরাং সারাদেশ সাইফুর রহমানকে করতালি দিয়ে বিএনপি'র 'মহান নেতা' হিসেবে মেনে নেবে এই ধারণা যদি তিনি পোষণ করে থাকেন, তবে মারাত্মক ভুল করেছেন। যারা তাকে এই কাজে প্ররোচিত করেছেন, তাদের ভুলও একসময় তারা বুঝতে পারবেন। বিএনপি বা আওয়ামী লীগ যেমন মনে করেছিল ক্ষমতা চিরস্থায়ী হবে, তেমন কিন্তু হয়নি। এখন যারা মনে করছেন, তারা চিরস্থায়ী, তারাও ভুল করছেন। সব বর্তমানকেই সাবেক হতে হয়। সাবেক হলে

www.pathagar.com

চামচিকাও ছাড়ে না। বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, তাদেরও বিষয়টা মনে রাখা খুব জরুরি।

সাইফুর রহমান যা করলেন, তার মানে হলো, বেগম খালেদা জিয়া বাদ, তিনিই বিএনপি'র চালিকাশক্তি। সত্যি কি সেটা সম্ভব? দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা ২০ বছর কারাগারে ছিলেন। সে সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিন যে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করেছিল, তাতে দেখানো হয়েছিল যে, ম্যান্ডেলা কারাগারে ঢুকেছিলেন নিতান্তই সামান্য একজন ছোটখাটো মানুষ হিসেবে, কিন্তু কারাগার থেকে বের হলেন এক বিশাল ব্যক্তি হিসেবে। সাইফুর রহমানের বোঝা উচিত ছিল যে, খালেদা জিয়া যদি কারাগারেও থাকেন, তা হলেও তিনি কেবলই বড় হতে থাকবেন। তাকে ছোট করা সম্ভব হবে না। এ কথা সত্য যে, বেগম খালেদা জিয়ার চেয়ে সাইফুর রহমানের বয়স অনেক বেশি, কিন্তু কী এক বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তিনি একেবারেই তুচ্ছ হয়ে গেলেন। অর্থাৎ বিএনপি থেকে খালেদা জিয়া বা জিয়া পরিবার বাদ এই ট্যাবলেট হজম করে ফেললেন সাইফুর রহমান। এখন তারা চাইছেন যে, নির্বাচন কমিশন যেন আলোচনায় তাদেরকেই ডাকে। বেগম খালেদা জিয়ার মনোনীত মহাসচিব যেন নির্বাচন কমিশনে আলোচনার জন্য যেতে না পারেন। অর্থাৎ খালেদা জিয়া তো বাদই, তার সাথে সংস্রব আছে, এরা সবাই বাদ। কী দারুণ ফর্মুলা। জনাব রহমানকে কি বিনীতভাবে একটা প্রশ্ন করা যায়, রাজিব গান্ধীর ছেলে রাহুল গান্ধী কেন ভারতে কংগ্রেস পার্টির মহাসচিব হলেন? কই গোটা ভারতে তো কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন তুলল না। আপনার ছেলে কেন এমপি হবে, কই, আমরা তো প্রশ্ন করিনি। তাহলে বেগম খালেদা জিয়া বা জিয়া পরিবারকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের রাজনীতি করবেন, এটা কেমন করে সম্ভব? অথচ রাতের অন্ধকারে সাইফুর রহমান তাই করতে গেলেন!

মান্নান ভূঁইয়া সাহেবরা বেগম খালেদা জিয়াকে মাইনাস করার জন্য এক আজগুবি ফর্মুলা বের করেছিলেন। সে ফর্মুলা অনুযায়ী কেউ দুই টার্মের বেশি পার্টির প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। মান্নান ভূঁইয়া সাহেবের হঠাৎ এমন দরকার পড়েছিল কেন, সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। কিন্তু সে ফর্মুলা নিয়ে তিনি ঘর থেকে বের হতে পারছিলেন না। পথ চলতে, ত্রাণ বিতরণ করতে, মাজার জিয়ারত করতে, তাকে পুলিশের সাহায্য নিতে হচ্ছিল। না হলে কর্মীদের রুদ্ররোষে পড়তে হতো তাকে। পড়েছিলেনও একবার। ফলে তিনি প্রায় শূন্য হয়ে যাচ্ছিলেন। আবার সরকারেরই বা হঠাৎ এমন প্রয়োজন হলো কেন যে, মান্নান ভূঁইয়াকে পুলিশি প্রহরায় বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়ে আনতে হবে। প্রশ্নগুলো আছে এবং এসব প্রশ্নের কোনো সুরাহা হয়নি।

সন্দেহ নেই, বিএনপিতে মান্নান ভূঁইয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিত লোক সাইফুর রহমান। প্রথম থেকেই আছেন। কিন্তু কখনো মনে হয়নি যে, তিনি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মতো ক্ষমতালোভী মানুষ। বি চৌধুরীর কি না হওয়ার খায়েশ ছিল। মন্ত্রী হবেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন, প্রেসিডেন্ট হবেন। সব তার খায়েশ। সে খায়েশ তিনি পূরণ করে ছেড়েছেন। বেগম খালেদা জিয়া তাকে সব কিছু হওয়ার ব্যবস্থা করে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পতাকার ভার বইতে পারেননি বি চৌধুরী। বিএনপি'র বিকল্প হিসেবে বিকল্প ধারা তৈরি করেছেন। অবঃ কর্নেল অলি আহমদের সাথে এলডিপি করেছেন। কিন্তু কোনোটাতেই শেষ পর্যন্ত জুৎ করতে পারেননি। নিজের বিকল্প ধারা শুধু তার আসনকেন্দ্রিক। আর অলি আহমদের সাথে তিনি থাকতে পারেননি। বোঝা গেল, বেগম খালেদা জিয়ার মতো একটি বড় দাতা থাকলে, তিনি রাজনীতি করতে পারেন, দাতা না থাকলে তার রাজনীতি অন্ধকারে মাথা কুটে মরতে বাধ্য। ফলে তিনি এখন ঐকমত্যের সরকারের আজগুবি ধুয়া তুলে নিজেই হারিয়ে যেতে বসেছেন। তার ঐকমত্যের ফর্মুলা কেউ গ্রহণ করেনি। কিন্তু সাইফুর রহমানের আচার-আচরণে কখনো মনে হয়নি যে, তিনি বিএনপিতে বেগম খালেদা জিয়ার বিকল্প হয়ে উঠতে চান। তাহলে হঠাৎ করেই তিনি তা চাইছেন কেন? এখন তিনি যে পথে গেলেন, সে পথ বিএনপি'র রাজনীতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পথ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতিকে দুর্বল করার পথ। অথচ তিনি জানেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়নের জন্য সঠিক পথ এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সে উন্নয়ন তারা করেছেনও।

সাইফুর রহমান বলেননি যে, বেগম খালেদা জিয়া স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ডেকে তাকে এই পরিবর্তন আনার কথা বলেছেন। বেগম খালেদা জিয়ার মতামত নেয়া বা তার সাথে দেখা করা দুঃসাধ্য কোনো কাজ ছিল না। সাইফুর রহমান যদি বুঝেই ছিলেন যে, দলে এই পরিবর্তন আনা দরকার, তাহলে নিজে দেখা করে বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে সে অনুমোদন আনতে পারতেন। তাহলে জনগণ তাকে ষড়যন্ত্রকারী ভাবত না। বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তার আইনজীবীরা দেখা করছেন, তার আত্মীয়স্বজন দেখা করছেন, তাহলে সাইফুর রহমানও দেখা করতে পারতেন। সে চেষ্টা তিনি করেছেন বলে কেউ শোনেনি এবং দেখা যায়, সে চেষ্টা তিনি করেননি। কারণ সাইফুর গং কর্তৃক নিয়োজিত নতুন মহাসচিব অবঃ মেজর হাফিজ বলেছেন, বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বেগম খালেদা জিয়া স্ট্যান্ডিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। মান্নান ভূঁইয়াও যেমন খালেদা জিয়া মাইনাস ফর্মুলা বের করেছিলেন, খালেদা জিয়ার সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ না করেই, তেমনিভাবে সাইফুর রহমান সাহেবও খালেদা জিয়া মাইনাস তত্ত্ব বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে এসেছেন। ভাবতে কিছুটা অবাক হতে হয় বৈকি। সোমবার দুপুর পর্যন্তও কেউ জানতেন না যে, বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি সভা বসবে সাইফুর রহমানের বাসায় আর সে বৈঠকে এমন গুরুত্বপূর্ণ হবে। সেই সাথে তাতে মান্নান ভূঁইয়ার ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপেরই জয় হবে। সাইফুর রহমানকে কেন এমন কাজে যেতে হলো, তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। যিনি নিজে হুইল চেয়ারে চলাচল করেন, তিনি খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে অসুস্থতার অভিযোগে অব্যাহতি দেন কিভাবে? সে ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণে তো তার নিজেরই নেতৃত্ব থেকে ১০০ হাত দূরে থাকার কথা। নিজে আচরি ধর্ম খোন্দকার দেলোয়ারকে শেখাতে পারতেন।

www.pathagar.com

তবু আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বিএনপি নিয়ে ষড়যন্ত্রের এখানেই শেষ নয়। সামনে আরো চমক আছে। ধারণা করা যায়, যেভাবে মান্নান ভূঁইয়া গং পরাভূত হয়েছেন, একইভাবে বর্তমান 'বিপ্লবী'রাও পরাভূত হবেন। এখন অপেক্ষার পালা।

শেষ করতে চাই ফ্লাইং ডাচম্যানের উপকথা দিয়ে। ফ্লাইং ডাচম্যান নেদারল্যান্ডের লোকগাথা। ফ্লাইং ডাচম্যান নামক এক জাহাজের নাবিক ছিলেন, ফ্যালকেনবার্গ। এই নাবিক শয়তানের সাথে তার আত্মা বাজি রেখে জুয়া খেলতে বসেছিলেন। সে বাজিতে হেরে যান ফ্যালকেনবার্গ। তার আত্মা চলে যায় শয়তানের দখলে। আর তারই কাফফারা হিসেবে এ জাহাজ অনন্তকাল ধরে সমুদ্রেই থাকবে, তীরে ভিড়তে পারবে না। জাহাজটি অবিরাম তীরে ভিড়ার চেষ্টা করছে শত শত বছর ধরে। শয়তানের ইচ্ছা অনুযায়ী এ জাহাজ কেয়ামত পর্যন্ত শুধুই দাঁড় বাইতে থাকবে। এখনো নাকি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সন্ধ্যার ভুতুড়ে অন্ধকারে সমুদ্রে দেখা যায় ফ্লাইং ডাচম্যান জাহাজ, তীরে আসার প্রাণান্ত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে।

শয়তানের কাছে মানুষের আত্মার সমর্পণে এর চেয়ে ভালো কোনো পরিণতি আশা করা যায় না।

০২.১১.২০০৭

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে নির্বাচন কমিশন

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ চলছে মাসাধিককাল ধরে। এই সংলাপ প্রক্রিয়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা যেসব বক্তব্য দিচ্ছেন, তা ক্রমেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কোনো কিছু তলিয়ে না দেখেই হাটুরে শ্লোগানের মতো 'যুদ্ধাপরাধীদের ঘৃণা করি', 'তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেয়া যায় না', 'সংবিধান সমুন্নত রাখার স্বার্থেই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হওয়া উচিত', প্রভৃতি বক্তব্য দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেকে দেশের রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে ফেলছেন। এসব বিতর্ক বিষয়ের অনেক কিছুই শেষ হয়ে গেছে বহু আগেই। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল খণ্ডিতভাবে সেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিচ্ছেন, যার সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সম্মুখযাত্রা বা বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোনো সম্পর্ক নেই। সেসব অযৌক্তিক বিতর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইতোমধ্যে পক্ষাবলম্বন করে তার নিরপেক্ষ অবস্থানকে নড়বড়ে করে ফেলেছেন।

শেখ মুজিব সরকারের আমলে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বলে আটককৃত ৩০ হাজার বন্দীকে ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। সে সময় প্রথমে যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ হাজার ১৫। পরে চূড়ান্ত তালিকায় ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাদের বিচার করা হয়নি। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠকে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সেই বিচারও রহিত করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয় : 'এ সম্পর্কে তিন মন্ত্রী উল্লেখ করেন, বিরোধ মীমাংসায় অটলভাবে কাজ করে যাওয়ার তিন দেশের অঙ্গীকারের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা হওয়া উচিত। মন্ত্রীরা আরো উল্লেখ করেন যে, স্বীকৃতিদানের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সফর

www.pathagar.com

করবেন এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে অতীতের ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমা ও ভুলে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে তিনি চান যে, জনগণ অতীত ভুলে যাবে ও নতুন করে শুরু করবে এবং বাংলাদেশের জনগণ জানে, কী করে ক্ষমা করতে হয়।'

ওই চুক্তির ১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে : 'পরিহার করার মনোভাবের আলোকে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অতীতকে ক্ষমা ও বিস্মৃত হওয়ার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার অনুকম্পা হিসেবে বিচার কাজ না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, দিল্লি চুক্তির শর্তাধীনে পাকিস্তানে যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণের যে কাজ চলছে, তাদের সাথে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকেও প্রত্যর্পণ করা যেতে পারে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন শেখ মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। তিনিও এখন নতুন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাইছেন। অর্থাৎ এখন যাকে খুশি তাকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা দিয়ে তার বিচার করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো তো কত কথাই বলে। বলুক। কিন্তু সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত, নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালনকারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন তাদের সুরে বগল বাজাতে শুরু করেন, তখন তাকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়া দুঃসাধ্য হবে বৈকি।

গত ৪ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের সংলাপ ছিল আওয়ামী লীগের সাথে। সে সংলাপকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ড. শামসুল হুদা আওয়ামী লীগকে কাছে পেয়ে খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক দল নয়, স্বাধীনতার অগ্রদূত। আপনারা মুজিবনগর সরকার গঠন করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই দেশের উন্নয়ন ও সব দায়-দায়িত্ব আপনাদের বহন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'আপনাদের আন্দোলনের ফসল এই নির্বাচন কমিশন।' সিইসি'র আওয়ামীপ্রীতির এই আবেগ-উচ্ছ্বাস তার হৃদয়ের ভেতরে থাকলে আমাদের হয়তো সংশয় হতো না। কিন্তু তিনি বড় খোলাখুলিভাবে হৃদয়ের কথা বলে ফেলেছেন সেদিক থেকে ১৯৯৬ সালের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান অনেক কুশলী ছিলেন। হৃদয়ের কথা তিনি মুখে প্রকাশ করেননি। কাজে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার অগ্রদূত– এই তমঘা আওয়ামী কপালে এঁটে দেয়ার দায়িত্ব প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কে দিল? এ দেশে যারা স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছেন, তার কত শতাংশ আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন? প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে তার কি কোনো হিসাব আছে? কার্যত দলমত নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, আওয়ামী লীগ একা নয়। আবেগাপ্লুত সিইসি সে কথা মনে রাখেননি। সিইসি ড. হুদা আরো বলেছেন, 'তাই এ দেশের উন্নয়ন ও সব দায়িত্ব আপনাদের বহন করতে হবে।' প্রধান নির্বাচন কমিশনার যদি স্থিরসঙ্কল্প হয়েই থাকেন যে, এ দেশের সব দায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগকে বহন করতে হবে, তা হলে আর এত ঝক্কি

www.pathagar.com

ঝামেলার প্রয়োজন কী! সংলাপ, আইডি কার্ড, ব্যালট বাক্স- এসবের তো প্রয়োজন নেই। সরকার পরিচালনার দায়িত্বও সিইসি সাহেব আওয়ামী লীগকে দিয়ে দিলে পারেন। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

সিইসি সাহেব আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা হলো, আপনাদের আন্দোলনের ফসল এই নির্বাচন কমিশন। এবারো কোনো রাখঢাক করেননি সিইসি। আওয়ামী লীগ এই দাবিই ১-১১'র পর থেকে করে আসছিল যে, এই সরকার তাদের আন্দোলনের ফসল। সুতরাং সরকার যেন কথা বুঝে চলে। সরকার অবশ্য খুব স্পষ্ট করে বলেনি, তারা আওয়ামী আন্দোলনের ফসল, না কি তাদের আসতে হলো আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রঘাতী অরাজকতার মাথায় মুগুর মারতে। শেখ হাসিনাকে লন্ডন থেকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়ার সময় সরকার স্পষ্ট বলেছিল যে, তথাকথিত আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল এবং শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে দেশ আবারো তেমন সর্বনাশের দিকে যেতে পারে।

তবে নির্বাচন কমিশন তো আর সরকার নয়। নির্বাচন কমিশন একেবারে স্বাধীন। তাই সরকারের তোয়াক্কা তারা করেন না। সুতরাং সিইসি সাহেব নিজেকে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রঘাতী আন্দোলনের ফসল বলে মনে করেন। ক্ষমতার অমৃতের লোভে আওয়ামী লীগ যে বাংলাদেশ মন্থন করছিল তাতে অমৃত আসেনি। কিন্তু এমন হলাহল যে এসেছে, এখন তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সিইসি সাহেবের কথায় বোঝা গেল যে, আওয়ামী লীগ আন্দোলন করেছিল বলেই তিনি সিইসি হতে পেরেছেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের প্রতি তার একটা আবেগ আছে না? আর সে আবেগের বশবর্তী হয়েই তিনি বলেই দিয়েছেন, দেশের সব দায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই বহন করতে হবে। সুতরাং এখানেও প্রশ্নবিদ্ধ সিইসি সাহেবের নিরপেক্ষতা।

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা আবারো প্রশ্নবিদ্ধ হলো বিএনপি'র সংস্কারবাদী নেতাদের প্রকৃত বিএনপি'র স্বীকৃতি দিয়ে। সে ক্ষেত্রে অনেকের মতে, কোনো যৌক্তিকতার ধার ধারলেন না প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এসব বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তার কণ্ঠে ৪ নভেম্বরের আবেগ আর শোনা গেল না। বরং শোনা গেল তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার ধ্বনি।

সংস্কারবাদী হাফিজউদ্দিনের কাছে নির্বাচন কমিশনের চিঠি দেয়ার বিষয়ে ৫ নভেম্বর সাংবাদিকদের কমিশন সচিব জানান যে, বিএনপি'র গঠনতন্ত্রের আলোকেই অব: মেজর হাফিজকে চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ৬ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. হুদা সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বলেন, গঠনতন্ত্র নয়, 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি' অনুসরণ করে বিএনপি'র সংস্কারপন্থী প্যানেলের অস্থায়ী মহাসচিব রিটায়ার্ড মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদকে চিঠি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সব কিছু যে গঠনতন্ত্রে থাকবে, এমন কথা নেই। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে রীতিপ্রথা এবং বিএনপি'র অতীত কর্মকাণ্ড ও বিবেচনায় আনা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপি'র বহিষ্কৃত মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়ার

www.pathagar.com

জন্য হৃদয় ভারাক্রান্ত করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া তাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করেছেন। খালেদা জিয়া খারাপ!

বিএনপি'র গঠনতন্ত্রের ৫(গ) ধারায় বলা হয়েছে : 'কোনো কারণে স্থায়ী কমিটির সভা আহ্বান সম্ভব না হলে জরুরি প্রয়োজনে দলের চেয়ারপারসন নিজ বিবেচনায় শাস্তিযোগ্য মনে করলে যেকোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আগে নেয়া যেকোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে পারবেন। তবে সব ক্ষেত্রে যথাশিগগির সম্ভব জাতীয় স্থায়ী কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। চেয়ারপারসন অথবা স্থায়ী কমিটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে অভিযুক্তকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দিতে পারবেন।' এই ধারা অনুযায়ী চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মান্নান ভূঁইয়া গংকে বহিষ্কার করেন। তাকে তিনি ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তাতে সিইসি সাহেবের প্রাণটা কেন পোড়ায়, বোঝা গেল না। গঠনতন্ত্র নয়, সিইসি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে ফেললেন কে হবেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, কে হবেন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব। দল কার প্রতি ন্যায়বিচার করেছে, কার প্রতি করেনি, সে রায় দিতে বসে গেছেন সিইসি। কারণ, সিইসির মতে, দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এখন কারারুদ্ধ। তিনি কার্যক্ষম নন। এ অবস্থায় দল তো ভেঙে যেতে পারে না। সিইসি'র একটি দায়িত্ব আছে না!

কিন্তু সিইসি সাহেবের হঠাৎ জরুরি প্রয়োজন পড়ল কেন সংস্কারবাদীদের বিএনপি বলে স্বীকৃতি দিতে? তিনি কেন ভুলে গেলেন বেগম খালেদা জিয়া আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী নন এবং তিনি কেন রায় দিতে গেলেন যে, বেগম খালেদা কার্যক্ষম নন– বোঝা গেল না।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য ইতোমধ্যেই তার নিরপেক্ষতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে এবং মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, তিনি কোনো একটা এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচন কমিশন জনগণের আস্থা হারাতে বাধ্য। সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলেই আমরা বরং খুশি হতাম।

০৯.১১.২০০৭

www.pathagar.com

লড়াই হোক এগিয়ে যাওয়ার, পিছিয়ে পড়ার নয়

দেশে সর্বব্যাপী সঙ্কট সুনামির ঢেউয়ের মতো বিশাল উচ্চতায় এগিয়ে আসছে। এই সঙ্কট দ্রব্যমূল্য বেড়ে ওঠার মতো এত চাক্ষুষ নয়। ধীর, নিভৃত কিন্তু বিশাল। এর প্রথম শিকার হওয়ার আশঙ্কা দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত তৈরী পোশাক শিল্প। গত এক মাসেই তৈরী পোশাক শিল্পের রফতানি কমেছে প্রায় ২৩ শতাংশ। যদিও কেউ কেউ আশা করছেন, শিগগিরই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে এবং বাংলাদেশে এই মাইনাস রফতানি অবস্থাকে প্লাসে নিয়ে যেতে পারবে।

এর মধ্যে আরো একটি উদ্বেগের খবর প্রকাশিত হয়েছে। সে খবর হলো, বাংলাদেশ গত এক বছরে তার সব অর্থনৈতিক সূচকে পিছিয়ে পড়েছে। গত ৩১ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তথা ডব্লিউইএফ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১২টি খাতের ওপর ভিত্তি করে ওই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, তার সব ক'টিতে গত এক বছরে অর্থাৎ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতার সূচকে গত এক বছরে বাংলাদেশ নেমে গেছে ১৫ ধাপ নিচে। ১৩১টি দেশের মধ্যে বিগত জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯২তম। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তা ১৫ ধাপ নেমে দাঁড়িয়েছে ১০৭তম স্থানে। ব্যবসায় প্রতিযোগিতার সক্ষমতার সূচকে জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৯তম স্থানে। বর্তমান অনির্বাচিত সুনীতিবাজ সরকারের আমলে ২০০৭ সালে সে অবস্থান দাঁড়িয়েছে ১১৮তম স্থানে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষমতার দিক থেকে ২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৮তম স্থানে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তা ১৮ ধাপ নেমে দাঁড়িয়েছে ১১৬ তম স্থানে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন সক্ষমতায় বাংলাদেশের অবস্থান ২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০০তম স্থানে। বর্তমান অনির্বাচিত সরকারের আমলে তা ২০ ধাপ নেমে দাঁড়িয়েছে ১২০তম স্থানে। বর্তমান সরকারের আমলে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থায়িত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮ ধাপ নেমে দাঁড়িয়েছে ৮৭তম স্থানে। অথচ ২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে এই অবস্থান

www.pathagar.com

ছিল ৬৯তম স্থানে। বিগত জোট সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এ খাতে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৭তম স্থানে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মাত্র ৯ মাসেই তা আট ধাপ নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে ১০৫ তম স্থানে।

দক্ষতা বাড়ানোর দিক থেকেও বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ১৫ ধাপ নিচে নামিয়ে দিয়েছে। এ সরকারের আমলে সে অবস্থান দাঁড়িয়েছে ৯১তম স্থানে। বিগত জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালে এ অবস্থান ছিল ৭৮তম। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে বাংলাদেশের অবস্থান নেমে গেছে ১৫ ধাপ নিচে, ১২৬তম স্থানে। ২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে এই অবস্থান ছিল ১১১তম স্থানে। পণ্যবাজার দক্ষতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০০৭ সালে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পিছিয়ে নেমেছে ৯৩তম স্থানে। ২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে এই অবস্থান ছিল ৭৮তম স্থানে। শ্রমবাজার দক্ষতার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ পিছিয়েছে ৬ ধাপ। বর্তমান অবস্থান ৭৬তম স্থানে। বিগত জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালে এই অবস্থান ছিল ৭০তম স্থানে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মুদ্রাবাজার স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ১৯ ধাপ পিছিয়ে নেমেছে ৭৫ তম স্থানে। অথচ গত বছর জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫৬তম। প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতার ক্ষেত্রে ড. ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ৯ ধাপ নেমে ১২৫ তম অবস্থানে পৌঁছেছে। অথচ ২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে এ অবস্থান ছিল ১১৬তম স্থানে। বাজারের আকারের সূচকেও ড. ফখরুদ্দীনের অনির্বাচিত সরকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়েছে তিন ধাপ। ২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে ৩৩তম স্থান থেকে পিছিয়ে ২০০৭ সালে তা নেমেছে ৩৬তম স্থানে। পণ্যের গুণগত মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে ড. ফখরুদ্দীন সরকারের আমলে বাংলাদেশ পিছিয়েছে ১৭ ধাপ, নেমেছে ১১১তম স্থানে। অথচ জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালে সে অবস্থান ছিল ৯৪তম। ব্যবসায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও ড. ফখরুদ্দীনের আমলে বাংলাদেশ ১৫ ধাপ নেমে দাঁড়িয়েছে ১০২তম স্থানে। অথচ ২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশের এই অবস্থান ছিল ৮৭তম স্থানে। আর অর্থনৈতিক খাতের পরিবর্তনের দিক থেকে ড. ফখরুদ্দীন সরকারের আমলে বাংলাদেশ ১৭ ধাপ পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৭তম স্থানে। অথচ জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালে তা ছিল ১০০তম স্থানে। এ পরিসংখ্যান নিয়ে সরকারের নিশ্চয়ই কোনো সংশয় নেই। কারণ, ডব্লিউইএফ'র পক্ষে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে সরকারের অফিসিয়াল গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ তথা সিপিডি।

এর আগে প্রকাশিত জাতিসঙ্ঘ বাণিজ্যবিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাডের রিপোর্টে বলা হয়, বিদেশী বিনিয়োগ সূচকে ড. ফখরুদ্দীন সরকারের আমলে বাংলাদেশ পিছিয়েছে দুই ধাপ, এফডিআই দক্ষতায় পিছিয়েছে দুই ধাপ এবং বিশ্ব ব্যাংকের বাণিজ্য সক্ষমতা

www.pathagar.com

রিপোর্টে বাংলাদেশ নেমে গেছে ১৯ ধাপ নিচে। আশা করি, এ সংবাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসকদের কারো জন্য আত্মশ্লাঘার কারণ হয়ে উঠবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেকেই বলতে খুব পছন্দ করেন যে, বিদেশীরা তাদের কার্যক্রমের খুব প্রশংসা করেছে। কিন্তু স্বদেশীরা এদের কার্যক্রম সম্পর্কে কী ভাবছে, এ বিষয়ে এরা কোনো ধারণা রাখেন না বলেই মনে হয়। তবে সেই বিদেশীদের মূল্যায়নেই বাংলাদেশের আজ এমন অধঃপতিত অবস্থায় পড়েছে।

বর্তমান সরকার কথিত 'দুর্নীতিবাজ' সরকারগুলোর আমলেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের ধারায় বাংলাদেশ এশিয়ার 'ইমার্জিং টাইগার' হিসেবে অভিহিত হয়েছিল। বর্তমান সরকার সেই বাঘকে মাত্র এক বছরের মাথায় ইঁদুরের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদের অপরিণামদর্শী বাকসর্বস্ব ভুল নীতির কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে হতদরিদ্র দেশ ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার ও উগান্ডার কাতারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি, এ জন্য তারা আগের কথিত 'দুর্নীতিবাজ' সরকারকে দায়ী করবেন না।

এই অধঃপতনের পরিণতি কী হতে পারে, সে সম্পর্কেও বর্তমান বাক-বিলাসী সরকারের কোনো ধারণা আছে বলে মনে হয় না। জাতিসঙ্ঘে দাঁড়িয়ে যদি কোনো দেশের সরকার তার নিজের দেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বলে ঘোষণা দেয়, তা হলে সেই দেশ, সে দেশের পণ্য, সে দেশে বিনিয়োগ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ধারণা কী হতে পারে, সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা দেশের স্বার্থবিরোধী তেমন উক্তি করতে কুণ্ঠিত হননি। জাতিসঙ্ঘের ইতিহাসে কোনো সরকারপ্রধান কোনো দিন নিজের দেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বলে আমাদের জানা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর অন্যতম জাপানে প্রায় প্রতিবছর এক একজন প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। কিন্তু তাদের কেউ কোনো দিন বিশ্বসভায় গিয়ে ঘোষণা দেয়নি যে, শুনুন, আমরা না পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। দুর্নীতি আমাদের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলেছে। সে হিসেবে জাতিসঙ্ঘে ড. ফখরুদ্দীনের ভাষণকে কেউ দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে অভিহিত করলে, তাকে কি দোষ দেয়া যাবে?

যে কথা বলছিলাম, বর্তমান অদূরদর্শী তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের বিগত এক বছরের শাসনে বাংলাদেশকে অধঃপতনের প্রায় শেষ প্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। এর ফলে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে রফতানি খাত। গত এক বছরে এই খাতসংশ্লিষ্ট প্রায় সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১৫-২০ ধাপ অধঃপতন ঘটেছে। শ্রমবাজার দক্ষতার অধঃপতন, পণ্যমান বৃদ্ধিতে অধঃপতন, প্রযুক্তি খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে অধঃপতন, ব্যবসায় সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে অধঃপতন। তার পরও রফতানি ধারাবাহিকতা রক্ষা বা বাড়ানোর আশা করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাতে ধারণা করা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই খাত ধীরে হলেও বড় ধরনের সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানির

www.pathagar.com

অর্ডার আমদানিকারকরা অন্য কোনো দেশে সরিয়ে নেবে সময়মতো সরবরাহ পাওয়ার জন্য। তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কী হবে?

তেমনিভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সবচেয়ে বড় দ্বিতীয় খাত জনশক্তি রফতানি। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক জনশক্তি রফতানির প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন পর্যায়ে ছিল ১৯৯৫-৯৬ সালে বিএনপি শাসনামলে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের ভুল নীতি ও কূটনীতির কারণে সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। ২০০১-২০০৬ সালে জোট সরকারের আমলে সে প্রক্রিয়া আবারো জোরদার করে তোলা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান জবাবদিহিতাহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মালয়েশিয়ায় প্রায় ২ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়। লোক পাঠানোও শুরু হয়। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লোক পাঠানো, বাংলাদেশী শ্রমিকদের দিয়ে বিক্ষোভ করানো প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে সে সম্ভাবনার দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। মালয়েশিয়া আপাতত আর বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিচ্ছে না। ডা. মাহাথির মোহাম্মদের সময়ে বিএনপি শাসনামলে বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার হয়ে ওঠে। বর্তমান সরকারের একদেশদর্শী কূটনীতির কারণে সে সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে কোনো পথই করতে পারছে না। বরং পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কথায় মনে হতে পারে হাল ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশ।

শুধু মালয়েশিয়া নয়, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্য। সেখানেও সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হওয়ার পথে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত আছেন হাজার হাজার বাংলাদেশী। অবৈধভাবে মেয়াদের অতিরিক্ত সময় ধরে তারা কাজ করছেন। আমিরাত সরকার তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে দ্বিতীয় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। শিগগিরই সেখান থেকে ফেরত আসছে ২৭ হাজার শ্রমিক। এরপর আরো আসবে। কিন্তু নতুন করে সেখানে শ্রমিক পাঠানোর ব্যাপারে সরকারের নিস্পৃহতা বেদনাদায়ক। তেমনিভাবে কুয়েতে কাজ করে বাংলাদেশের প্রায় সোয়া ৩ লাখ শ্রমিক। প্রতিবছর সেখানে কাজের জন্য যান ৫০ থেকে ৬০ হাজার শ্রমিক। এভাবেই চলে আসছিল দীর্ঘ দিন ধরে। তাতে খুব একটা সমস্যা কখনো হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময় সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাস সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, চাকরিদাতা কুয়েতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে রিক্রুটিং এজেন্টদের সাথে চুক্তি করতে হবে। চাকরিদাতারা বাংলাদেশের দূতাবাসের কাছে এমন কী দায় ঠেকেছে যে, দূতাবাসে গিয়ে কোনো কর্মকর্তার সামনে বসে থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করবে। তাদের দরকার শ্রমিক। সে শ্রমিক শুধু বাংলাদেশ থেকেই যায় না। আরো দেশ আছে, সেখান থেকে শ্রমিক আনতে দূতাবাসে গিয়ে বসে থাকতে হবে না। সুতরাং কুয়েতে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান 'সেন্ট্রাল টেন্ডার কমিটি' বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে ভারত, ফিলিপিনস, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কা থেকে শ্রমিক নিতে শুরু করেছে। ফলে বর্তমান সরকারের ১০ মাসে কুয়েতে মাত্র ৫ হাজার শ্রমিক পাঠানো সম্ভব হয়েছে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে যেমন, তেমনি

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজারেও বাংলাদেশের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। সরকারের ভুল নীতি ও কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণেই এসব শ্রমবাজার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আর তার পুরো সুবিধা নিচ্ছে ভারতসহ অন্যান্য দেশ। শ্রমবাজার যদি এভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসে, তাহলে রেমিট্যান্স কমবে। সেটা অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে বাধ্য।

কিন্তু পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কথায় মনে হলো, এ নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, আমাদেরকে নতুন শ্রমবাজার খুঁজতে। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোতে লোক পাঠানো সম্ভব। তার জন্য চাই শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। কিন্তু পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কী ধারণা যে, মধ্যপ্রাচ্যের মতো সেখানেও লাখ লাখ শ্রমিকের চাহিদা আছে? অর্থাৎ বর্তমান শ্রমবাজার ধরে রাখার ক্ষেত্রে কূটনৈতিক উদ্যোগের কোনো চিন্তাভাবনাও তার নেই। কে বিদেশে চাকরি পেল, না পেল, তাতে কার কি আসে যায়। কিন্তু সব মুসলিম দেশ থেকে বাংলাদেশে শ্রমবাজার সঙ্কুচিত হওয়ার পেছনে সরকারের একদেশদর্শী পররাষ্ট্রনীতিও দায়ী কি না ভেবে দেখার দরকার আছে।

বর্তমান সরকারের এক বছরেই পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাট বিপর্যয় অপেক্ষমাণ। তাই বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ড, হাওয়াই অভিযোগের পেছনে তাড়া করে দেশকে বিপর্যস্ত করার নীতি দ্রুত পর্যালোচনা দরকার। তা না হলে অর্থনীতিতে যেমন ধস নামছে, অধঃপতন যেমন চূড়ান্ত হচ্ছে, তেমনিভাবেই বিশ্বে একেবারেই একঘরে হয়ে পড়বে বাংলাদেশ। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার লড়াইয়ে আমাদেরও শরিক হতে হবে। সব ক্ষেত্রে দেশকে পিছিয়ে দিয়ে তা সম্ভব নয়।

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় কিছু ছাত্র একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তার নাম ছিল 'পাগল পার্টি' ক্লাসের ফাঁকে হঠাৎ পার্টি সদস্য এক পাগল এসে 'অপরাজেয় বাংলা'র পাশে দাঁড়িয়ে হাঁক দিত, 'আছ নাকি'। পাগল পার্টির সদস্যরা কলাভবনের বিভিন্ন তলা থেকে সাড়া দিত, 'আছি'। তারপর তারা 'অপরাজেয় বাংলা'র সামনে সমবেত হয়ে মিছিল করত। তাদের মাত্র দু'টি স্লোগান ছিল, 'আছ নাকি?' অন্যরা বলত, 'আছি'। তাদের অন্য স্লোগান ছিল, 'সামনে আছে জোর লড়াই/সে লড়াইয়ে আমরা নাই।'

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রতিটি দেশেরই টিকে থাকা বা এগিয়ে যাওয়ার জন্য জোর লড়াই অপরিহার্য। সে লড়াইয়ে আমরা নাই?

১৮.১১.২০০৭

www.pathagar.com

রাজনীতিশূন্যতা বিপদ বাড়িয়েছে

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তা পুষিয়ে নিতে সময় লাগবে। এই ঘূর্ণিঝড় কেড়ে নিয়েছে মানুষের আত্মীয়স্বজন, ক্ষেতের ফসল, গোয়ালের গরু, পুকুরের মাছ, ঘরবাড়ি সব কিছু। লাখ লাখ মানুষের এখন কিছু নেই। খোলা আকাশের নিচে একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন এরা। এখনো অনেক এলাকায় পৌঁছতে পারেনি উদ্ধার কর্মীরা। সড়ক আছে, কিন্তু গাছপালা ভেঙে পড়ে সে সড়ক সব ধরনের যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী। সেগুলো সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা এখনো করা যায়নি। সেসব রাস্তা চলাচলের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করছেন এলাকাবাসী, প্রশাসন ও সেনা সদস্যরা। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হেলিকপ্টারে করে যেসব এলাকায় যেতে পারছেন, সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন কিছু কিছু ত্রাণসামগ্রী। প্রয়োজনের তুলনায় যা অতি কম। সামান্য ত্রাণসামগ্রীর জন্য ছুটে আসছে হাজার হাজার মানুষ। খাদ্য চাই, কাপড় চাই, আর চাই খাবার পানি। গণমাধ্যমের কর্মীরা গেছেন আরো দুর্গম এলাকায়। সেখানে মানুষ ছবি তুলতে চায় না, খাদ্যসামগ্রী চায়। আর সে কারণেই কোনো কোনো গণমাধ্যমের কর্মীরা যেখানে খবর সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন, সেখানেই নিয়ে যাচ্ছেন খাদ্য-বস্ত্র-ওষুধসহ কিছু কিছু ত্রাণসামগ্রী।

এরকম একটি মহাদুর্যোগ মোকাবেলার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ দলমত নির্বিশেষে সবাইকে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। নেপথ্যে যারা সরকার পরিচালনা করেন, তারাও আহ্বান জানিয়েছেন সবার প্রতি দুর্গত ত্রাণে এগিয়ে আসার জন্য। জানিয়েছেন, ত্রাণকাজে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশ নেয়ায় কোনো বাধা নেই। সবাই যেন একযোগে কাজ করে এই মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে।

বাংলাদেশে ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস-ঘূর্ণিঝড় নতুন কোনো ঘটনা নয়। এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করেই হাজার হাজার বছর ধরে এই জনপদে টিকে আছে মানুষ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে সাজানো সংসার, ঘরবাড়ি, ফসলের জমি, গবাদিপশু। কিন্তু তার ভেতরেই আবার মানুষ নতুন করে গড়ে তুলেছে সংসার। এই গড়ে তোলার জন্য তারা অপেক্ষা করেনি কোনো হেলিকপ্টারের, অপেক্ষা করেনি দূরের

www.pathagar.com

কারো সাহায্যের। যারা টিকে থেকেছে, তারা নিজেরাই পরস্পরের উঠে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই যূথবদ্ধতাই আমাদের জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য। এভাবেই আমরা টিকে আছি হাজার হাজার বছর ধরে।

ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতের পর এবার তার কিছুটা ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ করলাম। এসব বিপর্যয়ে যারা দ্রুত এগিয়ে আসে, তারা পাড়া-প্রতিবেশী। বর্তমান সময়ে ইউনিয়ন পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মী। এসব রাজনৈতিক কর্মীকে ভোটের সময় যেতে হয় সাধারণ মানুষের কাছে। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তাদের তো দূরে থাকলে চলে না। বরং সব দলমতের লোক কত দ্রুত যেতে পারে দুর্গত মানুষের পাশে, তার একটা চেষ্টা থাকে। আমরা যে বলেছি, রাস্তাঘাটে গাছ পড়ে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে বলে উদ্ধার বা ত্রাণকর্মীরা পৌঁছতে পারছে না দুর্গত মানুষের পাশে। কিন্তু এক সময় তো সড়কও ছিল না। তখন বিপন্ন মানুষের পাশে আর একজন গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিভাবে? তারা তখন নৌকায় করে, ভেলায় করে, মাথায় করে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে গেছে দুর্গত মানুষের পাশে। এবার দুর্গম দুর্গত এলাকায় গিয়ে গণমাধ্যমের সদস্যরা সেই রাজনৈতিক কর্মীদের দেখতে পাননি। শুধুই দেখতে পেয়েছেন বিপন্ন মানুষের হাহাকার।

পুরনো ধারার রাজনৈতিক নেতৃত্ব বদলে দিয়ে যারা নতুন নেতৃত্ব ছেঁকে বের করার চেষ্টা করছেন, সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে বিগত প্রায় এক বছরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলেছে নিঃরাজনীতিকীকরণ প্রক্রিয়া। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, গত দশ মাসে সরকার প্রায় ৩ লাখ লোককে আটক করেছে নানা অভিযোগে। ফলে আটক হয়েছে গ্রামের সাধারণ কর্মীরাও। যারা আটক হয়নি, তারাও গ্রেফতারের আশঙ্কায় গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। শহরে রাজনীতির কানাগলিতে 'নতুন রাজনীতি'র পাতানো খেলায় কেউ কেউ বেরিয়েছেন মোটরসাইকেল বহর নিয়ে। গত বন্যার সময় এমন চিত্র দেখা গেছে। পুরনো রাজনীতিকদের যে কমিটমেন্ট ছিল, নতুনদের তা গড়ে ওঠেনি। তাদের মাথায় ছিল সুবিধাবাদের ধান্ধা। ফলে 'নতুন' রাজনীতিকদের তৎপরতায় যত না লোক দেখানোর প্রবণতা ছিল, ততটা ছিল না প্রকৃত কাজ করার মানসিকতা। প্রকৃত কাজ করার জন্য দরকার জনসমর্থন বা জনসম্পৃক্ততা। নতুনদের তার কোনোটাই ছিল না। তাদের ছিল ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদ ভরসা। কিন্তু সে আশীর্বাদ যখন ফিকে হয়ে গেল, তখন একইভাবে ফিকে হয়ে গেল ওইসব রাজনৈতিক দল। ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তারা ছিলেন পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে হাস্যোজ্জ্বল মুখ, স্টিল ক্যামেরার ঘন ঘন ফ্লাশ, খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছবি ও বক্তব্য, টিভি নিউজের শিরোনাম, সব ছিল তাদের। কিন্তু যেই না মুখ ফিরিয়ে নিল ক্ষমতাসীনরা, তখনই সব ফিকে, খাঁ খাঁ।

বিগত বন্যার সময় ত্রাণকাজে এই নতুন গজিয়ে ওঠা রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়ে যে কোনো কাজ হবে না, বিলম্বে হলেও ক্ষমতাসীনরা সে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর সে কারণেই শেষ পর্যন্ত তারা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে,

www.pathagar.com

ব্যানার নিয়ে হোক, বা না নিয়ে হোক, রাজনৈতিক দলগুলো গিয়ে দাঁড়াক বন্যার্ত মানুষের পাশে এবং আমরা লক্ষ করেছিলাম, পুরনো রাজনীতিকরা যখন মাঠে নামলেন, তখন দ্রুত উন্নতি হলো পরিস্থিতির। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেননি ক্ষমতাসীন শাসকরা। তারা বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতির আলোকে ব্যবস্থা নিতে পারেননি। যদি পারতেন, তা হলে ঘূর্ণিঝড়ের পাঁচ-ছয় দিন পরও দুর্গত এলাকায় গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়নি– এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

আলাদীনের চেরাগ ঘষে যে একদিনেই রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় না– আশা করি ইতোমধ্যে ক্ষমতাসীনদের সে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। ক্ষমতাসীনদের মদদে হোক, আর হালুয়া-রুটির লোভেই হোক, যারা দ্রুত নতুন নতুন রাজনৈতিক দল খুলে বসেছিলেন, তারা ইতোমধ্যেই বেশ চুপসে গেছেন, তাদের রা আর শোনা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক দল একদিনে গড়ে ওঠে না, একদিনে গড়ে তোলাও যায় না। ক্ষমতাসীনদের মধ্যে আশা করি, সে উপলব্ধি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। জোড়াতালি দিয়েও যে হয় না, অলি-বি.চৌধুরীকে দিয়েও তার প্রমাণ মিলেছে। আবার দলের ভেতরে থেকে যারা উপদল করে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেন, তারাও দেখেছেন, তাতে নিজস্ব ফায়দা হয়তো হাসিল করা যায়, কিন্তু জনগণের কাছে গেলে বিপদ। সেরকম বিপদ আছে বলেই, তোফায়েলরা আবার শেখ হাসিনার নেতৃত্বকেই শিরোধার্য বিবেচনা করে ফিরে আসেন। অবঃ মেজর হাফিজ তার ঘূর্ণিদুর্গত নির্বাচনী এলাকা ভোলায় ভোটারদের এই বিপদের সময় হাজির হতে সাহস পান না। ঢাকায় বসে টিভি ক্যামেরার সামনে বেগম খালেদা জিয়াকেই নেত্রী মেনে ঘোষণা দেন। অর্থাৎ দলছুট হয়ে গেলে নেতৃত্বও নড়বড়ে হয়ে যায়। কারণ, চূড়ান্ত বিচারে জনগণই আসল শক্তি, সে শক্তির ওপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সরকারের উপদেষ্টাদের কেউ কেউ এই দুঃসময়েও শাসিয়ে যাচ্ছেন। এরা রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তেমনি আবার শাসিয়ে দিচ্ছেন, ত্রাণকাজে যান, কিন্তু রাজনীতি করতে পারবেন না। এটা কেমন করে সম্ভব? যদি রাজনৈতিক কর্মীরা ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যান দুর্গত মানুষের পাশে, তবে কি তারা আত্মপরিচয় গোপন করবে? এলাকার মানুষ কি জানে না, কে বিএনপি করে, কে আওয়ামী লীগ করে কিংবা কে জামায়াতের সমর্থক? সে পরিচয় কেমন করে গোপন করা যাবে? কেউ রাজনৈতিক ত্রাণকর্মীকে তাড়া করবে না তো? বলবে না তো, ধর ব্যাটাকে, ত্রাণ দিতে এসে রাজনীতি করছে?' তাই বলতে চাই, এসব শর্তযুক্ত বক্তব্য সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। বন্যার সময়ও এমনি নানা শর্তের কথা বলা হয়েছিল দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে। তাতে দ্বিধা কাটেনি। কিন্তু যখন রাজনৈতিক কর্মীরা বুঝতে পারলেন, ত্রাণ দিতে গেলে ভয় নেই, শুধু তখনি ত্রাণকাজ সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল।

এখনো ত্রাণকাজের সুবিধার্থেই রাজনৈতিক দলগুলো জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছে। এ আহ্বানের মধ্যে যৌক্তিকতা আছে। গত ১০ মাসে সারাদেশে যে

www.pathagar.com

আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে হবে। দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতেও যদি লোকে ভয় পায়, তাহলে দুর্গত ত্রাণ দুঃসাধ্যই থেকে যাবে। বিডিআরের দোকান দিয়ে যেমন দ্রব্যমূল্য ও পণ্যসবরাহ নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি, তেমিনভাবে সরকারি লোকদের দিয়ে ত্রাণ নিশ্চিত করাও দুঃসাধ্যই থেকে যাবে। বরং জানমালের ক্ষতি আরো বাড়বে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তারা চলে যাবেন। কিন্তু পরে তিনি বলেছেন, সম্ভব হলে ২০০৮ সালের জুনেই নির্বাচন করা হবে। সরকার সম্ভবত উপলব্ধি করতে পারছেন যে, তাদের শাসন যত দীর্ঘায়িত হবে, ততই সঙ্কট আরো ঘনীভূত হবে। বিপদ বাড়বে। সে বিপদ তাদের জন্যও কম নয়। তারা হয়তো এখন বুঝতে পারছেন, 'দুর্নীতি, দুর্নীতি' বলে যে শোর তারা তুলেছিলেন, জনগণের কাছে ক্রমেই তা ফিকে হয়ে আসছে। দেশ সর্বব্যাপী সঙ্কটে পড়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য কোনো খাতেই আশানুরূপ ফল তো আনাই যায়নি, বরং প্রায় সব ক্ষেত্রে তারা পেছনে ঠেলেছেন দেশকে। এ সত্য জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

আর সে কারণে আমরাও চাই, যত দ্রুত সম্ভব, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক, রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করুক এবং নিঃরাজনীতিকীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হোক। সে কারণে রাজনীতিকে চলতে দেয়া হোক তার স্বাভাবিক গতিতে। এ কথা এখন অনেকেই বলতে শুরু করেছেন যে, বেগম খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে আপাতত রাজনীতি হচ্ছে না। হলে, তোফায়েল-হাফিজরা 'মাইনাস টু' ফর্মুলা বাদ দিয়ে হাসিনা-খালেদাকেই তাদের নেত্রী হিসেবে ঘোষণা আঁকড়ে ধরতেন না। তবে এটাই তো সত্য যে, রাজনীতির নামে যাতে কেউ দেশ ধ্বংসকারী কোনো অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে, তারও একটা গ্যারান্টি দরকার। রাজনীতির নামে কেউ যাতে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালাতে না পারে। তারও তো একটা নিশ্চয়তা দরকার। গত ১০ মাসের শিক্ষা থেকে বলা যায়, মুক্ত পরিবেশে রাজনীতি করাই যে শ্রেয় সে গ্যারান্টি বিষয়ে আলোচনা করে মীমাংসা করুন। তাদের সে সুযোগ করে দিতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। শুধু সেটুকু সম্ভব হলেই আমরা সম্ভবত বর্তমান সর্বব্যাপী সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবো। সেই শুভবুদ্ধির জন্য অপেক্ষা।

২৪.১১.২০০৭

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশনকে এ দায়িত্ব কে দিলো

গত এগারো জানুয়ারির পর যোগ্য লোকদের শাসনের জোয়ারে অনেক অচেনা লোক ভাসতে ভাসতে এসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও সাংবিধানিক পদে আসীন হয়ে গেছেন। এদের কেউ কেউ ছিলেন পদোন্নতিবঞ্চিত। অযোগ্যতার কারণে কেউ কেউ ওএসডি হিসেবে বসে ছিলেন। কেউ কর্মজীবন শেষে নির্বিঘ্ন অবসর জীবন যাপন করছিলেন। কেউ কেউ যোগ্যতার বিচারে জোট সরকারের আমলেও ছিলেন, বর্তমান সরকারের আমলেও যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। আবার অপ্রত্যাশিত এসব উচ্চ ক্ষমতার পদ পেয়ে টাল সামলাতে পারেননি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন।

এ রকম একজন জোট সরকারের আমলে চারবার পদোন্নতিবঞ্চিত ছিলেন। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। শেষে ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা এনবিআর-এর চেয়ারম্যান। সে পদ থেকে সরিয়ে দেয়ায় তিনি চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার বছরখানেক আগেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। তবে জোট সরকারের সময় সচিব হতে পারেননি বলে অশ্লীল উপসংহার টেনে এক বই লিখেছেন। বইয়ের নাম 'সরকারি চাকরিতে আমার অনুভূতি/পদোন্নতিবঞ্চনা'। এই বইয়ে তিনি জোট সরকারের সময় যেসব আমলা উচ্চপদে চাকরি করেছেন তাদের এক হাত নিয়েছেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল সম্পর্কে এক কথাও বলেননি। শুধু ভূমিকায় লিখেছেন, 'সরকার প্রণীত পদোন্নতি নীতিমালা অনুযায়ী সচিব পদে পদোন্নতির জন্য সম্পূর্ণরূপ যোগ্য থাকা সত্ত্বেও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে সচিব পদে আমাকে বারবার পদোন্নতিবঞ্চিত করা হলো। লিখিতভাবে এর কারণ জানতে চেয়ে আজো তা জানতে পারলাম না– যদিও স্বচ্ছ জনপ্রশাসনের জন্য সরকারের জবাবদিহিতাও অবশ্যই কাম্য।' আবার পদোন্নতি কেন দেয়া হলো না, তার কৈফিয়তও তিনি সত্যি সত্যি চেয়েছেন সরকারের কাছে। সেসব কৈফিয়ত তলবের চিঠি তিনি ওই বইয়ে ছেপেও দিয়েছেন।

তাকে যখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হলো তখন তিনি ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করতে শুরু করলেন। যেন পদোন্নতি পাননি যে সরকারের আমলে তাদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বেন। সরকার যখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, দুর্নীতিবাজের তালিকা আর নয়। আর কোনো জবরদস্তি নয়। তখনো তিনি জোর গলায় হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন।

www.pathagar.com

আবার তিনি ঘোষণা দিচ্ছিলেন, আগে কর দিতে পারেননি, ভুল হয়ে গেছে, এখন দিয়ে যান, অসুবিধা তো নেই। কিন্তু কর দিতে এসে আটক হয়েছেন যারা, তাদের তিনি সান্ত্বনা দিতে পারেননি। তিনি জোট সরকারের আমলে সচিব হতে পারেননি, কিন্তু চাকরি তাকে ছাড়তে হয়নি বা শেষ পর্যন্ত ছাড়েননি তিনি। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সচিব হলেন, কিন্তু চাকরি রক্ষা পেল না কেন? তিনি কি এবারো আগের মতো তাকে কেন বদলি করা হলো বলে সরকারের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন? ওই বইয়ে তিনি লিখলেন কেন বর্তমান সরকারের আমলে তার সচিব হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা, তার চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের কথা। বইটা পড়ে হতাশ হলাম।

তেমনি হতাশা বাড়ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যক্রমে। প্রধান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথেই যেন তিনি বিএনপি'র ওপর খড়গহস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি সরকারি চাকরি করেছেন। বিএনপি সরকার তাদের দু'দফায় বদিউর রহমানের ওপর সিইসি ড. এ টি এম শামসুল হুদার প্রতি কোনো অবিচার করেছিল কি না, জানা নেই। তিনি সে কথা বলেননি। কিন্তু বিএনপি সম্পর্কে তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে কোথায় যেন একটা জিঘাংসা ফুটে উঠছে। সাংবিধানিক পদে থেকে এ রকম বক্তব্য দিতে দিতে কমিশনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

গত ২৭ নভেম্বর ওয়ার্কার্স পার্টির সাথে সংলাপ অনুষ্ঠানে সিইসি ড. হুদা বলেছেন, 'নিবন্ধন পেতে হলে এবার নির্বাচন কমিশনের আইন মেনে বিএনপিসহ অনেক বড় দলকেই গণতন্ত্র সংশোধন করে আসতে হবে। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা না করলে হবে না।' এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে পরামর্শ দেন। সিইসি জানান, নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

বিএনপি'র রাজনীতি ও গঠনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে সিইসি বলেছেন, আমি একটি দলের গঠনতন্ত্র দেখেছি। বিএনপি'র গঠনতন্ত্র ভালোভাবে পড়েছি। নিবন্ধন পেতে হলে এই গঠনতন্ত্রের মতো অনেক দলেরই গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হবে। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, 'একটি লোক ১০-১২ বছর ধরে দলে আছে, অথচ একক ক্ষমতাবলে আপনি তাকে বহিষ্কার করে দেবেন তা হবে না।' সিইসি বলেছেন, খসড়া প্রস্তাব নিয়ে ১৬টি দলের সাথে বৈঠক হচ্ছে। এর বাইরে অনেক দল আছে, যারা ভোটে জনপ্রিয় না হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনপ্রিয়। তাদের সাথে নির্বাচন কমিশন সংলাপে বসবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রতিটি বক্তব্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী বছরের সম্ভাব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হতে হবে। আর নিবন্ধন

www.pathagar.com

করার জন্য দলের ভেতর গণতন্ত্রচর্চা করতে হবে, গঠনতন্ত্র বদলাতে হবে। কাউকে বহিষ্কার করা যাবে না। কাউকে হুট করে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো যাবে না। আয়ের উৎস, ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এখন পর্যন্ত এর কোনোটাই আইন নয়। ধারণা করা যায়, আইন হবে। সে আইন প্রণয়নের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করতে হবে। আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা যেহেতু হচ্ছে, তাতে মনে হয়, নির্বাচন কমিশন সে আলোচনাকে মূল্য দেবেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষায় 'স্বাধীনতার অগ্রদূত' আওয়ামী লীগের সাথেও তার কথা হয়েছে। আওয়ামী লীগও মনে করে না যে, নির্বাচন কমিশন যেসব শর্তের কথা বলছে, সেগুলো মেনে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে কমিশনে নিবন্ধন করা সম্ভব। তাহলে সিইসি এখনই যে এত বড় গলায় হুঙ্কার ছেড়ে বসলেন!

বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশে এক একটি রাজনৈতিক দলের এক এক রকম মতাদর্শ যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে তার গঠনতান্ত্রিক কাঠামো। এক এক দলে নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি এক এক রকম তো হতেই পারে। কিন্তু না, সিইসি'র সে বিষয় পছন্দ নয়। দলের ভেতরে গণতন্ত্রচর্চা করতে হবে। সে চর্চা এক এক দলে এক এক রকম। তাতে কোনো মহাভারত হঠাৎ অশুদ্ধ হয়ে গেল। এদিকে সিইসি যে আওয়ামী লীগকে 'এ দেশের উন্নয়ন ও সব দায়িত্ব' বুঝিয়ে দিতে চান। সে দলে গণতন্ত্রের চর্চা বিষয়ে আজ পর্যন্ত টুঁ শব্দটি পর্যন্ত যে করলেন না। হ্যাঁ, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্রের কথা আছে। কিন্তু শেখ হাসিনাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভানেত্রী নির্বাচন করে বাকি কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় শেখ হাসিনার ওপর। তাহলে কি গণতন্ত্র হলো, না স্বৈরতন্ত্র হলো? সিইসি দেখতে পাননি যে, আওয়ামী গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্রের গরু কেতাবে যত আছে, গোয়ালে ততটা নেই। কিন্তু সিইসি'র ভাষায় 'আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক দল নয়, স্বাধীনতার অগ্রদূত। তারা মুজিবনগর সরকার গঠন করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে দিয়েছেন।' সুতরাং তাদের দলের ভেতরে গণতন্ত্রচর্চা তেমনটা না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু বিএনপি কে? তাদের দলের ভেতরে তো গণতন্ত্রচর্চা থাকতেই হবে। তাদের গঠনতন্ত্র তো বদলাতেই হবে। নইলে তাদের নিবন্ধন হবে না। তারা নির্বাচনেও অংশ নিতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয়, সিইসি বরং একটি 'আদর্শ গঠনতন্ত্র' তৈরি করতে পারেন। সেটি সব দলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতে পারেন– এটা হবে সবার গঠনতন্ত্র। দশ বছর চর্চা করে এসে নিবন্ধন করিয়ে নির্বাচনে যাবেন। তার আগে নয়।

বিএনপি'র বহিষ্কৃত মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার প্রতি সিইসি'র ভারি দরদ। আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা আবুল হাসান চৌধুরী সম্পর্কে এই দরদ কেন নেই তার। জয়নাল হাজারীকে যে বের করে দিলো আওয়ামী লীগ। তার জন্য কোনো শো-কজটা তো করতে হয়নি। তার প্রতি এই 'অবিচারের' জন্য সিইসি আওয়ামী লীগকে যে তিরস্কার করলেন না। কেন? মান্নান ভূঁইয়ার জন্য যদি তার মায়া হয়, তাহলে

www.pathagar.com

জয়নাল হাজারীর জন্যও তো তার একই ধরনের মায়া হওয়ার কথা। আশা করি জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে আওয়ামী অবিচারের প্রতিবাদ তিনি করবেন। মান্নান ভূঁইয়ার জন্য সিইসি'র প্রাণটা পোড়াল, কিন্তু যুগ্ম মহাসচিব আশরাফ হোসেনের জন্যও কি তার প্রাণটা পোড়ায়? সাংবিধানিক পদে বসে প্রাণ পোড়ালে সবার জন্য সমানভাবে পোড়ানো উচিত। কারো জন্য পোড়াবে, কারো জন্য পোড়াবে না, তা হওয়া উচিত নয়। সিইসি বিষয়গুলো স্মরণে রাখতে পারেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তা হলো, খসড়া প্রস্তাব নিয়ে ১৬টি দলের সাথে বৈঠক হচ্ছে। এর বাইরে অনেক দল আছে, যারা ভোটে জনপ্রিয় না হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনপ্রিয়। তাদের সাথে নির্বাচন কমিশন সংলাপে বসবে। রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তার এক নতুন মাপকাঠি উদ্ভাবন করেছেন সিইসি। রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভের মাপকাঠি তো জনপ্রিয়তা। যে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে যত ভোট পাবে, সে তত বড় বা তত জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। যে দল সবচেয়ে বেশি ভোট পায়, তারা সরকার গঠন করে। এটাই তো গণতন্ত্র। কিন্তু সিইসি এ কোন নতুন গণতন্ত্র উপহার দিতে যাচ্ছেন! যারা ভোটে দাঁড়ালে ভোট পায় না, জনগণ যাদের সমর্থন দেয় না, যাদের জামানত বাজেয়াপ্ত করে নির্বাচন কমিশন, এসব পরগাছা রাজনীতিবিদদের হাতে জাতে তোলার জন্য সিইসি'র নতুন সংজ্ঞা রাষ্ট্রীয়ভাবে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। বাহ! তারা তাহলে কারা। জনগণ তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু রাষ্ট্র তাদের পছন্দ করে। সুতরাং জনগণের পছন্দের চেয়ে রাষ্ট্রের পছন্দ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে রাষ্ট্র কি জনগণের নয়? রাষ্ট্রের মালিক-মোক্তার তাহলে কি ভিন্ন কেউ। সিইসি সাংঘাতিক এক প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গেলেন। বিএনপি গত ১৫ বছরের মধ্যে ১০ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করল, সিইসি তাদের চিনতে পারেন। যে বিএনপিকে দেশের ৪০ শতাংশ লোক ভোট দেয়, সিইসি তাদের চিনতে পারেন না। সেখানে তিনি গঠনতন্ত্রেরও ধার ধারেন না। 'প্রয়োজনের নিরিখে' অবৈধ স্বঘোষিত ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবকে সংলাপের চিঠি দেন। আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে জনপ্রিয়দের গুরুত্ব দেন। তাহলে এই সিইসি'র মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচন কী করে সম্ভব হবে? ইতোমধ্যে বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সে প্রশ্ন তুলেছেন।

সংবিধানের ১১৯ ধারায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। তাতে বলা হয়েছে–

'১১৯। (১) রাষ্ট্রপতির পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী–

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

www.pathagar.com

(গ) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন;

(ঘ) রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপযুক্ত দফাগুলো নির্ধারিত দায়িত্বগুলোর অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোনো আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।'

নির্বাচন কমিশন বা সিইসিই'র এটাই সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাকে রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, কে দলে থাকবে না থাকবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব সংবিধান দেয়নি। তিনি সংবিধান সরক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানে শপথ নিয়েছেন। সে হিসেবে তিনি ইতোমধ্যেই সীমানা লঙ্ঘন করে ফেলেছেন বলেই মনে হয়।

এক-এগারোর পরিবর্তনের পর সব জায়গায় এ রকম একটা 'কী যেন হনু'রে ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। কোথায়ও কোথায়ও তা উপেক্ষণীয় হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এসব কী যেন হনুরেরা বুঝতেই পারছেন না, এই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। তাদের অস্তিত্ব ভারি ঠুনকো ভারি ক্ষণস্থায়ী। এসব হনুরেরা তা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করেন ততই মঙ্গল।

০২.১২.২০০৭

www.pathagar.com

আওয়ামী পদাঙ্কে নির্দলীয় সরকার

বর্তমান 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' মুখোশ প্রায় সবটাই এখন খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ১১ জানুয়ারি এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে আওয়ামী মহলে উল্লাসের বন্যা বয়ে যেতে শুরু করে। রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আমলাতন্ত্র সব ক্ষেত্রে সাড়া পড়ে। শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, এই সরকারের সব কাজে সমর্থন দেবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় গিয়ে এই সরকারের সব কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেবেন তিনি। কারণ, তিনি সম্ভবত আগে থেকেই জানতেন যে, এই সরকার সংবিধান অনুযায়ী চলতে পারবে না বা চলবে না এবং তাদের বৈধতা দানের প্রয়োজন হবে।

সংবিধান অনুযায়ী জোট সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়েছিল ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর। ২৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২৮ অক্টোবর থেকে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রঘাতী ও নরহত্যার রাজনীতি শুরু করে। এরপর ৭৭ দিন শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। নরহত্যা, গুণ্ডামি, পাণ্ডামি, খিস্তিখেউড় আবার অবিরাম মিথ্যাচারে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলে। আমদানি-রফতানি বন্ধ, শিল্প উৎপাদন বন্ধ, কলকারখানা, সড়ক যোগাযোগ বন্ধ, নৌ-যোগাযোগ বন্ধ, বন্দর বন্ধ, রেল বন্ধ। নরহত্যার উল্লাস, ধ্বংসযজ্ঞের উল্লাস। অতিষ্ঠ দেশবাসী। সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইছিল দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

তেমনি একটা পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের বদলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। ধারণা করা হয় সংবিধানের ৫৮গ ধারার (৫) নং উপধারা বলে তিনি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে উপধারায় বলা হয়েছে :

'(৫) যদি আপীল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।'

www.pathagar.com

কিন্তু ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কোনো রকম আলোচনা করেছেন বলে শোনা যায়নি। আলোচনা হয়েছে বলে কোনো রাজনৈতিক দল দাবিও করেনি। তা সত্ত্বেও বিএনপি'র চুপ থাকা এবং আওয়ামী লীগের স্বাগত জানানোতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তার নিয়োগে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি নেই। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বর্তমান 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রশাসনকে 'দলীয় প্রভাবমুক্ত' করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার মধ্যে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঢালাওভাবে চুক্তি বাতিল, ক্যাডারের আমলাদের গণহারে বদলি ও ওএসডি করা হয়। তার বদলে নতুন নতুন ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়। কোনো রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়াই গণহারে পদোন্নতি দিয়ে ওএসডি কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, প্রশাসনের প্রায় সব জায়গায় কট্টর আওয়ামীপন্থীরা আসীন হন। ফলে সেসব অফিসে আওয়ামীপন্থী নন, এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানাভাবে নাজেহাল হতে শুরু করেন। কার্যত নির্দলীয়করণের নামে প্রশাসনে ঘটে ব্যাপক আওয়ামীকরণ। যা 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' কাছ থেকে কোনো মতেই কাম্য ছিল না। এই প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা-দক্ষতার কোনো মূল্যায়নই করা হয়নি। ফলে প্রশাসনে আওয়ামী লীগ যে পরিবর্তন চেয়েছিল, সে পরিবর্তন বর্তমান সরকারের আমলে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

এরপর যা শুরু হলো তা হচ্ছে, ব্যাপকভাবে বিএনপি সমর্থক রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার অভিযান। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার জন্য এসব ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট দায়ী বলে অভিযোগ আনা হলো। কারো গুদামে কোনো পণ্য থাকলেই বিচার-বিবেচনা না করে তাদের গ্রেফতার করা শুরু হলো। সে ক্ষেত্রে ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগও করা হলো। ১০ কোটি টাকার মালিক ত্রাণের দশ পিস শাড়ি আত্মসাৎ করতে পারে কি না, সেটা বিবেচনা করে দেখা হলো না। ফলে ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ সাধারণ মানুষের হাসির খোরাকই কেবল যোগাল। আর মানুষ বুঝতে পারল, বিএনপি তথা জোটের রাজনীতি ধ্বংস করার জন্যই 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' এ অভিযান শুরু করেছে। পরে এসব সিন্ডিকেটের কোনো অস্তিত্ব তো পাওয়াই গেল না, বরং তথাকথিত সিন্ডিকেটঅলাদের আটক করার পর দ্রব্যমূল্য আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল। কথিত সিন্ডিকেটঅলারা যেহেতু জেলের ভেতরে তাহলে কেন দ্রব্যমূল্য এমন করে বাড়ল? তখন সিন্ডিকেটের তীর আর কারো দিকে ছোঁড়া গেল না দেখে সরকার বললেন, আন্তর্জাতিক বাজারে দর বাড়ার কারণেই দেশীয় বাজারে পণ্যমূল্য বেড়েছে।

www.pathagar.com

তবে যাই হোক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই অভিযানে আওয়ামী লীগ ঢাক বাজিয়ে সমর্থন যোগাল। আওয়ামী লীগের কিছু নেতাকে গ্রেফতার করা হলেও আওয়ামী লীগ যা যা করতে চেয়েছিল, সরকার সে পথেই অগ্রসর হতে থাকল। সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, সে দায়িত্বের সীমার মধ্যে এরা আর আবদ্ধ থাকছেন না। এরা যা খুশি করছেন বলেও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি সংবিধান। কারণ, তাদের কোনো গণভিত্তি নেই। আর বর্তমান সরকারকে 'সেনাবাহিনী সমর্থিত' সরকার বলে যা উল্লেখ করা হচ্ছে, তা তো স্বাভাবিক। কারণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেকোনো সাংবিধানিক সরকারকে সমর্থন দেয়া সেনাবাহিনীর দায়িত্বের অংশ। ফলে একে বর্তমান সরকারের ক্ষমতার অতিরিক্ত খুঁটি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, যদি আমরা এই সরকারকে সাংবিধানিক সরকার বলে এখনো মানি।

সংবিধানে বর্তমান সরকারকে শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং এই সরকারকে বলা হয়েছে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। আবার সংবিধানে এ ধরনের সরকারের দায়িত্বও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা আছে। সংবিধানের ৫৮ঘ ধারায় যা বলা আছে, তা হলো : '৫৮ঘ। (১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন।'

ব্যস, বর্তমান 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' এর চেয়ে বেশি কোনো কাজ নেই। দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করার প্রয়োজন ছাড়া কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সংবিধান তাদের নিষেধ করে দিয়েছে। আবার প্রধান উপদেষ্টা ও তার উপদেষ্টাম লীতে অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়-অনাত্মীয় উপদেষ্টা এই মর্মে শপথ নিয়েছেন যে, 'আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব; এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।'

তাহলে এই 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' কোন দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক', বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি 'বঙ্গবন্ধু'

www.pathagar.com

লেখা নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন? তুরস্ক, পাকিস্তান, ভারত আর উরুগুয়ে ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে কাউকে 'জাতির জনক' বানানোর প্রয়োজন পড়েনি। ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা ঘোষণা দিয়ে তার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আইন করেছিল। মাত্র ৩৮ শতাংশ মানুষের ভোটের জোরে সে আইন করা হয়েছিল। কিন্তু ২০০১ সালের পর ৬২ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিরা তা বাতিল করে দেয়। কারণ স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের একক অবদান ছিল না। শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করে যুদ্ধও করেননি। শেখ মুজিব গণতন্ত্র হরণ করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার লোভে একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করেছিলেন, বিভিন্ন বাহিনী তৈরি করে দেশে ব্যাপক নরহত্যা চালিয়েছিলেন, তার সরকারের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। তিনি মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলেন। ব্যাপক দুর্নীতি, লুটপাটে দেশ ফোকলা করে দিয়েছিলেন। তারপরও তাকে জাতির জনক হিসেবে মানতে হবে কি না, তা বিবেচনার জন্য গণভোট দেয়া যেত। কিন্তু সে দায়িত্ব সংবিধান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দেয়নি। তবু এই সরকার কেন এতটা মরিয়া হয়ে উঠলেন?

তেমনিভাবে আওয়ামী লীগের আর এক এজেন্ডা ৭ নভেম্বরের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে মুছে দেয়া। ১৯৭৫ সালের পর থেকে আওয়ামী শাসনের পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) ছাড়া এ দেশে বরাবরই ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ এ ছুটি বাতিল করে দেয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাতে শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-সৈনিকসহ অংশ নিয়েছিল সর্বস্তরের মানুষ। অর্জন করেছে স্বাধীনতা। ১৯৭৫ সালে সেই অর্জিত স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের জন্য আবারো তেমনিভাবে শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-ছাত্রজনতা ও সিপাহী একযোগে রুখে দাঁড়িয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে। ৭ নভেম্বর সে কারণেই ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের মতোই গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় দিন। সেই ৭ নভেম্বরের ছুটি বাতিল করে বর্তমান 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' আওয়ামী লীগের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। অথচ শপথ অনুযায়ী তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর 'ভীতি বা অনুগ্রহ, রাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া' কিছু না করার শপথ নিয়েছেন। আর ৭ নভেম্বরের ছুটি বাতিলের সাথে সরকারের কার্যাবলী সম্পাদনের কী সম্পর্ক। এখানে সে শপথ ভঙ্গ করা হয়েছে বলেই মনে হয়।

অর্থাৎ সরকার যা করছেন, তাতে যত ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক, আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। এটা করতে গিয়ে সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতার আওতা

www.pathagar.com

তারা লঙ্ঘন করছেন। অপরদিকে শপথও ভঙ্গ করছেন। তাদের 'নির্দলীয়' ভাবখানা আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সরকার যদি এ পথে অগ্রসর হতে শুরু করে, তাহলে লন্ডন থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'ইকোনমিস্ট' পত্রিকার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হতে পারে। ইকোনমিস্ট লিখেছে, '২০৮ সাল থেকে বাংলাদেশের জন্য একটি খারাপ সময়। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে সেনাবাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতাসীন হওয়া বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সরকার তার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে।... এ বছর সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের অসন্তোষ বাড়বে। সব ক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য।' এই ভবিষ্যদ্বাণী যাতে সত্য না হয়, তার জন্য সরকারকে সংযত পদক্ষেপ নিতে হবে।

০৮.১২.২০০৭

www.pathagar.com

জাগ্রত হোক জাতির বিবেক

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পরাজয়ের ঠিক আগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। পরাজয় যখন সুনিশ্চিত, যখন তারা বুঝতে পারে, স্বাধীনতা অর্জনই করে ফেলেছে বাংলাদেশের মানুষ, তখন এরা এ দেশের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে চাইল। স্বাধীন তো হলো বাংলাদেশ, কিন্তু দাঁড়াতে যেন না পারে মাথা তুলে, তার জন্য মেধাশূন্য করে দিতে হবে দেশকে। এই হীন মানসিকতা থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যরাতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। আজ জাতির সেই সুযোগ্য সন্তানদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এ লেখা শুরু করছি।

শহীদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন তারাই, যারা সদ্য স্বাধীন দেশকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হতে পারতেন। যারা রাজনীতিবিদ ছিলেন না, সম্ভবত এ দেশের কোনো নির্বাচনেও দাঁড়াতেন না। যাদের মন্ত্রী হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, বড় বড় পদ দখলের দরকার ছিল না, যাদের সম্ভবত চাওয়ারও কিছু ছিল না। এরা শুধুই দিতে পারতেন। মানুষ হিসেবে এরা নিরীহই ছিলেন। তেমন কোনো সাতে-পাঁচে ছিলেন না। শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ। তাদের আশঙ্কার সাজুয্য ছিল সাধারণ মানুষের সাথে। সে জন্য এরা খুব উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না। মঞ্চে লাউড স্পিকার ফাটিয়ে বক্তৃতাবাজিতেও ছিলেন না। এরা কেউ ছিলেন শিক্ষক, কেউ সাংবাদিক, কেউ লেখক, কেউবা চিকিৎসক। কিন্তু জাতিকে দেয়ার মতো বিশাল মেধা এদের ছিল। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের ভয় ছিল সেখানেই।

যুদ্ধ তো প্রাণ কেড়ে নেয়ই। যুদ্ধ তো সামাজিক বিপর্যয়ও ডেকে আনে। যুদ্ধে তো ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যুদ্ধ কখনো কখনো অনিবার্য হয়ে ওঠে। সত্য প্রতিষ্ঠা, সঠিক আদায় কিংবা স্বাধীনতা, অথবা দখলদারিত্ব থেকে মুক্তি– এসব কারণে যুদ্ধ কখনো কখনো অনিবার্য। যে যুদ্ধ '৭১ সালে আমরা করেছি, এ দেশের মানুষের অধিকার হরণকারী পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের জন্য সে যুদ্ধ অনিবার্য করে তুলেছিল। যুদ্ধ ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প এরা খোলা রাখেনি। শক্তি

www.pathagar.com

প্রয়োগ যদি কেউ করে, তবে নিশ্চিতভাবেই সে ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়াও থাকবে। সে প্রতিক্রিয়ার চিন্তা করেনি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। তারপর ন্যায়যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি। এ বিজয় মহান।

কিন্তু পরাভূত শক্তি যুদ্ধের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে আমাদের শক্তিকে পঙ্গু করে দিতে চাইল। ততক্ষণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এরা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ী দেশপ্রেমিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে। তারপরও এরা হীন চক্রান্তে নিয়োজিত হলো। অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করল। শেষ করে দাও এদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে। যাতে সদ্য স্বাধীন দেশ পথের দিশা না পায়। যাতে কাণ্ডারিবিহীন ঘুরতে থাকে এরা গভীর সমুদ্রে দিকভ্রান্ত। আর তারই পরিণতিতে এরা গণহারে হত্যা করল এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের।

বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে ক্ষতিটা এরা সত্যিই করতে পেরেছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন জাতির বিবেক। সত্যি সত্যি এরা হতে পারতেন সদ্য স্বাধীন দেশের পথ-প্রদর্শক। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অবর্তমানে আমরা তো স্বাধীনতার পরপর পথ হারিয়েছিলাম। সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পথের দিশা পাচ্ছিলাম না। ফলে শুরুটা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। আমরা দেখেছি, এরপরও যারা বেঁচে ছিলেন, তারা জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। যত দিন সম্ভব, যতটা সম্ভব, লিখে বা বলে এরা জাতিকে পথ-নির্দেশ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সে প্রচেষ্টা একেবারে কোনো সুফল বয়ে আনেনি, সে কথা কেউ বলতে পারবে না।

এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নিজেরা রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। এরা আলোচনার টেবিলে বসেননি, বসার কথাও ছিল না। কিন্তু তাদেরই অক্লান্ত ধারাবাহিক প্রয়াসে জাতির মনন বিকশিত হয়েছে। মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়মূল হয়েছে। এই জনপদের মানুষ তাদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে জানতে পেরেছে। জাতিত্ববোধে বলীয়ান হয়েছে। এরা মানুষকে স্বপ্ন নির্মাণ করতে শিখিয়েছেন। স্বজাত্যবোধে বলীয়ান করে তুলেছেন। ফলে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন দ্বিধায় পড়তে হয়নি কাউকে। ২৬ মার্চ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন তখন সর্বস্তরের মানুষ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য। রাজনীতিবিদরা হয়তো জোয়ার তোলেন, কিন্তু সে জোয়ারের মনোবল তৈরি হয় বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এরা শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার জন্য প্রেরণা যতটা না দিতে পারেন, তার চেয়ে বেশি পারেন মননের শক্তি বিকাশে, মনে দৃঢ়তা তৈরিতে প্রেরণা দিতে। এ কাজ বিশাল। সে বিশাল দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে পালন করে গেছেন আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ।

www.pathagar.com

মানুষের হৃদয়ের শক্তি, মনের শক্তি যোগাতে যারা কাজ করেন, তারা বুদ্ধিজীবী। তাদের মর্যাদা যে জাতি দিতে পারে না, সে জাতির অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমরা তার প্রতিফলন দেখেছি। আমরা দেখেছি, যেসব শাসক আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের পরামর্শকে মূল্য দিয়েছেন, তাদের শাসন সময়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে স্বদেশ। জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে। জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে। যারা মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছেন, যারা তাদের পরামর্শকে মূল্য দেননি, বরং দমিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন, তারা জাতিকে পেছনেই ঠেলেছেন। সামনে যাওয়ার পথ দেখেননি।

এ ধরনের পরিস্থিতি যখন সৃষ্টি হয়, তখন সুবিধাভোগী এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধি তাদের যা-ই থাক, বিবেক তাদের বাধা পড়ে যায় ভিন্ন কোনো স্থানে। এই শ্রেণী বুদ্ধিজীবিতার নামে শাসকগোষ্ঠীর প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠে। তখন বৃহত্তর প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা উপেক্ষিত হতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বিপদ আরো বাড়ে। যখন বিদেশী শক্তি এসব মুখোশধারী একদিকে বিদেশী শক্তির প্রলোভন, অপরদিকে দেশীয় শক্তির তোষণ তাদের আরো শক্তিশালী করে তোলে। এ দেশের শক্তির বদলে অপশক্তি বলেও অভিহিত করা যায়।

প্রকৃত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্ঘশক্তির দরকার হয় না। এরা প্রত্যেকেই এক একটি প্রতিষ্ঠান। ফলে দল বেঁধে সরকারকে তোষামোদ বা তোষণ করার দরকার পড়ে না তাদের। কারণ, তারা কাজ করেন ব্যক্তির হৃদয়ে ও মননে। সেটা কোনো আন্দোলন নয়। নীরবে, নিভৃতে, হৃদয়ের গভীরে। কিন্তু ভুয়া তোষামোদকারী 'বুদ্ধিজীবীদের' কারবার সেখানে নয় বলে তাদের সঙ্ঘশক্তির দরকার হয়। এরা নানা ধরনের স্বার্থবাদী সঙ্ঘ গড়ে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের আড়াল করে ফেলেন। যাতে জাতি সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে না পারে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে এমনই একশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে। এরা নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ বলে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন। এরা বলতে চাইছেন, কেবল তারাই, তাদের সংঘবদ্ধ চক্রই বুদ্ধির বেসাতি করার অধিকার রাখেন। এখানে অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই। এরাই শুধু নাগরিক, এরাই কেবল সুশীল? কোন যোগ্যতায়? দেশ, রাষ্ট্র, সমাজে তাদের অবদান কী? এসব প্রশ্ন করার অধিকার কারো নেই। আপনি সুশীল বলে, আমি কেন সুশীল নই? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে এরা বাধ্য নন। ফলে বুদ্ধির বেসাতি চলছে। আর এরা বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন শাসকদের। ফলে দেশ এগোবার বদলে পিছায়, সমৃদ্ধির বদলে খাবি খায়। এ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। এসব ভাড়াটে সঙ্ঘবদ্ধ 'বুদ্ধিজীবী' শ্রেণীর পরামর্শে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা– সব ক্ষেত্রে আমরা দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারিয়ে ফেলছি প্রতিযোগিতার ক্ষমতা। বিভ্রান্ত হচ্ছে নীতিনির্ধারকরা।

www.pathagar.com

কিন্তু ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে যে মহৎপ্রাণ বুদ্ধিজীবীরা শাহাদাৎ বরণ করেছেন, তারা ছিলেন জাতির প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। সেটাই তাদের কাল হয়েছিল। কিন্তু তাদের আত্মোৎসর্গ আমাদের দিয়ে গেছে শিক্ষা। সে শিক্ষা হলো, মুক্তবুদ্ধির চর্চার ভেতর দিয়ে জাতির বিবেককে জাগ্রত করার মধ্য দিয়েই জাতিকে এগিয়ে নিতে হবে। সে প্রয়াসে কোনোরূপ আপস যেন না করি। সে আপসে নিজের স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে, জাতির স্বার্থ উদ্ধার হয় না। আজ মহান বুদ্ধিজীবী দিবসে তাই আমরা আবারো শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাদের শান্তি কামনা করি।

১৪.১২.২০০৭

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের সরল সমীকরণ

২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবেই। যথাসময়েই নির্বাচন হবে। ডিসেম্বরের আগেও নির্বাচন করা সম্ভব। সব কিছু ঠিকঠাক মতো চললে এ বছরের মাঝামাঝিও নির্বাচন করা সম্ভব। এ রকম কথাবার্তা কিছু দিন ধরে বলতে শুরু করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্য উপদেষ্টারা। আর বলছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান দাবি করেছেন, রোডম্যাপে যাই থাকুক না কেন, নির্বাচন করুন জুন-জুলাইয়ের মধ্যে।

এর মধ্যে শেখ হাসিনার কানের অসুখের খবর এলো বিশেষ কারাগার থেকে। চিকিৎসা দরকার শেখ হাসিনার। সে চিকিৎসার জন্য তাকে যেতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে। কারা কর্তৃপক্ষ বললেন, কোনো কারাবন্দীকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর বিধান নেই। তার আগে সাবজেলে চিকিৎসা নেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। এ খবর দিয়ে কারা কর্তৃপক্ষ জানান, শেখ হাসিনার চিকিৎসার জন্য তিনি দেশের যে ডাক্তার চান, তার মাধ্যমেই তাকে চিকিৎসা দেয়া হবে। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে রাজি হননি শেখ হাসিনা। জিল্লুর রহমান আবার দাবি তুলেছেন, চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হোক। বিদায়ী তথ্য ও আইন উপদেষ্টা তার জবাবে বললেন, বিদেশে চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আবেদন করা হলে সরকার তা বিবেচনা করে দেখবে।

আর সবশেষ গত ৮ জানুয়ারি সংসদ ভবনের দায়রা জজ আদালতে তার আইনজীবীদের সাথে আলাপকালে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমাকে ছাড়াই আপনারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিন। কোনো শর্ত দিয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাব না। তিনি তার দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'বিভিন্ন শর্ত আমি পত্রিকার মাধ্যমে পড়েছি। শর্তে বলা আছে, মামলার রায় মেনে নিতে হবে। তাতে কি ধরে নেব, মামলার রায় কী হবে, তারা তা জানে, রায় তৈরি হয়ে আছে। যে দেশে অন্যের কথায় রায় হতে পারে, সে দেশে অন্যের কথায় মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও তৈরি হতে পারে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

www.pathagar.com

চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনাকে বিদেশে পাঠানোর সম্ভাবনার খবর প্রকাশের পর পরই পত্রপত্রিকায় নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনার কথা ছাপা হতে শুরু করে। তাতে বলা হয়, শেখ হাসিনা নাকি দাবি করেছেন, তাকে বিদেশে পাঠাতে হলে চিকিৎসার নামে বেগম খালেদা জিয়াকেও বিদেশে পাঠাতে হবে। তবে বেগম খালেদা জিয়া বিদেশে চিকিৎসার কথা মোটেও ভাবছেন না বলে পত্রপত্রিকার রিপোর্টে জানা যায়। বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর প্রসঙ্গটি আসে শেখ হাসিনাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর প্রসঙ্গেই। ক'দিন আগেও সরকারের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত সাবেক তথ্য ও আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের কথা থেকে এ প্রসঙ্গটি আসে। শেখ হাসিনাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে কি না– সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, প্রস্তাব পেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবে।

শেখ হাসিনাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর কথা বলেছেন তার চিকিৎসক ও আইনজীবীরা। সেখানে বর্তমানে সাবেক হয়ে যাওয়া তথ্য উপদেষ্টা যখন খালেদা জিয়ারও বিদেশে চিকিৎসার কথা তোলেন, তখন সংশয়ের কারণ ঘটে যে, ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

হ্যাঁ, ডালে যে কালা আছে, তা এখন ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শেখ হাসিনার সবশেষ বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে তার আভাস পাওয়া যায়। প্রথমত, তিনি এখন দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে আগ্রহী। সে ক্ষেত্রে তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তিনি চান, আগামী নির্বাচনে তার দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক এবং নির্বাচনে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে আসুক।

প্রথম দিকে বর্তমান অনির্বাচিত শাসকগোষ্ঠী আশা করেছিল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে ভেঙে তার টুকরো অংশকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে একটি গোঁজামিলের পার্লামেন্ট গঠন করবে। আর তার মাধ্যমে তাদের সব অনিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমকে বৈধতা দেবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অবশ্য শুরুতেই ঘোষণা দেন যে, এই সরকারের সব কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেবে তার দল।

সে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে 'সংস্কার'-এর ধুয়া তুলে বেছে নেয়া হলো বিএনপি'র শিকড়বিহীন নেতা আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে। তার সাথে গলা মেলালেন বিএনপি'র ইমিটেশনের অলঙ্কার দলের কয়েকজন উপদেষ্টা। আবার এলেন জনাতিনেক এমপি। তারা কিছুদিন সেজে-গুঁজে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বসলেন। টক শোতে সংস্কার নিয়ে গলা ফাটালেন। বেগম খালেদা জিয়াকে কিভাবে রাজনীতি থেকে বাদ দেয়া যায়, তার ফর্মুলা দিলেন। সে কি কুয়াত এক একজনের কণ্ঠে। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার আগে বেগম খালেদা জিয়া যখন মান্নান ভূঁইয়াকেই দল থেকে বের করে দিলেন, তখন তাদের সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেল। দেখা গেল, তার কাছে আর কাক-পক্ষীও যায়

www.pathagar.com

না। ইতোমধ্যে মান্নান ভূঁইয়ার দক্ষিণহস্ত হিসেবে আবির্ভূত আশরাফ হোসেন শুল্কমুক্ত গাড়ি বিক্রি মামলায় জেলে। অন্য দু'জন পলাতক। এখন আর তাদের কোথায়ও দেখা যায় না। ফলে যারা বিএনপিকে ভাঙতে চেয়েছিলেন মান্নান ভূঁইয়াকে দিয়ে, তারা উপলব্ধি করলেন তিনি কী মাত্রার ফাঁপা বেলুন, মাকাল ফল। ফলে তারা দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন মান্নান ভূঁইয়ার ওপর থেকে। কিন্তু দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি যে ভাঙতেই হবে। উপায়? তারা সওয়ার হলেন সাইফুর রহমানের ওপর। অশীতিপর এই বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ কেন জানি না, দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসলেন। স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বাসায় চায়ের দাওয়াত দিয়ে, সেটাকে সভা বলে দেখিয়ে দলের গঠনতন্ত্র বহির্ভূতভাবে নিজেকেই দলের অস্থায়ী চেয়ারপারসন ঘোষণা দিয়ে বসলেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভার সদস্য অব: মেজর হাফিজকে দলের মহাসচিব ঘোষণা দিলেন। মুছে গেলেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া গং। হুইল চেয়ারে চলাচলকারী সাইফুর রহমানের পক্ষে বেগম খালেদা জিয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়ে দল গঠন করাও যে পিঠ দিয়ে পাহাড় ঠেলার মতো ব্যাপার হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাইফুর-হাফিজ গং ক'দিন বেশ জিয়টেই ছিলেন। আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার একেবারেই লজ্জা-শরম ভেঙে মান্নান ভূঁইয়ার পক্ষে দাঁড়ালেন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে। তিনি বিএনপি'র গঠনতন্ত্র বুঝতে চাইলেন না। প্রয়োজনের খাতিরে বা ডকট্রিন অব নেসেসিটির যুক্তি দেখিয়ে সাইফুর-হাফিজ-মান্নানের পক্ষ নিলেন। এরপরও নিরপেক্ষ থাকেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার? আদালতের আদেশে তিনি কিছুটা থমকে গেছেন। নইলে এতদিনে আরো না জানি কত বেফাঁস কথা বলতেন! তারপরও কি বিএনপি ভাঙা গেছে? কল্কি কি পাচ্ছেন সাইফুর-মান্নান-হাফিজ গং? না পেলেও বিএনপি'র বেশ ক্ষতি করা গেছে এ সময়ে।

অন্যদিকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আমীর হোসেন আমু, মুকুল প্রমুখ কয়েকজন দলে সংস্কার আনার ঘোষণা দিয়ে চেপে গেছেন। শেখ হাসিনা গ্রেফতার হওয়ার পর তারা শেখ হাসিনাকেই নেতা মেনে আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছেন। ফলে শেখ হাসিনাকে বাদ দেয়া বা সংস্কারের ধুঁয়ায় আওয়ামী লীগের তেমন কোনো ক্ষতিই হয়নি। বিএনপি'র শীর্ষ এবং মাঝারি সারির সব নেতা জেলে কিংবা পলাতক। গুটিকয়েক ছাড়া আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতা মুক্ত আছেন। ফলে নির্বাচন আদৌ হলে সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগেরই বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাহলে ওই নির্বাচন করবেন না কেন শেখ হাসিনা? এক শ'বার করবেন।

আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে কিংবা অন্য কারো সাথে জোট বেঁধে তারাই সরকার গঠন করবে। সে সরকারের প্রথম কাজ হবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা সরকার পরিচালনা করছেন, তাদের গত দু'বছরের সব কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়া। সে কাজেও আওয়ামী লীগের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ তাতে আওয়ামী লীগের যে ক্ষতি না হবে, তার চেয়ে শতগুণ বেশি ক্ষতি হবে বিএনপি তথা জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

শক্তির। যা বর্তমান সরকারও চায় বলেই মনে হচ্ছে। আওয়ামী লীগও চায়। অন্যদিকে ক্ষমতায় গেলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা সম্ভব। ফলে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে রাজনীতি থেকে হঠিয়ে দেয়া যাবে। চিরদিনের জন্য আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত হবে। এরকমই নিশ্চয় আশা করছেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ।

এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা গেলে পেছনের শক্তিকে কখনো না কখনো সরে যেতে হবে। আওয়ামী লীগও চাইবে একচ্ছত্র ক্ষমতা। সে ক্ষমতা হাতে পেলে শেখ হাসিনার দেশে ফিরে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণে কোনো বাধা থাকবে না। আর পরোক্ষ শাসকদের অবিরাম চাপের মুখে রাখতে শেখ হাসিনা চলে আসতে পারেন ভারতের কলকাতায়। সেখান থেকে অবিরাম বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে পরোক্ষ শাসকদের চাপে রাখতে পারবেন। ততদিনে সাজা পেয়ে জেলে পচবে বিএনপি নেতৃবৃন্দ।

আওয়ামী লীগের দিক থেকে হতে পারে এটা একটা সরল সমীকরণ। সুতরাং নির্বাচন চাই যত দ্রুত সম্ভব। শেখ হাসিনা ততদিন থাকুন বিদেশে, মুক্ত পরিবেশে। তাতেও কাজ হবে। কারণ, শেখ হাসিনা জানেন, কী করে নিয়মিত মিডিয়ায় সরব উপস্থিতি বজায় রাখা যায়। তাই বিদেশে থেকেও সম্ভাব্য নির্বাচনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন।

এ ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর রক্ষাকবচ তাহলে কী হতে পারে? সেটাও ভাবার বিষয়। রক্ষাকবচ হতে পারে সম্ভবত একটাই, তা হলো কোনো একটি মামলায় শাস্তি দিয়ে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে শেখ হাসিনাকে বিরত রাখা। সে ব্যবস্থা মেনে নিতেও শেখ হাসিনা আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। কারণ, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসলে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সে পরিস্থিতি থেকে শেখ হাসিনাকে মুক্ত করতে বেশি সময় নেবে না। আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদী নেতারাও ইতোমধ্যে উপলব্ধি করেছেন যে, আওয়ামী লীগের জনসমর্থনের যে ভিত্তি তা শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করেই এবং তিনি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন এ অবস্থাই বহাল থাকবে। তা ছাড়া শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ঐক্যেরও প্রতীক। তাকে বাদ দিয়ে কোনো আওয়ামী লীগের চিন্তা করা হলে, এর পক্ষে জনসমর্থন আদায় করা কঠিন হবে। তাতে বরং ভেঙে খান খান হয়ে যাবে আওয়ামী লীগ। তাতে সংস্কারবাদী আওয়ামী লীগ নেতাদের কোনো লাভ তো হবেই না, বরং এক সময় গোটা দলই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার প্রমাণ আগেও আছে। শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে যে আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালের পরে ছিল, তা ছিল খণ্ড-বিখণ্ড। শেখ হাসিনা হাল ধরার পরই তার পুনর্জন্ম ঘটে। এই বাস্তবতার নিরিখে সংস্কারবাদী আওয়ামী লীগাররা শেখ হাসিনাকে বাদ দেয়ার অপচেষ্টা আর করবেন বলে মনে হয় না। শেখ হাসিনা এটা জানেন। জানেন বলেই তিনি সাময়িকভাবে দল থেকে কিছুটা দূরে থাকার ঝুঁকি নিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

www.pathagar.com

তাহলে বিএনপি'র কী হবে? দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ বিএনপি'র রাজনীতির সমর্থক। বিএনপি নেতাদের জেলে পুরে, শাস্তি দিয়ে সমর্থনের এই হার তো কমানো যাবেই না, বরং তা আরো বাড়বে। সে শক্তিকে যারা উপেক্ষা করতে চাইছেন, তারা কার্যত আহাম্মকের স্বর্গেই বসবাস করছেন। রাজনীতিতে চালাকির মাধ্যমে জনগণকে এক-আধবার হয়তো বোকা বানানো যায়, বার বার যায় না। সুতরাং এসব কৌশলে বিএনপিকে বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ধ্বংস করে দেব- এ ভাবনা যারা ভাববেন, তারা ভুল করবেন। অন্য সব রাজনীতি নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা চিরস্থায়ী করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে। তার সে অপচেষ্টা সফল হয়নি। হয়ও না। বরং এই অপচেষ্টাকারীদেরকেই করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়। সুতরাং যারা রাজনীতিকে দুমড়ে-মুচড়ে নতুন কাঠামো দেয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের ব্যর্থতা অনিবার্য। আর এই চেষ্টায় গত এক বছরেই দেশে চরম হাহাকার উপস্থিত হয়েছে। সব ক্ষেত্রে দেশ যাচ্ছে পেছনের দিকে।

তাই আমাদের বক্তব্য, রাজনীতিকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিন। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথ সুগম করুন। জনকল্যাণের নামে জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে শুধু তাদের বিতৃষ্ণাই অর্জন করা সম্ভব; অন্য কোনো কল্যাণ সম্ভব হবে না।

১২.০১.২০০৮

www.pathagar.com

'সত্যিকার গণতন্ত্র' অজানা গন্তব্যে

সংস্কারের পর এবার নতুন চমক 'সংলাপ'। নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশন এ সংলাপ শুরু করেছিল বেশ আগেই। সে সংলাপের ফলাফল এখন পর্যন্ত তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদার বিএনপি সম্পর্কে কিছু অনভিপ্রেত মন্তব্যের কারণে তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। আদালতের নির্দেশের কারণে দেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপি'র সাথে কোনো আলোচনাও এরা করতে পারেননি। নির্বাচন কমিশন এ সংলাপ শুরু করার পরপরই কয়েকটি রাজনৈতিক দল দাবি তোলে, এরা সরকারের সাথেও নির্বাচন ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কথা বলতে চান। প্রতিক্রিয়ায় সদ্য বাদ পড়া তথ্য ও আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছিলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের সংলাপের কোনো প্রয়োজন নেই। সে সময় ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন যেভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিলেন, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল, তিনি সরকারের মুখপাত্র হিসেবেই কথাবার্তা বলছেন। কিন্তু ৮ জানুয়ারি মইনুল হোসেনসহ চার উপদেষ্টার বহিষ্কারের পর দৃশ্যপটে কিছুটা হলেও পরিবর্তন ঘটেছে।

গত ১২ জানুয়ারি বর্তমান অনির্বাচিত সরকারের বর্ষপূর্তিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। সে ভাষণে সরকারের নানা সিদ্ধান্তে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। ভাষণে তিনি বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপ অনুযায়ী এমনকি সম্ভব হলে তার আগেই সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর। এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ নেই।' তিনি বলেন, '২০০৮ সাল আমাদের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর। কেননা, জনগণ ও সরকারের আকাঙ্খা অনুযায়ী একটি নির্ধারিত রোডম্যাপ অনুসরণ করে আমরা সত্যিকার গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাব। বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরণ বিরল। কিন্তু আমরা সেটাই করতে যাচ্ছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। ঢাকার বাইরে সারাদেশে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি। তা ছাড়া প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে জরুরি অবস্থা শিথিল বা প্রত্যাহারের বিষয়টিও আমরা বিবেচনা করব। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের সংলাপ অনুষ্ঠানের বিষয়ে উপদেষ্টা

www.pathagar.com

পরিষদ গত পরশু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা শিগগিরই এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।' তিনি আরো বলেন, 'আমি আপনাদের সুস্পষ্টভাবে জানাতে চাই, কোনো রাজনৈতিক দল বা শক্তি আমাদের প্রতিপক্ষ নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ বছরের শেষ নাগাদ আমরা দেশে বহুত্ববাদী এমন এক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারব, যাতে বাংলাদেশের সাড়ে ১৪ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে। এটা হবে এমন এক ব্যবস্থা, যা জনমতের ওপর নির্ভর করে টিকে থাকবে। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুরক্ষার জন্য আমরা যেসব নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি বা শক্তিশালী করেছি, এ ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।'

রাজনৈতিক দলগুলো যখন দাবি তুলেছিল যে, দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরুর জন্য ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি তুলে নেয়া হোক এবং জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হোক। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার নয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সরকারকে সে পরামর্শ দেয়ার অধিকার রাখে। প্রধান উপদেষ্টা সংবিধান অনুযায়ী 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন। সে শপথ যদি তিনি ভঙ্গ না করেন, তবে সংবিধান অনুযায়ী তার দায়িত্ব হচ্ছে, 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সব সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা দেবেন। (৫৮ঘ) (২)' অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া দরকার তাহলে সংবিধান ও শপথ অনুযায়ী জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারে বর্তমান সরকার বাধ্য।

কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের তেমন কোনো প্রয়োজন তো বোধ করলেনই না, বরং তিনি বললেন, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া অপরিহার্য নয়। পাকিস্তান আমলে ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডিন্যান্স (এলএফও)-এর অধীনে নির্বাচন হয়েছিল এবং সে নির্বাচন খুব নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু সে সময় দেশ ছিল মার্শাল ল'র অধীন। মার্শাল ল'র অধীনে যদি নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে, তাহলে জরুরি আইনের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে বাধা কোথায়?

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এ বক্তব্যে কিছুটা যে বিভ্রান্তি নেই, সে কথা বলা যাবে না। কারণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডিন্যান্স থাকলেও ওই বছর ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তাতে সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিলে বাধা তাতে দূর হয়। এবং সে বাধা দূর করা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য, যা জনগণের মতামত প্রতিফলনের জন্য খুবই জরুরি। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের জন্য সম্মানজনক হতো, যদি তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সরকারকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে বলতেন। কিন্তু কমিশন তা করেনি।

www.pathagar.com

যে প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের উপলব্ধি করার কথা ছিল, সে প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি তার ১২ জানুয়ারির ভাষণে জানিয়েছেন, প্রয়োজনে জরুরি অবস্থা শিথিল বা প্রত্যাহার করা হবে। তা ছাড়া এই সরকারের শক্তির পেছনে যে সেনাবাহিনীর সমর্থন রয়েছে সে কথা খুব স্পষ্ট। সে কারণেই বর্তমান সরকারও রাখঢাক না করেই বলেছেন, বর্তমান সরকার সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকার। সে ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী প্রধানও ঘোষণা দিয়েছেন, নির্বাচনের সময় জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এসব বিষয় থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

তবে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে কিছু বিষয় ধোঁয়াটেই রয়ে গেল। বর্তমান সরকারের এক বছরের শাসন সময়ের বহু দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কথা তিনি তার ভাষণে আমাদের জানিয়েছেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যাবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কাছে। সে ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্বহীন জনবিচ্ছিন্ন একটি সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে নির্বাচিত সরকার যে অগ্রসর হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়। গত এক বছরে বর্তমান সরকারের বহু সিদ্ধান্ত ভুল ও জনবিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে। সরকারের এখতিয়ারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ফলে জনদুর্ভোগ বেড়েছে। অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে স্থবিরতা এসেছে। শত কথা সত্ত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য চলে গেছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। সে পরিস্থিতিতে এরা এতসব দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় হাত দিলেন কেন?

তিনি বলেছেন, এরা দেশকে সত্যিকার গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাবেন এবং বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরণ বিরল। কিন্তু গণতন্ত্রের আগে বিশেষণ দেখলেই আমরা ভয় পাই। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে একদলীয় স্বৈরশাসন ব্যবস্থা বাকশাল চালুর আগে আওয়ামী লীগ নেতারা অবিরাম 'সত্যিকার গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিচ্ছিলেন। আমরা সাধারণ মানুষ ভয় পেয়েছিলাম যে, সে 'সত্যিকার গণতন্ত্রের' স্বরূপ না জানি কি হয়। কারণ অমারা তো গণতন্ত্র বলতে বুঝি, সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিত্বকারীরা সরকার গঠন করবেন। জাতীয় সংসদ হবে সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে বিরোধী দলের সদস্যরা জনগণের কল্যাণ ও স্বার্থের দিকটা তুলে ধরবেন, সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেবেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আবার নির্বাচন হবে। সে নির্বাচনে যারা জয়ী হবেন, তারাই সরকার গঠন করবেন। কিন্তু শেখ মুজিবের সত্যিকার গণতন্ত্র যখন এলো, তখন দেখা গেল বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা সবই হরণ করে নেয়া হয়েছে। আশা করি, প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় তেমন কোনো 'সত্যিকার গণতন্ত্র' উপহার দেয়ার কথা ভাবছেন না। শেখ মুজিবুর রহমানের আগে পাকিস্তানের একনায়ক জেনারেল আইউব খানও গণতন্ত্রের আগে 'মৌলিক' বিশেষণ যুক্ত করে এক অদ্ভুত গণতন্ত্র উপহার দিয়েছিল। সে গণতন্ত্রও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

তবে তিনি সত্যিকার গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলেই থামেননি। তিনি বলেছেন, বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরণ বিরল। এ কথার মাজেজাও বোঝা বেশ কষ্টকর। কারণ, গণতন্ত্র তো বাংলাদেশে ছিল। কোনো গণতান্ত্রিক দেশেরই শুরুটা খুব মসৃণ নয়। সে গণতান্ত্রিক লোকরাই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল বলেই প্রধান উপদেষ্টার মতো ব্যক্তিরা ক্ষমতার স্বাদ লাভ করছেন। রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার লোভের কারণে গণতন্ত্রের পথযাত্রায় সাময়িক বিরতি ঘটেছে। এ ধরনের বিরতির আশঙ্কা থেকেই তো তত্ত্বাবধায়ক নামক বিরল সরকারের জন্ম। সুতরাং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার জন্য নির্বাচন বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা হতে যাবে কেন?

তিনি আরো বলেছেন, 'এ বছরের শেষ নাগাদ আমরা দেশে বহুত্ববাদী এমন এক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারব, যাতে বাংলাদেশের সাড়ে ১৪ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে। একদিকে 'সত্যিকার গণতন্ত্র' অপরদিকে 'বহুত্ববাদী ব্যবস্থা' আমাদের সংশয়কে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে। কী এই বহুত্ববাদী ব্যবস্থা? সেটাই কি সত্যিকার গণতন্ত্র? এটা খোলাসা করে বলেননি প্রধান উপদেষ্টা।

প্রশ্ন তো উঠছেই। বহুত্ববাদ মানে কি তবে গণতন্ত্র নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা? বহুত্ববাদ মানে কি তবে সরকারের মর্জি মাফিক নির্বাচিত করে আনা বিভিন্ন দলের একশ্রেণীর শেকড়বিহীন পরগাছাদের সরকার ব্যবস্থা? নাকি সেনাবাহিনীও থাকবে তাদের রাখাল হিসেবে? কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান তো বারবার বলছেন, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের কোনো অভিপ্রায় নেই। তাকে কেন এসব কথা বারবার বলতে হচ্ছে? কারণ নানা মহল থেকে বারবার এই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষায়িত গণতন্ত্রের ঘোষণায়ও সে প্রশ্নের সুযোগ আছে।

সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা তার ঘনিষ্ঠজনদের বক্তব্যের দিকেও খেয়াল রাখতে পারেন। তার আশপাশের লোকরাও তো কথা বলতে শুরু করেছেন। তারা বলছেন, রাজনীতি শুধু নয়, অর্থনীতিতেও জরুরি অবস্থা চলছে। এ অবস্থা বেশিদিন চললে দেশের অবস্থা আরো ভয়াবহ হবে। আমরা আগে থেকেই বলছিলাম, অবস্থা যত দীর্ঘায়িত হবে, সঙ্কট ততই বাড়বে। সঙ্কট বাড়ছে। সরকার নির্ভর করেছিল আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ওপর। তারাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, সরকারের ভুল নীতির বিরুদ্ধে। আইএমএফ তো বলছে, প্রবৃদ্ধি নামবে ৫.২ শতাংশে– যা ছিল প্রায় ৭ শতাংশ। অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন, ৫ শতাংশও কম নয়, অনেক দেশে তাও হয় না। কী ভয়ঙ্কর আত্মপ্রসাদ! সরকার যদি মনে করে থাকেন, তারপরও জনগণ তাদের ভালোবাসতে থাকবে, তাহলে বড় ভুল হয়ে যাবে। কারণ, দেশ জনগণের। উৎপাদন-উন্নয়ন জনগণ করে, সরকার নয়। তাদের সে পথ এখন রুদ্ধ। তাহলে প্রধান উপদেষ্টাকে পরামর্শ দেয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওই গানটি শুনুন– 'এ পথ গেছে কোনখানে তা কে জানে তা কে জানে!' এমন অনিশ্চিত পথে কিছুতেই চলবে না এ দেশের মানুষ।

২৫.০১.২০০৮

www.pathagar.com

আমরা যখন বাদ্যি বাজাই

বর্তমান জরুরি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্যের বাদ্য যখন বাজানো হয়, তখন সাধারণত বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে আছে, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, প্রশাসনকে 'নিরপেক্ষ'করণ, আর দুর্নীতি দমন। কিন্তু এর কোনো কিছুই যে সরকারের মুকুটে অতিরিক্ত পালক যোগ করছে না, তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বিষয়গুলো এক এক করে বিশ্লেষণ করা যায়। নির্বাচন কমিশনের কথাই ধরা যাক প্রথমে। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের মধ্যে কী কৃতিত্ব তা আমাদের কাছে কখনো স্পষ্ট হয়নি। নির্বাচন কমিশনে ১১ জানুয়ারির আগে যারা ছিলেন, তাদের সাথে বর্তমান সরকার যে আচরণ করেছেন, তাকে কি ভব্যতা বলা যায়? নির্বাচন কমিশনে যারা ছিলেন, তারা সাংবিধাকিভাবেই সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট মেয়াদ ছিল। গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের নিয়োগ দেয়া কমিশনাররা তাদের মেয়াদ শেষ করেই সাংবিধানিকভাবে চলে গেছেন। আওয়ামী লীগ তো রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দিয়েছিল। রাজনৈতিক সরকার তা দিতেই পারে। তাদের অধীনেই ২০০১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শুধু নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিয়ে যে জনগণের ভোট পাওয়া যায় না, সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের নিয়োগ দেয়া নির্বাচন কমিশনের অধীনেই ২০০১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। মনে প্রশ্ন থাকলেও বিএনপি তথা চারদলীয় জোট ওই কমিশনারদের অধীনে নির্বাচন করব না- এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন দাবি তোলেনি। চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও তাঁরা নির্বাচন কমিশনে ছিলেন এবং সংবিধান অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই চলে গেছেন। চারদলীয় জোটকে ধন্যবাদ দিতেই হয় যে, বর্তমান সরকারের মতো কৌশল ও অপদস্থ করে তাদের বিদায় করার চেষ্টা তারা করেননি। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সে প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রেখে তারা যথার্থ কাজই করেছিলেন। সেটা দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক। গণতান্ত্রিক সরকারকে এই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতেই হয়। সংবিধান ও সাংবিধানিক পদগুলোকে মর্যাদা দিতেই হবে। গণতান্ত্রিক সরকারের গণভিত্তি থাকে বলেই তারা সংবিধানকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে পারেন

www.pathagar.com

না। তাদের জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু বর্তমান সরকারের কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় পরিস্থিতির বরং অবনতিই হয়েছে, উন্নতি কিছু হয়নি।

সাংবিধানিক পদ থেকে সাবেক নির্বাচন কমিশনারদের বিদায় করে নতুন কমিশনারদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিয়ে যে ভাষায় কথা বলছেন তাতে বিশেষ রাজনৈতিক দল বা গ্রুপের প্রতি তাদের পক্ষপাত প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু সাবেক নির্বাচন কমিশন সদস্যরা এ ধরনের পক্ষপাতমূলক বক্তব্য কখনো দেননি। তবু তাদের সরিয়ে দেয়াকে একটা কৃতিত্ব হিসেবে জাহির করছে সরকার।

দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি'র বিরুদ্ধে তিনি যে খুব ক্ষেপে আছেন, দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে তার বিভিন্ন বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর আওয়ামী লীগের প্রতি তার ভালোবাসার কথাও গোপন করেননি। নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনার জন্য বিএনপি'র মহাসচিব হিসেবে তিনি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে আমলেই নেননি। তিনি দলছুট অব: মেজর হাফিজকেই বিএনপি'র মহাসচিব সাব্যস্ত করে আলোচনার জন্য তাকে চিঠি দিয়েছেন। যদিও তিনি মনে করেন যে, আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করে ভারি অন্যায় কাজ হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনি কেন মান্নান ভূঁইয়াকে বৈধ মহাসচিব ধরে নিয়ে তাকেই আলোচনার চিঠি দিলেন না, তাও বোঝা গেল না। আবার বিএনপি চেয়ারপারসন মনোনীত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। বিএনপি সম্পর্কে তিনি যেসব উক্তি করেছেন, তাতে তিনি মারাত্মকভাবে নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেছেন।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে কী দেখা গেল? যে অব: মেজর হাফিজের জন্য তিনি এতটা ব্যাকুল হলেন, সেই হাফিজই রণে ভঙ্গ দিয়ে খোন্দকার দেলোয়ারের নেতৃত্বে কাজ করে যাওয়ার শপথ ঘোষণা করেছেন। সাইফুর রহমানও পিছিয়ে গেছেন। এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাকে বিএনপি'র বৈধ মহাসচিব হিসেবে মেনে নেবে? খোন্দকার দেলোয়ারকে? নাকি তিনি মান্নান ভূঁইয়াকে বিএনপি মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাকেই আলোচনার জন্য চিঠি দেবেন?

এদিকে অপর একজন নির্বাচন কমিশনার এক চমকপ্রদ বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ভোটার তালিকার কাজ শেষে ২০০৮ সালের মধ্যেই নির্বাচন হবে। তবে সে নির্বাচনে কে অংশ নিল বা না নিল, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাচ্ছেন না। দারুণ উক্তি, ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির ঘোষিত নির্বাচনে তো আওয়ামী লীগ অংশ নিচ্ছিল না। কিন্তু বিএনপি অংশ নিতে যাচ্ছিল। তাহলে সে নির্বাচনী শিডিউল বাতিল করে জরুরি অবস্থার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো কেন? ২০০৮ সালের সম্ভাব্য নির্বাচন কি তাহলে তেমনি আর এক জরুরি অবস্থার প্রয়োজন হবে? নির্বাচনে খেলোয়াড় রাজনৈতিক দলগুলো। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা রেফারির। যে খেলা হওয়ার কথা

www.pathagar.com

আবাহনী-মোহামেডানের মধ্যে, সে খেলা যদি মেরাদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়াচক্র আর কালকিনি দুস্থ শিশু স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে হয়, তাহলে মাঠে রেফারি থাকা না থাকা সমান কথা দাঁড়ায়। নির্বাচন কমিশনাররা আশা করি সে কথা উপলব্ধি করবেন।

এত সব ঘটনার পর নির্বাচন কমিশন সংস্কারের বাদ্যি আর না বাজানোই বোধকরি ভালো।

বর্তমান সরকারের আর এক গৌরব বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ। সন্দেহ নেই, কাজটি উত্তম হয়েছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এক সময় বিচার বিভাগ সত্যি স্বাধীন হবে এমন আশা করা যায়। কিন্তু বিচার বিভাগ স্বাধীন করার প্রক্রিয়া তো রাজনৈতিক সরকারগুলোই শুরু করেছিল। এর দাফতরিক কাজকর্মের প্রায় ৯০ শতাংশই তো তারাই সম্পন্ন করে গিয়েছিল। তাই বিচার বিভাগ স্বাধীন কৃতিত্ব গ্রহণের সময় রাজনৈতিক সরকারগুলোর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা ভালো।

সরকার কথায় কথায় আরো একটি পুনর্গঠন নিয়ে গর্বে বুক ফোলান। সেটা হলো পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, কমিশন শুধু দলীয় লোকদের নিয়োগ দিয়েছে। এই হল্লা-চিল্লা করেছিল আওয়ামী লীগ। শুধু চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধাচরণের জন্য আওয়ামী লীগ এমন অসঙ্গত অবিবেচনাপ্রসূত প্রচারণা চালাতে শুরু করে। তার সাথে যোগ দেয় ষড়যন্ত্রকারী ও বিদেশী স্বার্থের মুখপত্র কিছু সংবাদ মাধ্যম। বর্তমান জরুরি সরকার ক্ষমতায় এসেও সে ঢাক নতুন করে পেটাতে শুরু করে। এ কথা কখনো প্রমাণ করা যায়নি যে, পিএসসি কেবল দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দিয়েছে। যাদের সাধারণ কা জ্ঞান আছে, যারা পিএসসি'র নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য ধারণাও রাখেন, তারা জানেন অযোগ্য লোকদের পিএসসিতে নিয়োগ দেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ধারণা করি, পিএসসি নিয়ে যারা এত হল্লা-চিল্লা করেন তাদের সেখানকার নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো বাস্তব জ্ঞান নেই। কিন্তু ঢালাও অভিযোগ করে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটিকে শুধু কলঙ্কিত করার চেষ্টাই চালানো হয়েছে। পিএসসি সদস্যদের তাই জবরদস্তিমূলকভাবে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। সরকার সেখানে নতুন লোক নিয়োগ দিয়েছেন। এতে গুণগত পরিবর্তন কিছুই হয়নি। সরকার যে সন্তদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করল, তাদের মধ্যে থেকে অর্ধেক সন্তকে কেন বিদায় নিতে হলো? তারা যদি খারাপ কাজ করে থাকেন, তাহলে তার দায়িত্ব তো সম্মিলিতভাবে প্রধান উপদেষ্টাসহ টিকে যাওয়া অন্য উপদেষ্টাদেরও নেয়ার কথা। তারা তা নিলেন না। কেন?

তখন পিএসসি পুনর্গঠন করে সন্তদের বসানো হয়েছে। কিন্তু গুণগত পরিবর্তন কী হয়েছে? এই পিএসসি পরীক্ষাদি নিয়ে কিছু চিকিৎসকের পদোন্নতির বিষয়টি চূড়ান্ত করেন কিন্তু না, পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে, অনেক অযোগ্য চিকিৎসককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা নিল সন্ত পিএসসি, রায় দিচ্ছে পত্রিকা। ফলে একই গ্রুপে কেউ কেউ

www.pathagar.com

পদোন্নতি পেয়ে গেলেন। আবার আটকে গেল কারো কারো পদোন্নতি। ধারণা করি, যারা পদোন্নতি পেয়েছেন, তাদের মধ্যে যোগ্যতম কেউ কেউ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন। এই রাজনীতির সমর্থক হলে তিনি যত যোগ্যই হোন, পদোন্নতি পেতে পারবেন না। মহাভারত যে তাতে অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

এই পদোন্নতি ক্ষেত্রেও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। তখন বর্তমান পিএসসিকে তা অবহিত করে মন্ত্রণালয়। পিএসসি অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখে তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং ফল প্রকাশে নয় মাস দেরি করে শেষ পর্যন্ত ফল প্রকাশ করেছে। পিএসসি'র বর্তমান চেয়ারম্যান বলেছেন, ফল নিয়ে বিতর্ক হলেও আমরা ফল বাতিল করতে পারি না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যদি ফলাফল মেনে না নেয়, কেবল তা হলেই ফল বাতিল করা সম্ভব। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ফল মেনে নিয়েছে।

অর্থাৎ বর্তমান সৎ সরকারের পুনর্গঠিত সৎ পিএসসি নিয়েও বিতর্ক উত্থাপিত হচ্ছে। তাহলে কি পিএসসি নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে? পূর্ববর্তী পিএসসি'র পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল, তাদের চলে যেতে হয়েছে। বর্তমান পিএসসি'র সদস্যদেরও কি তবে বিদায় দেয়া হবে?

নিশ্চয়ই হবে না, তাই আমরা বলতে চাই মতলবি মিডিয়ার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা দেশের জনগণের বিরাট ক্ষতি করে ফেলেছি। এই অপপ্রচারে যেন আর বিভ্রান্ত না হই বরং নিজেদের যেন আমরা সংশোধন করে নিই।

০৫.০২.২০০৮

www.pathagar.com

দক্ষ জনপ্রশাসনের স্বার্থে

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা একটি যৌক্তিক দাবি উত্থাপন করেছে। সেটি হলো সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। কোটা মানেই এক ধরনের পক্ষপাত। এই পক্ষপাতের যে একেবারে কোনো নেই, এমন কথা বলা সঙ্গত নয়। সমাজের পশ্চাৎপদ কোনো গোষ্ঠীকে সামাজিক সাম্যের প্রয়োজনেই বা ন্যায়বিচারের প্রয়োজনেই কখনো কখনো বিশেষ সুযোগ দিতে হয়। আমাদের দেশেও সে কারণেই সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। উপজাতীয়দের জন্য কোটা, নারীদের জন্য কোটা, জেলার জন্য কোটা এমন সব বিধান চালু আছে বহুকাল ধরেই। কিন্তু সবসময় সব গোষ্ঠীর জন্য যে এই কোটা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, এমন নয়। কোটা যে শুধু চাকরি ক্ষেত্রেই আছে, এমন নয়। কোটাব্যবস্থা চালু আছে শিক্ষাক্ষেত্রে। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তির ক্ষেত্রেও আছে কোটা পদ্ধতি। কোটা মানে যোগ্যতা কম থাকা সত্ত্বেও কোনো যোগ্যতর পদে কাউকে বসানো। আমরা আগেও বলেছি এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যেমন সমাজে নারীদের সামনে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। আশা করি কেউ বলবেন না যে, এই সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি নারীদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে সবাই বলবেন, এটা মারাত্মক ভুল। কারণ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ছাড় দেয়া সম্ভব, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সে ছাড়ের কথা কল্পনাও করা যায় না।

আবার কোটা পদ্ধতিতে খারাপ রেজাল্ট নিয়েও মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন দিনাজপুরের সাঁওতাল এক যুবক। হ্যাঁ, খুব ভালো রেজাল্ট তার মেডিক্যাল কলেজেও হয়নি। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের লেখাপড়া শেষে তিনি ফিরে গেছেন তার পল্লীতে। সাঁওতাল পাড়ার বাসিন্দাদের জীবনমান তিনি বদলে দিয়েছেন পাঁচ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। প্রতিটি সাঁওতাল বাড়িতে টিনের ঘর, পাকা পায়খানা আর টিউবওয়েলের পানির ব্যবস্থা করেছেন। ভিটামিন সি'রই ওই এলাকার শিশুদের বড় সমস্যা। অভাব তাই প্রতিটি বাড়িতে তিনি লাগিয়েছেন পেয়ারা, কামরাঙ্গার গাছ। প্রতিটি পায়খানার পাশে আছে নারকেল আঁচায় এক টুকরা সাবান। প্রতিটি শিশু যায়

www.pathagar.com

স্কুলে। সাঁওতাল পল্লীতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তার এ সাফল্যের কাহিনী আমাকে জানিয়েছিলেন সেই চিকিৎসক যুবক। কোটা পদ্ধতি ছিল বলে এই যুবক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। সেভাবেই তিনি বদলে দিতে পেরেছেন একটি পল্লীর মানুষের জীবনমান। এ ক্ষেত্রে তো কোটা পদ্ধতিকে সাবাশ দিতেই হয়।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে জেলা কোটা চালু ছিল। দেশে যখন সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ, তখন কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল সবচেয়ে বেশি, ৩০ শতাংশ । কিন্তু রংপুরে হয়তো তখন শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র ৭ শতাংশ। সে সময় যদি কোটা পদ্ধতি না থাকত, তা হলে হয়তো সব চাকরি চলে যেত কুমিল্লার ছেলেমেয়েদের কাছে। তাতে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো আরো পিছিয়ে পড়ত। কিন্তু বর্তমান? এখন সারাদেশে সাক্ষরের হার ৬৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এখনো কি জেলাকোটা সংরক্ষণ করার কোনো যুক্তি আছে; অর্থাৎ কোটা পদ্ধতি সময়ে সময়ে সংশোধনের দাবি রাখে।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সে রকম একটি সংশোধনের দাবি উত্থাপন করেছেন। কর্মকর্তা পর্যায়ে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসি। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সবচেয়ে যোগ্য, সৎ ও মেধাবী প্রার্থীদের বাছাই করে দেশের প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করে থাকে। উদ্দেশ্য, একটি দক্ষ উন্নত জনপ্রশাসন তৈরি করা; যারা দেশ ও জনগণের স্বার্থে কাজ করতে পারে; যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নির্মাণ করতে পারে আরো উন্নত ও আরো সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ।

কিন্তু পিএসসি'র চাকরির ৫৫ শতাংশই কোটা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। অর্থাৎ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাবেন মাত্র ৪৫ শতাংশ প্রার্থী। কিন্তু ৫৫ শতাংশ প্রার্থীই নিয়োগ পাবেন বিশেষ বিবেচনায়, অনেক কম যোগ্যতা নিয়ে। এর ফলে মেধাবীরা যেমন বঞ্চিত হবে উপযুক্ত চাকরি থেকে, তেমনি দেশে মেধাহীনের শাসন চালু হবে। এর পরিণতি হবে ভয়াবহ।

বর্তমানে পিএসসি'র চাকরির ৩০ শতাংশ সংরক্ষিত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য, ১০ শতাংশ সংরক্ষিত আছে নারীদের জন্য, ১০ শতাংশ সংরক্ষিত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর জন্য, আর ৫ শতাংশ আছে উপজাতীয়দের জন্য।

সরকারি চাকরিতে এই কোটার আধিক্যের বিষয়ে দেশের গুণীজনেরা নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, কোটাব্যবস্থা একেবারেই তুলে দেয়া হোক। কেউ কেউ বলেছেন, সব মিলিয়ে কোটা যেন ২০ শতাংশ অতিক্রম না করে। কারো কারো মতে, শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান কোটা ছাড়া অন্য সব কোটা রদ করা হোক। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তার শ্রেণীকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছেন, কোটার মাধ্যমে যারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়, তারা মেধার জোরে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের মতো সহজে পড়া গ্রহণ করতে পারে না। তবে মতামত যাই হোক, সব

www.pathagar.com

পণ্ডিত ব্যক্তিই বলেছেন, যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসন তৈরির স্বার্থেই কোটাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস দরকার।

মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান কোটায় ৩০ শতাংশ চাকরির বিধান করা হয় ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগের শাসনামলে। তার আগে অনেক দিন ধরে চালু ছিল মুক্তিযোদ্ধা কোটা। স্বাধীনতার দুই যুগ পরে বয়স শিথিল করেও আর কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে নিশ্চয়ই চাকরি দেয়া সম্ভব হয়নি। এখন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান কোটার প্রবর্তন করে আওয়ামী লীগ। কিন্তু কেন তাদের এমন প্রয়োজন হলো?

আমরা পিএসসি'র মাধ্যমে চাকরির বিষয়ে বর্তমান ডামাডোলের সময়েও শক্ত অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করছি। আওয়ামী লীগ পিএসসিতে তাদের দলের লোক বসিয়েছিল, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পিএসসি'র পরীক্ষা পদ্ধতিই এমন যে, শুধু দলীয় সমর্থকদের বসিয়েও নিজের পছন্দের লোকদের চাকরি দেয়া সম্ভব ছিল না। আওয়ামী লীগ সরকার তখন লিখিত পরীক্ষার চেয়ে মৌখিক পরীক্ষার ওপর জোর দিতে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ১০০ থেকে ৩০০ করেছিল; যাতে নিজেদের দলীয় লোকদের চাকরি দেয়া সহজ হয়। তাতেও নিশ্চয়ই তারা ১০০ শতাংশ ফল পাননি। আর তাই মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান কোটার নামে পিএসসি'র ৩০ শতাংশ চাকরি তাদের হাতে নিয়ে নেয়।

এ প্রসঙ্গে খেতাব মুক্তিযোদ্ধা ফারুক-ই-আজম বীরপ্রতীক গত ১ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলো পত্রিকায় লিখেছেন, 'কোটা প্রথার প্রতি উচ্চকণ্ঠ সমর্থকেরা প্রায়ই বলেন, তারা দেশ ও জাতির জন্য যুদ্ধ করেছেন, নিজেদের স্বার্থে নয়। তাদের এই মহানুভবতার কথা ভাবলে কোটার স্বার্থপরতা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। প্রশ্ন তোলা যায়, এখনো যেখানে অবিতর্কিতভাবে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাই নিরূপণ করা হয়নি, সেখানে সন্তান নিরূপিত হয় কিভাবে? বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে যে প্রক্রিয়ায় এই যাচাই সম্পন্ন হয়, সে সম্পর্কে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ আছে।'

ফারুক-ই-আজম বীরপ্রতীক লিখেছেন, '১৯৭১ সালে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এই শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে ৩০ শতাংশ চাকরি কোটার ধারেকাছেও যাওয়া সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে এই অমানবিক কোটা প্রথার চোরাপথে সুযোগ নেয়ার জন্য অনেক রাজাকারও মুক্তিযোদ্ধা' বনে গেছে। প্রকৃতপক্ষে চাকরি কোটার কারণে সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন কোনো উপকার হয়নি।'

দেশে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি জাতির সীমাহীন শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাদের সবাই দয়াপ্রার্থী নন। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মেধায় প্রতিভায় যোগ্যতায় হয়ে উঠতে পারেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই বা কেন যাবেন কোটার দয়ায়? এরকম প্রার্থীর অভাব নেই এবং নিশ্চয়ই তারাও মেধার মূল্যায়ন চান; কারো দয়া চান না। তা সত্ত্বেও এমনও তো হতে পারে, একজন মুক্তিযোদ্ধা কষ্টে-সৃষ্টে তার সন্তানের লেখাপড়া সম্পাদন করিয়েছেন। এই সন্তানই হয়তো তার টিকে থাকার

www.pathagar.com

অবলম্বন। সেরকম ক্ষেত্রে এই মহান মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের ক্ষেত্রে চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করা আমাদের দায়িত্ব। সে সুবিধা তাদের দিতে হবে। তা দিয়ে আমরা জাতি হিসেবে নিজেদের সম্মানিত করতে পারব।

এ সম্পর্কে ইতোমধ্যে অনেকেই আলোচনা করেছেন। প্রায় সবাই একমত যে, কোটাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস দরকার। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যে অবস্থানে ছিল, বর্তমানে তা নেই। এখন নারীরা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন। সে কারণে নারীদের কোটা সংরক্ষণের আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। একইভাবে, ১৯৭২ সালেও আমাদের দেশে জেলায় জেলায় উন্নয়নের যে পার্থক্য ছিল, বর্তমানে তা নেই। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নতি, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির ফলে ওই বৈষম্যের অবসান ঘটেছে। সুতরাং এখন জেলা কোটারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তবে এখনো প্রয়োজন ফুরায়নি উপজাতীয় ও প্রতিবন্ধীদের। তাদের জন্য কিছুটা কোটা এখনো সংরক্ষণ করার দরকার আছে। এসব বিবেচনায় বর্তমানে সরকারি চাকরির ২০ শতাংশের বেশি কোটা রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

পিএসসি'র চেয়ারম্যান ড. সা'দত হুসেন বলেছেন, পিএসসি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে না। সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকারকে। আমরা মনে করি, দক্ষ ও মেধাবী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য কোটা পদ্ধতি পুনর্বিন্যাসের আশু ব্যবস্থা নেবেন। মেধার মূল্যায়ন না হলে মেধা পাচার হয়ে যায়। সেটা জাতির জন্য হবে এক দুর্বিষহ ঘটনা।

০৮.০৩.২০০৮

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদদের কি শিক্ষা হয়নি?

গত ১০ মার্চের সংবাদপত্রে তিনটি উদ্বেগজনক খবর ছাপা হয়েছে। এ তিনটি সংবাদকে এক সূত্রে মেলালে পাঠকদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এই তিনটি সংবাদ হলো : (১) নিউইয়র্কের এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ফেরত পাঠানো কানাডীয় আইনজীবী উইলিয়াম স্লোন বলেছেন, 'পাকিস্তানি স্টাইলে বাংলাদেশে মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হঠাৎ করে আসেনি। '১-১১'-এর পরিস্থিতিও পূর্বপরিকল্পিত। নির্বাচনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকায় প্রকাশ্যে পিটিয়ে মানুষ হত্যার নীলনকশাও পুরনো। আর এহেন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ব্যাপারটিও সভ্য বিশ্বের অজানা নেই।' মি. স্লোন ৮ মার্চের ওই সংবাদ সম্মেলনে জানান, ২০০৫ সালের আগস্টে তার ঢাকা সফরের সময় একজন এমপি এবং একটি সংবাদপত্র সম্পাদকের সাথে বৈঠকের সময় তিনি 'মাইনাস টু ফর্মুলা'র কথা বিস্তারিতভাবে শুনেছেন। ওই এমপি ও সম্পাদক বিস্তারিতভাবে এই ফর্মুলার কথা তাকে জানিয়েছিলেন। খালেদা জিয়ার সরকারের পদত্যাগের সাথে সাথে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচনের ইস্যুতে কী ধরনের আন্দোলন হবে এবং নির্বাচন বানচালের জন্য কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অবতারণা করা হবে, তাও তারা মি. স্লোনকে বলেছিলেন। তারা জানিয়েছিলেন, এরপর জরুরি আইন হতে পারে। জরুরি আইনের সময় সামরিক বাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হবে। এমনি অবস্থায় চালানো হবে দুর্নীতি দমন অভিযান। সে অভিযানের টার্গেট হবেন দুই নেত্রী। সংস্কারের নামে প্রধান দু'টি দলকে ভেঙে চুরমার করার পর আমেরিকার পছন্দের লোকদের নেতৃত্বে গঠন করা হবে নতুন রাজনৈতিক ফ্রন্ট এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সেই ফ্রন্টের লোকজনের সমন্বয়ে সরকার গঠন করা হবে। উইলিয়াম স্লোন 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব জুরিস্টস'-এর কানাডা চ্যাপ্টারের সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নিয়ে কর্মরত 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ল'ইয়ার্স'-এর কর্মকর্তা। গত ১৬ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা সফর করেছিলেন। সে অভিজ্ঞতার রিপোর্ট বিশ্বব্যাপী একযোগে প্রকাশ উপলক্ষ্যে তিনি ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। স্লোন তার রিপোর্টে বলেন, 'পাকিস্তানে জেনারেল মোশাররফকে ক্ষমতায় বসানোর স্বার্থে যেভাবে বেনজির ভুট্টো ও নওয়াজ শরিফকে

www.pathagar.com

দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল, ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের দুই 'বেগম'কেও নির্বাসনে পাঠানোর কথা আমি শুনেছি।' ১-১১-এর আগের কয়েক সপ্তাহে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং কানাডা ও ব্রিটিশ হাইকমিশনারদ্বয়ের তৎপরতার মধ্যেও এ ধরনের সংঘবদ্ধ পরিকল্পনার আভাস ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় খবরটি মার্কিন রাষ্ট্রদূত গিতা পাসিকে নিয়ে। গত ৯ মার্চ গীতা পাসি সকালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও বিকেলে বিএনপি'র সংস্কারবাজ সাইফুর রহমান ও অব: মেজর হাফিজের সাথে দেখা করেছেন। যথারীতি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা তাকে অভিভাবক ভেবে ঘিরে ধরেছেন। কত প্রশ্ন করেছেন। হাসিখুশি গিতা পাসি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র চায় রোডম্যাপ অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশের নির্বাচন হোক। গত ১১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক খবর দিয়েছে যে, শুধু গীতা পাসিই নন, ১-১১'র পূর্বাবস্থার মতো আবারো তৎপর হবেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসঙ্ঘ। এ ছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাক গলাতে আসবেন জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, আরো অনেকে।

আর তৃতীয় খবরটি হচ্ছে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ গত ৯ মার্চ নীতিগতভাবে এর অনুমোদন দিয়েছেন। এই নিরাপত্তা পরিষদ জাতীয় সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আগামীতে রাজনৈতিক সরকার গঠন হওয়ার পরও নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থবিষয়ক সিদ্ধান্ত এই কাউন্সিল অনুমোদন করবে। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ দেশের দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং তেল-গ্যাস-জ্বালানি বিষয়ক চুক্তিসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে তিনটি আলাদা বিভাগ থাকবে। এগুলো হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা সেল, নীতিনির্ধারণী সেল ও গোয়েন্দা সেল। নিরাপত্তা সেলের দায়িত্ব পালন করবেন নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা। নীতিনির্ধারণী বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন তিন বাহিনীর প্রধান। গোয়েন্দা সেলে প্রধান গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সরকার বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান করেছে। এই টেন্ডার আহ্বানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান বাটেক্সপো'র জন্য কোনো ব্লক সংরক্ষিত রাখা হয়নি।

উইলিয়াম স্লোনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশবিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই হোক আর নিজস্ব বিবেচনায়ই হোক, জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় থেকেই আওয়ামী লীগ এক রাষ্ট্রঘাতী ও মানবঘাতী আন্দোলন শুরু করে। সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিলে আওয়ামী লীগ তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে দেশ প্রায় অচল করে দেয়। ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করেননি।

www.pathagar.com

ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বিএনপি'র মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের সাথে আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ সিদ্ধান্তের পর শেখ হাসিনা বলেছিলেন, তারা প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কার্যকলাপ দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন, তিনি নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন কি না। তখন প্রতিদিন ব্রিটিশ-আমেরিকার কূটনীতিকরা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-নেত্রীদের বাসায় বাসায় দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও দেশের মানুষের ওপর নির্ভর না করে কূটনীতিকদের হাতেই যেন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব তুলে দেন। মিডিয়াও হা করে তাকিয়ে থাকে, আমার দেশ সম্পর্কে বিদেশী কূটনীতিকরা কী বলছেন সেটা দেখার জন্য। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, কূটনীতিকরাই বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে নেন। আমরা কিছু মানুষ তখন বার বার সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম যে, কূটনীতিকদের ওপর নয়, নির্ভর করুন এ দেশের সাধারণ মানুষের ওপর। কূটনীতিকদের নাকগলাতে দেবেন না নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে। ষড়যন্ত্রের শিকার মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিকরা সে কথায় কান দেননি। কূটনীতিকদের পরামর্শেই হোক আর না বুঝেই হোক, তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে গোটা দেশের মানুষকে জিম্মি করে ফেলেন। মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারবে না। রাস্তাঘাটে যানবাহন চলতে পারবে না। আমদানি পণ্য আটকে থাকবে বন্দরে। রফতানি পণ্য স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকবে গুদামে গুদামে। দেশের ব্যবসায়ী সমাজ বার বার দেখা করেছেন আন্দোলনকারীদের সাথে। কিন্তু ফায়দা কিছুই হয়নি। কিন্তু কার স্বার্থে রাজনীতিকরা এ পথ বেছে নিয়েছিলেন? বিদেশীরা বুঝিয়েছিল, যদি এ রকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে ক্ষমতায় তোমাদের বসিয়ে দেব। এই তো? ক্ষমতায় বসার জন্য জনগণের ওপর নির্ভর না করে বিদেশীদের ওপর নির্ভর করার পরিণতি শুভ হয়নি।

আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলগুলো ২৮ অক্টোবরের নরহত্যা ঘটানোর পরও থমকে যায়নি। থমকে গেলে যে বিদেশী ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন হয় না। তাই, একের পর এক দাবি তুলতে থাকলেন। না কি তাদের দিয়ে বিদেশীরা এসব দাবি বলিয়ে নিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা শেষ পর্যন্ত এমনও বললেন যে, পদত্যাগ না করলে তারা বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিনের অক্সিজেন পর্যন্ত বন্ধ করে দেবেন। পানি-বিদ্যুৎ সরবরাহ তো বন্ধ করবেনই। অর্থাৎ পরিস্থিতি এমন হতে হবে, যাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়। তা হলেই তো ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব। তাই ১৪ দলের অযৌক্তিক রাষ্ট্রঘাতী ও জনঘাতী আন্দোলন চলতেই থাকল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। কিন্তু রা রা করে উঠলেন বিদেশী কূটনীতিকরা। তারা বললেন, না সেনাবাহিনী মোতায়েনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সেনাবাহিনী মোতায়েন করে যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেন প্রেসিডেন্ট, তা হলে ষড়যন্ত্র যে ভেস্তে যাবে। এ রকম অরাজক অবস্থায়ও সেনাবাহিনী

www.pathagar.com

মোতায়েন করেই প্রত্যাহার করে নেয়া হলো। সফল হয়ে গেল ষড়যন্ত্রকারীরা। পরিকল্পনামতো বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হলো। সামনে বসানো হলো ঠুঁটো জগন্নাথ এক সরকার। পেছন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করল সেনাবাহিনী।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের নীলনকশা অনুযায়ী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাসহ গ্রেফতার করা হলো শত শত রাজনীতিককে। গ্রেফতার করা হলো প্রায় ৩ লাখ লোককে। দুর্নীতির দায়ে তাড়া করে গ্রেফতার করা হলো ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে। ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হলো। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ হলো। কর্মসংস্থানের পথ রোধ হলো। সারাদেশে লাখ লাখ হকার উচ্ছেদ করে বেকার করে দেয়া হলো প্রায় ১ কোটি লোককে। পরিবারে পরিবারে নেমে এলো হাহাকার। মানুষের জীবনমান পড়তে থাকে। দ্রব্যমূল্য সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আর কিছু নেই। একদিকে আয় কমেছে। অন্যদিকে ভোগ্যপণ্যের দাম কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ শিল্পপণ্যের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে। ফলে শিল্প খাতে দেখা দিয়েছে মন্দা। বন্ধ হয়ে যাবে অনেক শিল্পকারখানা। সরকারও বন্ধ করে দিচ্ছে কলকারখানা। ফলে নতুন করে বাড়বে বেকারত্ব। বেকারত্ব বাড়লে অপরাধ বাড়বে। বাড়বে সামাজিক অস্থিরতা। এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে বাংলাদেশ। অথচ বিগত ১৫ বছরের বাংলাদেশের মানুষ যে উন্নতি করেছিল, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প উন্নয়ন, স্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশের মানুষ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। সেটা বিবেচনা করে খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করছিল, বাংলাদেশে অগ্রগতির এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে নতুন যে ১১টি দেশ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে (নিউ ইকোনমিক জায়ান্ট) প্রতিষ্ঠিত হবে, বাংলাদেশ হবে তার একটি। সেই বিপুল সম্ভাবনা এখন তিরোহিত হতে বসেছে।

কিন্তু বাংলাদেশে কী চাই বিদেশী পরাশক্তিগুলোর? চাই বাংলাদেশে তেল-গ্যাস-কয়লা। এ ক্ষেত্রে ভারতেরও যে স্বার্থ, যুক্তরাষ্ট্রেরও তাই। ফলে এই ষড়যন্ত্রে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র সমানভাবে শরিক।

তা হলে আমরা কি হেরে যাব? না। এ দেশের মানুষ কখনো হারেনি। সাময়িকভাবে কেউ হয়তো থমকে দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়লাভও করেছে এ দেশের সাধারণ মানুষ।

কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা কি ১-১১ থেকে কোনোরূপ শিক্ষা নেননি? সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, সম্ভবত না। নির্বাচনের 'রোডম্যাপ' (দারুণ মজার কাণ্ড) ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশন নানান উল্টাপাল্টা কথা বলছে। রিজার্ভ রাখা রাজনীতিকরা কথাবার্তা বলছেন। ঠিক সেই সময় আবারো তৎপর হয়ে উঠছে কূটনীতিক মহল। এবার এ দৌড়ঝাঁপের উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী। তিনি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর

www.pathagar.com

রহমান এবং বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ারের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে ভালো গণতন্ত্র দেখতে চায় ভারত। এরপর জিল্লুর রহমান ও সাইফুর রহমানের সাথে দেখা করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত গীতা পাসি। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র চান আর 'রোডম্যাপ' অনুযায়ী নির্বাচন চান। ঢাকাস্থ অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনার দেখা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে। তিনি রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন চান। ব্রিটিশ হাইকমিশনার ছুটিতে আছেন। শিগগিরই ফিরবেন। তারপর শুরু হবে তার অভিযান।

কিন্তু ১৯৬১ সালের সম্পাদিত কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী তো কোনো দেশের রাজনীতি বিষয়ে নাকগলাতে পারে না কোনো কূটনীতিক। যদি কোনো কথা থাকে, তা হলে সে কথা বলতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে।

এবারও রাজনীতিকরা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারলেন না? গীতা পাসি যখন কথা বলছিলেন তখন আওয়ামী লীগের নেতারা তার পেছনে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেন গীতা পাসিই তাদের নেত্রী। দেশে ১-১১'র পরিবর্তন আনার দাবিদার একটি সংবাদপত্র তো প্রধান শিরোনামই করে বসেছে, ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র ও আওয়ামী লীগ। কী মজার কথা। সাইফুর রহমানেরও একই অবস্থা। তাদের নেত্রী গীতা পাসি হাজির। আর কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু সাইফুর রহমান ভুলেই গেছেন, খালেদা জিয়া যখন তাদের নেত্রী ছিলেন, তখন একাধিক কূটনীতিককে তিনি বাংলাদেশ থেকে দূতাবাস গুটিয়ে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। কার জোরে বলেছিলেন? নিশ্চয়ই বেগম খালেদা জিয়ার জোরে। এখন সে জোর কোথায় গেল?

জিল্লুর রহমান প্রবীণ নেতা। সাইফুর রহমানও। ১-১১-এর বিপর্যয়ের পর এখন কেন গীতা পাসির সাথে কথা বলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ করতে দিলেন? কেন বলতে পারলেন না, 'তুমি কূটনীতিক, তোমার কোনো কথা থাকলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে বলো।' না, পারলেন না। মিডিয়াও ব্যাকুল হয়ে থাকে, 'হে বিদেশী, বলো বলো আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কিছু বলো।' আবারো স্বদেশের ঠাকুর জনগণকে ফেলে বিদেশের কুকুর ধরছেন?

তা হলে উপায়? উপায় সেই জনগণই। এ দেশের মালিক যে জনগণ, সেই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তারা যাতে ঐক্যবদ্ধ না থাকতে পারে, সে ষড়যন্ত্র চলছে। নন-ইস্যুকে ইস্যু বানানোর চক্রান্ত আছে। ষড়যন্ত্রকারীরা জানে জনগণ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, তা হলে তাদের ষড়যন্ত্র ভুল হয়ে যাবে। দেশ রক্ষায়, দেশের সম্পদ রক্ষায় জনগণকেই দাঁড়াতে হবে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। জনগণের সেই ঐক্য আর জনগণই আমাদের ভরসা।

১৫.০৩.২০০৮

www.pathagar.com

ভারত পিরিতি বালির বাঁধ

বর্তমান অনির্বাচিত জবাবদিহিতাহীন সরকার বাংলাদেশকে সারাবিশ্বে কার্যত বন্ধুহীন করে ফেলেছে। একটি রাষ্ট্রের টিকে থাকার জন্য দরকার অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের। যারা বিপদে-আপদে-দুর্যোগে সংশ্লিষ্ট দেশের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। সিডর দুর্যোগের পর যেসব রাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সাহায্যের অর্ধেকেরও বেশি এসেছিল সৌদি আরব থেকে, এককভাবে। কিন্তু এমন কি হলো যে, সৌদি যুবরাজের রূপালী ব্যাংক কেনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলো এবং রূপালী ব্যাংক বেসরকারি করার প্রক্রিয়া বাতিল করতে হলো? সৌদি যুবরাজ জানালেন, তার স্ত্রী অসুস্থ থাকায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন বলে রূপালী ব্যাংক দেখার বিষয়টি ফয়সালা করতে মনোযোগ দিতে পারেননি। বাংলাদেশের অনির্বাচিত জবাবদিহিতাহীন সরকার এসব কথায় কর্ণপাত করেনি। এরা সৌদি যুবরাজের রূপালী ব্যাংক কেনার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে এবং রূপালী ব্যাংক বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিয়েছে। সাহসী সরকার। কথা দিয়ে যে কথা রাখে না, তার সাথে আবার চুক্তি-ফুক্তি কী!

সৌদি আরব বাংলাদেশের বিপদে-আপদে সব সময় আমাদের পাশে থাকে। দীর্ঘকাল ধরেই আছে। সে ক্ষেত্রে সৌদি যুবরাজের বাংলাদেশে এই বিনিয়োগ ছিল খুবই ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সফল হলে মধ্যপ্রাচ্যের আরো অনেক দেশের বিনিয়োগ সম্ভাবনা সৃষ্টি হতো। কিন্তু এমন কি মহাভারত উল্টে গেল যে, ওআইসি সম্মেলনের ঠিক আগে সরকারকে 'বলিষ্ঠ' ঘোষণা দিয়ে বসতে হলো, সৌদি যুবরাজের কাছে রূপালী ব্যাংক বিক্রি করবে না সরকার। বর্তমান সরকারের কোনো কর্মকা ই ইসলামি উম্মাহর অনুকূল নয়। ক্ষমতায় আসার পর থেকে তারা যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, যেসব বক্তব্য দিচ্ছে, সেটা পছন্দ না করার কারণ আছে। সৌদি আরবে প্রবাসী শ্রমিক-কর্মীদের বেশিরভাগই বাংলাদেশী। ২২ লাখেরও বেশি বাংলাদেশী শ্রমিক সেখানে কাজ করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড এবং একটি প্রতিযোগী দেশের ষড়যন্ত্রের ফলে সেখান থেকে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিতাড়ন চলছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ বছরের মধ্যে প্রায় ৫ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিককে

www.pathagar.com

সৌদি আরব থেকে চলে আসতে হবে। সে শূন্যস্থান পূরণের জন্য ভারত ইতোমধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে, তখন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হলেও সরকার মনোযোগ দিতে পারেনি। প্রতিবেশী দেশের দূতাবাস যখন তৎপর তখন আমাদের দূতাবাস এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়নি বাংলাদেশী শ্রমিকদের পাশে। বরং আমাদের উপদেষ্টারা বলেছেন, শ্রমের বাজার অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের আধাদক্ষ শ্রমিক হতে হবে। ইউরোপের বাজারে ভালো সম্ভাবনা আছে। এমনি সব আবোল তাবোল কথা। তার পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। সৌদি আরবের সাথে দীর্ঘকালের সুসম্পর্কে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। সৌদি আরবে বাংলাদেশের শ্রমবাজার এখন হুমকির মুখে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা যেতে চেয়েছিলেন সৌদি আরবে। কিন্তু সৌদি সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। গত ১১ মার্চ সেনেগালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার চৌধুরীর সাথে দেখা দিয়েছিলেন সে দেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. নিজার ওবায়েদ মাদানি। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তার কাছে ইস্যুগুলো তুলে ধরেন। তাকে সৌদি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান, সুবিধাজনক কোনো এক সময়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে সৌদি আরবে স্বাগত জানানো হবে। এরপর ওআইসি সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে সৌদি বাদশাহর প্রতিনিধি যুব রাজের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এমন কি চলার পথে একটুখানি, কিন্তু সেটুকুরও সম্মতি পাওয়া যায়নি। কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো, ভেবে দেখতে হবে সরকারকে। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সৌদি আরবের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের এই শীতলতার প্রভাব পড়বে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও। সেখানেও কাজ করে বহুসংখ্যক বাংলাদেশী শ্রমিক।

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রেও একই সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে ২ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ নিশ্চিত করেছিল মালয়েশিয়া সরকার। কিন্তু ভারতের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সে বাজারও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিক্ষোভে অর্থ ঢেলে ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় মদদ দিয়েছে ভারত। আমাদের দূতাবাস থেকেছে নির্বিকার। এসব খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু সরকার যেমন নির্বিকার ছিল, তেমনি নির্বিকারই আছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এই সরকারের সব মনোযোগ শুধু ভারতের দিকে। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ভারতের সাথে সম্পর্কে উন্নয়ন ঘটাতে হবে, 'দুই বাংলা'র সম্পর্কে আরো জোরদার করতে হবে। ভারতের খাঁচার মধ্য দিয়ে ট্রেন যোগাযোগ চালু করতে হবে– এসব কথাই শোনা যাচ্ছে বেশি করে। সরকারের ভুল পরামর্শকদের ভুল পরামর্শে এখন বাংলাদেশ পৃথিবী থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতনির্ভর হয়ে পড়েছে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তার পরিণতিও টের পাওয়া যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ভারতের সাথে নব উদ্যমে বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে সরকারের পরোক্ষ পরিচালক সেনাবাহিনী প্রধান ভারত সফরে গিয়েছিলেন গত মাসে। সেখানে তাকে প্রেসিডেন্ট/প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার সাথে দেখা করেন। ভারতের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরও তার সাথে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। সেনাবাহিনী প্রধানকে তারা তাদের পছন্দের লোক বলেও প্রচার করেন। সেখানে যেসব বিষয় আলোচনা হয়, তা হলো ভারত-বাংলাদেশে ট্রেন যোগাযোগ, ভারতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে যৌথ মহড়া, ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের ঘাঁটি উচ্ছেদ, চট্টগ্রাম বন্দর ভারতীয়দের ব্যবহার, ট্রানজিট, বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের পরিবহন বিমান চলাচল প্রভৃতি বিষয়। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় ভারতীয় পত্রপত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে এসব খবর ছাপা হয়। এর মধ্যে উদ্বেগ আছে, উৎকণ্ঠা আছে, দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। সেনাপ্রধানের ভারত সফরে বাংলাদেশের কী লাভ হলো, জানা যায়নি।

তবে সেনাপ্রধান ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন, বাংলাদেশে ভারতের যে ৫ লাখ টন চাল রফতানির কথা, তা যেন নির্বিঘ্ন হয়। কিন্তু প্রতিদিন নতুন নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ভারত নানা ফায়দা হাসিলের পাঁয়তারা করছে।

পরপর দু'টি বন্যা ও গত বছর নভেম্বরে দেশে দক্ষিণাঞ্চলে সিডরের আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় আমাদের শস্যের জমিন। তার আগে থেকেই দেশে খাদ্য সঙ্কট চলছিল। সিডর সে পরিস্থিতিকে আরো নাজকু অবস্থায় ঠেলে দেয়। বাংলাদেশ জরুরিভিত্তিতে ৫ লাখ টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়। সিডরের পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসেন। তখন তিনি 'বন্ধুত্বের স্মারক' হিসেবে ওই ৫ লাখ টন চাল বাংলাদেশে দ্রুত রফতানির প্রতিশ্রুতি দেন। আর ভারতীয় দুষ্ট লোকদের মিষ্টি কথায় ভুলে সরকার বিকল্প কোনো সূত্র থেকে চাল সংগ্রহের উদ্যোগ থেকে বিরত থাকে। ভারতের বাজারে তখন চালের দর ছিল টন প্রতি ৩৪০ ডলার থেকে ৩৫০ ডলার। এখনো প্রায় তাই আছে। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঘোষণার আগেই বাংলাদেশী আমদানিকারকরা ভারতীয় বাজার দরেই চাল আমদানির ঋণপত্র খোলেন। কিন্তু প্রণব মুখার্জি স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরদিনই সীমান্তে ভারতীয় চালের চালান আটকে দেন। না ৩৪০-৩৫০ ডলারের চালের দাম দিতে হবে ৪২০ ডলার করে। তা না হলে চাল রফতানি হবে না। দেনদরবার শুরু হলো। বাংলাদেশী আমদানিকারকরা ৪২০ ডলার দিতেই রাজি হলেন। কারণ দ্রুত চাল দরকার বাংলাদেশের বাজারে। এ ঘটনার পরও সরকার দু'হাতে বন্ধুত্বের স্মারক আঁকড়ে ধরে বসে থাকল, কী আর করা যাবে। ক'টি মাত্র ডলারই তো। না হয় নিলই বন্ধু দেশ। আমাদের ছেলেরা বিদেশে কত ডলারই কামাই করে দেশে পাঠাচ্ছে। কিন্তু বিকল্প অনুসন্ধান করেনি সরকার। তখনো মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম থেকে চাল আমদানির উদ্যোগ নেয়া হলো না।

www.pathagar.com

এরপর ক'দিন না যেতেই ভারত ঘোষণা করল এখন থেকে বাংলাদেশে কোনো বেসরকারি ভারতীয় রফতানিকারক আর চাল রফতানি করতে পারবে না। বাংলাদেশে চাল রফতানি করবে সরাসরি ভারত সরকার। আর তার জন্য বাংলাদেশকে দাম দিতে হবে ৫০৫ ডলার। বাংলাদেশ সরকার দু'ঠোঁট শক্ত করে চেপে রইল। এটা যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির বরখেলাপ, এটা যে রাস্তার চাঁদাবাজের মতো ট্রাক ঠেকিয়ে পয়সা আদায় সে কথা বলল না। বরং তোষামোদের পথ অনুসরণ করল। টনপ্রতি ৩৪০ ডলার দামের চাল নিল ৫০৫ ডলার, তবু চাল দিক। ভারতীয় রফতানিকারকদের হাজার হাজার টন চালের ট্রাক সীমান্তের স্থলবন্দরগুলোতে জমা হলো। তখন হঠাৎ করেই ভারতের 'বন্ধু' সরকার ঘোষণা করল, না চাল রফতানি বন্ধ। এখন বাংলাদেশকে টনপ্রতি চালের দাম দিতে হবে ৬৫০ ডলার করে। সরকার চুপচাপ বসে থাকল : 'দেখি, সালা বঙ্গাল কী করে।' ভারতীয় রফতানিকারকরাই অতিষ্ঠ হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। তারাও মনে করে না যে, এভাবে ট্রাক আটকে দিয়ে চালের দাম বাড়ানো যায়। সরকার চুপ। নিম্ন পর্যায়ে আলোচনা ফলহীন। এর মধ্যে ভারত সরকার ঘোষণা দিল, স্থলপথে বাংলাদেশে আর চাল রফতানি নয়। বাংলাদেশে চাল রফতানি হবে সমুদ্র বন্দর দিয়ে। ঠেলা সামলাও। যে হাজার হাজার টন চাল বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি স্থলবন্দর দিয়ে এক দিনেই চলে আসতে পারে, তা আনতে এখন লাগবে মাসাধিককাল। ও চালের ট্রাক ঘুরে যাবে কোনো সমুদ্রবন্দরে। সেখানে খালাস হবে। আবার উঠবে জাহাজে। সে জাহাজ আসবে বাংলাদেশে। মাল খালাস। ট্রাকে বোঝাই। তারপর গন্তব্যে। এখন চুপ করে বসে আছে বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু চুপ করে নেই বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী। ভারত যখন আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে সীমান্তে চালের ট্রাক আটকে দিয়ে দাম বাড়িয়ে দিল, তখন পিনাক বাবু বললেন, 'আমরা না খেয়ে থেকে তো আপনাদের খাওয়াতে পারি না।' যেন ভিক্ষা চেয়েছি আমরা, এমন একজনের কাছে, যে ভিক্ষা দিলে তাদের খাবারের সংস্থান থাকে না। কিন্তু সরকার পিনাক বাবুকে জানিয়ে দেয়নি যে, চাল আমরা বাজার দরে পয়সা দিয়ে কিনছি, দয়া চাইনি। আর আমরা কিনছি বলে ভারতীয় রফতানিকারকরা লাভবান হচ্ছে, নইলে তাদের দূরের কোনো বাজার অনুসন্ধান করতে হতো। বলেনি সরকার, এর মধ্যে সম্প্রতি ওই চক্রবর্তি আবারো বললেন, 'চাল আমদানিতে যে সমস্যা, তা সৃষ্টি করছে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা, ভারত সরকার নয়।' কেমন করে? চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বাংলাদেশের আমদানিকারকদের চাল আমদানির কথা ছিল পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। তারা চাল এনেছে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। তাই সঙ্কটের সৃষ্টি। সরকার এমন উদ্ভট কথারও কোনো প্রতিবাদ করেনি।

www.pathagar.com

সর্বশেষ পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী গত ১৮ মার্চ চট্টগ্রামে বলেছেন, আরো চমৎকার কথা। তিনি বলেছেন, 'ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার ও ট্রানজিটের সুযোগ দেয়া হলে উভয় দেশই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। ...ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য প্রত্যাশিতভাবে বাড়েনি । প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশকে বাণিজ্য আরো বাড়াতে হবে।'

এটা যেন ভূতের মুখে রাম নাম। পারস্পরিক বাণিজ্য বাড়ানো বিরাট নমুনা তো ভারত স্থাপন করেছে চাল রফতানি নিয়ে। তারপরও প্রত্যাশিত ফল চালু। কিন্তু আর কি করতে হবে বাংলাদেশকে? পিনাক চক্রবর্তী জানিয়ে দিয়েছেন, চট্টগ্রাম বন্দর দিতে হবে। ট্রানজিট দিতে হবে। এর বিনিময়ে আমরা কী পাব? ভারতের প্রভুত্ব?

বর্তমান সরকারের অত্যধিক ভারত-প্রেম আমাদেরকে যেমন বিশ্বের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে, তেমনি ভারত-নির্ভরতার সুযোগ নিচ্ছে ভারত। একদিকে সেনাপ্রধানকে লাল গালিচা সংবর্ধনা, অন্যদিকে সীমান্তে ট্রাক আটকে চাঁদাবাজির ধাঁচে ৩৪০ ডলার চালের দাম ৬৫০ ডলার আদায়। এটাই ভারত-প্রেমের উপহার। প্রাচীন ছড়া উল্লেখ করে তাই বলা যায়, 'ভারত-পিরিতি বালির বাঁধ/ক্ষণেই হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ।' লাল গালিচার চাঁদ পেয়েছিলাম, এবার হাতে দড়ি পরার উপক্রম।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় সুষ্ঠু, সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করে বর্তমান সরকারের বিদায় নেয়া। কোনো কৌশলের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান নেই।

২৩.০৩.২০০৮

www.pathagar.com

এসব কী করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' জাতির স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। সরকারের এসব সিদ্ধান্ত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব যেমন বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে যাচ্ছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতাকামীদের স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্র। আর এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে অত্যন্ত সঙ্গোপনে, জনগণকে জানতে না দিয়ে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকার ভারতের ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারত পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের কাছ থেকে যেসব সুবিধা আদায় করতে পারেনি, যার জন্য ভারত ৬০ বছর ধরে দেন-দরবার করে আসছিল, বর্তমান সরকার মাত্র কয়েক মাসেই ভারতকে সেসব সুবিধা দেয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। এসব সুবিধার মধ্যে আছে– বাংলাদেশের ওপর দিয়ে স্থল, নৌ ও বিমান ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুবিধা, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামী রাজ্যগুলোর বিদ্রোহী দমনে সহায়তা। কোনো রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়াই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক তরফাভাবে ভারতকে এসব সুবিধা দিয়ে দিচ্ছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পণ্যবাহী ভারতীয় বিমান চলাচল সম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যেতে পারবে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্যে।

পাকিস্তান তো বটেই, গত ৩৬ বছরে বাংলাদেশের কোনো সরকারই ভারতকে এই সুবিধা দেয়ার কথা বিবেচনা করেনি। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের কোনোরূপ পূর্বানুমতি ছাড়াই ভারতীয় ওই সব বিমান বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায় নামতে পারবে এবং উড়ে যেতে পারবে। এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পরিবহনের দুই স্কোয়াড্রন বিমান কেনার অর্ডার দিয়েছে। এসব বিমান গোপনে, রাডার এড়িয়ে যেকোনো জায়গায় ওঠানামা করতে

www.pathagar.com

পারে। এসব বিমানই বাংলাদেশের ওপর দিয়ে চলাচল করবে এবং ধারণা করা যায়, বাংলাদেশের অগোচরেই সেগুলো যেকোনো জায়গায় ওঠানামা করবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে এসব তথ্য জানা গেছে।

এ বিপজ্জনক দিকগুলো কী, সেটা বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি বর্তমান জনপ্রতিনিধিত্বহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। প্রথমত, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতাকামীরা ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। তারা হামেশাই ভারতীয় বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। স্বাধীনতাকামীদের দমনের জন্য ভারতকে প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার ঘুরে সড়কপথে নিয়ে যেতে হয় এই সামরিক সাজ-সরঞ্জাম। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পণ্যবাহী বিমান চলাচলের সুবিধা দিলে মাত্র ৩০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে দ্রুত পৌঁছানো যাবে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম।

চাই কি, এই চুক্তির বলে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গিয়ে ভারতীয় যুদ্ধবিমান আঘাত হানতে পারবে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে। ফলে সেখানকার স্বাধীনতাকামীদের সহজ টার্গেট হবে বাংলাদেশও। শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনীই যেখানে এই স্বাধীনতাকামীদের হাতে প্রতিনিয়ত নাস্তানাবুদ হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের সাথে এঁটে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। তা ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরীণ এই সজ্ঘাতের সাথে বাংলাদেশ কেন জড়াতে যাচ্ছে, সেটা বোঝা দুঃসাধ্য। উপরন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তো এটা কাজ নয়। বাংলাদেশকে এত বড় ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেয়ার এখতিয়ার তো তাদের নেই।

অপর দিকে বাংলাদেশের পূর্বানুমতি ছাড়াই ভারতীয় সমরাস্ত্রবাহী বিমান নামতে পারবে বাংলাদেশের যেকোনো এলাকায়, এমনকি বাংলাদেশের অগোচরে। তার পরিণতি কী হতে পারে? সেই পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ। আমরা লক্ষ করেছি, বাংলাদেশে জেএমবি যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, তার পেছনে মদদ ছিল ভারতীয়দের। তাদের কাছে যেসব গোলাবারুদ পাওয়া গিয়েছিল, তার সবই ছিল ভারতীয় সমরাস্ত্র কারখানার। গোলাবারুদ মুদি দোকানে বিক্রি হয় না যে, জেএমবি'র সদস্যরা তা কিনে চোরাপথে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিল। কার্যত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য এবং বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদী রয়েছে, এটা প্রমাণ করার জন্যই ভারত সরকার ওই সংগঠন তৈরি করে তাদের গোলাবারুদ সরবরাহ করেছিল। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পণ্য পরিবহন বিমান যাতায়াত ও ওঠানামার স্বাধীনতার ফলে ভারত এখন বাংলাদেশকে চাপে রাখার জন্য তাদের পেটোয়া সংগঠনকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে পারবে নির্বিঘ্নে। ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাও মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে।

এরপর আসা যাক ট্রানজিটের কথায়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারত এই ট্রানজিটের দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো সরকারই তাদের এ

www.pathagar.com

দাবি মেনে নেয়নি দেশের অভ্যন্তরীণ স্বার্থ ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে। কিন্তু বর্তমান জনপ্রতিনিধিত্বহীন সরকার তা 'সক্রিয়ভাবে' বিবেচনা করছে। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারের বাণিজ্য বিষয়ক কাউন্সিলর সুধাকর দালেলা গত ১৩ মার্চ বলেছেন, 'ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে সহজ যোগাযোগের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।' চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার সাবরুম শহরের দূরত্ব মাত্র ৭৫ কিলোমিটার। আর কলকাতা থেকে সাবরুমের দূরত্ব ঘুরপথে ১৪০০ কিলোমিটারেরও বেশি। দালেলা জানিয়েছেন, তিনি ও ভারতীয় কর্মকর্তারা বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের স্থলবন্দরগুলো পরিদর্শন করে এসেছেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা সীমান্তে ভারত-বাংলাদেশের চারটি স্থলবন্দর রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৪০৯৫ কিলোমিটার সীমান্তের স্থলবন্দর রয়েছে ৩২টি। তার ২৪টিই ভারতীয় এলাকায়। ত্রিপুরার চারটি ছাড়া পাঁচটি স্থলবন্দর পশ্চিমবঙ্গে, আটটি মেঘালয়ে ও তিনটি আসামে। মিজোরামের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত ৩১৮ কিলোমিটার। কিন্তু সেখানে কোনো স্থলবন্দর নেই। ভারত এখন মিজোরামেও স্থলবন্দর খোলার জন্য জনপ্রতিনিধিত্বহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এদিকে ট্রানজিটের আশ্বাস পেয়ে ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কলকাতা-আগরতলা রেল যোগাযোগের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে। আর নতুন রেললাইন বসাচ্ছে আগরতলা থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত। যার কাজ আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। ভারত সরকার তাদের ২০০৮-০৯ সালের রেল বাজেটে ওই রেললাইন বসানোর কাজের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে।

ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার ও ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার জন্য এত আয়োজন কেন গোপনে সারা হচ্ছে? কেন জনগণকে এসব বিষয় জানতে দেয়া হচ্ছে না? এসব কাজে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এখতিয়ার কোথায়? এসব প্রশ্নের জবাব মেলা ভার।

এ ক্ষেত্রে বিপদ দু'টি। এক হলো– ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতাকামীদের দমানোর জন্য বাংলাদেশ ভূখণ্ড ব্যবহারের ফলে অকারণে বাংলাদেশ তাদের প্রতিহিংসার শিকার হবে। আর আগেই বলেছি, সে অস্ত্র যে বাংলাদেশেই খালাস হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয়– চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কিংবা কলকাতা থেকে আগরতলা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংশয়। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বা কলকাতা থেকে আগরতলার পথে ভারত ব্যবহার করতে পারবে হাজার হাজার কিলোমিটার সড়কপথ। এই সড়কপথে লাখ লাখ টন ভারতীয় পণ্য যাতায়াত করবে। এসব পণ্য যে বাংলাদেশের কোথাও খালাস হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং শোরের সাথেই বলা যায়, খালাস হবে। তাহলে বাংলাদেশের শিল্পপণ্যের কী হবে। সেসব পণ্য ভারতীয় পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকবে কেমন করে? ফলে বাংলাদেশের বিকাশমান শিল্প খাত মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। দুর্মুখরা বলছেন, বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করার জন্যই বিনাবিচারে আটক রাখা

www.pathagar.com

হয়েছে দেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিককে। যাতে ইতোমধ্যেই ওই সব শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বাজারে পণ্য চাহিদা বাড়ে। আর ভারত থেকে আমদানির মাধ্যমে ও চোরাপথে সে পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

ভারতকে এত বড় সুবিধা দানের বিনিময়ে বাংলাদেশ কী পাচ্ছে ভারতের কাছ থেকে? পাচ্ছে অশ্বডিম্ব। কিছুই না। বাংলাদেশের সাথে নেপালের বাণিজ্য সুবিধার জন্য বাংলাদেশ চেয়েছিল কয়েক কিলোমিটার ট্রানজিট। ভারত তা দেয়নি বলে স্থলবন্দী নেপালের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বিকশিত হতে পারছে না। নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ভারতীয় ভূখণ্ডে কিছু খুঁটি বসানোর দাবি করেছিল বাংলাদেশ। ভারত তাতে রাজি হয়নি, বরং ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী এই দাবিকে 'ভুল ধারণা' বলে অভিহিত করেছেন। ভারত-বাংলাদেশ যে অসম পানি বণ্টন চুক্তি করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার, ভারত সেই চুক্তি অনুযায়ী পানি এখনো দিচ্ছে না। সে ব্যাপারেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার একবারে চুপটি মেরে আছে।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে একজন বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন, 'যুগের পর যুগ ধরে নেপালের ওপর ভারতের জবরদস্তিমূলক আচরণের ফলে নেপাল মাওবাদীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে ভারতের দাবিগুলো একটার পর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। তা না হলে বাংলাদেশও চরমপন্থীদের দখলে চলে যেতে পারে।' এই বিশ্লেষণকে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই।

এসব কর্মকা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন সর্বাত্মক ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে, তেমনি তাদের হাতে দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তাও এখন বিপন্ন। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় জনগণের ইস্পাত কঠিন ঐক্য। বাংলাদেশের মানুষকে সব ভেদাভেদ ভুলে, সব উসকানি উপেক্ষা করে এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে। সেই ঐক্যই এখন জাতির জন্য সবচেয়ে জরুরি।

২৯.০৩.২০০৮

www.pathagar.com

আমাদের নন্দলালেরা
মধ্যবিত্তকে চালের লাইনে দাঁড় করিয়ে জাতীয় দাবি খুঁজছেন?

বিগত ১৫ বছরের জনপ্রতিনিধিদের শাসনকালে বাংলাদেশ থেকে কিছু কিছু দৃশ্য বিদায় নিয়েছিল। সেটা হলো, অনাহারে মৃত্যু, পেটমোটা শিশু, পোলিও, ম্যালেরিয়া- এমনকি আরো অনেক কিছু। বর্তমান জনপ্রতিনিধিত্বহীন লাইনচ্যুত-রাষ্ট্র-উদ্ধার সরকার মাত্র ১৫ মাসেই সেসব দৃশ্য ফিরিয়ে এনেছে। এখন খাদ্যসহ পণ্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। দেশে খাদ্যের জন্য হাহাকার। বিডিআরের চালের দোকানের লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার কশাঘাতে বাজারের ব্যাগ হাতে মধ্যবিত্তও দাঁড়াচ্ছেন সে লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, লজ্জা ভুলে। এখন ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে বিক্রি হচ্ছে কোলের সন্তান। বিক্রি করে দিচ্ছেন স্বজনকে দাফন করতে কেনা কাফনের কাপড়। না খেয়ে মরেছে ফেনীতে দিনমজুর। কাজ নেই। সাধারণ মানুষের যে কাজ ছিল, সেসব স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সরকার। নির্মাণশিল্পে কাজ করছিল লাখ লাখ শ্রমিক। সেখানে দুর্নীতি ধরার নামে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে এই ক্রেন সরকার। ফলে ওই খাতেও বেকার লাখ লাখ শ্রমিক। টুকরি-কোদাল নিয়ে সারা দিন বসে থাকা। কাজ নেই। তা হলে? হয় অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরা। অথবা খাদ্য যার কাছে আছে, তার কাছ থেকে সে খাদ্য ছিনিয়ে নেয়া। সে আলামতও এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতি ঘটছে। সন্ত্রাসী-মাস্তান-চাঁদাবাজরা আবার তৎপর হতে শুরু করেছে। সরকারবান্ধব মিডিয়াও সেসব কথা আর লুকিয়ে রাখতে পারছে না, প্রকাশ করতে হচ্ছে।

এমনি একটি সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার উপদেষ্টা ও সহকারীর জন্য ১০ কোটি টাকার নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা খুবই সঙ্গত কাজ। দেশ উদ্ধারের জন্য তারা দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। তারা যদি নতুন ও দামি গাড়িতে চড়েই দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তবে তাদের প্রতি ভারী অবিচার হয়ে যাবে। তাদের ব্রান্ড নিউ গাড়িতে চড়ার সামান্য দাবি এ দেশের মানুষের মানা উচিত। তা নিয়ে চোখ টাটানো খুবই কুরুচিপূর্ণ কাজ হবে। তা ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারীরা তো সন্ত টাইপের লোক। যেসব গাড়িতে আগের মহাদুর্নীতিবাজ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা চড়েছেন, সেসব গাড়িতে চড়তে তো তাদের ঘৃণাও হয়। গা ঘিন ঘিন

www.pathagar.com

করে। বারবার মনে হয়, ছিঃ ছিঃ এক সময় এই সিটে দুর্নীতিবাজ অমুক বসত, এখন আমি বসছি, ছিঃ ছিঃ।

এছাড়া আরো এক ধরনের নতুন ও দামি শত শত গাড়ি সরকারের হেফাজতে আছে। 'এই ব্যাটা, এত দামি গাড়িতে চড়িস ক্যান, টাকা কোথায় পেলি। হিসাব দে' বলে সরকার এসব গাড়ি তার হেফাজতে রেখেছে। সরকারের বড় কর্তারা বলেছিলেন, এসব গাড়ি বিক্রি করে হাসপাতাল দেবেন। কই, হাসপাতাল যে দেখলাম না। গাড়ি বিক্রি হয়নি বলে? ওই গাড়ি বিক্রি হয়? কে কিনবে? কিনতে এলে সরকার ধরে বসবে, 'এই ব্যাটা, এত দামি গাড়ি যে কিনতে এসেছিস, টাকা পেলি কোথায়? ঢোক ফাটকে।' ফলে গাড়ি বিক্রির সাত মণ তেলও পোড়েনি, হাসপাতালের রাধাও নাচেনি।

কিন্তু এসব গাড়িতেই কি আর পাক-পবিত্র উপদেষ্টাদের চড়তে বলা যায়, বলুন? কার না কার গাড়ি। তার ওপর আবার না জানি কোন 'মহাদুর্নীতিবাজ' বসেছিল এই গাড়ির সিটে। সে রকম একটি না-পাক জায়গায় কোনো উপদেষ্টা বসতে পারেন? ছিঃ, আমাদের এরকম প্রস্তাব করাও ঠিক হবে না। সুতরাং তাদের শরীরে যাতে দুর্নীতির ছিটেফোঁটাও না লাগে, সেজন্যই তো নতুন গাড়ি দরকার উপদেষ্টাদের জন্য। জনসাধারণ কি এটুকুও না বুঝে সমালোচনা করতে শুরু করে দেয়– তাহলে এসব সন্ত উপদেষ্টা যাবেন কোথায়? তাদের প্রতি জনগণের একটা দায়িত্ব আছে না? সুতরাং নতুন গাড়ি চাই-ই চাই। যেমন শৈশবে ঈদ এলে আমরা জামা-জুতা চাইতাম। কোথায় একটা অসুস্থ দিনমজুর না খেয়ে মারা গেছে, কোথায় একটা দুই পয়সার মধ্যবিত্ত চালের জন্য বিডিআর'র দোকানে লাইন দিয়েছে, তাই বলে গাড়ি কেনার সমালোচনা? বাংলাদেশের গরিব মানুষ কবে না খেয়ে মরেনি। তাছাড়া মানুষ তো মরবেই। মানুষ কি কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে? আশ্চর্য কথা। মধ্যবিত্ত চালের জন্য লাইন দিয়েছে। হ্যাঁ, আমরা ভারত থেকে চাল এনে দিয়েছি বলেই তো লাইন দিতে পারছে। তা না হলে তো উপোস করতে হতো। সবুর নেই। কৃতজ্ঞতাও নেই এখানকার নেংটিপরা মানুষগুলোর। তা না হলে, ভারত আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করে দিল। গত ৩৬ বছরে কোনো সরকার কৃতজ্ঞতা দেখায়নি। ধিক্, অতীতের সরকারগুলোকে। আমরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে রেল সংযোগ দিয়েছি। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দিচ্ছি, বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট দিচ্ছি, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতাকামীদের দমনের জন্য বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বিনানুমতিতে অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছি। সেসব বিমানকে যখন তখন বাংলাদেশে যাত্রাবিরতির সুযোগ দিয়েছি। তাই নিয়ে একশ্রেণীর পাকিস্তানি অনুচর, যুদ্ধাপরাধীদের দোসরদের সে কি মাতামাতি। এসব দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বড় কর্তাদের। তাছাড়া ভারতের মহামান্য হাইকমিশনার বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের অংশীদারিত্ব আছে। একেবারে খাঁটি কথা, সুতরাং বাংলাদশের ভূখণ্ড, বাংলাদেশের বন্দর, বাংলাদেশের সড়কপথ-নৌপথ-রেলপথ

www.pathagar.com

শুধু বাংলাদেশীরাই ব্যবহার করবে, তা তো হয় না। যেহেতু অংশীদারিত্ব আছে, সুতরাং ভারতও তা ব্যবহার করবে। এতে দোসের কী আছে!

পিনাক বাবুদের এসব হক কথা শুনে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমী পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী নিশ্চয়ই যারপরনাই আহ্লাদিত হয়েছেন। কারণ, এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। তেমনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নব্য দাবিদার সেক্টর কমান্ডার বীরেরাই বা কোথায়। তারাও রা করেননি। সব নন্দলাল দেশকে মুক্ত করার জন্য ঘরের ভেতর চুপটি করে বসে আছে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা যে সবিশেষ আহ্লাদিত আছেন, সেটা বোঝা গেল তার জাতিসংঘ ভ্রমণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়াতে। আমরা তো ভেবেছিলাম, ভারত যে চাঁদাবাজদের কায়দায় বাংলাদেশ সীমান্তে চুক্তি সত্ত্বেও ট্রাক ঠেকিয়ে টনপ্রতি ৩৪০ ডলার চালের দাম হাজার ডলার নিচ্ছে, সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি। আমরা ভেবেছিলাম আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ভেঙে ভারত যে বাংলাদেশকে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা দিচ্ছে না, সে ব্যাপারে তিনি জাতিসঙ্ঘের সহায়তা চাইবেন। আমরা ভেবেছিলাম, ভারত যে প্রতিদিন বাংলাদেশের সীমান্তে বাংলাদেশীদের পাখির মতো গুলি করে ও পিটিয়ে হত্যা করছে, সে বিষয়ে তিনি জাতিসঙ্ঘের সহায়তা চাইবেন। উল্লুক না হলে কেউ এমনটা ভাবে।

কিন্তু কী মনে করছেন? কিছুই করে আসেননি আমাদের বাঘা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা? না। ভুল। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবের সহযোগিতা চেয়েছেন। একেবারে এমনি এমনি ছেড়ে দেননি তাকে। এবং তার কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস আদায় করে ছেড়েছেন। সাবাস। বাহা, বাহা, বেশ। সেটা কী? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে জাতিসঙ্ঘ সহায়তা দেবে। এর চেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট একটা জাতির জন্য আর কী হতে পারে। অতএব, আসুন, বাংলাদেশী ভাই ও বোনেরা, আমরা উল্লাসে নৃত্য করি।

আর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এই সহায়তা চাইবেনই বা না কেন? কারণ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা নয়, মানুষের খাদ্যসঙ্কট নিরসন নয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ নয়, দ্রব্যমূল্য হ্রাস নয়, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন নয়, কলকারখানা সচল রাখা নয়, ড. ইফতেখারের মতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় কেয়ারটেকার সরকার যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পদক্ষেপ নেয় তাহলে তারা জাতিসঙ্ঘের সহায়তা চাইতে পারে। এ ব্যাপারে মার্কিন স্বার্থের তল্পিবাহক ঠুঁটো জগন্নাথ জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব বান কি মুন সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। ব্রাভো, ড. ইফতেখার থ্রি চিয়ার্স ফর ইউ।

এই কলামে আমরা বারবার লিখেছি যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিষয়টি একটি মীমাংসিত ইস্যু। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক পর্যায়ে হাজারখানেক লোককে প্রাথমিকভাবে যুদ্ধাপরাধী

www.pathagar.com

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পর শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭৩ সালে ১৯৫ জন পাকিস্তানিকে চূড়ান্তভাবে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ১৯৭৪ সালে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে তাদের ক্ষমা করে দিয়ে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। আজ পানি ঘোলা করার জন্য, দেশের মধ্যে বিভক্তি, বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইসলামপন্থীদের ফাঁসিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নতুন করে ইস্যুটি তোলা হচ্ছে যাকে খুশি তাকে যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিত করার জন্য। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই দলীয় কূটচালের অংশীদার কেন হবে? আর জাতিসঙ্ঘে গিয়ে ধরণা দিতে হবে কেন? কেন নিজেরাই তা করতে পারবেন না? না কি, মীমাংসিত ইস্যুটি নিয়ে অগ্রসর হলে গোটা সমাজে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, তা মেটানোর জন্য ভারত-মার্কিন নেতৃত্বাধীন জাতিসঙ্ঘ বাহিনী ডাকবেন? তা না হলে জাতিসঙ্ঘের আর কি সহায়তার প্রয়োজন? আসলে ট্রেন লাইনে ওঠানোর এই ক্রেন সরকার লাইনে ওঠানোর বদলে দেশকে অতল অন্ধকারের দিকে নিক্ষেপ করতে বসেছে। দেশপ্রেমের এ এক চরম পরাকাষ্ঠা।

অর্ধ শতাব্দীরও বেশি কাল আগে 'নন্দলাল' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তার কিছু চরণ উদ্ধৃত করে আজকের লেখা শেষ করব।

'নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ/স্বদেশের তরে যে করেই হোক রাখিবে সে জীবন।/ সকলে বলিল, আহা আহা, কর কী, কর কী নন্দলাল/নন্দ বলিল, বসিয়া বসিয়া রইব কি চিরকাল?/আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?/ তখন সকলে কহিল, বাহা বাহা বাহা, বেশ।/... নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির/ গালি দিয়া সব গদ্যে-পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।/ পড়িল ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন,/ লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ।/ খাইতে ধরিল লুচি আর ছোকা সন্দেশ থাল থাল/ তখন সকলে কহিল, বাহা বাহা, নন্দলাল।/ নন্দ বাড়ীর হতো না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি/ চড়িত না গাড়ী, কি কখন উল্টায় গাড়ীখানি।/ নৌকা ফি-সব ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়/ হাঁটিলে সবই কুকুর আর গাড়ী চাপা-পড়া ভয়।/ তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল,/ সকলে বলিল, ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।'

দেশোদ্ধারে আমরা কি এমনই নন্দলালদের পাল্লায় পড়েছি?

০৫.০৪.২০০৮

www.pathagar.com

তবু সংশয় যে দূর হয় না

সংশয় তবু দূর হতে চাইছে না। সকলেই বলছেন, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবেই। প্রধান উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলেছেন যে, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে। উপদেষ্টারাও বলছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন, নির্বাচন ডিসেম্বরের মধ্যে হবে। নির্বাচন কমিশনারগণও একই কথা বলছেন। সবশেষে সেনাবাহিনী প্রধানও জোর দিয়ে বলেছেন, তাঁর নিজের বা সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবেই। কিন্তু ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে প্রায় সব রাজনৈতিক দল। সে ক্ষেত্রে ভুঁইফোড় দু-এক রাজনৈতিক দলের ভিন্ন কথা অবশ্য আমলে নেয়া হয়নি। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তেমন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। বিএনপি'র মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনও সংশয় প্রকাশ করেছেন যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে। এমনকি খোদ সরকারের ভেতরও আশঙ্কা আছে নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না। সংশয় যে আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে সরকার নির্দেশ দিয়েছিল একটি বিষয় জেনে নেয়ার জন্য। সেটা হলো, বাংলাদেশে ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী যদি নির্বাচন করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিভাবে নেবে? যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মুখপাত্র আমাদের রাষ্ট্রদূতকে জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো অজুহাতেই নির্বাচন বিলম্বিত করার চেষ্টা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মেনে নেবে না। অর্থাৎ সরকার মুখে যাই বলুক, ভেতরে ভেতরে তাদেরও মনে সংশয় আছে যে, যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নাও হতে পারে।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রধান পক্ষ তিনটি। নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলগুলো ও সরকার। এ তিনটি পক্ষের সমন্বয়ের ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। এর কোনো একটি পক্ষও যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না।

আমরা যদি 'এক/এগারো' বা ২০০৭ সালের জানুয়ারির পরিস্থিতির দিকে ফিরে দেখি, তাহলে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে পারে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে এই তিন পক্ষের দু'পক্ষই নির্বাচনের জন্য সর্বাত্মক ভাবে প্রস্তুত ছিল। নির্বাচন কমিশন

www.pathagar.com

জোরের সাথে ঘোষণা করেছিল, তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। ২২ জানুয়ারি সে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। নির্বাচন কমিশন জেলায় জেলায় ব্যালট বাক্স পর্যন্ত পাঠাতে শুরু করেছিল। ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজ শেষ হয়েছিল। সরকারও নির্বাচন কমিশনকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছিল। কিন্তু ঠিক ছিল না রাজনৈতিক দলগুলো। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট নানা দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে, রাজপথে নরহত্যার তাণ্ডব চালিয়ে দেশব্যাপী এক অরাজক পরিস্থিতি ও অচলাবস্থার সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বসেছিল। আমরা তাদের শুভবুদ্ধির কাছে বার বার কাতর আবেদন জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, একবার যদি দেশে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এর পরিণতি সুখকর হবে না। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনটা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য হলেও অনুষ্ঠিত হোক। তার পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে যথাশিগগির সম্ভব আবারো নির্বাচন করা যেতে পারে। তখন অনেকেই আমার 'নির্বুদ্ধিতা'য় হেসে ছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট সে কথায় কর্ণপাত করেনি। ফলে এক/এগারোর জরুরি অবস্থার সরকার নাজেল হয়।

এই জরুরি অবস্থার সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রাজনীতিকরাই, আর রাজনৈতিক দলগুলো। ১৪ দলের মূল দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির মামলায় কারাবন্দী হয়ে দিনের পর দিন আদালতে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছেন। তার সহকর্মীদেরও অনেকেই কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ কেউ পলাতক। কারো কারো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা। তিনিও কারাবন্দী। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলার চার্জশিটও হয়নি। তা সত্ত্বেও মাসের পর মাস কারাগারে আটক আছেন তিনি। বেগম খালেদা জিয়ার দুই ছেলেও প্রমাণহীন দুর্নীতির অভিযোগে কারাবন্দী। কারাবন্দী আছেন সংস্কারবাজ দু'একজন ছাড়া বিএনপি'র প্রায় সব মন্ত্রী ও বহু এমপি। অনেকেই পলাতক। লাভ হয়নি রাজনীতিকদের। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, দেশ প্রায় রাজনীতিশূন্য অবস্থায়।

এর পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। দেশজুড়ে হাহাকার। খাদ্য নেই, বিদ্যুৎ নেই, বীজ নেই, সার নেই। প্রতিদিন লাখো মানুষ চালের জন্য বিডিআর'র দোকানে লাইন দিচ্ছে। স্কুলের শিশু ক্লাস ছেড়ে দিনভর দাঁড়িয়ে থাকছে চালের লাইনে। কখনো পাচ্ছে, কখনো পাচ্ছে না। সরকারের তাড়া খেয়ে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা পালিয়েছেন। আমদানি নিয়ে সঙ্কট। নতুন বিনিয়োগ নেই। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। ফলে কমবে কর্মসংস্থান। দেশকে ফুলবাগান বানানোর অভিপ্রায়ে সারাদেশের অবৈধ হাটবাজার-দোকানপাট ভেঙে দিয়ে প্রায় কোটি মানুষকে পথে বসিয়েছে অনভিজ্ঞ দূরদৃষ্টিহীন বর্তমান সরকার। মানুষের আয় কমেছে। ব্যয় বেড়েছে। খাদ্যের ব্যয় বাড়ায় তারা কমিয়ে দিয়েছে শিল্পপণ্যের ব্যবহার। ফলে ইতোমধ্যেই ছোট বড় মিলিয়ে

www.pathagar.com

লক্ষাধিক শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারও কলমের খোঁচা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে বেশ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান। যেগুলো চলছে, সেগুলোতে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমছে। ফলে এক বিশাল ধস নেমেছে আমাদের অর্থনীতিতে। এজন্য কাকে দায়ী করবেন রাজনীতিকরা?

এসব বিষয় থেকে যা বলতে চাইছি, তা হলো ১/১১-এর ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রাজনীতিকরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করেন।

কিন্তু নির্বাচন? প্রধান নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব নিয়েই এমনভাবে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, তিনি যেন সারাদুনিয়ার বাদশাহী পেয়ে গেছেন। যাকে যা খুশি বলেছেন। সেটা তাকে মানায় কি না, সিইসি পদে তার অবস্থানকে মানায় কিনা, ভেবে দেখার চেষ্টা করেননি। আর এক কমিশনার, নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করে বলেই বসেছিলেন যে, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হবেই, তাতে কোন দল সে নির্বাচনে এলো, কোন দল এলো না, তাতে কিছু যায় আসে না। নির্বাচন কমিশনের করার কথা ছিল নির্বাচনী আচরণবিধি। করার কথা নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ। সঠিক ভোটার লিস্ট তৈরি। এর কোনো কাজই ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। এবারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, নির্বাচনী রোডম্যাপ অনুযায়ী তিনি অগ্রসর হতে পারেননি। তা হলে তিনি কি এই পথে গন্তব্য পর্যন্ত পৌছতে পারবেন?

সরকারও বিশাল বিপর্যয় সৃষ্টির পর শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অনানুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু করেছে। এ মাসেই শুরু করবে আনুষ্ঠানিক আলোচনা। সরকার ঘোষণা করেছে, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে তাদের সংলাপ হবে শর্তহীন। সেই ভালো। সরকার যে আগে থেকেই শর্ত চাপিয়ে দিয়ে পরিবেশ ঘোলাটে করে তোলেনি, সেটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

এই সংলাপের উদ্দেশ্য সম্ভবত নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। রাজনৈতিক দলগুলোর যদি কিছু দাবি-দাওয়া থাকে, তবে সেটা সরকারই মেটাতে পারবে, নির্বাচন কমিশন নয়। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল নিশ্চয়ই তাদের দলীয় নেত্রীদ্বয়ের মুক্তি চাইবে। ধারণা করা যায়, আলোচনা শুরু হবে সেখান থেকেই। যদি একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হয়, তা হলে তার পরিবেশ সৃষ্টির প্রধান দায়িত্ব সরকারের। আমরা বলতে চাই, এ ক্ষেত্রে সরকারকেও আন্তরিক হতে হবে। রাজনীতিকদের ব্যাপারে বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা বলতে চাইছি না যে, প্রকৃত দুর্নীতিবাজদের ছেড়ে দেয়া হোক। কিন্তু বিপুলসংখ্যক রাজনীতিককে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা তথ্য প্রমাণ ছাড়াই মাসের পর মাস আটকে রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো মামলা থাকে, সে মামলাকে স্বাভাবিক গতিতে পরচালিত হতে দেয়া দরকার। যেন মনে না হয়, সরকার জোর করে তাদের আটকে রাখতে চাইছে। নিম্ন আদালতে যাদের ৩০-৪০ বছরের জেল হয়েছে,

www.pathagar.com

তাদের উচ্চ আদালতে বিচার পাওয়ার সুযোগ অবারিত করা হোক। ভুল যদি কোথায়ও হয়ে থাকে, তা হলে সে ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর দেয়া দরকার। এ রকম পরিবেশ সৃষ্টি হলে নির্বাচন নিয়ে সরকার ও রাজনীতিকরা একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব বিরাট। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের মধ্য সমঝোতা প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ও জনগণের স্বার্থেই তা প্রয়োজন। রাজনীতিকদের নিজেদের স্বার্থেও। রাজনীতিকরা যদি ১/১১ থেকে কোনোরূপ শিক্ষা নিয়ে থাকেন, তা হলে এই সমঝোতা তাদের প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই পরিপক্বতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হলে তাদের দুর্ভোগ জারিই থাকবে।

তারা পাকিস্তানের উদাহরণ থেকেও শিক্ষা নিতে পারেন। পাকিস্তানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল বেনজির ভুট্টোর পিপলস পার্টি ও নওয়াজ শরিফের মুসলিম লীগ। এমকিউএম'র সাথেও পিপলস পার্টির ছিল সংঘাতময় সম্পর্ক। কিন্তু গত ৯ বছর জে. পারভেজ মোশাররফের সামরিক শাসনের ভিকটিম ছিল উভয় দল। নিজেদের স্বার্থে ও দেশের মানুষের স্বার্থে সামরিক আইনের অবসানের লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনী সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন তারা। সে সমঝোতার অংশ হিসেবে সব সময় যে সবাই মিলে সরকার গঠন করতে হবে, তা আমাদের বক্তব্য নয়। আমাদের বক্তব্য হলো, যেন আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারি, যেন পরস্পরকে সহ্য করতে পারি। সে জন্য সরকারের সাথে সংলাপের আগেই, আমাদের বিবেচনায়, রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠা দরকার।

এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাজনীতিকরা যে ম্যাচিউরিটির পরিচয় দিয়েছেন এখনো পর্যন্ত আমাদের রাজনীতিকরা সে ম্যাচিউরিটি দেখাননি। এখনো আমরা হুজুগেই বলে যাচ্ছি, ওমুক দলের সাথে আমরা কোনো আলোচনায় বসব না। অমুককে যদি ডাকা হয়, তা হলে আমরা যাব না। এখন এই সব সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি আর হীনম্মন্যতার অবসান হওয়া দরকার। বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের শোষণের ঘাঁটি বানানোর চক্রান্তের অংশ হিসেবে যে কিছু নন-ইস্যুকে ইস্যু করা হচ্ছে, সেগুলো থেকে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সরে আসা জরুরি। কেবল তা হলেই সরকারের সাথে সংলাপে রাজনীতিকরা লাভবান হতে পারবেন। অন্যথায় নয়।

পরিশেষে আবারো বলতে হয় নির্বাচন কমিশনের কথা। এই কমিশনের সদস্যরা সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি ব্যক্তি হিসেবে তাদের সমর্থন থাকতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের কথায় ও কাজে যদি সেই সমর্থন পক্ষপাতিত্বের রূপ নেয়, তা হলে নির্বাচন কমিশনের আর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না, তারা নিরপেক্ষতা হারান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপি'র সংস্কারবাজ নেতাদের প্রতি ইতোমধ্যে তেমনই পক্ষপাতমূলক আচরণ করে

www.pathagar.com

ফেলেছেন। কিন্তু তারও জেনে রাখা উচিত যে, বিএনপি বা আওয়ামী লীগ যত সংস্কারবাজই গজিয়ে উঠুক না কেন, এই দুই দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাই। ইতোমধ্যে তার প্রমাণও পাওয়া শুরু হয়েছে। বিএনপি'র সংস্কারবাজরা ইতোমধ্যেই একঘরে হয়ে পড়েছেন। আওয়ামী লীগের সংস্কারবাকেরা মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সাধারণ কর্মীদের হাতে নাজেহাল হচ্ছেন। সাধারণ কর্মীদের দাবি কেন তারা শেখ হাসিনার মুক্তি চাইছেন না। ফলে আওয়ামী সংস্কারবাজদেরকেও এখন শেখ হাসিনার মুক্তি দাবি করতে হচ্ছে। নেতারা যে অবস্থানেই থাকুন না কেন, কর্মী পর্যায়ে দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেছে। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের কোনো আচরণে যদি চালাকি কিংবা সংস্কারবাজদের প্রতি পক্ষপাত লক্ষ করা যায়, তা হলে এই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পর্যন্ত নাও টিকতে পারে। দেশকে গণতন্ত্রের উত্তরণের পথে তাই তাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে।

আমরা চাই, দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। বর্তমান ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশ ও দেশের মানুষ পরিত্রাণ লাভ করুক।

১৩.০৪.২০০৮

www.pathagar.com

সংস্কারবাদীদের জন্য সুখবর নেই

আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব এখন মোটামুটি সংস্কারবাদীদের হাতে সংহত আছে। তারা আলাপ-আলোচনা করছেন। বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্তই এখন সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল ভূমিকা পালন করছেন। জিল্লুর রহমান বা মতিয়া চৌধুরী পড়ে গেছেন সাইড লাইনে। তারা নীরবে সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ শেখ হাসিনা আদালতে হাজিরা দিতে এসে বারবার বলছেন যে, যেকোনো মূল্যে তারা যেন দলের ঐক্য বজায় রাখেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন শেখ হাসিনাকে লন্ডন থেকে দেশে আসতে দিচ্ছিল না, তখন তিনি ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির সাহায্যের জন্য তার সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন। প্রণব মুখার্জির সাথে সরকারের কোনো কথা হয়েছিল কি না জানা না গেলেও শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা দেশে ফেরত এসেছিলেন। বর্তমান সরকার তার রাষ্ট্রঘাতী ও লগি-বৈঠার নরহত্যা আন্দোলনের ফসল দাবি করে তিনি সরকারকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গিয়ে তিনি বর্তমান সরকারের সব কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেবেন। সরকার যেন লাখ লাখ কোটি টাকার 'দুর্নীতিবাজ' জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপি, নেতা-কর্মীদের আস্থামতো পিট্টি দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেয়।

কিন্তু সময় যত গেছে, ততই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, ভারত তার পুরাতন মূর্তি বিসর্জন দিয়ে নতুন প্রতিমা গড়ে তুলেছে। সেখানেই তারা অর্ঘ্য নিবেদন করে যাচ্ছে। সেখানে তিনি বিসর্জিতা, পরিত্যক্ত। ফলে আওয়ামী লীগের সংস্কারবাজ নেতারা এখন সামনে। তাদের কাছেও শেখ হাসিনা মূল্যহীন একটি নাম। কিন্তু বিপত্তি বাধল টুঙ্গীপাড়ায় গিয়ে। এই সংস্কারবাজরা যখন টুঙ্গীপাড়ায় শেখ মুজিবের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে গিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগের কর্মীরা নেতাদের চেপে ধরেন, কেন তারা শেখ হাসিনার মুক্তি দাবি করছেন না। বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা তখন সাধারণ কর্মীদের হাতে নাজেহাল হন। তা হলে? আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীরা উপলব্ধি করেন যে, শেখ হাসিনার মুক্তি না চাইলে ঘর থেকে বের হওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। যেখানে-সেখানে সাধারণ কর্মীদের হাতে তারা নাজেহাল হবেন।

www.pathagar.com

তখন কৌশল পরিবর্তন করা হলো। আওয়ামী লীগ নেতারা কানের চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে পাঠানোর আহ্বান জানাতে শুরু করছেন। লক্ষণীয় তারা শেখ হাসিনার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছেন না। সরকারের সাথে আলোচনাকালে আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদী নেতারা বলেছেন, 'শেখ হাসিনার উপস্থিতি ছাড়া সংলাপে অর্থবহ ফল পাওয়া যাবে না।' এখানেও কথার মারপ্যাঁচ আছে। অর্থাৎ শেখ হাসিনাকে যদি সরকার মুক্তি দেয়ও, তাহলে তাকে যেন কানের চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নির্বাচনের আগে তার আর দেশে না ফিরলেও চলবে। ফিরলে আবারো জেলে। দুর্নীতির দায়ে যদি কেউ জেলে যায়, তাহলে আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদী নেতাদের কী করার আছে! অর্থাৎ বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে এখন নিজ দলেরই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছেন শেখ হাসিনা।

তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের কাছে এই ষড়যন্ত্র অস্পষ্ট থাকবে না। তখন সংস্কারবাদীরা যেতে পারবেন তো ভোটারদের কাছে? সংশয় হয়। গেলে নাজেহাল হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। কারণ আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতারা যে ভাষায় কথা বলছেন, তাদের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আন্দোলন করছে তার ভাষা ভিন্ন। তারা শেখ হাসিনার 'নিঃশর্ত মুক্তির' দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে শুরু করেছে। তাহলে আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীদের জন্য কী ধরনের নির্বাচন দরকার? যে নির্বাচনে ভোট চাইতে জনগণের কাছে যেতে হবে না। ভোট হবে এবং তারা আপনাআপনি নির্বাচিত হয়ে আসবেন। সে রকম ভোটের অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগ নেতাদের আছে।

তবে সে রকম নির্বাচন করে ক্ষমতায় থাকতে হলে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো সেনাবাহিনীর সমর্থন লাগবে। জনগণ যদি স্বতঃস্ফূর্ত কাজে সেনাবাহিনীকে ভয় পায়, তাহলে সেনাবাহিনী জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হবে। ধারণা করি, সেনাবাহিনী সে পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেবে না। তখন এইসব নেতা বা রাজনীতিক ডাস্টবিনে পরিত্যক্ত বেওয়ারিশ শিশুর মতো অসহায় হয়ে পড়বেন।

এদিকে বিএনপি'র সংস্কারবাজদের অবস্থা ইতোমধ্যে করুণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের আহ্বান যারা জানিয়েছিলেন, সরকার পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে তারাই এখন সংস্কার-ফংস্কার থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু নানাবিধ সংস্কার প্রস্তাব তুলে এরা এখন হাস্যকর টোকাইয়ে পরিণত হয়েছেন। এদের সংস্কার প্রস্তাবের মুখ্য বিষয় ছিল বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। দুই টার্মের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। চেয়ারপারসন থাকলে প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না। দুই টার্মের বেশি চেয়ারপারসন থাকা যাবে না। এসব করতে গিয়ে এক সংস্কারবাজ নেতা ইতোমধ্যেই জুতাপেটা হয়েছেন।

www.pathagar.com

এত সব কাণ্ডের পর নিজেরাই বেগম খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন আর অস্থায়ী মহাসচিব ঘোষণা করে আর একটি বিএনপি'র জন্ম দিয়েছেন। ইতোমধ্যেই দৃশ্যপট থেকে মুছে গেছেন বহিষ্কৃত মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। মান্নান ভূঁইয়া সংস্কারের নানা ধুয়া তুলে তেমন একটা জুৎ করতে না পারায় বাদ হয়ে গেছেন তিনি। মান্নান ভূঁইয়ার আরেক সহযোগী সাবেক হুইপ আশরাফ হোসেন এখন জেল খাটছেন। তার অপর সহযোগী জিয়াউল হক জিয়া পলাতক। আরেক সহযোগী ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকারও সময় হয়ে আসছে। বিপুল পরিমাণ অনর্জিত সম্পত্তি পাওয়া গেছে খোকা ও তার স্ত্রী-সন্তানদের নামে। নরসিংদীর বকুলকে আরটিভি'র পর্দা কাঁপিয়ে খালেদা জিয়াকে বিদায় করার কথা শোনা যায় না। বেগম খালেদা জিয়া কারাবন্দী হওয়ার মাত্র কিছু দিন আগে অব: লে. জে. মাহবুবুর রহমানকে স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোনীত করেছিলেন। বিশ্বাসঘাতক ক্লাবের তিনি একজন নেতা। আর আছে বিএনপি'র ইমিটেশনের অলঙ্কার বিএনপি চেয়ারপারসনের দু-একজন উপদেষ্টা।

কিন্তু সাধারণ মানুষ বিস্মিত হয়েছে বিএনপি'র বয়োবৃদ্ধ নেতা সাইফুর রহমানের কাণ্ড দেখে। বেগম খালেদা জিয়া সম্ভবত তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানের আসন দিয়েছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে। সেই সাইফুর রহমান তার বাসায় চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির কয়েকজন সদস্যকে। সেখানে গিয়ে কমিটির অন্তত তিনজন সদস্যকে চাপ দিয়ে একটি কাগজে সই নেন সাইফুর। সেই চায়ের দাওয়াতকে তিনি স্থায়ী কমিটির সভা বলে চালানোর চেষ্টা করেন। এবং নিজেকে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন ও অব: মেজর হাফিজউদ্দিনকে অস্থায়ী মহাসচিব ঘোষণা করেন। স্থায়ী কমিটির তিনজন সদস্য আদালতে এফিডেভিট দিয়ে ঘোষণা করেন যে, তাদের কোনো সভায় ডাকা হয়নি এবং চাপ প্রয়োগ করে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয়া হয়। তা ছাড়া স্থায়ী কমিটির সভা ডাকতে পারেন কেবল চেয়ারপারসন নিজে, অন্য কেউ নন। আদালত যখন জানতে চান যে, ওই সভা কে ডেকেছিলেন, সাইফুর রহমানদের পক্ষ তার কোনো জবাব দিতে পারেনি। অর্থাৎ বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ও রকম কোনো সভাই হয়নি। তার পরও সাইফুর-হাফিজ কেমন করে নিজেদের বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন ও অস্থায়ী মহাসচিব দাবি করছেন বোঝা গেল না।

কয়েক দিন আগে বিএনপি'র এই টোকাই ক্লাব একটা শোডাউনের আয়োজন করেছিল। তাতে বিভিন্ন সময়ে বিএনপি থেকে নির্বাচিত সাবেক ৪০-৫০ এমপিকে হাজির করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল সাইফুর-হাফিজের সাথে অনেক সাবেক এমপি আছেন। ফলে তাদের অংশও একটা শক্তিশালী দল। কিন্তু সেখানে সাইফুর রহমানের

www.pathagar.com

করুণ দশা দেখে যেকোনো পাষাণেরও দুঃখ হবে। বোঝা গেল একেবারে বিছানা থেকে তাকে চার-পাঁচজনে তুলে এনেছেন বক্তব্য দেয়ার জন্য। তার পরনে লুঙ্গি। সে লুঙ্গি বারবার খসে যায়। দু-একজন ধরে রাখে। মাইক ছুটে গেল হাত থেকে। কথা বলতে পারছিলেন না তিনি। অবঃ মেজর হাফিজ তার মুখে কথা গুঁজে দিচ্ছিলেন। শুধু বোঝা গেল তিনি গণতন্ত্র চান। ওখান থেকে ফিরে তিনি এ্যাপোলো হাসপাতালে শয্যা নিয়েছেন। আমরা তার রোগমুক্তি কামনা করি।

তবে সাধারণ কর্মীদের কাছে এই ক্লাব সদস্যদের অবস্থার প্রমাণ পাওয়া গেল গত বৃহস্পতিবার। সে দিন সকাল ১০টায় আলোচনার জন্য নির্বাচন কমিশন তাদের দাওয়াত দিয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের সাথে মূল বিএনপি'র আলোচনা ছিল দুপুর ১২টায়। বিএনপি'র সংস্কারবাজ অংশের প্রতিনিধি হিসেবে কমিশনে গিয়েছিলেন অবঃ লে. জে. মাহবুবুর রহমান, অবঃ মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদ, মনজুরুল করিম ও ফজলুল আজিম। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন জনাচল্লিশেক যুবককে। সংস্কারবাজরা যখন সিইসি'র সাথে আলোচনা করতে যান, তখন তারা করতালি ও শ্লোগান দিয়ে স্বাগত জানায়।

কিন্তু মূল ধারার বিএনপি'র সাথে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা উপলক্ষ্যে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ওই এলাকায় সমবেত হতে শুরু করে বিএনপি'র বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। কমিশন এলাকা থেকে সংস্কারবাজদের পক্ষে শ্লোগান শুনে বিএনপি'র হাজার হাজার কর্মী পাল্টা শ্লোগান দিতে শুরু করে। তখন অবঃ মেজর হাফিজদের পক্ষে আসা যুবকরা বাণিজ্য মেলার মাঠ পেরিয়ে জিয়া উদ্যান পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু মাহবুব-হাফিজ গং পালাবেন কোন পথে? তারা রোকেয়া সরণি দিয়ে না বের হয়ে পুলিশের সহায়তায় মিরপুরের দিকে পালিয়ে যান। পালাতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনে মোবাইল ফোন হারিয়ে ফেলেন অবঃ মেজর হাফিজ। সেটি কুড়িয়ে পান কমিশনের এক কর্মী। পরে তা জনাব হাফিজের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

ইতঃপূর্বে জনাব হাফিজ জোর গলায় বলেছিলেন, তারা লাখ লাখ লোকের সমাবেশ করে দেখিয়ে দেবেন যে কারা মূল বিএনপি। বৃহস্পতিবার যদি তারা চারজন শুধু আসতেন নির্বাচন কমিশনে, তাহলে বুঝতাম যে তারা সংঘর্ষ এড়াতে চান বলে তাদের কোনো 'কর্মী'কে নির্বাচন কমিশনে আসতে বারণ করেছেন। কিন্তু তারা তো তা করেননি। জনাচল্লিশেক লোক ভাড়া করে এনেছিলেন করতালি দিতে। নিএনপি কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ দেখে সে ভাড়াটেরাও পালিয়ে গেছে জনাব হাফিজদের মতোই।

www.pathagar.com

তবু নির্বাচন কমিশনের কাছে কিছুই স্পষ্ট হতে চায় না। বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। এ সত্যে কোনো প্রশ্ন নেই। এখন কথা নেই বার্তা নেই, কেউ একজন হঠাৎ নিজেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন ও আরেকজন নিজেকে দলের অস্থায়ী মহাসচিব ঘোষণা করল। অমনি কি দল ভাগ হয়ে গেল? প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রাজনৈতিক দল চলে তার গঠনতন্ত্র দিয়েই। যেমন সরকার চলে সংবিধান দিয়ে। সে গঠনতন্ত্র গণতান্ত্রিক না স্বৈরতান্ত্রিক সে বিবেচনার দায় নির্বাচন কমিশনের হতে পারে না। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের বিবেচনা গঠনতন্ত্র অনুযায়ীই হওয়া দরকার।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য যেকোনো এক পক্ষকে চিঠি দেবে। সে ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কমিশনের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাই হবে বড় কথা। তাতে যেন সজ্ঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেটা দেখার দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের।

২১.০৪.২০০৮

www.pathagar.com

অনিশ্চিত বন্ধুর পথে যাত্রা

বাংলাদেশে এ বছরের শেষ নাগাদ জাতীয় সংসদের নির্বাচন যদি হয়ও, তা হলে সে নির্বাচন কেমন হবে, তার একটা ধারণা পাওয়া গেল নির্বাচন কমিশনের বিএনপি বিষয়ক সিদ্ধান্ত থেকে। গত ২২ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন প্রকৃত বিএনপি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সাইফুর রহমান ও হাফিজউদ্দিন আহমদকে। সে ক্ষেত্রে কোনো যুক্তির ধার ধারেন না নির্বাচন কমিশনাররা। তারা যাদের পছন্দ করেছেন, তারাই বিএনপি। তারা যাদের নির্বাচিত বলে পছন্দ করবেন, তারাই নির্বাচিত বলে বিবেচিত হবে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রিয় বুলি 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি' প্রাধান্য পাবে বলে মনে হয়। কে কত ভোট পেল, সেটা আর বড় কথা বলে বিবেচিত হবে এমন মনে হয় না।

এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের উদাসীনতা কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কমিশনের যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল, তা-ও শিথিল হয়ে আসছে। আগামী মাসে ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৭টি পৌরসভা নির্বাচনের যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তা-ও পিছিয়ে গেছে। এখন যেটুকু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, তা স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন বলতে প্রথম দিকে বোঝা গিয়েছিল জেলা-উপজেলা নির্বাচন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সরকার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনও করতে চাইছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে। যে কারণে সরকার ইউপি সদস্যদের সম্মেলন করাচ্ছেন, সে সম্মেলনে উপদেষ্টারা প্রধান অতিথি হচ্ছেন। সেখান থেকে দাবি তোলানো হচ্ছে, আগে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করতে হবে, তারপর জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এর মধ্যে সরকারের ধামাধরা বলে পরিচিত দু-একজন নামকরা ব্যক্তিও আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চাইছেন। সরকারের বা নির্বাচন কমিশনের ধারণা, এসব কৌশলের বোধ করি কিছুই বুঝতে পারছে না জনগণ। তারা যেভাবে বোঝাতে চাইছেন, জনগণও ঠিক সেভাবেই বুঝবে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো। ব্যাপারটা বোধ হয় এতখানি সরল নেই।

নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার শুরুতেই সরকার ও নির্বাচন কমিশন বিএনপি ভাঙার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ধুয়া তুলে পরিস্থিতি বেশ গরম করে ফেলেছিল। নির্বাচন

www.pathagar.com

কমিশনও বলতে শুরু করেছিল, দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা করতে হবে, সংস্কার করতে হবে, তা না হলে আলোচনা নেই। যে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা নেই, তারা দেশে গণতন্ত্র চর্চা করবেন কিভাবে? ফলে বিএনপি ও আওয়ামী লীগে কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেল। তারা নানা ধরনের সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করতে শুরু করল। সে সংস্কার প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ থেকে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে বাদ দেয়া। বিএনপিতে এই সংস্কারবাজদের নেতৃত্ব নিলেন দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। আর আওয়ামী লীগে সে দায়িত্ব নিলেন তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। কিন্তু পরিস্থিতি হিতে বিপরীত হলো। এসব সংস্কারবাজ নেতা মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের ধাওয়া খেয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। সাধারণ কর্মীরা জানান দিয়ে দিলো, তাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাই। সংস্কারবাজদের এসব প্রস্তাবে তাদের কোনো সমর্থন নেই।

তত দিনে সরকার শেখ হাসিনাকে জেলে নিয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন গৃহবন্দী। জেল থেকে শেখ হাসিনা কাউকে সংস্কারবাজির দায়ে বহিষ্কার করেননি। কিন্তু আদালতে সংস্কারবাজদের তিরস্কার করেছেন। ফলে আওয়ামী লীগের সংস্কারবাজরা আপাতত চুপ হয়ে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর সরকার বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার আগে বেগম খালেদা জিয়া গঠনতন্ত্র বলে মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে বিএনপি'র মহাসচিব নিয়োগ করেন। কিন্তু আবদুল মান্নান ভূঁইয়া নিজেকে বিএনপি'র মহাসচিব দাবি করতে থাকেন এবং তার আশপাশে কয়েকজন ভাসা-পানা জোগাড় করেন। কিন্তু সময় যত যেতে থাকে, ততই একা হয়ে পড়তে থাকেন মান্নান ভূঁইয়া। ক্রমে তার অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তার মদতদাতারাও তার ওপর থেকে আশীর্বাদের হাত সরিয়ে নেন। কিন্তু বিএনপি যে ভাঙতেই হবে। উপায়?

এই রঙ্গমঞ্চে হুইল চেয়ারে চড়ে আবির্ভূত হলেন প্রবীণ বিএনপি নেতা সাইফুর রহমান। তার বাসায় তিনি চায়ের দাওয়াত দিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির ৬ সদস্যকে। এই সাইফুর রহমানসহ বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির ৮ জন সদস্য এখন কারাগারের বাইরে আছেন। ১২ জনের মধ্যে বাকি চারজন কারাগারে। এর মধ্যে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ছাড়া বাকি ৭ জন তার বাসায় চায়ের দাওয়াতে হাজির হন। সেখানে চাপ প্রয়োগ করে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। তারপর মিডিয়ায় জানিয়ে দেয়া হয়, সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে সভায় সাইফুর রহমানকে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও মেজর (অব:) হাফিজউদ্দিন আহমদকে অস্থায়ী মহাসচিব নিয়োগ করা হয়েছে। সেদিনই স্থায়ী কমিটির দীর্ঘকালের এক সদস্য পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে জানান, সাইফুর রহমানের বাসায় তিনি চায়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্থায়ী কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি বা সভা হবে বলে কোনো নোটিশও দেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন যেন এই ঘটনারই অপেক্ষায় ছিল। তাই ঘোষণামাত্রই তারা বিএনপি'র স্থায়ী মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে বাদ দিয়ে 'স্থায়ী কমিটি মনোনীত' অস্থায়ী মহাসচিবকে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল। এ ক্ষেত্রে বিএনপি'র গঠনতন্ত্রকে কোনো বিবেচনায় নেয়নি নির্বাচন কমিশন। তারা ঘোষণা করলেন, বিএনপি'র গঠনতন্ত্র নয় প্রয়োজনের খাতিরেই (ডকট্রিন অব নেসেসিটি) তারা মেজর (অব:) হাফিজকে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ব্যাপারটা সেখানেই থেমে যায়নি। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে রিট আবেদন করেন বেগম খালেদা জিয়া। দীর্ঘ শুনানির পর এটিকে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় মীমাংসার এখতিয়ার আদালতের নয় বলে খারিজ করে দেয়। তখন স্থায়ী কমিটির তিনজন সদস্য আদালতকে জানান, ওই দিন স্থায়ী কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তারা চায়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের স্বাক্ষর নেয়া হয়। পরে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির ৫ জন সদস্য নির্বাচন কমিশনকে একই কথা লিখিতভাবে জানান। তা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন মেজর (অব:) হাফিজকে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটি মনোনীত 'অস্থায়ী মহাসচিব' হিসেবে সংলাপে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উপেক্ষা করেছেন প্রকৃত বিএনপিকে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, তা হলো এক. বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী স্থায়ী কমিটির সভা আহ্বান করার ক্ষমতা একমাত্র চেয়ারপারসনের। সাইফুর রহমানের বা অন্য কারো এ ধরনের সভা আহ্বান করার কোনো ক্ষমতাই নেই। দুই. সেদিন তিনি চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সভা আহ্বান করেননি। তিন. বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির ১২ সদস্যের মধ্যে ৪ জন কারাগারে। বাইরে আছেন ৮ জন। সেদিন সাইফুর রহমানের বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন সাইফুর রহমানসহ ৭ জন। তাদের মধ্যে ৫ জনই বলেছেন, সেদিন স্থায়ী কমিটির কোনো সভা হয়নি। বাকি থাকে ২ জন। এই দুইজনের একজন সাইফুর রহমান নিজে। অপরজন লে. জে. (অব:) মাহবুবুর রহমান। এরকম দুই ব্যক্তি বসে নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠিত ও দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের চেয়ারপারসন-মহাসচিব ঘোষণা দিলেই তারা চেয়ারপারসন ও মহাসচিব হয়ে গেলেন! আর নির্বাচন কমিশনও তাদেরকেই ওই দলের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নিলো। কি বিচিত্র আমাদের নির্বাচন কমিশন!

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, প্রতিযোগিতামূলক খাঁটি নির্বাচন চাইছে না নির্বাচন কমিশন। সে নির্বাচনে তারা যেমন তাদের পছন্দের লোকদের অংশগ্রহণ চায়, তেমনি সম্ভবত, তাদের পছন্দের লোকদের নির্বাচিত করে আনতে চায়। নির্বাচন কমিশনের এই অযৌক্তিক ও খামখেয়ালি আচরণের জন্য বিএনপি ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের প্রতি তাদের অনাস্থা ঘোষণা করেছে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য দুই কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেছে।

www.pathagar.com

এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন চায় না, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি অংশগ্রহণ করুক। বিএনপি বর্জন করলে সাইফুর-হাফিজকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের শেষ রক্ষা হবে না। সে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যও হবে না।

আর যা হবে বলে আশঙ্কা করা যায়, তা হলো গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা। প্রধান দলগুলোর কোনোটি যদি নির্বাচনে না যায়, তাহলে যেনতেন প্রকারে একটি নির্বাচন হয়তো করা যাবে। সে নির্বাচনে পছন্দের লোকদের বিজয়ী ঘোষণা করে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সেসব খেলার পুতুলদের শাসন স্থায়ী করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। মেজর (অবঃ) হাফিজকে বিএনপি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে নির্বাচন কমিশন সে সংঘাতের পথেই পা রাখল। আর বাড়ল নির্বাচন নিয়ে সংশয়। এ সংশয় শুধু জাতীয় নির্বাচন নিয়েই নয়। সরকার ও নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের যে ঢেরা পেটাচ্ছেন, সে নির্বাচনও যে অবাধ ও সুষ্ঠু হবে, সে আশা করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। তেমনি নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা পৌঁছল শূন্যের কোঠায়। বিএনপি'র প্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচ সদস্যের ভোটের চেয়ে দুই সদস্যের ভোটকেই বেশি মনে করেছে নির্বাচন কমিশন। পাঁচ ভোট পেয়েও জয়লাভ করতে পারেননি খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। সেখানে নির্বাচন কমিশন দুই ভোটের সাইফুর-হাফিজকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। ভবিষ্যতের নির্বাচনে ৫০ হাজার ভোট পেয়ে পরাজিত ঘোষিত হতে পারেন কেউ। ২০ হাজার ভোট যে পেয়েছে তাকে 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'র দোহাই দিয়ে যে নির্বাচন কমিশন বিজয়ী ঘোষণা করবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে?

না, নিশ্চয়তা নেই। ফলে এক অনিশ্চিত বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু হলো আমাদের। সামনে রাজনৈতিক-সামাজিক সংঘাত-বিশৃঙ্খলা হয়তো অপেক্ষমাণ। বাংলাদেশকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি, সে ষড়যন্ত্র রুখতে জনগণের শক্তির ওপরই এখন ভরসা। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, শেষ পর্যন্ত জনগণেরই জয় হয়, ষড়যন্ত্রকারীরা নিক্ষিপ্ত হয় আঁস্তাকুড়ে।

২৬.০৪.২০০৮

www.pathagar.com

কেড়ে নিলেন ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের গ্রাস?

ক্ষুধার্ত দুস্থ মানুষেরা সকাল থেকে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেলা যত বেড়েছে সে লাইন তত দীর্ঘ হয়েছে। এক এসেছে ডেকচি ভর্তি গরম খাবার। ভাপ উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে খাবার পাবেন তারা পাত্রে। শিশু ও বৃদ্ধরা অপেক্ষমান। ঠিক তখনই এলো দানোসম পুলিশ বাহিনী। ভ্যানে করে খাবারের সব ডেকচি তুলে নিয়ে গেল অজানা গন্তব্যে। এ এক ভয়াবহ নিষ্ঠুর অমানবিক দৃশ্য। ক্ষুধার্ত মানুষের একেবারে মুখের কাছ থেকে গ্রাস কেড়ে নিয়েছে অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই ঘটনায় স্তম্ভিত দেশের বিবেকবান মানুষেরা। এও কি সম্ভব? হ্যাঁ, সরকার সেটা সম্ভব করেছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তাদের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল এক দিনের খাবার। সে খাবার দুস্থদের মধ্যে তিন দিন ধরে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছিল। সে উদ্যোগের অংশ হিসেবেই খাবার বিতরণের কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল। খাবার তৈরি করে নির্ধারিত স্থানে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল। দুস্থ ক্ষুধার্ত মানুষেরা এসে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু সে খাবার কেড়ে নিয়ে গেছে সরকার।

প্রথম দিন রান্না করা খাবার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল খিলগাঁও চৌরাস্তাসহ ৬টি স্পটে। বাড্ডা ছাড়া আর কোনো স্পটেই খাদ্য বিতরণ করতে পারেনি বিএনপি নেতা-কর্মীরা। খাবার কেড়ে নিয়ে গেছে পুলিশ। খিলগাঁও চৌরাস্তায় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করার কথা ছিল বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের। সেখানে সকাল থেকে মানুষ সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করছিল খাবারের আশায়। তাদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধরাও ছিল। দুপুর একটায় এ খাদ্য বিতরণের কথা ছিল। তার আগেই পুলিশ ২২টি ডেকচি ভর্তি খাবার ছিনিয়ে ভ্যানে করে নিয়ে চলে যায়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ক্ষুব্ধ ক্ষুধার্ত মানুষ। পুলিশ বলেছে, এখানে খাবার বিতরণ শুরু করলেও যানজট লেগে যেতে পারে। তাই তারা খাবারের ডেকচিগুলো অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এটা কি কোনো যুক্তি হতে পারে? সকাল থেকে শত শত মানুষ অপেক্ষা করছিল সারিবদ্ধভাবে– যানজট তো হয়নি। খাবার বিতরণের সময় যানজট লাগবে কেন? এর কোনো সদুত্তর মেলেনি।

www.pathagar.com

এই কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনেও পুলিশ মিরপুর, কাফরুল, পল্লবী, সিদ্ধেশ্বরী, হাজারীবাগের ছয়টি স্পট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে রান্না করা খাবার ও চাল-ডালের প্যাকেট। খাদ্য বিতরণের জন্য মিরপুর মাজার গেটে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। তার সামনে থেকেই পুলিশ রান্না করা ২০ ডেকচি খাবার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কাফরুল থেকে পুলিশ একইভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ২০ ডেকচি রান্না করা খাবার। পুলিশ পল্লবী থেকে ছিনিয়ে নেয় ১৫ ডেকচি খাবার। সিদ্ধেশ্বরী থেকে পুলিশ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে চাল-ডালের ৩০০ প্যাকেট। আর বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে অজ্ঞাত স্থান থেকে হুমকি দেয়া হয়েছে এই কর্মসূচির জন্য।

কিন্তু এমন এক মানবিক কর্মসূচিতে বাধা দেবে সরকার? দেশে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, নৃত্যদিবস উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, নানা ধরনের উৎসবমূলক মিছিল। কোনোটা নিয়েও তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের এমন একটা মানবিক কর্মসূচি নিয়ে কেন এত সমস্যা? এখানে তো শুধু বিএনপি'র লোকরা জড়িত ছিল না। জড়িত ছিল হাজার হাজার দুস্থ মানুষ। বিএনপি যদি তাদের একবেলা খাবারের আয়োজন করেই থাকে তাতে দোষের তো কিছু ছিল না। এখানে তো সরকার একেবারে কিল মারার গোসাইয়ে পরিণত হলো।

গত ১৫ মাসে সরকার তো সাধারণ মানুষের জন্য কোনো সুখবরই সৃষ্টি করতে পারেনি। এই সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনমান কেবল অধোগামীই হয়েছে। এখন এই সরকারকে ক্ষমতায় আনার দাবিদার তথাকথিত সুশীল সমাজেরই কেউ কেউ বলছেন যে, বর্তমান সরকারের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে চার কোটি লোক কর্মসংস্থান হারিয়েছে। হকার উচ্ছেদ, দোকানপাট উচ্ছেদ, হাটবাজার উচ্ছেদ, ফ্ল্যাট ক্রেতাদের হাঁড়ির খবর- এমনি সব কাজের জন্য বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অপর দিকে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের তাড়া করে সরকার বিনিয়োগের পরিবেশ ধ্বংস করে দিয়েছে। ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা নতুন বিনিয়োগ করছেন না, ফলে নতুন কোনো কর্মসংস্থান হচ্ছে না। তার ওপর শ্রম বাজারে প্রতিদিন আসছে নতুন মুখ। তাদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে সরকার নিরুদ্বিগ্ন। এখন সরকার-বান্ধব এক সুশীল বলছেন, বাংলাদেশে কালো টাকা যখন পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছিল, তখনই তার ওপর আঘাত করা হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এক গবেষণায় উঠে এসেছে আরো এক ভয়াবহ চিত্র। সে গবেষণায় দেখা যায় গত মাত্র ১৫ মাসে নতুন করে ২০ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশে ৩ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। আগের সরকারের আমলে প্রায় ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৬ কোটি মানুষ ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। যদিও তাদের মধ্য থেকে ৯ শতাংশ মানুষ প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসছিল। বর্তমান সরকারের আমলে সে উঠে আসা তো বন্ধ হয়েছেই, তার ওপর এক বছরেই ২০ শতাংশ মানুষকে এই সরকার ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ দেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৯ কোটি মানুষই গরিব হয়ে গেছে এই সরকারের অপরিণামদর্শী ও অদূরদর্শী সব পদক্ষেপের ফলে।

এ ছাড়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপই নিতে পারেনি। খাদ্যসামগ্রীর দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে গণতান্ত্রিক সরকারের তুলনায়। আগে এক টাকায় যেটুকু খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যেত, এখন এক টাকায় পাওয়া যায় তার পাঁচ ভাগের ২ ভাগ। অর্ধেকেরও কম। অর্থাৎ সরকারের ভুল পদক্ষেপের পরিণামে এখন নয় কোটি মানুষ আধপেটা খেয়ে আছে। এক দিকে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম, অপর দিকে বেকারত্ব। ফলে অপুষ্টির শিকার হচ্ছেন কোটি মানুষ। তাদের কর্মক্ষমতা কমবে। কমবে উৎপাদন। সরকার যদি আরো ৮ মাস ক্ষমতায় থাকে এবং তাদের বর্তমান কর্মধারা যদি অব্যাহত রাখে তবে ধারণা করা যায়, এই ৮ মাসে কমপক্ষে আরো এক কোটি ষাট লাখ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাবে।

এর আলামত অবশ্য আছে জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে। বিগত জোট সরকারের শেষ বছরে বাংলাদেশের বার্ষিক জাতীয় প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল ৬.৭-এ। ধারণা করা হয়েছিল, ২০০৮ সাল নাগাদ এই প্রবৃদ্ধির হার ১০-এ উন্নীত হবে। বর্তমান অনির্বাচিত জবাবদিহিতাহীন সরকারের অদূরদর্শী কর্মকা র ফলে প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন, প্রবৃদ্ধি পাঁচ শতাংশ হলেই তিনি সন্তুষ্ট। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রবৃদ্ধি পাঁচ শতাংশও হয় না। কী ভয়ঙ্কর উন্নয়নবিরোধী ও উৎপাদনবিরোধী চিন্তা! এদের হাতে পড়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার! জাতির জন্য এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। কেউ কেউ বলছেন 'নীরব দুর্ভিক্ষ' চলছে। সরকার এটা মানতে রাজি নন। সরকারের এক উপদেষ্টা বলেছেন, না না কোনো নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে না। 'গোপন ক্ষুধা' বা 'হিডেন হাঙ্গার' বিরাজ করছে। কি যে হাস্যকর সব উক্তি! এমন অবস্থা তৈরি হয়েছিল ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময়। তখনো আমি সংবাদপত্রে চাকরি করতাম। দুর্ভিক্ষের সময় যখন পত্রিকায় লেখা হচ্ছিল, 'অনাহারে' অতজন মারা গেছে। তখন পত্রিকা অফিসগুলোতে তথ্য মন্ত্রণালয় এক আদেশ জারি করে বলেছিল, এখন থেকে আর 'অনাহারে মৃত্যু' বলা যাবে না। বলতে হবে 'অপুষ্টিতে' মারা গেছে। বর্তমান সরকার অবশ্য এখনো সে ধরনের আদেশ জারি করেনি যে, 'নীরব দুর্ভিক্ষের' বদলে 'হিডেন হাঙ্গার' লিখতে হবে। ক্ষুধা ক্ষুধাই। হিডেনই হোক আর নীরবই হোক, ক্ষুধার অনুভূতি একই। সে ক্ষুধা বাড়ছে। ফলে অপুষ্টিও বাড়ছে।

এমন একটা সময়ে যখন দুস্থ মানুষদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি নিলো তখন সে খাদ্য কেড়ে নিয়ে তাদের ঠ্যাঙাতে গেল কেন সরকার? সরকার যদি জনগণের কথা সামান্যও চিন্তা করত, তাহলে তাদের উচিত ছিল, বিএনপি'র এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনে পুলিশি সহায়তা দেয়া, খাদ্য ছিনিয়ে নেয়া নয়।

www.pathagar.com

আসলে ব্যাপারটি যে চূড়ান্ত রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক কাজ, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই। 'নির্দলীয়' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের ফলে সাধারণ মানুষের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হতে শুরু করেছে, সরকার মূলধারা বিএনপিকে ঝেটিয়ে বিদায় করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছে। এ কথা একজন বালকও বুঝবে যে, নির্বাচন কমিশনের সাথে অব: মেজর হাফিজদের বৈঠকের আগের রাতে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের ৫০ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কেন মামলা দেয়া হলো। কিন্তু হাফিজরা গার্মেন্টস ও দোকানদারদের ভাড়া করে নির্বাচন কমিশনে নিয়ে এসেছিলেন। ভাড়ার পয়সা দেননি অনেককে। তার আগেরবারও যারা এসেছিলেন, তারাও ভাড়ায় এসে শ্লোগান দিয়ে বেগতিক দেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা যে হাফিজদের সমর্থন করছেন না–সেটা তো এখন আর অস্পষ্ট নেই। বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা মূলধারা বিএনপি'র সাথেই আছে। বিএনপি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল। তাকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার চিন্তা করে থাকলে ভুল করছে সরকার।

এ সরকারের নিরপেক্ষ থাকাই ভালো। তা না হলে সরকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। এ সরকারের অধীনে নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে না। সে নির্বাচনে মূলধারার বিএনপিকে বাদ দিতে চাইলে দেশে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। একদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব। অপর দিকে রাজনৈতিক হানাহানির পরিবেশ সৃষ্টি হলে কোনো একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে জ্বলে উঠবে দেশ। সেটা কারো জন্য কল্যাণকর হবে না।

বর্তমান সরকার গত ১৫ মাসে মানুষের অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। বরং তাদের কর্মকাণ্ডে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। ক্ষুধা বাড়ছে। এই অবস্থায় কেউ যদি ক্ষুধার অন্ন নিয়ে দাঁড়ায় মানুষের পাশে, সে অন্ন ছিনিয়ে নেয়া মানুষের কাজ নয়। কোনো অজুহাতেই এ ধরনের মানবিক কাজে সরকারকে বাধা সৃষ্টি না করার অনুরোধ করি। জনমানুষের সাথে সম্পর্কহীন সরকারের কেউই মানুষের দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করতে পারছেন না। আমরা বলতে চাই সাধারণ মানুষ যেন সরকারকে 'ভাত দেওয়ার ভাতার নয়, কিল মারার গোসাই' না বলে।

০৩.০৫.২০০৮

www.pathagar.com

হ্যালো সিইসি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন কি?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দেশ কাঁপানো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজে নিয়োজিত সুপ্রিয় সিইসি তথা প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংস্কৃতিবান মানুষ কি না আমার জানা নেই। সব মানুষকে সংস্কৃতিবান হতেই হবে, এমন কোনো কথাও নেই। তা ছাড়া সংস্কৃতির চর্চা করেন কিছু লোক, উপভোগ করেন লাখ লাখ মানুষ। যারা উপভোগ করেন, তারাও সংস্কৃতিবান। আবার বহু মানুষ এর কোনো কিছুর সাথে জড়িত নেই। আয় করে। খায়দায় ঘুমায়। আরো আয় করে। তবু মানুষ সিনেমা দেখে। যাত্রা শুনতে যায়। সময় সুযোগ পেলে নাটক দেখে। আর গান শোনে। আশা করি আর কিছু না করুন, আমাদের সিইসি গানটান শোনেন। অঞ্জন দত্তের এক গানে শিল্পীর সে যে কী আকুতি! যে গানের কথা এমন : 'চাকরিটা আমি আজ পেয়ে গেছি বেলা শুনছ?/এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না।/সমন্ধটা এইবার তুমি ভেস্তে দিতে পারো।/ মাকে বলে দাও, বিয়ে তুমি করছ না।/চুপ করে কেন বেলা কিছু বলছ না?/ হ্যালো এটা কি টু ফোর-ফোর ওয়ান-ওয়ান থ্রি নাইন?/বেলা বোস, তুমি পাচ্ছ কি শুনতে?/দশ বারোবার রং নাম্বার পেরিয়ে তোমাকে পেয়েছি/দেব না কিছুতেই আর হারাতে?/দিন না ডেকে বেলাকে একটিবার।/মিটার যাচ্ছে বেড়ে, এই পাবলিক টেলিফোনে/জরুরি খুব জরুরি দরকার। দিন না ডেকে বেলাকে একটিবার?/বেলা বোস, তুমি পাচ্ছ কি শুনতে?'

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডক্টর এ টি এম শামসুল হুদাকে এখন ভারি দরকার। তিনি যে কিছুই শুনলেন না। বুঝতেও পারলেন না। কিন্তু গত বুধবার তার সাধের সাইফুর রহমান যা বলেছেন, তা কি তিনি শুনতে পেয়েছেন? বেলা বোস কি শুনতে পেয়েছিল? বেলা বোস চুপ করে ছিল। অপর প্রান্তে আর্তধ্বনি, বোলা, তুমি শুনতে পাচ্ছ কি?

না, কোনো কথা শুনতে চাননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার। কী যেন হনুরে ভাব নিয়ে যা খুশি তাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন প্রথম থেকেই। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের চেয়ার চিরস্থায়ী নয়। এখানে অনেকেই এসে বসে। আবার চলেও যেতে হয়। সব সময় সে চলে যাওয়া সম্মানেরও হয় না।

www.pathagar.com

বিএনপিকে নিয়ে প্রথম থেকেই প্রধান নির্বাচন কমিশনের যে যৌক্তিক মানসিকতা কাজ করেছে, তাতে বুঝাই গেছে যে, তিনি যৌক্তিক কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। তিনি যেন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন যে, বিএনপি ভাঙবেন এবং গঠনতন্ত্র নয়, তার পছন্দের অংশকে বিএনপি বলে স্বীকার করে নেবেন। সে জন্য তিনি বিএনপি'র বহিষ্কৃত মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়াকে বহিষ্কার করা বেগম খালেদা জিয়ার জন্য ভারি অন্যায় কাজ হয়েছে বলে হম্বিতম্বি করেছেন। যেন তিনি মান্নান ভূঁইয়া সমর্থক এক মহাজন। যে পরিস্থিতিতেই হোক, বিএনপি'র দু'নাম হলো বটে, কিন্তু মান্নান ভূঁইয়া মহাসচিব থাকেননি। তবে সিইসি'র তম্বি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মান্নান ভূঁইয়াকে দলের মহাসচিব পদে পুনর্বহাল করে ছাড়বেন। তা তিনি পারেননি।

শেষমেশ দলের ভুয়া সভা দেখিয়ে সাইফুর রহমানকে অস্থায়ী চেয়ারপারসন আর অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ঘোষণা করা হয়। তাতে হাতে চাঁদ পেয়ে যান সিইসি। তিনি সাইফুর-হাফিজকে বিএনপি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কমিশনে ডেকে, কেনো গঠনতন্ত্রের দিকে না তাকিয়ে ওদের ডাকা হলো? সিইসি বললেন, গঠনতন্ত্র নয়, ডকট্রিন অব নেসেসিটি অনুসারে তাদের ডাকা হয়েছে। এমন অন্ধ স্বৈরাচারী মানসিকতা সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত এই লোকের।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির তথাকথিত এক সভা নাকি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাইফুর রহমানের বাসায়। সেখানে হাজির হয়েছিলেন স্থায়ী কমিটির সাত সদস্য। চায়ের পর তাদের কাছ থেকে চাপের মুখে স্বাক্ষর নেয়া হয় এক কাগজে। তাতে সাইফুর রহমানকে অস্থায়ী চেয়ারপারসন ও হাফিজ উদ্দিনকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বিএনপি'র গঠনতন্ত্রে এমন কোনো পদই নেই। আবার চেয়ারপারসন ছাড়া বিএনপি স্থায়ী কমিটির সভা ডাকার এখতিয়ারও কারো নেই। স্বাক্ষর নেয়া হলেও ওই দিনই স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য জানান, সেখানে স্থায়ী কমিটির কোনো সভা হয়নি। এরা সাইফুর রহমানের চায়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন। সংলাপের জন্য ডাকার আগে স্থায়ী কমিটির আট জন সদস্য নির্বাচন কমিশন বরাবর চিঠি দিয়ে জানান, সেদিন স্থায়ী কমিটির কোনো সভা হয়নি এবং তারা সাইফুর-হাফিজকে দলীয় কোনো দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। তা সত্ত্বেও জন্মান্ধ নির্বাচন কমিশন ওই অংশকেই বিএনপি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংলাপে ডাকেন।

কিন্তু যে সাইফুর রহমানকে আঁকড়ে ধরে সিইসির এত আকুলতা সে সাইফুর রহমানই সিইসি'র অন্ধ চোখে আলপিনের আঁচড় দিয়ে দিয়েছেন। গত বুধবার তিনি বলেছেন, 'আমি আর বিএনপি'র অস্থায়ী চেয়ারম্যান নই।' সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার আগে সিলেট থেকে আসা বিএনপি'র নেতাকর্মীদের সামনে তিনি বলেন, স্থায়ী কমিটির চারজন সদস্য আদালতে হলফনামার মাধ্যমে গত ২৯ অক্টোবরের বৈঠক বাতিল করার পর থেকে তিনি আর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন নেই। দলে একজন চেয়ারপারসন রয়েছেন। তিনি বেগম খালেদা জিয়া। গত ২৯ অক্টোবর স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তাকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন মনোনীত করেন। কিন্তু তা ছিল নামমাত্র। এরপর স্থায়ী

www.pathagar.com

কমিটির চারজন সদস্য বিষয়টি আদালতে হলফনামার মাধ্যমে প্রত্যাহার করে নেয়ার পর থেকে তার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসনের পদও অকার্যকর হয়ে গেছে। এ জন্য আর কাউকে দায়িত্ব দেয়ারও প্রশ্ন ওঠে না।

সাইফুর রহমান বলেছেন, 'একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ২৯ অক্টোবর দল পরিচালনার জন্য একটি সভা হয়েছিল। তখন যারা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকেই এখন বলছেন, সে সভাটি স্থায়ী কমিটির ছিল না। আমি তাদের চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলাম। আসলে আমি তো নামে মাত্র ছিলাম।'

তিনি বলেন, আজ বিএনপিতে যারা সংস্কারবাদী হিসেবে পরিচিত তারা দল ভাঙতে ওস্তাদ। দল গড়তে জানে না। যা কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, আওয়ামী লীগ থেকে এসেছে তারা দল ভাঙার কাজে লিপ্ত। বেগম খালেদা জিয়া হচ্ছেন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংস্কারবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। ইতিহাস এক সময়ে তাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করবে। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দক্ষিণ এশিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, খালেদা জিয়া শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষার দিক দিয়ে সব দেশকে ছাড়িয়ে যায়। তার জোরালো সমর্থন ছিল বলেই এসব সংস্কার কাজে অর্থমন্ত্রী হিসেবে আমি সফল হই। আজ যারা দলে সংস্কারবাদী হিসেবে পরিচিত, তারা এসব জনকল্যাণমুখী সংস্কার কাজে পেছন থেকে হাত টেনে ধরতেন। আমি আমৃত্যু বিএনপিতে থাকতে চাই।

সাইফুর রহমানের এই বক্তব্যের পর বাম ঘরানা থেকে বিএনপিতে এসে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙের দায়ে বহিষ্কৃত সংস্কারবাদী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া কোনো কথা বলেননি। স্বঘোষিত ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'সাইফুর রহমান বয়োবৃদ্ধ মানুষ। কী থেকে কী বলে ফেলেছেন, তা ঢাকায় এসে জেনে এবং নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করে কথা বলবেন।' তবে দলের ঐক্যের প্রয়োজনে তিনিও অস্থায়ী মহাসচিবের পদ ছেড়ে দেবেন। তার নির্বাচনী এলাকা তজুমদ্দিন-লালমোহনে গিয়েও তিনি স্থায়ী নেতাদের হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হন। তবে জেলা পর্যায়ের নেতাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এড়িয়ে গেছেন মেজর হাফিজ।

হ্যালো, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন কি? এবার কাকে বানাবেন বিএনপি'র অস্থায়ী চেয়ারপারসন? আপনার ডকট্রিন অব নেসেসিটি কী বলে? গত ২৯ অক্টোবর বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সভা যে হয়নি, এটা সাইফুর রহমানও স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ছাড়া ওই বৈঠকে তিনি ছিলেন 'নামে মাত্র' বলে জানান দিয়েছেন জনাব সাইফুর রহমান। ওই সভা যদি না হয়ে থাকে আর সাইফুর রহমান যদি অস্থায়ী চেয়ারপারসন না থেকে থাকেন তা হলে অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ কি আর ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব থাকেন? প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাহেব কী বলেন? তিনি অবশ্য বলতে পারেন, হাফিজ তো আছেনই, এখন দরকার একজন অস্থায়ী চেয়ারপারসন। যে

www.pathagar.com

কোনো লেদি-ছেদীকে ঘোষণা দিয়ে দিলেই হলো। নির্বাচন কমিশন এ পর্যন্ত যা করেছে তাতে সে রকমটা আশা করাই সঙ্গত।

সিইসির স্মরণ থাকতে পারে যে, সিলেটের লোকদের কাছে সাইফুর রহমান দুঃখ করে বলেছিলেন, তিনি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছেন। সিলেটের জন্য এত কিছু করেছেন। নেতাকর্মীদের জন্য করেছেন। তবে তিনি শুনেছেন সিলেটে গেলে তাকে ঢিল মারা হবে। কেউ তার টেলিফোন পর্যন্ত রিসিভ করেনি তিনি নিজেকে দলের অস্থায়ী চেয়ারপারসন ঘোষণা দেয়ার পর থেকে। এদিকে নিজেকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ঘোষণা করার পর মেজর হাফিজ দু'বার তার নির্বাচনী এলাকায় গেছেন। ভোলা শহরে যাননি। নীরবে তজুমদ্দিন-লালমোহন সফর করে এসেছেন। তার সাথে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতারা কেউ দেখা করেনি। এই নেতাদের পুলিশ দিয়ে বা মূল বিএনপি'র কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার পর মামলা দিয়ে রক্ষা করা যাবে না, বা তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বিএনপিতে তারা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছেন।

শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম, নির্বাচন কমিশন যেন চালাকি বা খামখেয়ালি পথ অবলম্বন না করে। নির্বাচন কমিশন যেন নিরপেক্ষভাবে তার দায়িত্ব পালন করে। তা না হলে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে নির্বাচন কমিশন। সে বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন।

আমাদের বিবেচনায় সাইফুর রহমান যে কারণে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তিনি আর বিএনপি'র অস্থায়ী চেয়ারপারসন নেই একই কারণে মেজর হাফিজ উদ্দিনও আর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নেই। এখন নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা করতে হলে কাকে ডাকবে নির্বাচন কমিশন। এখন তো আর বিএনপি'র সংস্কারবাজরা কেউ নেই। সে ক্ষেত্রে ডাকতে হবে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকেই। সেটা কি নির্বাচন কমিশনের জন্য সম্মানজনক হবে? না হলে এই কমিশনের বিদায় নেয়াই ভালো।

১১.০৫.২০০৮

www.pathagar.com

অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ গত ১২ মে জাতির উদ্দেশে আবেগমথিত কণ্ঠে এক ভাষণ পাঠ করেছেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক অনিশ্চয়তা, অনেক পরামর্শ যখন চলছিল তখন খবর পাওয়া গেল, প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। অনেক আশা, অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে টিভির সামনে বসেছিলেন লাখ লাখ লোক। শেষে ১২ মে রাত ৮টায় প্রধান উপদেষ্টা ভাষণ দিলেন । সে ভাষণে অনেক বিষয় বেশ স্পষ্ট। তিনি ঘোষণা করেছেন, এ বছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের কোনো একদিন জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত শিডিউল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। শর্ত সাপেক্ষে ১৩ মে থেকে শুরু হবে ঘরোয়া রাজনীতি। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ও বিদেশী মন্ত্রীরা যদিও বারবার বলছিলেন, নির্বাচনের আগে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়টি মোটামুটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের আগে প্রয়োজনে জরুরি অবস্থার সংশ্লিষ্ট ধারা স্থগিত বা শিথিল করা হবে। অর্থাৎ জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। আর তিনি বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ে নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলকে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। সেই ঐকমত্যের তিনি নাম দিয়েছেন জাতীয় সনদ। এই জাতীয় সনদ প্রণয়নের জন্য ২২ মে থেকে শুরু হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ। কথা পরিষ্কার।

আগামী ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের যেকোনো দিন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আশা করি এরপর সাধারণ নির্বাচন নিয়ে সব প্রশ্ন, সন্দেহ ও সংশয়ের অবসান ঘটবে। সত্যি কি সন্দেহের অবসান ঘটল?

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের যে সংলাপ শুরু হতে যাচ্ছে সে প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ঐতিহাসিক এ সংলাপে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যাতে সব রাজনৈতিক দল, শ্রেণী, পেশা এবং সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সূচিত এই জাতীয় ঐকমত্যকে একটি নৈতিক ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব

www.pathagar.com

দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সরকারের রাজনৈতিক দল সব শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় সনদ তৈরি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই জাতীয় সনদের মাধ্যমেই স্থাপিত হবে একটি সুস্থ ও সুন্দর নির্বাচনী অবকাঠামো। সূচিত হবে একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা।

কিন্তু সরকার, রাজনৈতিক দল এবং সব শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের ঐকমত্য কিভাবে সম্ভব? সব শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক শেষ করতে কত দিন লাগবে? নির্বাচনের প্রধান পক্ষ তিনটি– নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল ও সরকার। এখানে সব শ্রেণী-পেশার ঐকমত্য কেন প্রয়োজন? সংশয়ের শুরু এখানেই।

সংলাপের প্রথমেই দেখা যাক, নির্বাচন হওয়ার জন্য কী কী বিষয়ে ঐকমত্য চান প্রধান উপদেষ্টা? কী কী থাকবে তার জাতীয় সনদে? আবার এসব বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল একমত হলেই চলবে না, একমত হতে হবে সব শ্রেণী-পেশার মানুষকেও। দেখা যাক ঐকমত্যের বিষয়াদি (১) নির্বাচন কমিশন শিগগিরই সংশোধিত নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান জারি করবে। এখনো তা করেনি, করলে তাতে কী থাকবে, তাও স্পষ্ট নয়। সেটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না, আগাম বোঝা যাচ্ছে না। সেই সম্ভাব্য আইন ও বিধিবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পদক্ষেপ নিতে হবে।

(২) সুস্থ ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে রাজনীতির গুণগত উত্তরণের বিষয়ে সবাইকে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বপ্রণোদিত হয়ে অভ্যন্তরীণ সংস্কার করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ করতে হবে এবং সৎ, যোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা সৃষ্টির জন্য দলে (কার প্রত্যাশিত) প্রত্যাশিত সংস্কার করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সব কার্যকলাপে সুস্থ ও গতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন করে তা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(৩) নির্বাচনী-পরবর্তী সংসদ কার্যকর করার ব্যাপারে নির্বাচনের আগেই সবাইকে একমত হতে হবে। কেউ নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করবে না। সংসদ বয়কট করবে না এটা নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ জনস্বার্থে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সংস্কার করেছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(৫) দুষ্ট রাজনীতির একটি অন্যতম উৎস হচ্ছে লেজুড় রাজনীতির অপসংস্কৃতি। যে শুভ উদ্দেশেই অঙ্গসংগঠনগুলোর জন্ম হয়ে থাকুক না কেন, আজকের রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশ অঙ্গসংগঠন আদর্শহীন লেজুড় রাজনীতির অপসংস্কৃতিতে নিমজ্জিত। রাজনীতিকে এই অপসংস্কৃতি থেকে উদ্ধার করতে হবে। অর্থাৎ সব রাজনৈতিক দলকে তার অঙ্গসংগঠনগুলো বিলুপ্ত করার ঘোষণা দিতে হবে।

www.pathagar.com

(৬) অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে একমত হতে হবে যে, তারা সব নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতি পরিহার করবে। তারা আর কোনোদিন হরতাল, অবরোধ ও সহিংস বিক্ষোভ করবে না।

(৭) প্রশাসন বা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিকীকরণ চলবে না। অর্থাৎ প্রশাসন বা কোনো প্রতিষ্ঠানে দলীয় বা পছন্দের কোনো লোককে নিয়োগ দেয়া যাবে না, তা যত বড় যোগ্য ব্যক্তিই হোন না কেন। যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলকে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে।

(৮) রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার বিন্যাসের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে ভারসাম্যের অভাব। কী ধরনের ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য দরকার সে ব্যাপারে একটি পথ বের করে সবাইকে তাতে একমত হতে হবে। সেখানে সরকার ব্যবস্থা ও রাজনীতির বর্তমান ধারায়ও পরিবর্তন আনতে হবে।

(৯) ক্ষমতার ভারসাম্য, আইনের শাসন, সুস্থ রাজনীতি, কার্যকরী সংসদ, জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থার অনুষঙ্গ মাত্র। এসব অনুষঙ্গকে ধারণ করার মতো একটি অবকাঠামো বা রূপরেখা থাকা আবশ্যক। এমন একটি অবকাঠামো বা রূপরেখা যা জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে জাতিকে সব সময় ঐক্যবদ্ধ রাখবে। রাজনৈতিক দর্শন বা আদর্শের ভিন্নতা থাকতে পারে তবে তা কোনোক্রমেই যেন স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করতে না পারে। তাই সব রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষ মিলে পরবর্তী সরকারগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমন একটি অবকাঠামো বা রূপরেখা তৈরি করতে হবে যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা সর্বদা অটুট রাখবে।

(১০) সংলাপ একটি বিশ্বাসনির্ভর উদ্যোগ। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, বৈরিতা থাকতে পারে, প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। কিন্তু এগুলোই আমাদের মুখ্য পরিচয় নয়। জাতি আমাদের সবার কাছে আশা করছে একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল উত্তরণ। এই পথে এগোতে সবাইকে সঙ্কীর্ণতা, প্রতিহিংসা ও অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

এর বাইরেও আরো অনেক কথা পাঠ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা কবিতা আবৃত্তির ঢঙে। কিন্তু আগে থেকেই তিনি জাতীয় সম্পদের নামে কী কী রাজনীতিকদের করতে হবে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, করতে হবে আবার কোথাও কোথাও বলেছেন হওয়া দরকার। বক্তৃতার ভাষায় বোঝা যায়, এর সবই রাজনীতিকদের করতে হবে। অর্থাৎ এ সরকার যা দিয়ে শুরু করেছিল ঠিক সেখানেই আবার ফিরে গেছে। দলের সংস্কারও করতে হবে। সংস্কারের নামে দলীয় লোকদের দিয়ে দল ভাঙার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর এবার সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

উপরে উল্লিখিত ৮ নম্বর ও ৯ নম্বর বিষয়ের দিকে পাঠক যদি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন প্রধান উপদেষ্টা তার কথিত জাতীয় সনদে চাইছেন 'ক্ষমতার

www.pathagar.com

ভারসাম্য'। তার জন্য চান এমন একটি অবকাঠামো বা রূপরেখা যা শত বিরোধের মধ্যেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা অটুট রাখবে। অর্থাৎ তা হতে পরে রাজনীতিরও বাইরে ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা। ভিন্ন কোনো শক্তির উপস্থিতি। তিনি সরকার ব্যবস্থারও পরিবর্তন চান। তবে অবকাঠামো বা রূপরেখাটা কী হবে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি প্রধান উপদেষ্টা। এমনকি বলেননি সরকার ব্যবস্থায় কী পরিবর্তন নিশ্চিত করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে।

তবে রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের আত্মহননের এই জাতীয় সনদ তৈরি করে দেন তাহলে সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো রাজনৈতিক উচ্চবিলাসিতা নেই। তাহলে জাতীয় সনদ তৈরির পর সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হয়ে যাবে। আর যদি তারা তা মেনে না নেয় তা হলেও কি নির্বাচন হবে? ধারণা করি হবে। কারণ প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, নির্বাচনের আগে জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হবে। বড় রাজনৈতিক দলগুলো যদি ওই দলিল তৈরি করতে না চায় তাহলে টোকাই রাজনীতি নিয়েই জাতীয় সনদ তৈরি হবে এবং সেই সনদের ভিত্তিতেই একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অবকাঠামো বা রূপরেখা তৈরি হবে। ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হবে। সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে। অন্য সংগঠন বিলুপ্ত হবে।

আর কেউ বলবে না নির্বাচনের ফলাফল মানি না। বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন বহাল তবিয়তে থাকবে। দেশে দুধের নহর বইতে থাকবে।

দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো প্রধান উপদেষ্টার এ ভাষণকে ইতোমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজনীতি বা নির্বাচনের জন্য তিনি যেসব কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন, তা পূরণ করতে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো পারবে বলে মনে হয় না। যা হোক, সংলাপ-নির্বাচন নিয়ে এমন সাংঘাতিক সব শর্তের পরও প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আমরা আশা করছি, রাজনৈতিক দলগুলো খোলা মন নিয়ে আসন্ন সংলাপে অংশ নেবে। আমি আশ্বাস দিতে পারি সরকারের কোনো পূর্বনির্ধারিত এজেন্ডা নেই। কারো বিরুদ্ধে বৈরিতাও নেই। রয়েছে সমঝোতাউন্মুখ মুক্ত মন।

আর এই মুক্তমনের অনুষঙ্গ ধরেই এই ভাষণের মাত্র তিন দিন আগে গ্যাটকো মামলায় নতুন করে এগার জনকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে।

আসলে গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রের ধারায় চলতে দেয়াই ভালো ছিল। গণতন্ত্র কোনো রসায়নের ফর্মুলা নয় যে, এক অণু অক্সিজেন আর দুই অণু হাইড্রোজেন মিশিয়ে দিলেই পানি হেয় গেল। গণতন্ত্র নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই স্থায়ী রূপ পায়। পৃথিবীর স্থিতিশীল গণতন্ত্রের দেশগুলোতে স্থিতিশীলতা আসতে শত শত বছর লেগেছে। তারপর তারা নিজেদের দেশ-কাল, সমাজ-সংস্কৃতি অনুযায়ী লাগসই পথ বেছে নিয়েছে। তাই কোথাও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, কোথাও সংসদীয়, কোথাও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, কোথাও এক কক্ষ। কোথাও শাসনকালে মেয়াদ ৪ বছর, কোথাও

www.pathagar.com

৭ বছর, কোথাও মাত্র দু'বার প্রেসিডেন্ট হওয়া যায়, কোথাও বারবার প্রধানমন্ত্রী হতে কোনো বাধা নেই।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর আগেও ছিল বাংলাদেশে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তাদের প্রাক-সংলাপ, সংলাপ, সংলাপে জাতীয় সনদ, সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন, অবকাঠামো বা রূপরেখার ধূম্রজাল কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয়নি। তারা সংবিধানে বেঁধে দেয়া ৯০ দিনের মধ্যেই নির্বাচন করে দিয়ে সম্মানের সাথে বিদায় নিয়েছিলেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দু'বছর ক্ষমতায় থেকে এখন নানা ধারা ও টালবাহানা যে কেন করতে হচ্ছে তা রহস্যময় হলেও অস্পষ্ট নয়।

আমরা মনে করি দেশের কল্যাণে এসব প্রক্রিয়া বন্ধ করে অবিলম্বে আন্তরিকতার সাথে নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভালো। এ পথে যত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে সঙ্ঘাতের আশঙ্কা ততই বাড়বে এবং কোন শক্তি দিয়েই তা দমন করা যাবে না। আর একবার সে আগুন জ্বললে তার আঁচ সবাইকেই স্পর্শ করবে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের দুটি চরণ দিয়ে শেষ করছি 'অনেক কথা যাও যে বলে, কোনো কথা না বলি। তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।

১৭.০৫.২০০৮

www.pathagar.com

ছহি ক্ষুদ্র মান্নাননামা

গণতন্ত্র হত্যা, বিএনপি ভাঙা, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার 'ষড়যন্ত্রকারী' বলে অভিহিত জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে শেষ পর্যন্ত গ্যাটকো দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করেছে তার অতি প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তবে গ্যাটকো মামলা কোনো মামলাই নয়। সরকারি ক্রয় কমিটির সদস্য হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রধান ড. মোজাফফর আহমদের হিসাব মতে তার মন্ত্রণালয়ই ছিল জোট সরকারের আমলে সবচেয়ে বড় দুর্নীতির আখড়া। মান্নান ভূঁইয়াকে ওই মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির দায়ে বা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়নি।

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তাকে বিএনপি'র মহাসচিব করেছিলেন ১১ বছর আগে। মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদারের ইন্তেকালের পর তাকে ওই পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে পাঁচ বছর মন্ত্রী রাখেন বেগম খালেদা জিয়া। ২০০১ সালের নির্বাচনে জোট সরকারের বিজয়ের পর তাকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সর্ববৃহৎ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ফলে মান্নান ভূঁইয়া হয়ে ওঠেন বিএনপি'র একজন প্রভাবশালী নেতা।

১৯৯১-৯৬ সালে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় মান্নান ভূইয়া তাকে প্রভাবিত করার নানা আয়োজন সম্পন্ন করেন। বেগম খালেদা জিয়ার চারপাশে তার মতো আরো কিছু লোক এনে জড়ো করেন। সে রকম একজন ছিলেন মান্নান ভূঁইয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর ড. কামালউদ্দীন সিদ্দিকী। তাকে প্রধানমন্ত্রীর সচিব হিসেবে নিয়োগ পাইয়ে দেন তিনি। ড. কামাল সিদ্দিকীর কৃতকর্মের বিষয়ে পাঠকরা কমবেশি অবহিত আছেন। তিনি ফাইল আটকে প্রধানমন্ত্রীকে নানা কুপরামর্শ দিয়ে সরকারের ভেতরে নানা সঙ্কট তৈরি এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা হ্রাসের নানা কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তাতে যে তিনি সফল হন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি'র পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে একরকম জোর করেই তিনি এডিবি'র বিকল্প ভাইস প্রেসিডেন্টের চাকরি বাগিয়ে পগাড় পার হয়ে যায়। অথচ তখন বিএনপি'র সরকারের সঙ্কট ছিল পর্বতপ্রমাণ। একটানা পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রীর সচিবের দায়িত্ব পালন করে

www.pathagar.com

বিএনপি সরকারকে সঙ্কটে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যান কামাল সিদ্দিকী। কারণ তিনি জানতেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ভুল পরামর্শ দিয়ে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস করতে পেরেছেন এবং এভাবে ১৯৯৬ নির্বাচনে বিএনপি'র পরাজয় নিশ্চিত করা গেছে।

না, মান্নান ভূঁইয়া পালাননি। তিনি মহাসচিব হিসেবে ছিলেন বহাল তবিয়তেই। কিন্তু বিএনপি'র কোনো সাংগঠনিক কাজকর্মে তাকে কখনো দেখা যায়নি। দল গোছানো, দলের বিস্তার ঘটানো, স্থানীয় নেতাদের সংগঠিত করা, তাদের অভাব-অভিযোগ শোনা এ ধরনের কোনো সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন না। তাই দলের জন্য প্রায় সব কাজই করতে হয়েছে বেগম খালেদা জিয়াকেই। কেন এমন অকর্মণ্য হয়ে ছিলেন মান্নান ভূঁইয়া? এখন মনে হচ্ছে, সেটাও বিএনপিকে নিষ্ক্রিয় করার ষড়যন্ত্রের অংশই ছিল।

আর বেগম জিয়া দয়াবতী নারী। কাউকে কোনো পদে বসালে সহজে তাকে সরিয়ে দেন না। দলের ভেতর থেকে বার বার চাপ এসেছে, মহাসচিব হিসেবে এই নিষ্কর্মা ব্যক্তিকে সরিয়ে কার্যকর একজন মহাসচিব নিয়োগ করা হোক। বেগম খালেদা জিয়া বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। তার ফলে দলীয় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ-হতাশা বাড়তেই থাকে। দলের হাল ধরতে হয় বেগম জিয়াকেই। তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে দলকে যেমন সংগঠিত করতে শুরু করেন, তেমনি জনসভা করেও সাধারণ মানুষের কাছে তার এজেন্ডা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। ফলে ১৯৯৬ সালের পর থেকে বিএনপি অনেকখানি সুসংগঠিত হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় বেগম খালেদা জিয়া উপলব্ধি করেন যে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের জন্য জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর ঐক্য জরুরি। সে উপলব্ধি থেকেই তিনি জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে নির্বাচনী ঐক্য গড়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

কিন্তু এই প্রয়াসের একেবারে শুরু থেকেই বিরোধিতা আরম্ভ করেছেন মান্নান ভূঁইয়া ও তার সাঙ্গাতরা। তারা বলতে থাকেন, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যদি ইসলামপন্থী দলগুলোকে ছাড়াই বিএনপি এককভাবে ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে ২০০১ সালের নির্বাচনেও বিএনপি তা পারবে। এই জোটের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের আশা ছিল, নির্বাচনে যদি বিএনপিকে এককভাবে নামানো যায়, তাহলে বিএনপি'র পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে। আর যদি জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে যায়, তাহলে কোনো শক্তিই বিএনপিকে হারাতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে চক্রান্তকারীদের মনস্কামনা যে পূর্ণ হয় না এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব যে অটুট থাকে। তাহলে চক্রান্তকারীরা বিদেশী প্রভুদের কাছে কী জবাব দেবে?

কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তাই ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে চারদলীয় জোট গঠিত হয় এবং বিএনপি জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচনে অংশ নেয়।

www.pathagar.com

ওই নির্বাচনে চারদলীয় জোট জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর এই ফন্দিবাজরা আবারো সক্রিয় হয়ে ওঠে। আবারো বোনে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা। আবারো বেগম জিয়াকে ঘেরাটোপে বন্দী করার সঙ্কল্প নিয়ে এরা কাজ শুরু করে দেয়।

ড. কামাল সিদ্দিকী সরকারকে বিপদে ফেলে ১৯৯৬ সালে পালিয়ে গিয়েছিলেন এডিবি'র চাকরি নিয়ে। তাকে চাকরিচ্যুত করে হাসিনা সরকার। কামাল চাকরিচ্যুতির পর ম্যানিলা থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নেন দিল্লিতে। কামাল সিদ্দিকী তো খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ভারত কেন তাকে পাঁচ বছর আশ্রয় দিলো? কেন তিনি ভারতের অত প্রিয়ভাজন হলেন? মান্নান ভূঁইয়ারা আবারো ঢাকায় নিয়ে এলেন তাকে। এবারে তার বরং পদোন্নতি হলো। তিনি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে জেঁকে বসলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। একাধিক সিনিয়র মন্ত্রী ড. কামাল সিদ্দিকীর এই নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন। মান্নান ভূঁইয়ার সামনেই তারা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বলেছিলেন, 'ম্যাডাম একে আর নিয়োগ দেবেন না প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। এ এক নম্বর বিশ্বাসঘাতক। সরকারকে বিপদে ফেলে সে পালিয়েছিল'। কিন্তু মান্নান ভূঁইয়ার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত কামাল সিদ্দিকীকে নিয়োগ দেন খালেদা জিয়া। এটা ছিল বেগম জিয়ার আরো একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত।

১৯৯১-৯৬ সালে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এ ধরনের চক্রান্তকারী আমলা আর সাচ্চা জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কিছুটা হলেও ভারসাম্য ছিল। কামাল সিদ্দিকী প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হওয়ার পর সারাদুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকা আরো কিছু অথর্ব অনুগত বাম আমলাকে নিয়ে এসে সাজিয়ে বসেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। বেগম খালেদা জিয়া চক্রান্তের এই দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ পাননি বলেই মনে হয়। ফলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মান্নান ভূঁইয়া-কামাল সিদ্দিকীর চেলাচামুণ্ডাদের দখলে চলে যায়। বেগম জিয়া আবারো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে শুরু করেন জনগণ থেকে। বাকি ইতিহাস সাম্প্রতিক। ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরপরই ড. কামাল সিদ্দিকী দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় বেগম জিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ বয়ান করে দেশ ছেড়ে নিরাপদে পালিয়ে যান। তার কাজ শেষ। বাকিটুকু সম্পন্ন করার দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন তার সন্ত্রাসী ক্যাডারদের দিয়ে রাষ্ট্রঘাতী আন্দোলন শুরু করেছিল, তখন বিএনপি'র মহাসচিব হিসেবে মান্নান ভূঁইয়া সংলাপ শুরু করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের সাথে। প্রতিদিন আলোচনা শেষে টিভি ক্যামেরার সামনে সহাস্যবদন মান্নান ভূঁইয়া জানান দেন, আমরা সমঝোতার শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি। কী ছিল সে 'সমঝোতা'? সে কথা বলেননি কোনোদিন। সমঝোতা কি ছিল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্নকারী বর্তমান পরিস্থিতি? সে সমঝোতা কি ছিল ভিন্ন পন্থায় দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়া? সমঝোতা কি ছিল

www.pathagar.com

দেশকে রাজনীতিশূন্য করে এক অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়া? সে কথা হয়তো আমরা কোনোদিনই জানতে পারব না।

এক-এগারোর পটপরিবর্তনের পর একেবারে স্বমূর্তিতে বেরিয়ে এলেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। বেগম খালেদা জিয়া তখনো গ্রেফতার হননি। তাকে বিদেশে পাঠানোর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। তিনি অনেকটা অন্তরীণ নিজ বাসগৃহে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে হঠাৎ হাজির বেগম জিয়া। কিন্তু অনুপস্থিত মান্নান ভূঁইয়া আর তার কুচক্রী সাঙ্গপাঙ্গ। এর মধ্যে তিনি সংস্কার প্রস্তাব আনলেন বিএনপি'র। দল ভাঙতে হবে। সংস্কার করতে হবে। এগারো বছর যে দলের মহাসচিব ছিলেন তিনি, সে দল ভাঙতে হবে কেন? সংস্কার যদি করতে হয়, তাহলে এই এগারো বছরের মধ্যে সে প্রস্তাব কেন আনতে পারলেন না? সংস্কার নিয়ে কেন কথা বলতে পারলেন না দলের চেয়ারপারসন বেগম জিয়ার সঙ্গে? কত যে মজার সেসব প্রস্তাব। 'কেউ দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। দলের প্রধান থাকলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। দলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে হবে। নিয়মিত কাউন্সিল করতে হবে। দলে আত্মীয়করণ বন্ধ করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দলে থাকতে পারবে না বেগম খালেদা জিয়া। তিনি আর কোনোদিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তিনি থাকতে পারবেন না দলের চেয়ারপারসন। ভাগ্য ভালো, গ্রেফতারের আগে বেগম খালেদা জিয়া মান্নান ভূঁইয়াকে মহাসচিব ও দলের সদস্যপদ থেকেও বহিষ্কার করে গেছেন।

বিএনপি গঠনের সাথে মান্নান ভূঁইয়ার কোনো যোগাযোগ ছিল না। তখন তিনি কাজী জাফর আহমদের ইউনাইটেড পিপলস পার্টিতে ছিলেন। অনেক পরে দলে ভেড়েন মান্নান ভূঁইয়া। এই দল গড়ে তোলা বা বিকাশের ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা নেই। ফলে দল ভাঙতে তার বাধা কোথায়?

কিন্তু বেগম খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে বিএনপি? একথা কল্পনাও করেন না বিএনপি'র কোটি কোটি সমর্থক, কর্মী-নেতা। ফলে ঘর থেকে বের হলেই ধাওয়া খেতে শুরু করলেন মান্নান ভূঁইয়া ও তার সাঙ্গাতরা। শেষ পর্যন্ত ঘরেই উঠে গেলেন মান্নান ভূঁইয়া। একে একে বিএনপি'র ডজন ডজন মন্ত্রী-এমপি গ্রেফতার হলেন। আটক হলো হাজার হাজার কর্মী। চুপচাপ মান্নান ভূঁইয়া। কিন্তু তিনি যাদের লোক, তারা বললেন, অন্তত ত্রাণ দিয়ে আসুন নিজ এলাকায়। গেলেন পুলিশ পাহারায়। সাথে গেল সরকারি টিভি'র ক্যামেরা। দু-চারজন ত্রাণগ্রহীতা দাঁড়িয়ে। নেতা নেই, কর্মী নেই। জিন্দাবাদ নেই। করতালি নেই। এক একটা স্পটে যান। ঝটপট দু-এক প্যাকেট ত্রাণ দিয়েই গাড়িতে উঠে বসেন। শেষ পর্যন্ত টিভি ক্যামেরাম্যান বলল, স্যার, একটু দাঁড়ান। এক মিনিট সময় দেন। নইলে তো ছবি তোলা যাচ্ছে না।

ঘরে ঢুকে গেলেন মান্নান ভূঁইয়া। তার দায়িত্বও প্রায় শেষ। কিন্তু তার সাঙ্গাতরা যখন বাইরে যায়, বিএনপি কর্মীরা জুতা মারে, কলার চেপে ধরে। দালাল দালাল বলে

www.pathagar.com

ধাওয়া দেয়। তাড়া করে। তখন তিনি ভার ছেড়ে দিলেন সাইফুর রহমান আর মেজর (অব:) হাফিজের কাঁধে।

না, এমন চরিত্রের লোকদের শেষ রক্ষা হয় না। মূল ষড়যন্ত্রকারীরা এদের জুতার মতো ব্যবহার করে। প্রয়োজন শেষে ছুড়ে ফেলে দেয়। গত ১৭ মে গ্যাটকো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে মান্নান ভূঁইয়াকে। এখন তিনি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে একই সেলে। এই সরকারের আমলে যাদের জেলে পোরা হচ্ছে, ভবিষ্যতে তারা নির্যাতিত ত্যাগী নেতা হিসেবে বিবেচিত হবেন। কিন্তু সে তালিকা থেকে বাদ যাবে মান্নান ভূঁইয়ার নাম। তার নাম উচ্চারিত থাকবে 'জাতীয় বেঈমান' আর 'বিশ্বাসঘাতক' বলে। তার প্রমাণ মিলেছে জেলগেটে। বিএনপি'র শত শত কর্মী হাজির হয়েছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে। মান্নান ভূঁইয়া কি ভেবেছিলেন যে, তারা শোকাহত কর্মী? তার জেলে যাওয়ায় সমবেদনা জানাতে এসেছে? ভুল। শ' শ' কণ্ঠে ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে, 'দালাল দালাল, ধর ধর।' এক পলকের জন্য পেছনে তাকিয়ে নিজেই নিজের নিরাপত্তার জন্য দ্রুত ঢুকে পড়েছেন কারাগারের ভেতরে। সেখানেও কি তিনি নিরাপদ? না। নিরাপদ নন বলে সব আসামি-কয়েদিকে তালাবদ্ধ করে মান্নান ভূঁইয়াকে নেয়া হয়েছে সেলে। সেখানে তাকে রাখা হয়েছে অন্যান্য কয়েদির থেকে অনেক দূরে। স্বজনরা জেলারকে জনাব ভূঁইয়ার নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ করেছেন।

ইতিহাস বড় নির্মম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিশ্বাসঘাতকদের পরিণাম কখনো সুখের হয় না। পলাশীর যুদ্ধে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে, তাদের সবার পরিণতি ভয়াবহ হয়েছিল। লর্ড ক্লাইভ ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা নিজেই কেটে আত্মহত্যা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে বিশাল দুর্নীতির অভিযোগ আনার পর। মীরজাফর মারা গিয়েছিলেন এক নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে, কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন ভোগার পর। আর মীরজাফরের বসত এলাকার বর্তমান নাম 'নিমকহারাম দেউড়ি'। মিরনের মৃত্যু হয়েছিল বজ্রপাতে। জগৎশেঠ, মাহতাব চাঁদ, মানিক চাঁদ, আমির চাঁদদের মুঙ্গেরের পাঁচ হাজার ফুট উপরের পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। উমিচাঁদ পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় পাগলামি করতে করতে সে মারা যায়। সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যাকারী মোহাম্মদী বেগও পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে অবস্থায় কুয়ায় পড়ে তার মৃত্যু ঘটে। মহারাজ নন্দ গোপালের হয়েছিল ফাঁসি। আর হেস্টিংস রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে মৃত্যু বরণ করে।

বাংলাদেশের বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি কী হয়, কে জানে।

২৮.০৫.২০০৮

www.pathagar.com

দেশ ছেড়ে চলেই গেলেন শেখ হাসিনা

চলে গেলেন শেখ হাসিনা। যাবার কথা ভাবেননি তিনি। এক-এগারোর ঘটনা ঘটানোর পর শেখ হাসিনা আশা করেছিলেন, তিনি যাদের ক্ষমতায় নিয়ে এলেন তারাই তাকে তুলে নিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দেবেন। এ ক্ষেত্রেও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তিনি মোটেও জনগণের ওপর নির্ভর করতে চাননি। জনগণের ওপর যদি নির্ভর করতে পারতেন তাহলে রাষ্ট্রের জন্য যেমনি এত বড় বিপর্যয় ঘটতো না, তেমনি শেখ হাসিনাকেও কারাগারে ঠাঁই নিতে হতো না। আর এখন ক্ষমতার গদির আশা ছেড়ে তাকে প্রবাস জীবন কবুল করতে হতো না। বিদেশে থাকা নিয়ে অনেক নাটকই তো তিনি তৈরি করেছিলেন প্রবাস থেকে ফেরার জন্য। বিশ্বময় অনেক শোরগোল তুলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রবাসে যাবার জন্য অনেক কিছুই তাকে ফেলে যেতে হলো।

এক-এগারোর পর যুক্তরাষ্ট্রে নাতনীকে দেখার জন্য গিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। তখন তারই ডেকে আনা সরকার বাংলাদেশে তার প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তাকে রাষ্ট্রের নিরপাত্তার জন্য হুমকি বলে ঘোষণা করে এ সরকার। গত বছর ১৮ এপ্রিল সরকার এক প্রেসনোট জারি করে বলেছিল, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে, স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে, জননিরাপত্তা ও অর্থনীতি বিপন্ন হবে, বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। তাই সরকার তার দেশে ফেরার সব পথ বন্ধ করে দেয়। এই ঘোষণার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে গেলেন যুক্তরাজ্যে। বাংলাদেশে চলাচলকারী সব এয়ারলাইন্সকে সরকার জানিয়ে দেয়, তারা যেন শেখ হাসিনাকে বহন করে বাংলাদেশে নিয়ে না আসে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের পর তিনি দেশে ফেরার জন্য মিডিয়ায় ব্যাপক হইচই ফেলে দেন। মিডিয়ায় থাকার কৌশল শেখ হাসিনা ভালো বোঝেন। তিনি বিশ্বের অনেক নেতার কাছে ফোন করেছিলেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রভাব খাটানোর জন্য ফোন করেছিলেন। যেন সরকার শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে দেয়। শেষ পর্যন্ত সরকার তাদের প্রেসনোট প্রত্যাহার করে শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরার সুযোগ করে দিয়েছিল।

শেখ হাসিনা ভেবেছিলেন, জয় তিনি চেয়েছিলেন, জয়ী তিনি আজ। তখনো তার মনে আশা ছিল সরকার বিএনপিকে নির্মূল করার জন্য যে অভিযান শুরু করেছে তাতে ধ্বংস

www.pathagar.com

হয়ে যাবে বিএনপি। তার ক্ষমতায় যাওয়া রোখে কে? ফলে আনন্দেই ছিলেন তিনি। কিন্তু এ আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যে দুর্নীতি দুর্নীতি বলে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তার দোসররা জোট সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম বিষোদাগার করে যাচ্ছিলেন, সেই দুর্নীতির অভিযোগেই আটক হলেন তিনি। আর ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, যে রাষ্ট্রদূতদের তিনি আঁচল পেতে বাংলাদেশের ভাগ্য বিধাতা বানিয়েছিলেন তাদের কেউই শেখ হাসিনার মুক্তি দাবি করলেন না। বললেন, তারা চান শেখ হাসিনা যেন ন্যায়বিচার পান। বাংলাদেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে যে ভারতকে তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন গঙ্গার পানির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার, যে ভারতকে তুষ্ট করতে করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত শান্তিচুক্তি, যে ভারতকে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলের নামে ঢুকিয়েছিলেন বাংলাদেশে– সে ভারতও পূজা শেষে শেখ হাসিনাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নতুন বিগ্রহকে পূজার আসনে বসাল। পরিত্যক্ত শেখ হাসিনা কারার অন্তরালে সম্ভবত কেবলই দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে থাকলেন।

তার দলও যে তার সাথে সদাচরণ করেছে সে কথা এখন তার মনে না-ও হতে পারে। কারণ, শেখ হাসিনা জেলে যাওয়ার পরই দেখা গেল দলের ভেতর তাকে নিয়ে অনেক অসন্তোষ আছে। তার প্রতি আপনজনেরা, কাছের লোকেরা রাজনীতি থেকে শেখ হাসিনাকে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে সামনে এলেন আর তিনি হয়তো আশা করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারবে না তারই ডেকে আনা সরকার। কিন্তু সে আশা টিকেনি। একদিকে তার দলের নিকটজনদের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে সরকারের 'অকৃতজ্ঞতার' ওপর বাংলাদেশের ভাগ্য বিধাতাদের নিষ্ক্রিয়তা শেখ হাসিনাকে একেবারেই মর্মাহত করে তোলে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাই ওই দলের সংস্কারবাদীদের নাম দিয়েছেন 'র‌্যাটস'। তারা হলেন রাজ্জাক, আমু, তোফায়েল ও সুরঞ্জিত।

শেখ হাসিনা এখন হয়তো উপলব্ধি করতে পারছেন যে, জরুরি সরকারকে ক্ষমতায় আনার জন্য তিনি দেশকে ধ্বংসের একেবারে দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে সরকার তাকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য আসেনি, নিজেরাই ক্ষমতায় থাকার জন্য এসেছে। ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রথম দফায় যেমন তারা মাইনাস টু ফর্মুলা বের করেছিল এবারো এরা তেমনি এক ফন্দি বের করেছে। মাইনাস টু মানে রাজনীতি থেকে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা বাদ। এক-এগারোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসকেরা অন্তত একটা বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন, এ দেশের রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার প্রভাব অপরিসীম। তারা যদি উপস্থিত থাকেন তাহলে এ দুই দলের ইঁদুর-বিড়াল দিয়ে কোনো ফায়দা হাসিল করা যাবে না। এ পর্যন্ত যায়ওনি। এরা যদি না থাকেন, তাহলে দল দু'টির ভেতরে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভাঙন সৃষ্টি করা সম্ভব। দল দু'টিকে ভাঙা গেলে তবেই শান্তিতে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবে শাসকরা অন্যথায় নয়।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা যখন জোট সরকারের বিরুদ্ধে 'দুর্নীতিবাজ দুর্নীতিবাজ' বলে পথের মোড়ে মোড়ে মজমা বসিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজ শাসনকালের কালিমাগুলো দেখতে পাননি। কত জায়গা থেকে যে তিনি কত কেসে অনুদান-সাহায্যের নামে অর্থ গ্রহণ করেছেন সে কথা বেমালুম ভুলেই ছিলেন। ভাসমান বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য তিন কোটি টাকা চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করার মামলা যখন শুরু হলো তখন তিনি থমকে গেলেন খানিকটা। ফাইল ঠেকিয়ে টাকা নিয়েছিলেন। হাতেনাতে প্রমাণ মিলল। তখন তিনি বললেন, এটা ডোনেশন। সরকার ডোনেশন আর চাঁদাবাজির মধ্যে পার্থক্য করতে পারছে না। আর এই ডোনেশন দিয়ে চলে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সহায়তা করা হয় শত শত দুস্থ মানুষকে। অর্থাৎ চাঁদাবাজিকে একটা যৌক্তিক ভিত্তি দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। দল চালাতেও টাকা লাগে। জনসভা-সমাবেশ করতে টাকা লাগে। মাস্তান পুষতে টাকা লাগে, সে টাকা ডোনেশন ছাড়া আসবে কোথা থেকে? ফলে ফাইল ঠেকিয়ে চাঁদা চিরজীবী হোক।

এরপর এলো মিগ-২৯ কেনার প্রসঙ্গ। এই যুদ্ধ বিমানগুলো যখন কেনা হয় তখনই সবাই প্রতিবাদ করেছিল। বিমানগুলো কেনার প্রয়োজনীয়তা, মূল্য এবং কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তখনই এই বিমান কেনায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে শোনা গিয়েছিল। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এই বিমান ক্রয়ের মধ্যস্থতাকারী নূর আলী যখন মামলা করলেন তখন আর একবার হোঁচট খেলেন শেখ হাসিনা। তখন তিনি বার বার বলতে থাকলেন আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। টাকা বানাতে চাইলে আগেই বানাতে পারতাম। কিন্তু টাকা যে তিনি নেননি এমন কোনো কথা জোরের সাথে বলতে পারেননি। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তিনিই প্রথম চাঁদাবাজ আর দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, তাকে গ্রেফতার করা হলে সারাবাংলায় আগুন জ্বলবে। লাখ লাখ মানুষ তার জন্য রাজপথে নেমে আসবে। দলের সবাই একযোগে তার মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তার সে আশা কুহক হয়েই রইল। তার চাঁদাবাজির অকাট্য তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ায় জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ওদিকে তার জেলে যাওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা সংস্কারবাদী হিসেবে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে কীইবা করতে পারতেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণকারীরা ক্ষমতায় থেকে যেতে চায় তা এখন আর লুকানো ছাপানো নয়। ফলে জেলে পচে কী লাভ শেখ হাসিনার। তারচেয়ে আগেও যেমন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরাচারী সরকারকে সমর্থন যুগিয়ে গেছেন তেমনি বর্তমান শাসকদের সমর্থন জুগিয়ে যাওয়াই ভালো মনে করছেন শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বিদেশে যাবার সকল ব্যবস্থা প্রায় একদিনের মধ্যেই সম্পন্ন করে নিয়েছে সরকার। তার বিচারিক চারটি আদালত একদিনেই মামলার শুনানির দিনে আদালতে তাকে হাজির হতে হবে না বলে রায় দিয়েছেন। তার পাসপোর্ট ফেরত দিয়েছে। শেখ হাসিনার ফুফুকে কারাগারে গিয়ে কথা বলে আসার

www.pathagar.com

সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনাকে তারই ডেকে আনা সরকার যে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে এমন কথা বলা যায় না। সরকারের মনোভাব প্রতিফলিত হয়, এমন এক সংবাদপত্র লিখেছে, 'শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তার দলের মূল সংলাপে যোগদান, স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাসহ আগামী সংসদ কার্যকর রাখতে আওয়ামী লীগের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া আগামী সংসদ অধিবেশনে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়ার ক্ষেত্রে সমর্থন ও সহযোগিতার ভূমিকায় শেখ হাসিনার চুক্তি মোতাবেক আওয়ামী লীগ থাকবে সর্বাগ্রে।' পত্রিকাটি লিখেছে এই ধরনের একটি কাগজে-কলমে চুক্তির ভিত্তিতেই শেখ হাসিনা বিদেশ গেছেন। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। শেখ হাসিনার মামলাগুলো চলবে এবং ধারণা করা যায় এতে তার শাস্তিও হবে। ফলে কোনো অবস্থাতেই যাতে শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন সেটা নিশ্চিত করা হবে।

তাহলে লাভ কী হলো আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার? প্রথম লাভ, তার ব্যক্তিগত মুক্ত জীবন। দ্বিতীয় লাভ, সরকারকে সহযোগিতার মাধ্যমে বিএনপিকে যদি নিশ্চিহ্ন করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে তার দলের ধারাবাহিক ক্ষমতারোহণ নিশ্চিত হবে। আবার দেশে ফিরবেন। আবার নির্বাচন করবেন। আবার ক্ষমতার গদিতে বসবেন। কিংবা বিএনপি যদি ১৯৯০ সালের মতো আন্দোলনকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে তবে শেষ মুহূর্তে এসে ৯০-এর মতোই আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি শুদ্ধ হবেন। আর লোকসান? লোকসান হলো হতাশায় দলের কর্মীরা ছত্রখান হবেন। স্বার্থের দ্বন্দ্বে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বহুধাবিভক্তও হবেন। দলের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হবে। তবে লাভ লোকসানের এই সরল অঙ্ক শেষ পর্যন্ত মিলবে কি না, বলা দুষ্কর। তবু বলি, শেখ হাসিনা ভালো থাকুন চিরকাল।

১৩.০৬.২০০৮

www.pathagar.com

ছুঁচোর কেত্তন

সরকার এখন উপলব্ধি করছে, বাংলাদেশের প্রধান দু'টি দল হলো- বিএনপি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এর আগে বড় এই দু'টি রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য সরকার ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী পরাশক্তিগুলো কম কোশেশ করেনি। বিএনপি নেতাকর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার করে সরকার বোঝাতে চেয়েছিল, এই দলে শুধুই দুর্নীতিবাজ, টাউট-বাটপার, চোর-ছ্যাচ্চোর আছে। এখানে কোনো ভালো মানুষ নেই। সে ধরনের একটি তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য সরকারের 'অফিসিয়াল গবেষণা প্রতিষ্ঠান' সিপিডি তথা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে 'সৎ ও যোগ্য প্রার্থী' অনুসন্ধানে নেমেছিল। সংগঠনটির সাবেক প্রধান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এই অনুসন্ধানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত প্রভৃতি সুসংগঠিত দলকে বাদ দিয়ে নতুন ধারার রাজনৈতিক নেতানেত্রী খুঁজে বের করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যাতে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নিতে না পারে, সেই সুপ্ত ইচ্ছা তাদের মনে ছিল। সে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় ধাওয়া খেয়ে দেবপ্রিয় ঘরে ফিরেছিলেন। তাতে কী। সরকারের জন্য অনেক পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে দেশের প্রচলিত রীতি-নীতির তোয়াক্কা না করে সরকার ড. দেবপ্রিয়কে জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান পদে নিয়োগ দিয়েছেন। বিধান ছিল, কেউ যদি কোনো বিদেশী/বিদেশিনীকে বিয়ে করেন কিংবা বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেন, তবে তিনি কোনো কূটনৈতিক পদে নিয়োগ পাবেন না। রাশিয়ায় পড়তে গিয়ে দেবপ্রিয় এক রাশিয়ানকে বিয়ে করে এনেছেন। এখনো তার বিদেশিনী স্ত্রী রয়েছে। এক দেবপ্রিয়কে পুরস্কৃত করার জন্য সরকার দেশের ৩৭ বছরের প্রচলিত বিধি-বিধান উপেক্ষা করতে কসুর করেনি।

ড. দেবপ্রিয় পগাড়-পার হলে নতুন মুরগার সন্ধান শুরু হলো। মুরগা হিসেবে পাওয়া গেল- শেখ হাসিনার ভাষায় 'সুদখোর' অর্থনীতিবিদ, শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে। নতুন ধারার রাজনৈতিক দল গড়বেন তিনি। দোকান খুলে বসলেন। রাজনীতির 'র'ও যার দখলে নেই, এমন ব্যক্তি কোন সাহসে রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিলেন? তিনি হয়তো ভেবেছিলেন

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংক থেকে যে লাখ লাখ লোক মোটা সুদে ঋণ নিয়েছে, তারাই হবেন ড. ইউনূসের নাগরিক শক্তি নামের রাজনৈতিক দলের সদস্য। সেখান থেকে নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাছাই করে বের করা হবে। তারা স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবেন এবং তারাই সরকার গঠন করবেন। দেশে নতুন এক রাজনৈতিক ধারার সৃষ্টি হবে। সে ধারায় ড. ইউনূসের মতো স্বঘোষিত সুশীলরা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ড. ইউনূস উপলব্ধি করলেন, সুদে ঋণ দেয়া বা নেয়ার সাথে ভোট দেয়া-নেয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। ভোট না দিলে যদি ঋণ না দাও, ঋণ দেয়ার লোকের অভাব নেই। জোর-জবরদস্তি করলে সুদের ব্যবসায়ই লাটে উঠবে। ফলে ড. ইউনূস তার নাশ বা বিনাশ পার্টি গুটিয়ে নিলেন। হলো না।

তখন চলল রাজনীতির টোকাইদের অনুসন্ধান। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকার মধ্যেও মদদ পেয়ে এই টোকাইয়েরা ঝটপট রাজনৈতিক দল খুলল। প্রেস কনফারেন্স করল, মিটিং-মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করল। প্রতিদিন সংবাদপত্রের শিরোনাম হতে থাকল। সরকার নীরব থাকায় বোঝা গেল, এরা দল খুলেছে সরকারকে সমর্থন করার জন্য। তাদের কেউ কেউ আবার স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিল যে, এক-এগারো'র পরবর্তী চেতনা বাস্তবায়নের জন্যই তাদের এই দল গঠন। ফলে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হলো যে, ভবিষ্যতে সরকার এসব দল নিয়ে নির্বাচন করবে। এদের দিয়েই একটি রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট করবে এবং পেছনের শক্তি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে থাকবে।

শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ খুব বগল বাজিয়েছিল। এরা ভেবেছিল বিএনপি'র সব সম্ভাব্য প্রার্থীকে যেহেতু জেলে ঢোকানো হয়েছে, ফলে তাদের বিজয় রুখে কে? কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে যখন আওয়ামী লীগ নেতাদেরও গ্রেফতার শুরু হলো, তখন বোধ করি তাদের খানিকটা টনক নড়ল। এই গ্রেফতার অভিযানে শেখ হাসিনা যখন আটক হলেন, তখন আওয়ামী লীগ বুঝল সরকার রাজনৈতিক দলের শাসন চায় না, টোকাইদের সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেরাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চায়। তখন এরা ঘুরে দাঁড়াল।

প্রথম থেকেই বলতে চেয়েছি, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোকে বাদ দিয়ে দেশে রাজনৈতিক সঙ্কটের সুরাহা করা ঠিক নয়। সম্ভব নয় দীর্ঘকাল ধরে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক নাগরিক দিয়ে সফল রাষ্ট্র পরিচালনাও। রাজনীতিবিদদের সব সময়ই জনগণের চাহিদা, সুবিধা-অসুবিধার কথা মনে রাখতে হয়। সেভাবেই তারা নানা ধরনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভালো বলি, মন্দ বলি দীর্ঘ জনসম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেন এক একজন রাজনৈতিক নেতা। জনগণের জন্য এরা কতটুকু কাজ করেছেন, কতটুকু কাজ করতে পারবেন, এরা কতটা চোর, কতটা সৎ, তার ওপর ভিত্তি করেই সাধারণ মানুষ এক একজন রাজনৈতিক নেতাকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। যদি দেখেন তার নির্বাচিত প্রতিনিধি তার কল্যাণে সঠিকভাবে কাজ

www.pathagar.com

করেনি তাহলে পরের নির্বাচনে ওই প্রতিনিধিকে বাদ দিয়ে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। একবার পরাজিত হলে পাঁচ বছর পর আবারো নির্বাচিত হওয়ার আশায় ওই রাজনৈতিক ব্যক্তিকে অধিক মনোযোগের সাথে জনগণের কল্যাণে পাঁচ বছর ধরেই কাজ করে যেতে হয়।

কিন্তু আমলাদের সেই দায় নেই। সহকারী সচিব হিসেবে ঢুকে, ৩০-৩৫ বছর চাকরি করে হয়তো সচিব হিসেবে অবসর নেবেন। রাজনৈতিক সরকার সদয় থাকলে আরো দু'চার-পাঁচ বছরের জন্য তাকে চুক্তিভিত্তিতে কাজে লাগান। এই পুরোটা সময় তিনি শুধুই হুকুম তামিল করে যান। হুকুম যারা করেন, তারা জনপ্রতিনিধি। জনগণের কল্যাণের কথা মনে রেখেই তারা হুকুম জারি করেন। যে আমলা যত দক্ষতার সাথে এই হুকুম তামিল করতে পারেন, কর্মজীবনে তিনি তত সফল। রাজনৈতিক নেতাদের সাফল্য তাদের জনকল্যাণের ওপর।

বর্তমান সরকার দৃশ্যত সম্পূর্ণরূপে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের সরকার। জনগণের চাহিদা কী, জনগণের আকাঙ্খা কী, জনগণের কিসে কল্যাণ সে বিষয়ে এই আমলাদের কোনো ধরনের ধারণাই নেই। তার ফলে অর্থনীতি বলি, সামাজিক শৃঙ্খলা বলি, শিল্পায়ন বলি, কর্মসংস্থান বলি, ব্যবসায়-বাণিজ্য বলি- বিগত দেড় বছরের শাসনে এই সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এই দেড় বছরের শাসনে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হয়ে গেছে। বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, এদের দেড় বছরের শাসনে দেশ ২০ বছর পিছিয়ে গেছে। জনগণ বলছে, দ্রব্যমূল্য কমবে তো? কারখানা বন্ধ হবে না তো? আমার সন্তানের চাকরি হবে কোথায়?

জনপ্রতিনিধিদের শাসনের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, তাদের কৈফিয়ত দিতে হয়, সংসদে এবং খোদ জনগণের কাছে। যদি জনপ্রতিনিধিদের শাসন থাকত, তাহলে এই ১৮ মাসে কমপক্ষে ৯ বার জাতীয় সংসদের বৈঠক বসত। সেখানে সরকারকে বিরোধী দলের কাছে এবং একই সাথে জনগণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হতো- কেনো বিনিয়োগ আশানুরূপ হলো না? কেন গ্যাস, তেল, বিদ্যুতের দাম বাড়বে? কেন সারের মূল্য একলাফে দ্বিগুণ হলো? কেন জামিন পাওয়া যাবে না জরুরি মামলায়? কেন জামিনের আবেদনই করা যাবে না এসব ক্ষেত্রে? কিন্তু এই সরকারকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে না। খেয়াল-খুশিমতো ঘোষণা দিয়ে, খেয়াল-খুশিমতো কাজ করে, খেয়াল-খুশিমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে তারা গত দেড় বছরে কেবলই পেছনে ঠেলেছেন।

সরকার যখন শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করল, তখন মনে হলো তারা হয়তো এই সত্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, রাজনীতি করবেন রাজনীতিকরাই। আর দেশের কল্যাণ নিহিত সেখানেই। সরকার বললও, আসন্ন নির্বাচনে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ সব দলের অংশগ্রহণ চায় তারা; যাতে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। আর তাই গত

www.pathagar.com

১১ জুন শেখ হাসিনাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মুক্তি দিয়েছে সরকার। এর আগে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেছিল, শেখ হাসিনার মুক্তি ছাড়া তারা সরকারের সাথে কোনো আলোচনায় বসবে না। বিএনপিও জানিয়ে দিয়েছে, দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া তারা সরকারের সাথে কোনো আলোচনায় বসবে না। সরকারের মুখপাত্র বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, দেশের প্রধান দু'টি দল হচ্ছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া সরকার আগের জরুরি বিধিমালায় বলেছিল, এই বিধিতে আটক কেউ উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবেন না এবং জামিন পাবেন না। এখন সে বিধিতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিনের আবেদন করতে পারবেন। নিম্ন আদালতে শাস্তি হলে তিনি যদি উচ্চ আদালতে আপিল করেন, তাহলে জামিন পেতে পারবেন এবং কারাবন্দী অবস্থাতেও যেকোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন।

পরিস্থিতি যদি সত্যিই এই হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এবং সরকার প্রকৃতই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায়। সরকার অবশ্য এক ধাপ এগিয়েও কাজ করেছে। শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিজে তার সাথে টেলিফোনে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে আলাপ করেছেন। সরকারের চার উপদেষ্টা তার বাসভবনে গিয়ে তার সাথে বৈঠক করেছেন। শেখ হাসিনা একজন বিচারাধীন আসামি হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রীর মর্যাদায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন। একে সাধুবাদ দিতে দ্বিধা নেই। আমরা আশা করি একই রকম দ্রুততায় ও মর্যাদায় সরকার বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিও দ্রুত নিশ্চিত করবেন। তাহলে সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ মিলবে। অন্যথায় সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে আবারো প্রশ্ন সৃষ্টি হতে বাধ্য।

কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্যত্র। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াত যখন বেগম জিয়া, শেখ হাসিনা ও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মুক্তি দাবি করছিল– তখন হঠাৎ করেই যেন অশনি সঙ্কেত পেয়েছিল নামসর্বস্ব, প্যাডসর্বস্ব কোনো কোনো তথাকথিত রাজনৈতিক দল। উকিল-কাম-সরকারি উকিল-কাম-বহুজাতিক কোম্পানির উকিল-কাম-রাজনীতিবিদ ড. কামাল হোসেন প্রথম বললেন, যারা বিচারাধীন আসামির মুক্তি চায়, তারা দুর্নীতিবাজদের সহযোগী। তাদেরও আটক করা হোক। টোকাইদের নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার যে স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসেছিল সেটি বুঝি যায় যায়। তাই হঠাৎ করেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। এবং শেখ হাসিনা যখন সত্যি সত্যি প্যারোলে মুক্তি পেলেন এবং খালেদা জিয়া মুক্তি পাবেন বলে সরকার ঘোষণা দিল তখন একেবারেই রাগে ফেটে পড়লেন এই বহুরূপী উকিল। এই মুক্তি প্রক্রিয়ার কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিচারাধীন মামলার আসামিদের এভাবে ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে বর্তমান সরকারকে নিশ্চয়ই চাপ দেয়া হচ্ছে। তিনি বিষয়টি তদন্তের দাবি জানান। তিনি বলেন, 'দুর্বৃত্তদের

www.pathagar.com

প্রতি দুর্বলতা দেখানোর মানে ১৫ কোটি মানুষের স্বপ্ন ভেঙে দেয়া। দুর্নীতির অভিযোগে রাজনৈতিক নেতাদের বিচারে সরকারকে অনমনীয় হতে হবে যাতে যেনতেনভাবে এ বিচার শেষ না হয়।' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আপনাদের দৃঢ়তার পরীক্ষা হচ্ছে। সততার পরীক্ষা হচ্ছে। আমার মতো ১৫ কোটি মানুষ আপনাদের সাথে আছে। আপনারা জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিন। কারো কাছে মাথা নত করবেন না।' তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে দুর্বৃত্তায়িতদের সহযোগী হিসেবে যারা অনুপ্রবেশ করেছে আমরা তাদের চিহ্নিত করতে চাই। জনগণ এই ব্যাপারে তদন্ত চায়। আমি তদন্ত দাবি করি। খালেদা-হাসিনার মুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন, সুষ্ঠু রাজনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দুর্বৃত্তায়িত যারা আছেন, তাদের ব্যাপারে যে অভিযোগ এসেছে, তদন্ত হয়েছে, চার্জশিট হয়েছে সে মামলাগুলোকে কার্যকরভাবে চূড়ান্ত করতে হবে। কোনো চাপের মুখে সে ব্যাপারে দুর্বল অবস্থান নেয়া চলবে না। এক-এগারোর পর গঠিত নব্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের প্রধান ফেরদৌস কোরেশী বলেছেন, বর্তমান সরকারের উপদেষ্টাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তারা দেশ চালাতে পারছেন না। তাদের কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে, উপদেষ্টাদের অনেকে ঘাবড়ে যাচ্ছেন এবং এক-এগারোর পূর্ববর্তী অপশাসনের নায়কদের সাথে আপস করার চেষ্টা করছেন।

যেন মুখের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল ক্ষমতার রসাল ফল। এখন বড় দলগুলোর সাথে সরকার সমঝোতার চেষ্টায় সে ফল কেবলই নাগালের বাইরে সরে যাচ্ছে। তাই মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। রাজনীতিতে যখন শূন্যতা আসে, তখন ছুঁচোরা প্রাধান্য পায়। সামনে আসে। খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের শিরোনাম হয়। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা বলে আর অবিরাম কেত্তন করে। গত দেড় বছরে এ রকম ছুঁচোদের কেত্তন আমরা অনেক দেখলাম। কিন্তু যখন প্রকৃত রাজনৈতিক দলগুলো সামনে আসে, তখন ছুঁচোরা চিঁচিঁ করতে করতে এদিক-ওদিক আত্মগোপন করে।

সরকার বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে সামনে এনে নির্বাচনের যে উদ্যোগ নিয়েছে, জরুরি আইন সংশোধনের যে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে, আমরা মনে করি সে পথেই দেশের কল্যাণ। আমরা সরকারকে বিশ্বাস করতে চাই, তাদের কথায় যেন ব্যত্যয় না ঘটে।

২০.০৬.২০০৮

www.pathagar.com

দুর্নীতি কি সত্যি কোনো ইস্যু ছিল?

যত দিন যাচ্ছে, অনেক বিষয় ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রাজনীতি অর্থনীতি ধ্বংস করার সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবেই যে, এক-এগারো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাতে এখন আর কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের জীবনমানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশ্বের একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় দোসররা ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী যে অভিযানের সূত্রপাত করেছে ইরাক ও আফগানিস্তানে, বাংলাদেশকেও তারা সে বলয়ের ভেতরে স্থাপন করে সাধারণ মানুষের সেই অভাবনীয় সাফল্যের ধারা দেখে। বন্যাপীড়িত হতদরিদ্র দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল বাংলাদেশ এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনামলে। কিন্তু মাত্র ১০ বছরেই বাংলাদেশ দ্রুত সে অপবাদ ঘুচিয়ে দেয়ার পথে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে চিন্তিত করে তোলে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদের। দেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি শক্তির বিপুল বিজয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশবিরোধী তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলে।

পৃথিবীর কোনো দেশেই বোধকরি হাড্ডি ছুড়লে কুত্তার অভাব হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ আর হত্যালীলা সত্ত্বেও ইরাকে ও আফগানিস্তানে পাওয়া গেছে নূরী আল-মালিকি ও হামিদ কারজাইয়ের মতো লোকদের। বাংলাদেশেও সে রকম লোকের অভাব ঘটেনি। ২০০১ সালের আগ থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু করে তার অংশ হিসেবেই বিদেশী অর্থে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের তথাকথিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। তার একটি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি। অপরটি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি।

টিআইবি ২০০০ সালে ও ২০০১ সালে শেখ হাসিনার শাসনকালে বাংলাদেশকে পৃথিবীর সেরা দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে ঘোষণা করে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে সময় আওয়ামী রাজনীতির বিরোধীরা খুব খুশি হয়েছিলেন। কারণ, তাতে শেখ হাসিনার সরকারকে সেরা দুর্নীতিবাজ বলা সহজ হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশকে সেরা

www.pathagar.com

দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে গবেষণা চালানো হয়েছিল, সে অর্থের জোগান দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস এক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকার তাদের এ টাকার হিসাব চায়নি। শেখ হাসিনা সরকার যদি তখন টিআইবি'র অর্থের উৎস সন্ধান করত, তাহলে বিষয়টি তখনই স্পষ্ট হতে পারত। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতি নিয়ে এই গরু খোঁজা কেবল তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেনে প্রতি বছর কী মাত্রায় দুর্নীতি হয়, তা দেখার দায় টিআইবি'র নেই। অথচ ওই সব দেশের একটি কেসের দুর্নীতি বাংলাদেশের ১০ বছরের দুর্নীতিকেও ছাড়িয়ে যাবে। ধনী দেশগুলোর তা হলে কী প্রয়োজন পড়ল যে, এরা গাঁটের অর্থ খরচ করে পোষ্যদের দিয়ে গরিব দেশে দুর্নীতির গরু খোঁজা শুরু করল?

কারণ একটাই। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে দেশটিকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। সে ব্যবস্থা কী? প্রয়োজনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-এডিবি টাকা দেবে না; এসব দেশের পণ্য কিনবে না ধনী দেশগুলো। তখন বাধ্য হয়ে এরা যেভাবে বলে সেভাবেই কাজ করতে। অর্থাৎ তাদের স্বার্থের অনুকূলে থাকতে।

বাংলাদেশের জন্য আরো বিপদ হলো, বাংলাদেশ মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ক্রুসেডে নেমেছে। এরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী বলতে কেবলই মুসলিম দেশগুলোকে চিহ্নিত করছে। আর সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের জন্য সেসব দেশে অভিযান চালানোকে এরা অধিকার বিবেচনা করছে। বাংলাদেশকে চাপে রাখার আর একটি কৌশল এটাই। তাই যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা বাংলাদেশে প্রায়ই ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের অস্তিত্ব খুঁজে বের করছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ইসলামি সন্ত্রাসবাদী খোঁজার অভিযানের পথ আওয়ামী লীগ আগেই প্রশস্ত করে রেখেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের সময় বিএনপি'র মুখে চুনকালি মাখার উদ্দেশ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্র যাতে কখনো বিএনপিকে ভালো চোখে না দেখে সেজন্য সরকারি খরচে বিভিন্ন প্রচার-পুস্তিকা বের করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, বিএনপি'র সাথে ইসলামি জঙ্গিরা আছে ও বিএনপি তাদের মদদ জোগাচ্ছে। যদিও বিএনপি জোটের শাসনকালে এরা এই অপবাদ অনেক কমিয়ে এনেছিল। কিন্তু তখনো আওয়ামী লীগের এই রাষ্ট্রঘাতী প্রচারণা অব্যাহত ছিল, এখনো আছে।

বাংলাদেশের আর একটি বিপদ তার জ্বালানিসম্পদ। বাংলাদেশে আছে উন্নতমানের কয়লা ও গ্যাস। এ ছাড়া ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে আছে বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস। পৃথিবীর জ্বালানি সঙ্কট প্রকট হচ্ছে। সে কারণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দরকার জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা। বাংলাদেশের জ্বালানিসম্পদ দখলে নেয়াও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ। সে জন্যই এরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে, বাংলাদেশে আছে হুজি বা হরকাতুল জেহাদ, আছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরা। ফলে বাংলাদেশে যখন-তখন হামলা করতে বাধা নেই।

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে রাজনীতিকরা লাগামহীন তথ্য-প্রমাণহীনভাবে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধেই ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। জোট সরকারের আমলে একবার অঙ্ক কষে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপি-নেতা-কর্মীরা তাদের পাঁচ বছরের শাসনকালে ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। কোথায় পেলেন এমন আজগুবি তথ্য? সে কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। শেখ হাসিনা এ কথা বলার পর শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সহস্র মুখে আওয়ামী নেতা-কর্মীরা একই কথা প্রচার করেছে। রিকশাওয়ালা, কুলি-মজুর, হকাররাও সে কথা প্রচার করেছে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখেনি, জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনকালের যে পাঁচটি বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছিল, ওই অর্থ ছিল তার প্রায় আড়াই বছরের বাজেটের সমান। কিন্তু এরা কেউ কোনো দিন সমাজে অন্য কেউ দুর্নীতি করেছে এমন কথা বলেননি। দুর্নীতি সমাজের সব পেশার মানুষের মধ্যেই আছে। দুর্নীতি আছে আমলাতন্ত্রে, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক- সব পেশার মানুষের মধ্যেই। কিন্তু রাজনীতিবিদরা কেবল তাদের নিজেদের দুর্নীতির কথাই প্রচার করেছেন। আর রাজনীতিকরা তথ্য-প্রমাণ ছাড়া যেকোনো কথা বলুক, মিডিয়া তা হুবহু প্রচার করেছে। তারাও কখনো প্রশ্ন করেনি। এই যে অভিযোগ- এর ভিত্তি কী? মিডিয়া যদি দায়িত্বশীল হতো, তাহলে তারা প্রশ্ন করত। কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলেই তা সত্য হয় না। মিডিয়া অসত্য প্রচারের বাহন নয়। তা ছাড়া মিডিয়ারও কোনো জবাবদিহিতা নেই। এমন ধরনের আইনও নেই। যে আইন আছে তার প্রয়োগ নেই। এভাবেই আকাশে-বাতাসে প্রচারিত হয়েছে রাজনীতিকরা বড় চোর। সমাজের আর সবাই সাধু।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কিন্তু তাদের কাজ করেই যাচ্ছিল। প্রতি বছরই তথাকথিত গবেষণা প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাতে প্রতি বছরই বাংলাদেশকে সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস পায় টিআইবি।

আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের অদূরদর্শী রাজনীতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেশকে এক ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের জন্য তারা ৩০০ আসনে মনোনয়নপত্রও দাখিল করে। আওয়ামী লীগ যদি ওই নির্বাচনে অংশ নিত, তাহলে তাদের দুর্গতি যেমন এতটা হতো না, তেমনি দেশের ভাগ্যেও নেমে আসত না এমন বিপর্যয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিলে বাংলাদেশবিরোধী দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য যে হাসিল হয় না, তারা আরো তৎপর হয়ে উঠতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে পা দিল আওয়ামী লীগ। কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনা ছাড়াই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াল

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ। জাতিসঙ্ঘ থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের সব তল্পিবাহক প্রতিষ্ঠান বলল, ২২ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচন হলে এই সরকারকে কোনোরূপ সহযোগিতা করবে না তারা। মেনে নেবে না তারা। ফলে কবর হয়ে গেল সাংবিধানিক সরকারের। সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় বসে গেলেন ড. ফখরুদ্দীনের সরকার। তারাও বলতে চাইলেন, তারা এসেছেন সাংবিধানিক পন্থায়ই। প্রতিবাদ করল না কেউ।

কিন্তু বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার কথা ছিল। এরা নির্বাচনের দিকে যতটা না মনোযোগী ছিলেন, তার চেয়েও বেশি মনোযোগী ছিলেন দুর্নীতি দমনের নামে রাজনীতিকদের আটক করার ব্যাপারে। একেবারে ঢালাওভাবে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট যাকে পাওয়া গেল, গ্রেফতার করা হলো তাকেই। প্রথম প্রথম বিএনপি'র ওপর ক্র্যাকডাউন হলেও কিছুদিনের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা শুরু হলো আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদেরও। আওয়ামী লীগ কেনো? আওয়ামী লীগ তো এই সরকারকে সমর্থন জানাল, ভবিষ্যতে সরকারের সব কাজের বৈধতা দেবে বলে অঙ্গীকার করল, তাহলে আওয়ামী লীগারদের কেন গ্রেফতার শুরু করল সরকার। সম্ভবত দেখাতে চাইল, কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না তারা। দুর্নীতিবাজের রেহাই নেই।

না, সেটা তো মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে শুধু রাজনীতিবিদরা কেন? কেন নয় আমলারা, কেনো নয় অন্য কেউ? কারণ, এ সরকার এসেছে দেশের রাজনীতিবিদদের হেয় করতে। দেশকে রাজনীতিশূন্য করে দিতে। এ এক বিশাল ষড়যন্ত্রের অংশ। গত দেড় বছরে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের সে পরিকল্পনায় বহুলাংশে সফল হয়েছে।

কিন্তু সচল আছে টিআইবি। রাজনীতিকদের তো ঘায়েল করা গেছে। তাদের কপালে তো দুর্নীতির সিল মেরে দেয়া গেছে। বলা হচ্ছে, রাজনীতিকদের দিয়ে দেশ শাসন করা হবে না। কারণ, তারা দুর্নীতিবাজ। তাহলে দেশ শাসন করবে কে? সেনাবাহিনী। হয়তো সরাসরি নিজেরা। কিংবা তাদের সমর্থক কোনো গোষ্ঠী। না, তাহলেও তো সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সফল হয় না। সেনাবাহিনীও তো একটা বড় শক্তি। তাদের অস্তিত্বও নিরঙ্কুশ করে না চক্রান্তকারীদের অভিপ্রায়।

এবারো টিআইবি তার তথাকথিত গবেষণার ফল প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের জুলাই-ডিসেম্বরের তুলনায় ২০০৭ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে দুর্নীতি তো কমেইনি বরং আরো দুই শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকারের আমলের চেয়ে সেনাবাহিনী সরকারের আমলে ঘুষ-দুর্নীতি আরো বেড়েছে। এই ঘুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, যৌথ বাহিনী অর্থাৎ টিআইবি বলতে চাইছে, ঘুষের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীও পিছিয়ে নেই। যৌথ বাহিনীতেই ঘুষ বেশি।

www.pathagar.com

মতলবটা কী তাহলে? দেশকে রাজনীতিশূন্য করার প্রাথমিক পদক্ষেপ সফল করা গেছে। সে কাজে সেনাবাহিনীকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে ইতোমধ্যেই জনগণের সাথে সেনাবাহিনীর একটা দূরত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। দেশকে রাজনীতিশূন্য করার প্রক্রিয়ায় রাজনীতির কিছু টোকাইকে সামনে আনা হয়েছে। যারা রাজনীতিক নন, আধিপত্যবাদী শক্তির ধশংবদ। এবার বর্তমান সরকারের চালিকাশক্তি সেনাবাহিনীর ওপর আঘাত হানতে হবে। রাজনীতির সাথে যাতে সেনাবাহিনীকেও ধ্বংস করে দেয়া যায়।

তাহলে ভবিষ্যতে এ দেশ শাসন করবে কে? সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেসব কারজাই বা নূরীকে মদদ দেবে তারা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেহেতু দুর্নীতিগ্রস্ত, তাহলে তারা বাদ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নেবে কে? সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই।

এ রকম এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের জালে আটকে যাচ্ছি আমরা। এখান থেকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থেই আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। অস্তিত্বের স্বার্থেই বের হয়ে আসতে হবে। আর বের হয়ে আসার সে পথ নির্বাচন। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও সব দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া। সেভাবেই আমরা এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। এর জন্য চাই সব মহলের শুভবুদ্ধি।

০১.০৭.২০০৮

www.pathagar.com

পানিতে নামলে চুল ভিজবেই

পূর্ণদাস বাউলের গাওয়া জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত, 'জলে নামব, জল ছিটাব, চুল ভেজাব না/আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভেজাব না।' আওয়ামী লীগ জলে নেমেছে, জল ছিটাচ্ছেও। কিন্তু এখন বলছে চুল ভেজাবে না। তা কি হয়? গত ১১ জুন অস্বাভাবিক দ্রুততায় রাতের অন্ধকারে আদালত বসিয়ে ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে শেখ হাসিনাকে জামিনে মুক্তি দেয় সরকার। এর পরই আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে তারা নির্বাচনে যাবে। আগামী ৪ আগস্ট সরকার চারটি সিটি করপোরেশন ও নয়টি পৌরসভার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগের সাথে সরকার সংলাপের তারিখ ঘোষণা করে ৩ জুলাই। ওই দিনই ছিল মনোনয়নপত্র জমা দানের শেষ তারিখ। অর্থাৎ নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েই আওয়ামী লীগকে সরকারের সাথে সংলাপে বসতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ কি টের পায়নি যে, সরকার তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সংলাপে বসিয়েছে? টের পেয়েছে নিশ্চয়ই। টের পেয়েও এই বন্ধনকেই বন্দিত্ব না ভেবে মেলবন্ধন হিসেবে বরণ করে নিয়েছে।

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭ ও ২৮ জুন। আলোচ্য বিষয় ছিল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবে কি যাবে না। ওই সভা শেষে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, যেহেতু বেশিরভাগ নেতা নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন, সেহেতু নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলাম। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন লতিফ সিদ্দিকী। তখন নির্বাচনপন্থী নেতারা চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দেন। কেউ কেউ তার ওপর চড়াও হওয়ারও চেষ্টা করেন। লতিফ সিদ্দিকীকে থামিয়ে দিয়ে জিল্লুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনা নয়, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। সাজেদা চৌধুরী বলেন, দলের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থায় আন্দোলন-সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। সুতরাং নির্বাচনে যাওয়া উচিত। আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদী নেতা আমির হোসেন আমু বলেন, আন্দোলনের অংশ হিসেবেই নির্বাচনে যাওয়া উচিত। এ ছাড়া বর্তমান সরকার সত্যিকারভাবেই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় কিনা সেটা পরীক্ষার জন্য হলেও নির্বাচনে যেতে হবে। সংস্কারবাদী আবদুর রাজ্জাক বলেন, দলের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থায় নির্বাচন প্রতিরোধ সম্ভব নয়। তাই উচিত নির্বাচনে অংশ নেয়া। সংস্কারবাদী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, এই নির্বাচন ভালোভাবে হলে উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেয়া যাবে।

www.pathagar.com

উপজেলা নির্বাচন ভালো হলে জাতীয় নির্বাচনে যাওয়া যাবে। সুলতান মোহাম্মদ মনসুর বলেন, 'শুধু সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা উচিত। সারা দেশে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করলে দানবীয় সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী পুনর্গঠিত হবে। তখন এই দানবীয় শক্তি আবার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। জরুরি অবস্থা থাকার কারণে এই অপশক্তি অদৃশ্যমান রয়েছে।' ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন বলেন, নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়ার বিকল্প নেই। এ ছাড়া দলের ২৬ মে'র বর্ধিত সভার দাবি ছিল, নো হাসিনা, নো ইলেকশন, নো ডায়লগ। এখন নেত্রী আমাদের মধ্যে এসেছেন। সরকারও নেত্রীর সাথে ডায়লগ করেছে। এ কারণে আমাদের নির্বাচনে যাওয়া উচিত।

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় কোনো ভিন্নমত ছিল না, এমন নয়। সভায় মতিয়া চৌধুরী বলেন, কোনোভাবেই জরুরি অবস্থায় নির্বাচনে যাওয়া ঠিক হবে না। আর বিএনপি নির্বাচন প্রতিরোধের কথা বলছে বলে আমরা প্রতিরোধের কথা বলব না, এটা ঠিক নয়। ক্যাপ্টেন (অব:) তাজুল ইসলাম নির্বাচনে যাওয়ার বিরোধিতা করে বলেন, জরুরি অবস্থা সামরিক আইনের চেয়েও খারাপ। আর সংস্কারবাদী হিসেবে পরিচিত তোফায়েল আহমেদ বলেন, জরুরি অবস্থার মধ্যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না।

তবে যে যাই বলুক, শেষ পর্যন্ত 'সর্বসম্মতভাবে' জরুরি অবস্থার মধ্যেই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ। আর সরকারের সাথে সংলাপও সম্পন্ন করেছে তারা। ৩ জুলাই সংলাপ শেষে একটু উষ্ণ উষ্ণ ভাব ছিল আওয়ামী লীগের। কিন্তু গত ৬ জুলাই আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেছেন, সংলাপে সরকারের সাথে তীব্র মতবিরোধ হয়েছে। তারা কোনোভাবেই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে চায় না। অবশেষে যুক্তিতর্কে কুপোকাত হয়ে তারা আর একবার বসবে বলে সময় নেয়। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সিটি ও পৌর নির্বাচনে গেলেও জরুরি অবস্থায় কোনোভাবেই উপজেলা ও জাতীয় নির্বাচনে যাবে না।

কার্যত জিল্লুর রহমান সাহেবের এই ঘোষণাও বিভ্রান্তিকর। চারদলীয় জোটসহ সমগ্র দুনিয়া যখন বলছে, জরুরি অবস্থার মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, তখনই তো নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আওয়ামী লীগ। আর সরকার তো কখনো বলেনি, নির্বাচনকালে তারা জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নেবে। তা হলে এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য কেন? জরুরি অবস্থার মধ্যে উপজেলা ও সংসদ নির্বাচনে যাবেন না, অন্যান্য নির্বাচনে তাহলে যাবেন? ধারণা করি, জরুরি অবস্থার মধ্যে ১৩টি সিটি-পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে নেননি তাদের মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা। আর যারা জরুরি অবস্থার মধ্যেও নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, তাদের সবাই সংস্কারবাদী। অনেকেই মাঠপর্যায়ের কর্মীদের হাতে আগে ধাওয়া খেয়েছেন। কেউ কেউ শারীরিকভাবে নাজেহাল হয়েছেন। ওই কর্মীদের আপাতত শান্ত রাখার জন্যই সম্ভবত জিল্লুর সাহেব হঠাৎ করে যেমন বেণী তেমনি রাখার কথা বলেছেন। জলে গেলেও চুল না ভেজানোর সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

যদিও আমরা বরাবরই লক্ষ করে আসছি যে, আওয়ামী লীগের এসব সঙ্কল্প কচুপাতার পানির মতো 'এই আছে এই নেই'। ১৯৮৬ সাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে ঘটছে এ ঘটনা। ১৯৮৬ সালে স্বৈরাচারী এরশাদের পাতানো নির্বাচনে দেখেছি একই ব্যাপার। তখন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ওই নির্বাচনে যারা যাবে, তারা জাতীয় বেঈমান। কিন্তু এই ঘোষণার মাত্র দু'দিনের মধ্যে শেখ হাসিনা নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে নিজেই 'জাতীয় বেঈমান' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। মনোনয়নপত্রও জমা দিয়েছিল ৩০০ আসনে। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ পর ঘোষণা দিল, নির্বাচনে যাবে না তারা। আবার জাতীয় নির্বাচনের আগে পৌর নির্বাচনকে তামাশা বললেন শেখ হাসিনা। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে সে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল আওয়ামী লীগ। সুতরাং আওয়ামী লীগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন বড়ই কঠিন কাজ।

এ সম্পর্কে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মন্তব্যও চমকপ্রদ। আওয়ামী লীগ পৌর নির্বাচনে যাচ্ছে দেখে তিনি খুব হতাশ হয়েছেন। এ ব্যাপারে দলের এক কেন্দ্রীয় নেতাকে তিনি ঢাকায় ফোন করেছিলেন। তিনি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'আমরা সিটি ও পৌরসভা নির্বাচনে যাচ্ছি বটে, কিন্তু উপজেলা নির্বাচনে যাচ্ছি না। আর আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের কায়দায় বর্তমানেও ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই। আর সিটি ও পৌরসভা নির্বাচন তো দলীয় ভিত্তিতে হচ্ছে না।'

গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছেন, "নেতার আপ্তবাক্য শুনে শরৎচন্দ্রের টগর বোষ্টমীর কথা আমার মনে হয়েছে। বোষ্টমী তার নিচু জাতের স্বামী সম্পর্কে বলেছিল, 'মিনসের সঙ্গে কুড়ি বছর ঘর করেছি বটে, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেইনি।' নেতাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়েছিল, সিটি ও পৌর নির্বাচনে দৌড়ে গিয়ে ঘর করার পর হেঁসেলেও না ঢুকে উপায় থাকবে কি?" সম্ভবত থাকবে না।

তবে আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীরা নির্বাচনে যাওয়া ও জরুরি অবস্থার পক্ষে দু'টি খাঁটি যুক্তি তুলে ধরেছেন। তার একটি হলো : দলের সাংগঠনিক অবস্থা এতই খারাপ যে, দলের পক্ষে আন্দোলন-সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। অপরটি হলো, জরুরি অবস্থার মধ্যেই সরকারের ছত্রছায়ায় নির্বাচন করা উচিত। মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন হলে চারদলীয় জোট আবারো ক্ষমতায় বসে যাবে।

আওয়ামী লীগ এত বড় দল, তার সাংগঠনিক অবস্থা এতটা খারাপ হলো কেন– সেটার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পত্রিকায় ছাপা হয়নি বলে আমরা জানতে পারিনি। সরকার বিএনপি'র নেতাকর্মীদের যে হারে তাড়া করেছে, আওয়ামী নেতাকর্মীদের সেভাবে তাড়া করেনি। বিএনপি'র যত নেতাকর্মীকে আটক করেছে, তার ভগ্নাংশও আটক হননি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। সঙ্কট তাহলে কোথায়? সঙ্কট ভীতির। আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের কাছে যেতে সংস্কারবাদীদের ভয়। তারা উপলব্ধি করছেন, রাজনীতিকদের বাদ দিয়ে সরকার রাজনীতির কিছু টোকাইকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনার চেষ্টা করছে। সেখানে স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা যায় না। আর সরকার এটা করতে পারছে আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীদের কারণেই। তা ছাড়া সব ক্ষেত্রে সরকারের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা, অসহনীয় দ্রব্যমূল্য, আইনশৃঙ্খলার অবনতি

www.pathagar.com

প্রভৃতি কারণে আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরাও নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ। সে সরকারের নীলনকশা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থীদের জড়িয়ে পড়ায় তারা ক্ষুব্ধ। তাদের সামনে যাওয়ার শক্তি এদের নেই। তাই সাংগঠনিক অবস্থার দোহাই দিচ্ছেন সংস্কারপন্থীরা। তা ছাড়া সংস্কারপন্থীরা ভালো করেই জানেন যে, সংস্কারবাদীদের জন্যই শেখ হাসিনাকে শেষ পর্যন্ত বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো : জরুরি অবস্থার মধ্যেই নির্বাচন চাওয়া। তা না হলে চারদলীয় জোটের ক্ষমতায় আসার ভয়। আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীদের এই ভয় অমূলক নয়। শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদী-ইসলামি শক্তিকে নির্মূল করার জন্য সরকার পরিকল্পিত অভিযান চালিয়ে আসছে। আওয়ামী লীগের অযৌক্তিক ধ্বংসাত্মক অবরোধ, লগি-বৈঠার তাণ্ডবে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। বর্তমানের এই দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই যে অসহনীয় দ্রব্যমূল্য, এই যে অমানবিক পীড়ন-নির্যাতন তার জন্য সাধারণ মানুষ এখন আওয়ামী লীগকেই দায়ী করছে। যে সরকার দেশকে ধ্বংসের মূলে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আওয়ামী লীগ বলছে, এই সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে তারাই। ফলে দেশ ধ্বংসের দায় বহুলাংশে চেপেছে আওয়ামী লীগের কাঁধেই। এখন সরকারের ছত্রছায়ায় ছাড়া নির্বাচনে গেলে, সন্দেহ নেই, জনগণই তাড়া করবে আওয়ামী লীগকে। তাই আওয়ামী লীগেরও দরকার জরুরি অবস্থার বর্ম। সুতরাং জোটকে ঠেকাতে জরুরি অবস্থাই চাই আওয়ামী লীগের।

সরকারের সাথে সংলাপের পর জিল্লুর রহমান বললেন, তারা সবার আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাবি করেছেন সরকারের কাছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দেয়ার পর সবার আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন চাওয়াকে দাবি বলে না, আবদার বলে। দাবি আদায় করে নিতে হয়। আবদার দয়া করে কেউ পূরণ করতেও পারে, নাও পারে। আওয়ামী রাজনীতির দেউলিয়াত্ব কোথায় পৌঁছেছে যে, একটি অনির্বাচিত এবং 'স্বল্প সময়ের জন্য এসে বেশি সময় থাকা' সরকারের কাছে তাদের দয়া ভিক্ষা করতে হচ্ছে।

কথা যাই বলা হোক না কেন, আসলে আওয়ামী লীগ জরুরি অবস্থার মধ্যে হলেও সব নির্বাচনেই যাবে। তবে সরকার গঠন করার জন্য নয়, সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য। সরকার যে পথে এগোচ্ছে, তাতে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তারা দেশ থেকে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি শক্তিকে নির্মূল করতে চায়। সে লক্ষ্যে শক্তি জোগাবে আওয়ামী লীগ। তাদেরও ওটাই লক্ষ্য। তারা আরো উপলব্ধি করছে, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে সরকার গঠন করতে পারবে না তারা। তাই নিজের নাক কাটা গেলে যাক, বিএনপি'র তো যাত্রা ভঙ্গ হবে– এই নীতিতে এগোচ্ছে। তার ফলেই হয়েছে শাসকগোষ্ঠী ও আওয়ামী লীগের আঁতাত।

তবে এ ধরনের আঁতাত করে ১৯৮৬ সালে যেমন আখেরে আওয়ামী লীগের কোনো সুবিধা হয়নি, ধারণা করা যায়, ভবিষ্যতের অবাধ নির্বাচনেও কোনো সুবিধা হবে না। জনগণ ১৯৯১ সালের মতো তাদের প্রত্যাখ্যানই করবে। দেখা যাক, আওয়ামী লীগ কিভাবে জলে নেমে জল ছিটিয়ে চুল না ভিজিয়ে বেণী শুকনো রাখে।

১২.০৭.২০০৮

www.pathagar.com

হ্যালো সিইসি বুঝতে পারছেন কি?

একেবারে শিশুর মতো সরল উক্তি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা। উপজেলা নির্বাচনের বিরোধিতা কেন করছে রাজনৈতিক দলগুলো, এটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। জাতীয় নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলোর সমস্যা কোথায়, তা খোলাসা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। জনাব হুদা বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচন হলে সমস্যা কোথায়? রাজনৈতিক দলগুলো এ নিয়ে নানা রকম কথা বলছে। তাদের যদি কোনো সমস্যা থেকেই থাকে, তবে তা জনগণের সামনে খোলাসা করা দরকার। আমরা তো রোডম্যাপ অনুযায়ীই নির্বাচন করছি। জাতীয় নির্বাচন বিঘ্নিত হবে না, তা নিশ্চিত হয়েই আমরা স্থানীয় নির্বাচন করছি। উপজেলা নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর যে বিরোধ, তা সরকারের সাথে। নির্বাচন কমিশন মাঝখানে রয়েছে। সুতরাং এ বিষয় নিয়ে বোঝাপড়া করার থাকলে তা রাজনৈতিক দল ও সরকারের মধ্যে হবে। সিইসি সাহেব আরো বলেছেন, তিনি তদবির করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হননি। সরকার এই দায়িত্ব নিতে বলেছে, তাই দায়িত্ব নিয়েছেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) দায়িত্ব গ্রহণের পর গত দেড় বছরে প্রথম প্রথম এমন অনেক কিছুই বুঝতে পারেননি। প্রথমে তিনি বুঝতে পারেননি রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র। কেন একই লোক বার বার দলের প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি হবেন। কেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান যখন যাকে খুশি বাদ দিতে পারবেন? এসব নিয়ে মহাসমস্যায় পড়েছিলেন সিইসি সাহেব। রাজনীতি নিয়ে নতুন নতুন ভাবনা তো! ফলে এ নিয়ে বেশ শোর ফেলে দিয়েছিলেন মহামান্য সিইসি। কিন্তু তিনি একবারও ভেবে দেখিনি যে, ওরকম এক একটি গঠনতন্ত্র নিয়েই এক একটি রাজনৈতিক দল ৩০ বছর কি ৫০ বছর ধরে রাজনীতি করে আসছিল। দেশ শাসন করে আসছিল। আবার আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র ওরকম গঠনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা যখন করে যাচ্ছিলেন, তখন তার একবারও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রের কথা মনে পড়েনি। সেটা আরো ভয়াবহ। এমন না-বুঝ সিইসি সাহেবের সেটা মনে পড়ল না কেন?

www.pathagar.com

আমাদের কোমলমতি সিইসি বারবার বায়না ধরছিলেন, না, আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করতেই হবে। নইলে কোনো ছাড়াছাড়ি নেই। উভয়দলেই কিছু দালাল পাওয়া গেল। তারাও বলতে থাকলেন, তাদের দলের সংস্কার করতে হবে। সে জন্য তারা নানা ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে থাকলেন। সিইসি কখন এসব আবদার তুললেন? যখন সরকার বিএনপি আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব থেকে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে অপসারণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র সংস্কারবাজরাও তাদের সংস্কার প্রস্তাব এমনভাবে উত্থাপন করছিল, যাতে আর সংশয় ছিল না যে, তারা সংস্কারের নামে সরকারের বদ-মতলব বাস্তবায়ন করতে চায়; বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে নির্বাসনে পাঠাতে চায়। অর্থাৎ সরকার, নির্বাচন কমিশন আর সংস্কারবাজ– এই তিন পক্ষ একই সরল রেখায় অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। সরকার বলে সংস্কার, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন বলে সংস্কার আর সংস্কারবাজরা বলে সংস্কার। কী মজার খেলাই না তখন জমে উঠেছিল।

কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে নির্বাসনের এই মতলব যখন হালে পানি পেল না, সরকার তখন সংস্কারের ধোঁয়া বর্জন করল। সরকার বন্ধ করে দিলো সংস্কারের জন্য চাপ প্রয়োগের কৌশল। আওয়ামী লীগের সংস্কারবাজরা সংস্কার ফংস্কার বাদ দিয়ে মূল দলে ভিড়ে গেল। বিএনপি'র সংস্কারবাজদের কেউ কেউ গা ঢাকা দিলো। আবার সংস্কারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার শাস্তি হিসেবে কাউকে কাউকে জেলে ঢোকানো হলো এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, সিইসি সাহেবও রাজনৈতিক দলে সংস্কার নিয়ে মাইক্রোফোন ফাটানো আওয়াজ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কেন? রাজনৈতিক দলের সংস্কারবাজ ও সরকারের সুনির্দিষ্ট মতলব থাকতে পারে; নির্বাচন কমিশন তো সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা কেন ভুলে গেলেন সংস্কারের কথা? নিষ্পাপ সিইসি সাহেব জবাব দেবেন কি? তবে কি নির্বাচন কমিশন স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কাজ করছে, নাকি সরকারের সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে? নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড দেখে তো মনে হয়, এজেন্ডা বাস্তবায়নেই তারা নিবেদিতপ্রাণ।

আমাদের অতি নিরপেক্ষ সিইসি সাহেব আর এক দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন বিএনপি'র বহিষ্কৃত মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে নিয়ে। মান্নান ভূঁইয়া বহিষ্কৃত হওয়ার পর সিইসি একেবারে ভূঁইয়ার রাজনৈতিক চেলার মতো আচরণ করতে শুরু করেন। কেন মান্নান ভূঁইয়াকে বহিষ্কার করবেন বেগম খালেদা জিয়া? এটা মগের মুল্লুক নাকি? এই খামখেয়ালি চলতে পারে না। ১১ বছর তিনি সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন দলের। তাকে এভাবে বহিষ্কার করে বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচারী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং মূলধারার অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপিকে অস্বীকার করে বসলেন সিইসি। যেন বেগম জিয়ার উচিত ছিল, মান্নান ভূঁইয়াকে বহিষ্কারের আগে সিইসি শামসুল হুদার অনুমতি নেয়া। সিইসি মান্নান ভূঁইয়া

www.pathagar.com

ও তার সঙ্গী কয়েকজন 'লাফাঙ্গা'কেই বিএনপি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সাথে নির্বাচন নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করে দিলেন। খালেদা জিয়ার বিএনপি যেন কোনো বিএনপিই না। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের চেয়ারে বসেই অন্ধত্ববরণকারী সিইসি বলছেন, মান্নান ভূঁইয়ার সাথেই তো বিএনপি'র গুরুত্বপূর্ণ নেতারা সব আছেন, তিনি দেখেছেন। কিন্তু খালেদা জিয়াপন্থীদের সাথে তো তিনি কাউকে দেখতে পান না। দু-চারজন অচেনা লোক আর কয়েকজন মহিলা শুধু আছেন তাদের সাথে। সুতরাং মান্নান ভূঁইয়ারা ক'জনই আসল বিএনপি। কেন তিনি এমন দেখলেন? কারণ সরকারের কাছে মান্নান ভূঁইয়া তখন খুব প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। সরকারের উপদেষ্টারা বলেন, মান্নান ভূঁইয়া আসল বিএনপি। সিইসি বগল বাজিয়ে বলেন, মান্নান ভূঁইয়া আসল ব্যক্তি। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের এ কেমন মাহাত্ম!

কিন্তু মান্নান ভূঁইয়া তখন নতুন কোনো বিএনপি খোলেননি। টেকনিক্যাল অসুবিধা। কী করে মান্নান ভূঁইয়া গংকে রাজনৈতিক দলের অবয়ব দেয়া যায়। সরকার এগিয়ে এলো। বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে যাদের তখনো জেলে ঢোকানো হয়নি, চায়ের দাওয়াতের নামে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো গুরুতর অসুস্থ সাইফুর রহমানের বাসায়। সরকারই এ উদ্যোগ নিলো। সেখানে তাদের একটি কাগজে সই করানো হলো। ওই চা চক্রকে বলা হলো বিএনপি'র 'স্থায়ী কমিটির সভা'। সাইফুর রহমানকে বলা হলো সভাপতি। মান্নান ভূঁইয়াকে বাদ দিয়ে মেজর (অব:) হাফিজউদ্দিনকে বলা হলো মহাসচিব। কাঠামো একটা দাঁড়িয়ে গেল সরকারের তত্ত্বাবধানে। সিইসি সাহেব হাতে চাঁদ পেলেন। বেগম খালেদা জিয়া এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তার মনোনীত খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের মূল বিএনপি বাদ। এবার সাইফুর-হাফিজের বিএনপি'র সাথে মহাসমারোহে সংলাপে বসল সিইসি। বিএনপি কর্মীদের রোষ থেকে এই হাফিজগংকে বাঁচাতে সরকার দিলো পুলিশি পাহারা। আর সিইসি সাহেব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সংলাপ সম্পন্ন করলেন। সরকার আর সিইসি'র লক্ষ্য কেমন আশ্চর্য রকমে মিলেমিশে একাকার।

কিন্তু আবারো গোল বাঁধল। তথাকথিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত সাতজনের পাঁচজন নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে জানালেন, 'সেদিন সাইফুর রহমানের বাসায় স্থায়ী কমিটির কোনো বৈঠক হয়নি। বৈঠক ডাকার এখতিয়ারও সাইফুর রহমানের নেই। সে বৈঠক ডাকার একমাত্র এখতিয়ার চেয়ারপারসনের। সুতরাং সাইফুর রহমান বিএনপি'র চেয়ারপারসন নন। হাফিজও নন অস্থায়ী মহাসচিব। নির্বাচন কমিশন যেন সংলাপের জন্য মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকেই আহ্বান জানায়।' এরপরও কোনো সুস্থ মানুষ সংলাপের জন্য মেজর (অব:) হাফিজকে চিঠি দিতে পারে? সেটা কি ন্যায়সঙ্গত হয়? কিন্তু তারপরও নির্বাচন কমিশন সংলাপের চিঠি দিয়েছিলেন (অব:) হাফিজকেই। কারণ? কারণ সরকার যে অব: হাফিজকেই চায়। হ্যালো, সিইসি সাহেব, এর নাম নিরপেক্ষতা?

www.pathagar.com

কিন্তু মান্নান ভূঁইয়া? বেগম খালেদা জিয়া ১১ বছরের মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়াকে অপসারণ করে মহাদোষ করে ফেলেছিলেন। ভারি অন্যায় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সাইফুর রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত তথাকথিত সভায়ও যে মান্নান ভূঁইয়াকে বহিষ্কার করল, বাদ দিয়ে দিলো। সিইসি সাহেব, এবার কোনো অন্যায় হলো না? এবার কেন শোরগোল করে উঠলেন না? চুল খাড়া করে কেন প্রতিবাদ করলেন না? কেন এত বড় অন্যায় মেনে নিলেন? কারণ সরকার যে মান্নান ভূঁইয়াকে আর চায় না। সিইসি চাইবেন কোন মুখে? বাদ পড়ে গেলেন এমন সজ্জন মান্নান ভূঁইয়া। সরকার শেষ পর্যন্ত তাকে জেলে ঢোকাল। কেন চুপ করে থাকলেন সিইসি? কেন 'ন্যায় ও সত্য' প্রতিষ্ঠার জন্য গর্জে উঠলেন না? কারণ সরকার যে আর চায় না। অতসব কাণ্ড করে সিইসি সাহেব দারুণ এক মজার মানুষে পরিণত হয়েছে। চায়ের আড্ডায় অনেকে তাই এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সিইসি না বলে 'ছি ছি' বলেন।

এই প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. হুদা এখন নতুন সমস্যায় পড়েছেন। এ সমস্যা তার নয়, সরকারের। সে কথা তিনি নিজেও বলেছেন। কিন্তু বরাবরের মতোই সরকারের সমস্যাটা তিনি নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন। এ সমস্যাটা হলো রাজনৈতিক দলগুলো কেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচনের বিরোধিতা করছে। সরকার একগুঁয়েমিতে আছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই তারা উপজেলা নির্বাচন করবে। জাতীয় সংসদ ভেঙে যাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কেউ বলুক, না বলুক জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হবে ৯০ দিনের মধ্যে। সে দায়িত্ব পালন না করে নির্বাচন কমিশন যে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে, উচ্চআদালত সে রায় দিয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। নির্বাচন পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন। সরকার স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী। রাজনৈতিক দলগুলো তা চায় না। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো কেন চায় না, তা তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। কেন পাগল হলেন সিইসি? কারণ সরকার যে পাগল হয়ে গেছে, ওই নির্বাচনের জন্য।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন না করার কারণ খোলাসা করতে বলেছেন। কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না। গত ১১ জুলাই জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ স্থানীয় সরকার নির্বাচন না করার পাঁচটি কারণ তুলে ধরেছেন। কারণগুলো হলো : এক. বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ঘ ধারায় বলা আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাওয়া। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে। আর সরকার সহযোগিতা করবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকা অবস্থায় স্থানীয় নির্বাচন করা ইসি'র (নির্বাচন কমিশন) এখতিয়ারে নেই। এ কাজ সংবিধানবহির্ভূত। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের লোক হয়ে সিইসি'র সংবিধান মানা উচিত। দুই. এরশাদের মতো স্বৈরাচারী সরকার সংসদের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করে। একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

হিসেবে আগে স্থানীয় নির্বাচন করা হয়। সংবিধান লঙ্ঘন করে আগে স্থানীয় নির্বাচন করার অধিকার জনগণ দিতে পারে না। তিন. সরকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চায়। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৩৪০ জন সংসদ সদস্যের সাথে ৫২০ জন উপজেলা চেয়ারম্যানকে ভোটার করা হবে। আর এই ৫২০ জন উপজেলা চেয়ারম্যানকে যদি পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা যায়, তাহলে বর্তমান সরকার পছন্দের লোককে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করতে পারবে। এ ব্যাপারে সরকার নীরব। আর নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। সংবিধানে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের দায়িত্বের কথা বলা আছে। পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে বাছাই করা লোকদের নির্বাচিত করে পছন্দের লোককে প্রেসিডেন্ট করার সুযোগ সৃষ্টির অধিকার জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোকে দেয়নি। চার. নির্বাচন নিয়ে আঁতাত করা হচ্ছে। ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা দিয়ে নির্মমভাবে মানুষকে হত্যা করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধা করা হয়েছে। লগি-বৈঠার রাজনীতি করে যারা বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তাদের সাথে আঁতাত করা হয়েছে। তিনটি দল আঁতাত করেছে– লগি-বৈঠার রাজনৈতিক দল, সরকার ও নির্বাচন কমিশন। এই ত্রিমুখী আঁতাতের পাতানো নির্বাচনের প্রতি জনগণের কোনো সমর্থন নেই। পাঁচ. জাতীয় সংসদের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা সংবিধান, জনগণ ও রাজনৈতিক দল চায় না। যে বিদেশী শক্তি ট্রানজিট আদায় করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে, যে বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় দাপট দেখাচ্ছেন, তারা সংসদের আগে স্থানীয় নির্বাচন চায়। এটা তাদের ব্লুপ্রিন্ট।

জনাব মুজাহিদ এই পর্যন্তই বলেছেন। তবে নির্বাচন কমিশন অবাধ নির্বাচন করে দিলেই শেষ হচ্ছে। সরকার যদি মনে করে, তার পছন্দের লোক আসেনি, তবে বরখাস্ত করতে পারবে চেয়ারম্যানকে। ভেঙে দিতে পারবে নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ। সিইসি সাহেব, বুঝতে পারছেন কি?

তবে এ পর্যন্ত যা দেখা গেছে, তা হলো, সরকার যা চেয়েছে, সিইসি সাহেব তথা নির্বাচন কমিশনও তাই চেয়েছে। এর সামান্য ব্যতিক্রমও হয়নি। সরকার বলে দিলো, উপজেলায় এই এই লোককে নির্বাচিত দেখতে চাই। সিইসি সাহেব এ পর্যন্ত যা করেছেন, তাকে বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে যে, তিনি নির্বাচিত হোন বা না হোন, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করে দেবেন। সরকার যে চায়। তার সে কারণেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিরোধিতা করা হচ্ছে। হ্যালো সিইসি, বুঝতে পারছেন কি?

১৬.০৭.২০০৮

www.pathagar.com

বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে ভারতের উপহার!

ভারতের সাথে সম্পর্ক আরো 'সুদৃঢ়' করার লক্ষ্যে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ-ভারত সচিব পর্যায়ের বৈঠক যখন চলছিল, তখন 'বন্ধুত্বের স্মারক' হিসেবে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের দুই কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে দুই বিডিআর সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে। না, ১৮ জুলাই রাতে দুই বিডিআর সদস্যকে হত্যা করে রক্তপিপাসা মেটেনি ভারতের। ১৯ জুলাই ভোরে যশোর সীমান্তে আরো দুই বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ভারতের বিবেচনায় স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৭ বছরের ইতিহাসে বর্তমান সরকারই তাদের জন্য সবচেয়ে অনুকূল ও বন্ধুত্বপূর্ণ। সে বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে বর্তমান সরকারকে ভারত গত দেড় বছরে প্রায় দেড় শ' বাংলাদেশী নাগরিকের লাশ উপহার দিয়েছে। এই দেড় বছরে প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশীকে হত্যার জন্য সরকার 'কড়া প্রতিবাদ' জানিয়েছে। বাকি সব হত্যাকাণ্ডে ছিল একেবারে নিশ্চুপ। বন্ধুত্ব বলে কথা।

জনপ্রতিনিধিত্ব, বিদেশনির্ভর, জনসমর্থনহীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভারতপ্রীতি এমনই এক নিবেদনের পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভারত সেটাকে স্বেচ্ছাদাসত্ব হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। মেয়াদোত্তীর্ণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা পর্যন্ত সবারই এমনি গদগদ ভাব। প্রধান উপদেষ্টা দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন যে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি নতুন মাত্রা যুক্ত করবেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার চৌধুরী বলেছেন, তারা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাবেন যে, পরবর্তী কোনো সরকার এসে সেখান থেকে আর পিছু হটতে পারবেন না। তবে সে পর্যায়টা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা খোলাসা করে না বললেও তাদের কর্মকাণ্ডে সেটা ক্রমেই অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারতের সাথে বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে বর্তমান সরকার ভারতের সাথে স্বাক্ষর করেছে সামরিক বিমান চলাচলের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)। সে সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ভারতীয় সামরিক বিমান বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ছাড়াই এ ধরনের সামরিক বিমান বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে অবতরণ ও সেখান থেকে

www.pathagar.com

উড্ডয়ন করতে পারবে। আবার এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর ভারত যুক্ত স্কোয়াড্রন যুদ্ধবিমান কেনার অর্ডার দিয়েছে। এই যুদ্ধবিমানগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো রাডার ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে অবতরণ ও সেখান থেকে উড়ে যেতে পারবে।

এই পুরো ব্যবস্থাটিই বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যেই চলছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। এত বড় ভারতীয় সেনাবাহিনী গত ৫০ বছর লড়াই করেও ওই সাত রাজ্যের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে পারেনি। ভারত যদি বাংলাদেশের আকাশসীমা ব্যবহার করে স্বাধীনতাকামীদের দমন করতে চায়, তাহলে ভারতের সহযোগী হিসেবে সেখানকার গেরিলাদের সহজ টার্গেট হতে পারে বাংলাদেশের স্থাপনা। যুদ্ধ বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে বাংলাদেশের ভেতরও। সরকার অকারণেই বাংলাদেশকে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার এমন সমঝোতা কেন স্বাক্ষর করতে গেল? কিংবা কোন এখতিয়ারে তারা এমন একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করল? সংবিধান তো সরকারকে সে ধরনের কোনো ক্ষমতা দেয়নি। কিন্তু ভারতকে তোয়াজ করার জন্যই জনপ্রতিনিধিত্বহীন সরকার এমন একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করে বসেছে।

এই সমঝোতা স্মারকের ভিন্ন দিকও আছে। এই চুক্তি ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাজুক করে তুলতে পারে। ভারতীয় সামরিক বিমান এমনকি বাংলাদেশ সরকারের অজ্ঞাতে যেখানে সেখানে অবতরণ করে, কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনকে অস্ত্রের চালান নামিয়ে দিয়ে যাবে না, তারইবা নিশ্চয়তা কোথায়? ভারতীয় সমরাস্ত্র কারখানায় তৈরি গোলাবারুদ-বিস্ফোরক ভারত সরবরাহ করত জেএমবিকে। সেভাবেই ওই সংগঠনের উত্থান ঘটিয়েছিল ভারত নানা রকম মদদ দিয়ে। জেএমবি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু ভারত নতুন কোনো গ্রুপকে ওই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ করে যে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজজীবন অস্থির করে তুলবে না, তারইবা নিশ্চয়তা কী? তবু বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভারতের সাথে এমন একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভারতের সাথে রেল চলাচল চুক্তি করেছে। সে চুক্তির শর্তাবলিও জনসাধারণ জানতে পারেনি। শুধু দেখতে পেয়েছে, সীমান্তে বাংলাদেশী মানুষকে মাথা নিচু করে পার হতে হচ্ছে লোহার খাঁচার ভেতর দিয়ে। আর ট্রেনের চালকদের বাংলাদেশের সীমান্তে গিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিতে হচ্ছে ভারতীয় চালকদের কাছে। কারণ বাংলাদেশী চালকদের প্রতি বিশ্বাস নেই। যাত্রীদের বিশ্বাস নেই, চালকদেরও বিশ্বাস নেই। অথচ পাকিস্তানের সাথেও ভারতের ট্রেন যোগাযোগ আছে। সেখানে মুরগির খাঁচাও নেই, ট্রেনচালক বদলও নেই। এটা যোগাযোগের প্রশ্ন নয়, ইজ্জতের প্রশ্ন। বাংলাদেশের মানুষের সে ইজ্জত ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

www.pathagar.com

ভারত থেকে চাল আমদানি নিয়েও এমনি তেলেসমাতি কারবার করেছে দিল্লি সরকার। সিডর বিধ্বস্ত বাংলাদেশ সফরে এসে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, 'বন্ধুত্বের স্মারক' হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশে পাঁচ লাখ টন চাল রফতানি করবে ভারত। তখন ভারতের বাজারে টনপ্রতি চালের মূল্য ছিল ৩৪০ ডলার। ভারত থেকে বাংলাদেশ চাল আমদানি করে দীর্ঘকাল ধরেই। সে আমদানি করে থাকে বেসরকারি আমদানিকারকরাই। তাতে বাংলাদেশের আমদানিকারকদের চেয়ে ভারতের রফতানিকারকদের সুবিধাই বেশি। কারণ সড়ক পথে এই রফতানি হয় বলে তাদের শিপিংয়ের ঝক্কি-ঝামেলা কম। তারা দ্রুত পেয়ে যায় তাদের পাওনা। সিডরের কারণে বাংলাদেশের চাহিদা সৃষ্টি হয় জরুরি ভিত্তিতে। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'বন্ধুত্বের স্মারকের' কথা বলে দিল্লি ফিরে গিয়েই ঘোষণা দিলেন, বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে আর চাল রফতানি করা যাবে না। চাল রফতানি করবে ভারত সরকার নিজে। এই ঘোষণা দিয়ে পরদিনই ৩৪০ ডলারের চালের রফতানিমূল্য করা হলো ৪৩০ ডলার। সেটা মেনে নিয়েই আমদানি করতে চাইল বাংলাদেশ। তখন চালের দর হাঁকা হলো টনপ্রতি ৬০০ ডলার। তারপর ৮০০ ডলার। শেষে টনপ্রতি ১০০০ ডলার দাম নির্ধারণ করল ভারত সরকার। ভারত সরকার দাম বাড়ায়। সে দামেই যখন চাল কিনতে রাজি হয় বাংলাদেশ, তখন সীমান্তে ট্রাক আটকে দিয়ে আবার দাম বাড়ায় ভারত সরকার। কখনো বলে সড়ক পথে রফতানি করা যাবে না বাংলাদেশে এখন থেকে নৌপথে রফতানি হবে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ভারতীয় রফতানিকারকরা। কিন্তু দিল্লি সরকার থাকে অনড়। আমরা অবিশ্বস্ত ভারতের ওপর চাল আমদানির জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। কেউ কান দেয়নি। সে চাল এখনো আসেনি বাংলাদেশে। বন্ধুত্বের এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তবে দেখিয়ে দিয়েছে ভারতের স্বার্থের তাঁবেদার ও তল্পিবাহক কিছু সংবাদপত্র। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গুলি করে দুই বাংলাদেশীকে হত্যা করল। সে খবর প্রকাশ করেছে পেছনের পাতায় গুরুত্বহীনভাবে। আর ভারত ওয়াদার ৫ লাখ টনের ৫০ হাজার টন চাল রফতানি করেছে বাংলাদেশে। সে খবর ছেপেছে প্রথম পাতায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে।

যাই হোক, এ রকম ওয়াদা ভঙ্গকারী অবিশ্বস্ত 'বন্ধু' রাষ্ট্র ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল কেন বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার? আমরা আগেও বলেছি, ভারত যে ট্রানজিট চায়, তা আসলে ট্রানজিট নয়, করিডোর। দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলে যাওয়ার জন্য মাত্র তিন বিঘা করিডোর নিয়ে ভারত টালবাহানা করছে আজ ৩৫ বছর ধরে। সে করিডোর মাত্র ১২ ঘণ্টা খোলা রেখে বন্ধ করে দেয় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তারপর অবরুদ্ধ বাংলাদেশের নাগরিক ছিটমহলের বাসিন্দারা। এ ছাড়াও কারণে-অকারণে ভারত বন্ধ করে দেয় করিডোর। সেখানকার নাগরিকদের ওপরও চালায় নানা ধরনের নির্যাতন। সেই ভারতকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার করিডোর কেন দিতে হবে বাংলাদেশকে?

www.pathagar.com

কার্যত এই করিডোরের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের সড়ক ও রেলপথের গোটা নেটওয়ার্কই নির্বিঘ্নে ব্যবহার করার অধিকার আদায় করে নিতে চায়। যেন বাংলাদেশ ভারতেরই আরেকটি রাজ্য।

পৃথিবীর কোথাও এ ধরনের করিডোরের ব্যবস্থা নেই। কোনো একটি দেশের এক প্রান্ত থেকে সে দেশেরই অপর প্রান্তে যাওয়ার জন্য অন্য একটি সার্বভৌম দেশের গোটা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কোথায়ও নেই। যা আছে সেটা হলো ট্রানজিট। সে ব্যবস্থা হলো একটি দেশের ওপর দিয়ে তৃতীয় কোনো দেশে যাওয়ার সুযোগ। সেটাও তখনই হয়, যখন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অর্থনীতি মোটামুটি অভিন্ন থাকে। ইউরোপীয় দেশগুলোর ট্রানজিটের কথা উদাহরণ হিসেবে অনেকেই ব্যবহার করেন। কিন্তু ফ্রান্স থেকে লুক্সেমবার্গ পর্যন্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি একই। সেখানে মাদকের চোরাচালান ছাড়া অন্য কোনো পণ্যের চোরাচালানের আশঙ্কা নেই। সেখানকার অর্থনীতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিও নয়। ফলে ওই ট্রানজিট তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো হুমকিও নয়।

কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রতিযোগিতামূলক। বাংলাদেশে যেসব পণ্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে উৎপন্ন হয়, ভারত সেসব পণ্য চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠায়। ফলে বাংলাদেশের শিল্প-কারখানা ও তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। অপরদিকে অনেক রফতানি পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের সাথে প্রতিযোগিতা করে। বাংলাদেশের গোটা যোগাযোগব্যবস্থা ভারতকে অবাধে ব্যবহার করতে দিলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

কারণ বাংলাদেশের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে নিয়ে যাবে লাখ লাখ টন পণ্য। এসব পণ্য তারা যে বাংলাদেশে খালাস করবে না, তার ন্যূনতম নিশ্চয়তাও নেই। বরং এখন চোরাচালানের মাধ্যমে যা আসে, তার সহস্র গুণ ভারত অবাধে বাংলাদেশে খালাস করে চলে যাবে। ফলে বাংলাদেশ পরিণত হবে ভারতের বাজারে। বাংলাদেশের শিল্প-কারখানা পড়বে সঙ্কটের মুখে।

তেমনিভাবে বাংলাদেশে অবাধে আসবে ফেনসিডিল, হেরোইন, আফিম, গাঁজা, মদসহ নানা ধরনের ভারতীয় মাদকদ্রব্য। বাংলাদেশের পক্ষে এমন কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, যা দিতে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে ভারতীয় যাত্রীবাহী ও কার্গোবাহী যানবাহনগুলোকে। ভারত তা মানবেও না। ফলে যুবসমাজের চরম অধঃপতন অবধারিত হয়ে উঠবে।

ভারতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী, ভারতীয় কার্গোবাহী অসংখ্য যানবাহন বাংলাদেশে অবস্থান করবে সাত দিন। কিন্তু ভারতীয় যাত্রীবাহী যানবাহনগুলো বাংলাদেশে থাকতে পারবে এক মাস। অর্থাৎ হাজার হাজার বা লাখ লাখ ভারতীয় নাগরিক এক মাস ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবে। অবাধে চলাচল করতে পারবে। এক মাস ধরে

www.pathagar.com

তারা কি করবে বাংলাদেশে? নাশকতা পরিকল্পনা? সন্ত্রাসী গ্রুপ তৈরি ও প্রশিক্ষণ? নির্বাচনের সময় ভোট কারসাজি? না কি অন্য কিছু?

এ ছাড়া নিরাপত্তার প্রশ্ন তো আছেই। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অনিয়ন্ত্রিত কার্গো থেকে অবৈধ অস্ত্র তুলে দিবে না তো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য? ভারতকে তো বিশ্বাস নেই। আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করার মতো কোনো নজিরই ভারত সৃষ্টি করেনি। তার ওপর আছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামী ৭ রাজ্যের গেরিলা যোদ্ধাদের রোষ। সে রোষ মোকাবেলার সাধ্য বাংলাদেশের নেই।

এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়েই সম্পূর্ণ এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে সরকার নয়াদিল্লিতে করিডোর প্রশ্নে আলোচনায় বসেছিল। বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদ উঠেছে দেশপ্রেমিক সব মহল থেকে। শেষ পর্যন্ত সরকার বিরত রয়েছে। এ যাত্রা এমন চুক্তি করেনি।

কিন্তু বাংলাদেশ দল আলোচনার জন্য যখন দিল্লিতে অবস্থান করছিল তখনই চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তের দুই কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে ভারতীয় বাহিনী হত্যা করেছে দু'জন বিডিআর সদস্যকে। পরদিন যশোর সীমান্তে খুন করেছে দু'জন বাংলাদেশীকে। তার পরদিন লালমনিরহাট সীমান্তে গুলি করে জখম করেছে এক বাংলাদেশীকে। এটাই ভারতীয়দের বন্ধুত্বের নমুনা।

ভারত এখন জানান দিচ্ছে, তারা বল প্রয়োগ করে তাদের শর্ত মানাতে চায়। এই বল প্রয়োগ প্রতিহত করতে হবে। সে শক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই। সে প্রতিরোধ করার শক্তি রাখে জনগণ। একতাবদ্ধ জনগণই দিতে পারে এর সমুচিত জবাব। সরকারের উচিত সেই ঐক্যে জনগণকে সহযোগিতা করা।

২৩.০৭.২০০৮

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে আরো দুর্বল কে করল?

প্রথম প্রথম খুব সরল বিশ্বাসে মনে করার চেষ্টা করেছিলাম যে, সরকার হয়তো ভুল করে বা না বুঝে সাম্রাজ্যবাদী ফাঁদে পা দিয়েছে। আমি আশাবাদী মানুষ। তবু আশা জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই নিজেকে আহাম্মক মনে হচ্ছে। না, সরকার ভুল করেনি। তারা সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির দেখানো পথে স্বেচ্ছায়ই অগ্রসর হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তি যা চায়, সেটাই নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে সরকার। ওই দুই শক্তি চায়, বাংলাদেশ হবে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র। তাহলে বাংলাদেশের ওপর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তারা সরাসরি কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারবে। বাংলাদেশ হবে আর এক ইরাক বা আফগানিস্তান।

কোনো রাষ্ট্রকে ব্যর্থ বা অকার্যকর করার জন্য দরকার তার অর্থনৈতিক মেরুদ ভেঙে দেয়া। সীমান্ত গোলযোগপূর্ণ করে তোলা, নিজ ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নড়বড়ে করে তোলা, প্রশাসনকে অকার্যকর করে ফেলা ও রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেয়া। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের মেয়াদোত্তীর্ণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯ মাস ধরে নিষ্ঠার সাথে সেই কাজগুলোই করে আসছেন। আগামী পাঁচ মাসে নিশ্চয়ই তাঁরা ষোলকলা পূর্ণ করবেন।

অর্থনীতি দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রঘাতী বিভিন্ন আন্দোলন-কর্মসূচি সত্ত্বেও জোট সরকারের শেষ বছরে (২০০৫-০৬) দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছুঁই ছুঁই করছিল। বর্তমান সরকার গত দেড় বছরে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তা ৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। এ অর্থ আরো কম হতো যদি প্রবাসীরা যথেষ্ট রেমিট্যান্স না পাঠাতেন। এদিকে সরকারের সীমাহীন উদাসীনতার কারণে এসব শ্রমবাজারও হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণ করেই সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ও সাধারণ মানুষের ওপর। যেন গোটা রাষ্ট্রের সব মানুষই সরকারের প্রতিপক্ষ। কেন তারা প্রতি বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এমন করে এগিয়ে নিয়ে এলো? কেন এরশাদ আমলের (১৯৮৯-৯০) তিন শতাংশ প্রবৃদ্ধিকে তারা ৭ শতাংশে উন্নীত করল? সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই সেই সাধারণ মানুষের আয়-রোজগারের পথ রুদ্ধ করে দেয়ার জন্য দোকানপাট, শত বছরের পুরনো হাটবাজার, 'অবৈধ' স্থাপনা উচ্ছেদ করতে বুলডোজার নিয়ে নেমে পড়ল। মানুষের কর্মসংস্থানের হাজার হাজার

www.pathagar.com

স্থাপনা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো। হকার উচ্ছেদ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বস্তি উচ্ছেদ, গ্যারেজ বের করার নামে দোকানপাট উচ্ছেদ করে তারা লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে বেকার করে দিলো। এসব মানুষই দেশের মালিক-মোক্তার। তারাই রাজপথে আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটায়। এরা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়। এসব মানুষের পেটে যদি লাথি মারা যায়, তাহলে তারা আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত, দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত মানুষের মতো আর প্রতিবাদী হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারবে না। কোটি কোটি মানুষকে অভাবের দিকে ঠেলে দিতে পারলে তারা প্রাণশক্তি হারাবে এবং তখন বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করা সম্ভব হবে।

সে লক্ষ্যে সরকার একের পর এক সরকারি ও চালু মিলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে বেকারের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে তুলল। তেমনি ট্যাক্স ফাঁকি, দুর্নীতি প্রভৃতি অভিযোগ তুলে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের ঢালাওভাবে জেলে পুরলো অথবা তাড়া করে বিদেশে পাঠিয়ে দিলো; যাতে তারা আর কোনো বিনিয়োগ করতে না পারে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হয়। আবার 'কালো টাকা, কালো টাকা' বলে তাড়া করে জেলে পুরলো শত শত বিত্তবানকে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই কালো টাকা যখন ক্যাপিটাল বা পুঁজি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এ ধরনের অপরিণামদর্শী ব্যবস্থা নিলো সরকার। কালো টাকা পুঁজি হলে, তা উৎপাদনে যেমন অবদান রাখতে পারত, তেমনি কর্মসংস্থানের পথও সুগম করতে পারত। সে টাকা এখন হয় অলস পড়ে আছে, নতুবা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। আর ভারত বলেছে, বাংলাদেশীরা নির্বিঘ্নে সে দেশে বিনিয়োগ করতে পারবে। অর্থাৎ বিনিয়োগ যদি করতেই হয়, বাংলাদেশে নয়, ভারতে করো। বাংলাদেশ ভারত থেকে কিনে আনবে, উৎপাদনের কী দরকার?

বাংলাদেশের অদম্য চাষিরা কৃষিখাতে বিপ্লব এনেছিলেন। গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলে খাদ্যমূল্য ছিল সহনশীল পর্যায়ে। কৃষিতে ভর্তুকি ছিল। সঙ্কট একেবারে কখনো হয়নি, তা নয়। কিন্তু জনগণের কাছে দায়বদ্ধ বলে সে সঙ্কটে সরকারকে মনোযোগ দিতে হয়েছিল। কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছিল। বর্তমান সরকার ভর্তুকি প্রত্যাহার, জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বাজার ব্যবস্থাপনায়, অদক্ষতা দিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যাতে দ্রব্যমূল্য চলে গেছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। ফলে মধ্যবিত্তও পড়ে যাচ্ছে গভীর সঙ্কটে। সরকারের লক্ষ্যও তাই। এর ফলে তারাও প্রতিবাদের শক্তি হারাবে। ফলে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথ সহজ হবে। একদিকে সীমাহীন বেকারত্ব সৃষ্টি, ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে আনা, অপর দিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যাঁতাকলে পিষ্ট হবে মানুষ।

আবার রফতানি খাতেও সরকার ধস নামিয়ে দিয়েছে। গত দুই অর্থ বছরে সরকার তাদের সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতির মাধ্যমে রফতানি প্রবৃদ্ধি প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে

www.pathagar.com

এনেছে। জোট সরকারের শেষ বছর অর্থাৎ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (২০০৭-০৮) সে প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ১২ দশমিক ৪৩ শতাংশে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গত দুই বছরের অপশাসনে প্রাথমিক পণ্য, পাট ও পাটজাতদ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, চামড়াজাত পণ্য, তৈরি পোশাক সব ক্ষেত্রেই রফতানি আয় হ্রাস পেয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতি সৃষ্টিতেও সরকার দারুণ সফল হয়েছে। জোট সরকারের আমলে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ২ হাজার ৮৮৯ মিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরে (২০০৭-০৮) তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৯২১ মিলিয়ন ডলারে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ভারত থেকে বৈধ আমদানি ছিল ১ হাজার ৮৬৮ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান সরকার তা সাফল্যের সাথে ২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে। আর বাংলাদেশ রফতানি বাজার হারিয়েছে। সেটা দখল করে নিয়েছে ভারত।

কোনো রাষ্ট্রকে ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর জন্য দরকার সীমান্ত গোলযোগপূর্ণ করে তোলা। সে কাজটিও চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের তিন দিকই ঘিরে আছে ভারত। মিয়ানমারের সাথে আমাদের সীমান্ত সামান্যই। এসব সীমান্তে ভারত ও ভারতীয়রা অবিরাম হামলা চালাচ্ছে। পাখির মতো হত্যা করছে বাংলাদেশীদের। সরকার প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারছে না। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সীমান্তের দেড় কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে দুই বিডিআর সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সরকার এটাকে শুধু 'গ্রহণযোগ্য নয়' বলতে পেরেছে। গত ছয় মাসে সীমান্তে বাংলাদেশের প্রায় ১০০ লোককে হত্যা করেছে ভারত। তারপরও চুপ করে বসে আছে সরকার। কেন এই প্রসঙ্গ জাতিসঙ্ঘে উত্থাপন করছে না? কারণ এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে তো বাংলাদেশকে ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। সুতরাং ভারত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাবে, সরকার 'মিন মিন' করবে। বাংলাদেশ ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্র করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের আরো একটি শর্ত পূরণ হবে।

এর সাথে নিজ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও আছে। এক দিকে মূল সীমান্তে অবিরাম ভারতীয় হামলা, অপর দিকে বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ব্লকগুলো দাবি করছে ভারত ও মিয়ানমার। সরকার জলসীমানা নির্ধারণে কোনো উদ্যোগ না নিয়ে, ফয়সালা না করে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্লকগুলো ইজারা দেয়ার টেন্ডার দিয়েছে। গোলযোগ আরো বাড়বে। ব্যর্থ রাষ্ট্র করার পক্ষে আর এক কদম এগিয়ে যাওয়া যাবে। আবার বাংলাদেশের সীমান্ত সংরক্ষিত না অরক্ষিত, সেটা নির্ণয় করার জন্য সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে সরেজমিন সীমান্ত ঘুরিয়ে এনেছে। তারা রায় দিয়েছে, বাংলাদেশের সীমান্ত অরক্ষিত। অতএব, বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

তৃতীয় প্রসঙ্গ অকার্যকর প্রশাসন। প্রশাসন অকার্যকর করার জন্য সরকার প্রথম থেকেই ছিল সাঙ্ঘাতিক তৎপর। ড. ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মসনদে বসার পরপরই যে নির্লজ্জ প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে দিলেন, সেটা জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কের অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করার জন্য তাদের চেয়ে অনেক অযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপদস্থমূলক ব্যবস্থা নেয়। কারণ একটাই, সরকার সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। তারপর 'দুর্নীতি দুর্নীতি' বলে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যাতে প্রশাসন আর কোনো কাজ করতেই সাহস না পায়। এতে এখন কেউ আর কোনো কাজ করছে না। কাজ করলে কখন আবার 'দুর্নীতি'র অভিযোগে ফেঁসে যান। ফলে এখন সাম্রাজ্যবাদীদের আকাঙ্খা অনুযায়ী প্রশাসন অচল। সবাই নির্ভর করতে চাইছে উপদেষ্টাদের ওপর। তাদের আবার সময় খুব কম। ফলে সাফল্যের সাথে জনপ্রশাসন অচল করে করে দেয়া গেছে।

আর শেষ প্রশ্ন শান্তি ও স্থিতিশীলতার। হ্যাঁ, 'এক-এগারো'র আগে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা মিলে দেশে ভয়াবহ অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল করে দিয়েছিল। রাজপথে প্রকাশ্যে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল নিরীহ মানুষ। সে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন যা করছে, তা আরো ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সরকার বিএনপি বা চারদলীয় জোটকে নির্বাচনের বাইরে রেখে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নির্বাচন করতে চাইছে। সরকার নিষ্পত্তি হওয়া যুদ্ধাপরাধীর সস্তা মতলবি ইস্যুকে অকারণে মদদ দিচ্ছে, যা দেশকে আবারো অশান্তি ও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য। সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাকে ইসলামি মৌলবাদের উত্থান বলে চালিয়ে দেয়াও কঠিন হবে না। সে সূত্র ধরে বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র বলার পথ সুগম হবে।

এর ওপর সরকার উপযাচক হয়ে গঠন করেছে ট্রুথ কমিশন। সাধারণত চার কারণে ট্রুথ কমিশন গঠন করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো : ১. নতুন গণতন্ত্রপন্থী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সন্ত্রাসী ও সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। নতুন সরকারগুলো অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল থাকে। তারা শান্তি প্রক্রিয়ায় আপসের পথ বেছে নিতে ট্রুথ কমিশন গঠন করে। ২. অনেক সঙ্ঘাত মাঝপথে শেষ হয়। সেখানে জবাবদিহিতার চাপ থাকে। আগের সঙ্ঘাত বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা হ্রাস করে দেয়। সেখানে অমানবিক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা শক্তিশালী থাকে। এ ক্ষেত্রে আপসের পথ হিসেবে ট্রুথ কমিশন গঠন করা হয়। ৩. সঙ্ঘাত এড়াতে পরাজিতদের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের লক্ষ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ থেকে মুক্তি ও বিচার

www.pathagar.com

নিষ্পত্তির জন্য ট্রুথ কমিশন গঠন করা হয়। ৪. গৃহযুদ্ধ বা সঙ্ঘাতমূলক পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় উভয় পক্ষে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য ট্রুথ কমিশন গঠন করা হতে পারে।

বাংলাদেশে এ রকম কোনো সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ না করলেও সরকার রুয়ান্ডা-বুরুন্ডির মতো ট্রুথ কমিশন গঠন করে বসেছে। এটা ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর দুর্নীতিবাজদের রেহাই দেয়ার জন্য যদি এই কমিশন গঠন করা হয়ে থাকে, তাহলে তারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সে জন্য আইন আছে, দুর্নীতি দমন কমিশন আছে, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই কমিশন গঠন করে সরকার যেন ঘোষণা দিয়ে দিলো যে, বাংলাদেশে এক মহা সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসে 'দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্র : নিরাপত্তা হুমকি সৃষ্টি ও মার্কিন নীতি' শীর্ষক এক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নীতিনির্ধারণী রিপোর্ট। তাতে ১৭৭টি রাষ্ট্রের ওপর জরিপ চালিয়ে ৩২টিকে ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অক্লান্ত শ্রমে বাংলাদেশ গত বছরের তালিকার ১৬ নম্বর থেকে এবার ১২ নম্বরে উঠে এসেছে।

আর যুক্তরাষ্ট্রের বিচারে কোনো রাষ্ট্র দুর্বল, ব্যর্থ বা অকার্যকর হলে সে রাষ্ট্র চারটি বিষয়ে হুমকি সৃষ্টি করে। সেগুলো হলো সন্ত্রাসবাদ, আন্তর্জাতিক অপরাধ, পরমাণু অস্ত্র বিস্তার ও আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা। সন্ত্রাসবাদের জন্য আল কায়েদাসহ জঙ্গি সংগঠনগুলো দুর্বল বা ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকেই বেছে নেয়। একেবারে ব্যর্থ রাষ্ট্র তাদের পছন্দ নয়। আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্র দুর্বল দেশগুলোকে নিরাপদ স্বর্গরাজ্য মনে করে। কারণ উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতি হলে অপরাধীরা সহজেই তাদের কাজ হাসিল করতে পারে। পরমাণু অস্ত্র বিস্তারে দুর্বল রাষ্ট্র ঝুঁকি সামলাতে অক্ষম। ওই দেশগুলোতে রাসায়নিক, জীবাণু ও তেজস্ক্রিয় উপকরণ সহজেই চলাচল করতে পারে। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা হিসাব দিয়েছে, যেসব দেশের সীমান্ত অরক্ষিত, সেসব দেশের সীমান্ত দিয়ে ১৯৯৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১ হাজার ৮০টি পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় বস্তুর চোরাচালান ধরা পড়েছে। গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের চালানও সেখান দিয়ে আনা নেয়া সহজ। আর যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সহায়তায় সরেজমিন তদন্ত করে দেখে গেছেন যে, আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, বাংলাদেশ ক্রমেই আরো বেশি দুর্বল ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। এর সীমান্ত অরক্ষিত। ফলে তা মার্কিন নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তা ছাড়া বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়তে পারে গোটা অঞ্চলে। ভারতীয় পণ্ডিতরা বলছেন, বাংলাদেশ অকার্যকর রাষ্ট্র। সুতরাং ভারতের জন্য হুমকি। তাই ভারতের উচিত বাংলাদেশকে দখল করে নেয়া। ফলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ বিশাল হুমকির মুখে। এত কিছু সত্ত্বেও সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার।

www.pathagar.com

মেয়াদোত্তীর্ণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টামণ্ডলীর কাছে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা জানতে চাই, বাংলাদেশ কি সত্যি সত্যি আরো দুর্বল ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে? বাংলাদেশ কি সত্যি সত্যি মার্কিন ও ভারতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে, যদি দেশের প্রতি সামান্য ভালোবাসাও থেকে থাকে, তাহলে প্রকাশ্যে এই চক্রান্তের জবাব দিন। বলুন, মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে উত্থাপিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত রিপোর্টটি সত্য নয়। এটা বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ। তা না হলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে আরো দুর্বল, আরো অকার্যকর করার দায়ভার তো আপনাদের ওপরই বর্তাবে। কারণ মার্কিন ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে আপনারাই আরো দুর্বল ও আরো অকার্যকর করে তুলেছেন। ভবিষ্যতে সে দায় মোচন খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

তবে এসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আমরা নস্যাৎ করে দিতে পারি জনগণের ইস্পাতকঠিন ঐক্য দিয়ে। সে ঐক্য যাতে না হয়, তার জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, যারা রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, তারাই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে সে ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পারবেন।

০৬.০৮.২০০৮

www.pathagar.com

বিদেশী শ্রমবাজার নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত ও সৌদি আরব থেকে জোর করে শ্রমিকদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। যারা ফেরত এসেছেন, তারা এসেছেন একেবারেই শূন্যহাতে। তাদের মধ্যে অনেকেই সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। কুয়েতে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মিছিল, ধর্মঘটসহ অন্যান্য আন্দোলন শুরু করলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই বিক্ষোভ, মিছিল, আন্দোলন বেআইনি। প্রায় এমন ধরনের অভিযোগে এর আগে সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন থেকেও বাংলাদেশী শ্রমিকদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। এরও আগে একই ধরনের অভিযোগে নতুন শ্রমবাজার মালয়েশিয়ায় শ্রমিক রফতানি বন্ধ হয়ে গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। বর্তমানে সৌদি আরবে ২০ থেকে ২২ লাখ ও কুয়েতে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ বাংলাদেশী কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ বছরে এই খাত থেকে ৫৫ হাজার কোটি টাকা আয় করে। তার মধ্যে সৌদি আরব ও কুয়েত থেকেই বছরে আসে ২২ হাজার কোটি টাকা। মধ্যপ্রাচ্যের বাকি ৬টি দেশ থেকে আমাদের কর্মীরা দেশে পাঠায় আরো ১৩ হাজার কোটি টাকা।

দীর্ঘকাল ধরে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশী শ্রমিকরা খুবই সুনামের সাথে কাজ করে আসছেন। তারা যেকোনো পরিবেশে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে থাকেন। ফলে সেখানে বাংলাদেশের শ্রমিকদের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েছেই। সাধারণ শ্রমিক ছাড়াও বাংলাদেশের চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়াররাও সেখানে কাজ করছেন। বাংলাদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার কারণে ওই সব দেশে হাজার হাজার শ্রমিক বছরের পর বছর মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসায় কাজ করছেন। সরকারগুলোও সেদিকে প্রায় চোখ বন্ধ করেই থেকেছে। অর্থাৎ প্রশ্রয় দিয়েছে। এটা বাংলাদেশীদের কাজের সুনামের কারণেই।

বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির সর্বব্যাপী চক্রান্তের অংশ হিসেবে আনা হয়েছে 'এক-এগারো'র বর্তমান সরকারকে। এই সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর সে পরিকল্পনা

www.pathagar.com

স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আর প্রথমেই আঘাত আসে অর্থনীতির ওপর। হাট-বাজার-দোকানপাট-হকার উচ্ছেদের নামে লাখ লাখ লোককে বেকার করে দেয়া, কল-কারখানা বন্ধ করে দেয়া, বিনিয়োগকারীদের তাড়া করা, কালো টাকা উদ্ধারের নামে টাকা বিদেশে পাচার করে দিতে উৎসাহিত করা; এমনি সব ভুল পদক্ষেপ নিয়ে সরকার বিপুল সম্ভাবনার অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকার যে দেশকে কতটা পিছিয়ে দিয়েছে, সেটা বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান শাসের জরিপ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গোল্ডম্যান শাস তাদের ২০০৫ সালের জরিপে বলেছিল, ২০১৭ সালের মধ্যে যে নতুন ১১টি দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির শীর্ষে উঠে আসবে, বাংলাদেশ হবে তাদের একটি। সেই গোল্ডম্যান শাসই সম্প্রতি বলেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্য আয়ের একটি দেশ। গোল্ডম্যান শাসের দাবি, কয়েক দশক ধরে তারা বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, তার কোনোটাই ভুল প্রমাণিত হয়নি। অঙ্কের হিসাবে বর্তমান সরকার তাদের ১৯ মাসের শাসনে দেশকে ৩০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতগুলোর ওপর আঘাতের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জনশক্তি রফতানি খাতের ওপর আঘাতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেমে পড়ে বাংলাদেশবিরোধী চক্রান্তকারীরা। প্রথমেই তারা আঘাত করল বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় নতুন শ্রমবাজার মালয়েশিয়ায়। বাংলাদেশ থেকে দুই লাখ শ্রমিক নেয়ার ব্যাপারে মালয়েশিয়া সম্মত হয়। সে অনুযায়ী শ্রমিক পাঠানোও শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের একশ্রেণীর রিক্রুটিং এজেন্ট আর মালয়েশিয়ার চাহিদাপত্র সরবরাহকারীরা যোগসাজশ করে চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত শ্রমিক সেখানে নিয়ে যায়। ফলে সেখানে গিয়ে বাংলাদেশী শ্রমিকরা এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়েন। তাদের খাওয়া-দাওয়া নেই, কাজ নেই, থাকার জায়গা নেই। রিক্রুটিং এজেন্সির দেখা নেই। ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বাংলাদেশী শ্রমিকরা। তারা দূতাবাস ঘেরাও-অবরোধ প্রভৃতি বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জড়িয়ে পড়েন। নেপথ্যে থেকে তাদের ইন্ধন জোগায় ভারতীয় রিক্রুটিং এজেন্সির লোকরা। ঢাকার সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। খুব সঙ্গত কারণেই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এমন পরিস্থিতি মেনে নেয়নি মালয়েশীয় সরকার। ফলে যারা ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় গিয়েছিলেন মালয়েশিয়ায়, তারা ফেরত এলেন। সে দেশের সরকার বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেয়া বন্ধ করে দিলো।

মধ্যপ্রাচ্য কিংবা মালয়েশীয় শ্রমবাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগী ভারত। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে দেখা গেল, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের পুরোটাই দখল করতে চায় ভারত। মালয়েশীয় জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সুতরাং শুরুতেই এ শ্রমবাজার ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়ে যায়। নিয়োগকারীদের প্রতিনিধিকে উৎকোচ দিয়ে বাংলাদেশে প্রকৃত চাহিদার চেয়ে বেশি লোকের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়; যাতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে এবং তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

বিদেশী জনবল নিয়োগকারী কোনো দেশই এই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিকভাবে নেবে না। মালয়েশিয়াও নেয়নি। ফলে এক বিশাল শ্রমবাজার হারিয়েছে বাংলাদেশ।

আমরা তখনই সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারের বিরুদ্ধে ভারতীয় ষড়যন্ত্র চলছে। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অবস্থান ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় ষড়যন্ত্র জারি আছে। এর প্রতিকারের জন্য এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হোক। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে বহু ভারতীয় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। তাদের একজন শ্রমিকের সামান্য অসুবিধায়ও ভারতীয় দূতাবাসের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা সেখানে গিয়ে হাজির হন। যাতে কোনো অবস্থাতেই পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে, সে ব্যাপারে তাঁরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আমাদের দূতাবাস কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে নির্বিকার থেকেছেন। তাতে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে এবং হাজার হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক ধর্মঘট, মিছিল করে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের শ্রমবাজার গড়ে উঠেছে কয়েক দশক ধরে। রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময়ে কখনোই এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। আমরা তো শুনিনি যে, মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও শর্ত অনুযায়ী বেতন কম দেয়া হয়েছে বলে বাংলাদেশী শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ সরকার কেন তা হতে দিলো?

বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বাহরাইনেও কাজ করেন। সেখানেও তারা ভালো শ্রমিক হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে আসছেন। কিন্তু এ সরকারের আমলে প্রথম অভিযোগ উত্থাপিত হলো যে, বাংলাদেশী শ্রমিকরা সে দেশে নানা ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে। বাহরাইনের এমপি-মন্ত্রীরা পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। কয়েক মাস আগে তারা ঘোষণা করলেন, বাহরাইনে আর কোনো বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ করা হবে না এবং এখন যারা কর্মরত আছেন, পর্যায়ক্রমে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। আমরা আবারো মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য সরকার সোচ্চার হয়ে ওঠার আহ্বান জানালাম। বাহরাইন সরকারের সাথে দেন-দরবার করতে বললাম। শেষ পর্যন্ত কথা বলল সরকার। কিন্তু সেটাও দায়সারা গোছের। ফলে বাহরাইন সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে, 'নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলো'। কিন্তু আগের ধারায় লোক নিয়োগ আর শুরু হয়নি। সৌদি আরবের চিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করানো হয়েছে। এর পরিণতিতে সেখানে যা হওয়ার তাই হয়েছে। সৌদি আরব বাংলাদেশী শ্রমিকদের দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করেছে। যে সৌদি আরবে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসায় হাজার হাজার শ্রমিককে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, সে দেশই বাংলাদেশী শ্রমিকদের গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছে। সৌদি আরব অবৈধ বা মেয়াদোত্তীর্ণ শ্রমিকদের ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি বাংলাদেশী শ্রমিক কমিয়ে আনারও সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নিয়েছে। এ রকম হচ্ছে না বলে সৌদি রাষ্ট্রদূত যা জানিয়েছেন, সে ভাষা কূটনৈতিক। প্রকৃত প্রস্তাবে সৌদি আরবে নতুন জনশক্তি রফতানি বন্ধ হয়ে আছে। একই সাথে, নতুন কোনো ভিসা ইস্যু করছে না সৌদি কর্তৃপক্ষ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে বছরে প্রায় দশ হাজার শ্রমিক চাকরি নিয়ে সৌদি আরব গেছেন। কিন্তু গত ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত বড়জোর হাজারখানেক লোক সৌদি আরব গেছেন। বাংলাদেশে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো গত কয়েক মাস ধরে নতুন লোক পাঠানোর চাহিদাপত্র সৌদি আরব থেকে সংগ্রহ করতে পারেনি। এ বাজার বন্ধ হওয়ার পথে।

সাম্প্রতিক ঘটনার প্রভাব পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই। বাংলাদেশী শ্রমিকদের যাতে ওসব দেশের সরকার ও নিয়োগকারীরা আস্থায় নিতে না পারেন, সে আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। ১/১১ সরকারের চরম উদাসীনতা, বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনগুলোর দায়িত্বহীনতা এবং কিছু অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সির অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জনশক্তি রফতানি খাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। পত্রপত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, দূতাবাস ও মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অনেকেই অবৈধভাবে জড়িয়ে পড়েছেন জনশক্তি রফতানিতে। কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস যদি দ্রুত হস্তক্ষেপ করত, তাহলে বিক্ষোভ মিছিলের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। কুয়েত থেকে বিতাড়িত কর্মীদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, দূতাবাস কর্মকর্তারা কখনো কখনো তাদের মালিক এবং রিক্রুটিং এজেন্সির কাছ থেকে নানাবিধ সুবিধা আদায় করেন।

সরকারের আয় কমছে। ঘাটতি মেটাতে সরকার বিদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে। জনগণের ঋণের বোঝা ভারী হচ্ছে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স নিয়ে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের বাহাদুরি করছে। আর সেই বাংলাদেশ ব্যাংকই সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সরকারের শীর্ষ মহলে চিঠি দিয়ে জনশক্তি রফতানির আশঙ্কিত বিপর্যয় রোধে ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছে।

অর্থাৎ জনশক্তি রফতানির এই বিপুল সম্ভাবনার খাত অর্থনীতির অন্যান্য খাতের মতো ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি খাতের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বি ভারতের এই চক্রান্ত নতুন নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর তা সর্বাত্মক রূপ নিয়েছে। ভারতীয়রা ওয়েবসাইট খুলে আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অবিরাম মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয়রা ওই সব দেশে সংঘটিত যেকোনো অপরাধের সাথে বাংলাদেশী শ্রমিকদের যোগসাজশের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করে আসছে। কখনো কখনো তারা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নিজস্ব পত্র-পত্রিকায় এসব কল্পকাহিনী প্রচার করতে সক্ষম হয়। সম্ভবত সে রকম প্রচারণা থেকেই বাহরাইনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয়দের এই অপপ্রচার কৌশল আগে খুব বেশি কাজে না লাগায় তারা এখন শ্রমিক অসন্তোষকে পুঁজি করে শ্রমবাজারে বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ করতে চাইছে। এখন তো মনে হচ্ছে, সে অপচেষ্টায় ভারতের সাফল্য বিরাট। আমাদের নিদ্রালু পররাষ্ট্র

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয় বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে, যেসব শ্রমিক তারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী নয়। তারা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু। কোনোভাবে বাংলাদেশী পাসপোর্ট জোগাড় করে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে এই রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এই বিবৃতি কার্যত অপরাধের অভিযোগ স্বীকার করে নেয়ার শামিল। নিয়োগকারী দেশ এ কথা শুনতে যাবে কেন? যার পাসপোর্টে বাংলাদেশী, যার ভিসা লাগানো হয়েছে বাংলাদেশ থেকে, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যাকে বাংলাদেশী বলে চাকরি করতে পাঠিয়েছে, তাকে তো সরকার নাগরিক হিসেবে অস্বীকার করতে পারে না। হায় রে কূটনীতি।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। তারা দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ব্যাপারেই আমাদেরকে সহযোগিতা করে আসছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্পূর্ণরূপে ভারতমুখী ও যুক্তরাষ্ট্রমুখী নীতির ফলে তারা তাকাতে পারেননি অন্য কোনো সঙ্কট বা সম্ভাবনার দিকে। সময় শেষ হয়ে যায়নি। কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাছে প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমরা জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রে ধস মোকাবেলা করতে পারি। রক্ষা করতে পারি বিপুল কর্মসংস্থানমূলক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক খাতকে।

১৩.০৮.২০০৮

www.pathagar.com

কত ঘণ্টা দিন মাসে দ্রুততম সময় হয়?

অভিধানে দ্রুত শব্দের অর্থ লেখা আছে : ত্বরান্বিত, ক্ষিপ্র। সে হিসেবে দ্রুততম শব্দে অর্থ দাঁড়ায় সবচেয়ে বেশি ত্বরান্বিত, সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। কিন্তু গত কয়েক দিন যাবৎ দু'টি শব্দ আমাকে কেবলই তাড়া করেছে। সেগুলো হলো 'দ্রুততম সময়'। আমি প্রতিদিন অপেক্ষা করেছি, 'দ্রুততম সময়' কখন শেষ হয়। শেষে ভাবলাম, কি জানি, এই প্রৌঢ় বয়সে এসে 'দ্রুততম' শব্দের মানে বুঝতে ভুল করলাম নাকি। হয়তো 'দ্রুততম সময়' মানে অন্তহীন প্রতীক্ষা। তাই অভিধান ঘেঁটে আবারো তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করলাম। না, আমার স্মৃতিবিভ্রম হয়নি। তবে কি 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের স্মৃতিবিভ্রম ঘটল?

সরকার বিশেষ উদ্যোগে শেখ হাসিনাকে গত ১১ জুন মুক্তি দেয়ার পর থেকেই জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, কবে মুক্তি পাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া? আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১৩টি চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির মামলা দায়ের করেছে সরকার। তারপর শেখ হাসিনাকে মুক্তি যখন দেয়া হলো, তখন আমরা দেখলাম, দ্রুততম সময়ের মধ্যেই মুক্তি পেলেন তিনি। তার বিভিন্ন মামলায় ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য এক দিনের মধ্যে রাতের অন্ধকারে আদালত বসিয়ে ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন দুপুরের মধ্যে সংসদ ভবন এলাকার বিশেষ কারাগার থেকে শেখ হাসিনা মুক্তি পেয়ে তার ধানমন্ডির বাসভবনে চলে আসেন। তার সামনে-পেছনে পুলিশের গাড়ি। লোকজনকে সরিয়ে শেখ হাসিনার জন্য পথ করে দিতে পুলিশ অবিরাম হুইসেল বাজাচ্ছিল। আমরা দ্রুততম সময়ের একটা মানে বুঝেছিলাম– ২৪ ঘণ্টা। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার বেলায় 'দ্রুততম সময়' যে আর শেষ হয় না।

বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি চেয়ারপারসন। তিনি তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সরকার এ পর্যন্ত তার নামে তিনটি দুর্নীতির মামলা দায়ের করেছে। তার মধ্যে দু'টি মামলার কার্যক্রম আদালত স্থগিত করেছেন। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলাটি দায়ের করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুক্তির পর থেকেই সরকারের উপদেষ্টারা বলে আসছেন, মুক্তি দেয়া হবে বেগম খালেদা জিয়াকেও। শুধু উপদেষ্টারাই একথা বলেননি, বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা নিজেও। গত ৩০ জুলাই রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংলাপে প্রধান

www.pathagar.com

উপদেষ্টা বলেছেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার।' অবশ্য তার দেড় মাস আগে থেকেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একাধিক উপদেষ্টা বারবার একই কথা বলেছেন।

আমরা শুধু আগস্ট মাসে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি নিয়ে কে কী বলেছেন, তা আবার মনে করে দেখতে পারি। গত ২ আগস্ট বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, 'খালেদা জিয়ার মুক্তি নিয়ে বিএনপি'র সাথে আলোচনা হচ্ছে কী হচ্ছে না, সে বিতর্কে জড়িয়ে লাভ নেই। মূল কাজ হচ্ছে ফলাফল। শিগগিরই ফলাফল দৃশ্যমান হবে।' এরপর ৩ আগস্ট যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) গোলাম কাদের বলেছেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার পুত্র তারেক রহমানের মুক্তি প্রক্রিয়া যেভাবে ছিল, সেভাবেই চলছে।'

আবার ১০ আগস্ট উপদেষ্টা গোলাম কাদের বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়া কোনো শর্ত ছাড়াই মুক্তি পাচ্ছেন। তার মুক্তির প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যায়ে রয়েছে।' একই দিন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) এম এ মতিন বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। এর আগের দিন বাণিজ্য উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।' ১১ আগস্ট স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আবারো জানান, খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

এদিকে ১২ আগস্ট হোসেন জিল্লুর রহমান খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন। তিনি বলেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে কোনো ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়নি। এটা মিডিয়ার সৃষ্টি। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ধূম্রজাল আপনারা সৃষ্টি করছেন। খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মুক্তি দেয়ার জন্য যে খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, তা গুছিয়ে আনা হচ্ছে। বেগম জিয়ার মুক্তির জন্য রাজনৈতিক আলোচনার সাথে সাথে প্রশাসনিক আদেশ জারির বিষয় রয়েছে। এসব করতে যে যৌক্তিক সময়ের প্রয়োজন 'তা লাগছে। এ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে'। আর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এক কথার মানুষ। একই দিন তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

এতসব 'প্রক্রিয়া'র পর ১৩ আগস্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খোদ প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, 'বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে দ্রুততম সময়ে মুক্তি দেয়া হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে যে প্রক্রিয়ায় মুক্তি দেয়া হয়েছে, সেই একই প্রক্রিয়ায় তাকে মুক্তি দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। যেকোনো সময় এ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবে বলে আশা করছি। যত দ্রুত সম্ভব মুক্তি প্রক্রিয়া শেষ করার চেষ্টা করছি।'

এরপর আর একটি কথা। তা হলো, ১৪ আগস্ট স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্য। ওই দিন তিনি জানান, 'খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি হচ্ছে। একইভাবে তারেক

www.pathagar.com

রহমানের মুক্তি প্রক্রিয়াও এগোচ্ছে। যথাসময়ে তা জানানো হবে। খালেদা জিয়ার ফাইল এখনো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসেনি। আইনগত প্রক্রিয়া শেষ করে ফাইল মন্ত্রণালয়ে এলে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

প্রিয় পাঠক, একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দেখবেন উপদেষ্টাদের বক্তব্যে কতবার 'প্রক্রিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া বা তারেক রহমানের মুক্তির ব্যাপারে 'প্রক্রিয়া'র যত বেড়াজাল, তা দেখা যায়নি আবদুল জলিল, শেখ হাসিনা বা মোহাম্মদ নাসিমের মুক্তির বেলায়।

তাহলে পর্দার অন্তরালে কী ঘটছে? আমাদের জানতে দিন শেখ হাসিনার সাথে পর্দার অন্তরালে কী আঁতাত আপনারা করলেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ২৪ ঘণ্টায় সব প্রক্রিয়া-ট্রক্রিয়া শেষ করে তাকে ভিআইপি মর্যাদায় মুক্তি দিতে পারলেন? আপনারা তো রাজনৈতিক দল নন। আপনাদের তো পরবর্তী টার্মেও ক্ষমতায় যাওয়ার কথা নয়। তাহলে আপনারা কেন এমন অস্বচ্ছ কৌশল আর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন?

হোসেন জিল্লুর রহমান সাহেব আমাদের ছেলে ভোলানোর মতো করে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য রাজনৈতিক আলোচনার সাথে সাথে প্রশাসনিক আদেশ জারির বিষয় রয়েছে। এসব করতে যে যৌক্তিক সময়ের প্রয়োজন, তা লাগছে। আর এ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

কিন্তু শেখ হাসিনা, আবদুল জলিল, মোহাম্মদ নাসিমের মুক্তির সময় কি রাজনৈতিক আলোচনার সাথে সাথে প্রশাসনিক আদেশ জারির বিষয় ছিল না? আমরা তো তার জন্য মাসের পর মাস সময় নিতে দেখিনি। আমরা তো তার জন্য 'প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া' বলতে শুনিনি। আমাদের চরম শিক্ষিত উপদেষ্টারা কি তবে বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাতে চাইছেন?

'চাইছেন' বলা বোধ হয় এখন আর সঙ্গত নয়। তারা হাইকোর্ট দেখিয়েই দিয়েছেন। গত ২০ আগস্ট আবারো বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুক্তির জন্য আবেদন করতে রাজি না হলেও একটি অর্থবহ নির্বাচনের স্বার্থে সরকার তাকে মুক্তি দিতে চায়। আমরা চাই, অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং এর গুণগত পরিবর্তন। এ কারণেই তার মুক্তির বিষয়টি আসছে।' ড. জিল্লুর বলেন, 'বৃহত্তর সমঝোতা হলে তার স্থায়ী জামিন বা প্যারোল কোনো বিষয় হবে না। এ ব্যাপারে সরকারের অবস্থান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুক্তির সময়ই তুলে ধরা হয়েছে। তারপরও কিছু খুঁটিনাটি সমস্যা ছিল। এ সমস্যা দূর করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

আমরা একই দিন যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) গোলাম কাদের বলেছেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দিনক্ষণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। খালেদা জিয়ার মুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক দল ও সরকার দু'পক্ষ কাজ করছে।

www.pathagar.com

দিনক্ষণ বলা সম্ভব নয়।' তিনি বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা যেভাবে বলেছেন, বিষয়টি এখনো সে অবস্থায়ই রয়েছে। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে যত দ্রুত সম্ভব, আমরা চেষ্টা করছি।'

চরম শিক্ষিত ড. হোসেন জিল্লুরের বক্তব্যের কোনো সারবত্তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এবং সত্যি সত্যি তা হেঁয়ালি ও ধূম্রজালে ভরা। প্রধান উপদেষ্টা যেখানে বলেছেন, দ্রুত সময়ে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়া হবে সেখানে এই উপদেষ্টা এত সব সুবচন কেন ছাড়ছেন? তার অর্থ দাঁড়ায়, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের ওপর প্রধান উপদেষ্টার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এটা কি কল্পনা করা যেত বেগম খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনার সরকারের আমলে? প্রধানমন্ত্রী বলছেন এক কথা আর তার মন্ত্রীরা বলছেন ভিন্ন কথা? তবে কি প্রধান উপদেষ্টার কাছে অন্য উপদেষ্টাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই? তারা কি অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ? অন্য কারো কথায় কথা বলেন?

উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) গোলাম কাদের বলেছেন আরো চমৎকার কথা। তিনি বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দিনক্ষণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। এ কথা যদি বলতে হয়, সেটা বলতেন প্রধান উপদেষ্টা নিজেই। গোলাম কাদের কেন বলবেন? সরকার গোলাম কাদের, না ড. ফখরুদ্দীনের? সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। তবে কার নিয়ন্ত্রণে আছে? সরকারের বাইরে অন্য কারো নিয়ন্ত্রণে? সে কোন কর্তৃপক্ষ যে সরকারেরও ওপরে?

বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার 'দ্রুততম সময়ে'র ঘোষণার পর দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। মুক্তি পাননি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বরং এ সম্পর্কে উপদেষ্টাদের হেয়ালিপূর্ণ বক্তব্য অব্যাহত আছে। এর কোনো কিছুই আমরা আর এক সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার বেলায় দেখিনি।

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব তারেক রহমানের মুক্তি নিয়েও সরকারের আচরণ দ্বিমুখী, নিষ্ঠুর ও অমানবিক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এ দেশীয় এজেন্টরা জোট সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ধারাবাহিক ও সমন্বিতভাবে প্রচার করে আসছিল। আর তারেক রহমানকে দাঁড় করানো হয়েছিল 'দুর্নীতির প্রতীক' হিসেবে। প্রচার করা হয়েছিল, তারেক রহমান দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা অর্জন ও পাচার করেছেন। সরকার গত দেড় বছর ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। এ সময় একজন লোকও পাওয়া যায়নি, যিনি বলতে পারেন যে, তারেক রহমানকে কোনো কারণে তিনি ঘুষ বা টাকা দিয়েছেন। অথচ এমন লোক তো পাওয়া গেছে, যিনি বলেছেন, শেখ হাসিনাকে তিনি কাজ হাসিলের জন্য টাকা দিয়েছেন। তা হলে তারেক রহমানকে কেন আটক রাখা হচ্ছে?

সরকারের হেফাজতে থাকার সময় তারেক রহমানের মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেছে। তিনি এখন গুরুতর অসুস্থ। সরকারের অবহেলায় তিনি পঙ্গু হতে বসেছেন। তার চিকিৎসকরা গত আট মাস ধরে বলে আসছেন, দেশে তারেক রহমানের চিকিৎসা সম্ভব

www.pathagar.com

নয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে অবিলম্বে বিদেশে পাঠানো দরকার। সর্বশেষ গত ২৩ আগস্ট তার চিকিৎসক বিএসএমএমইউ'র অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক সিরাজউদ্দীন আহমেদ তারেক রহমানের অবস্থা খুবই খারাপ আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'বড় ধরনের কিছু ঘটে গেলে তার দায় আমরা চিকিৎসকরা নিতে পারব না। এ জন্য সরকারের কাছে ইতোমধ্যে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধান হিসেবে দাখিল করা প্রতিবেদনে তারেক রহমানকে সুচিকিৎসার স্বার্থে বিদেশে পাঠানো প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলাম। আজো একই অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলাদেশে তারেক রহমানের সুচিকিৎসার কোনো সুব্যবস্থা নেই। গত আট মাস ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তার চিকিৎসা হচ্ছে। কিন্তু কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ায় তাকে সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। একাকী চলতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম।'

গুরুতর অসুস্থতার কারণে যদি শেখ হাসিনা, আবদুল জলিল এবং ১৩ বছর কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মোহাম্মদ নাসিমকে চিকিৎসার জন্য মুক্তি দেয়া যায়, তাহলে তারেক রহমানকে কেন এত গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও মুক্তি দেয়া যাবে না? সরকারকে তো এর জবাব দিতে হবে।

বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তির ব্যাপারে সরকারের আচরণ চরম পক্ষপাতদুষ্ট ও অমানবিক। এ আচরণ কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমাদের বক্তব্য, সকল প্রকার হেয়ালি, টালবাহানা ও কথার মারপ্যাঁচ বাদ দিয়ে দেশের স্বার্থে অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে মুক্তি দেয়া হোক। আর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রশ্ন– কত ঘণ্টা দিন মাসে 'দ্রুততম সময়' হয় জনাব?

২৫.০৮.২০০৮

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর অমানবিক ও নির্লজ্জ

দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির ১৬ মামলার আসামি শেখ হাসিনা। এসব মামলার বেশ কয়েকটির চার্জশিট হয়েছে। শুনানিও চলছিল কোনো কোনো মামলার। এর মধ্যে হঠাৎ করেই তার কান আর চোখের রোগ ধরা পড়ল। প্রতিদিন শেখ হাসিনার চিকিৎসকরা বলতে থাকলেন, তার বাম কানে ডিভাইস বসানো আছে। সেটা না বদলালে তিনি চিরদিনের জন্য কর্ণপ্রতিবন্ধী হয়ে যাবেন। আর যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথায়ও ওই ডিভাইস লাগানো যাবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় এক ছবিতে দেখা গেল, তিনি বাম কানে মোবাইল লাগিয়ে কথা বলছেন। এ ছবি ছাপার পর ঢাকায় তার সহকারী ও ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা বললেন, ছবিটি বানোয়াট। কম্পিউটারে তৈরি। শেখ হাসিনার বাম কান অচল। এর ক'দিন পর প্রবাস থেকেই শেখ হাসিনা জানালেন, বাম কান নয়, তার ডান কান অচল। যাই হোক, বিদেশ যাওয়ার আগে শেখ হাসিনার উন্নত চিকিৎসার জন্য অনেক শোরগোল হলো। সরকারের সাথে আলোচনা হলো। রাতারাতি তার পাসপোর্ট ফেরত দেয়া হলো। রাতে আদালত বসিয়ে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি মিলল। কারাগার থেকেই বেগম খালেদা জিয়াও শেখ হাসিনার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবি জানালেন। শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া সরকারের কাছে আবেদন জানালেন এবং কারাগার থেকে সরকারি অনুকম্পায় নির্বাহী আদেশে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। তারপর 'গুরুতর অসুস্থ' শেখ হাসিনা পাখির মতো আজ লন্ডন, কাল কানাডা, পরশু যুক্তরাষ্ট্র, তরশু ফিনল্যান্ড ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এ নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। সে সুযোগ প্রতিটি নাগরিকেরই প্রাপ্য, তা তিনি মুক্ত মানুষ হোন, কারাবন্দী থাকুন, কিংবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হোন। সে হিসেবে শেখ হাসিনার আগে চিকিৎসা নিতে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দুর্নীতির অভিযোগে কারাবন্দী আবদুল জলিলকে। শেখ হাসিনার পর দুর্নীতির দায়ে ১৬ বছরের কারাদণ্ডে

www.pathagar.com

দণ্ডিত আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমকে। তারও প্রতিবাদ করেনি কেউ। আর এদের কেউই আইনি প্রক্রিয়ায় বা জামিন নিয়ে বিদেশে যাননি। সবাই গেছেন সরকারের অনুকম্পায়।

কিন্তু তারেক রহমানের মুক্তি প্রক্রিয়া এগিয়েছে বিচারিক প্রক্রিয়ায়। শেখ হাসিনার মুক্তির সময় সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল তারেক রহমানের উন্নত চিকিৎসার জন্য মুক্তি পেতে তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আবেদনও করা হয়নি। তখন তার স্ত্রী-কন্যা সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু তার সে আবেদনে সাড়া দেয়নি সরকার। এরপরও প্রায় তিন মাস পার হয়ে গেছে। উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করেন তারেক রহমান। উচ্চতর আদালত তার বিরুদ্ধে দায়ের করা সব ক'টি মামলায় তাকে জামিন দেন। ফলে তারেক রহমানের জামিনে মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের মুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার সম্ভাবনা দেখা দেয়া মাত্রই তার মুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আওয়ামী লীগ। প্রথম দিন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, এটা বিএনপি-জামায়াতের সাথে সরকারের আঁতাতের ফসল এবং আশ্চর্য, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সভা ডাকা হয় ৩০ আগস্ট। সভা শেষে বলা হয়, 'দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে ছেড়ে দিলে আর কাউকে আটক রাখার অধিকার সরকারের থাকে না। সে জন্য তাকে ছাড়ার আগে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে।' দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ছিল লোক দেখানো। এর আসল লক্ষ্যই ছিল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে একই লেভেলে নিয়ে আসা। এটা এখন প্রমাণিত। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নই যদি মুক্তি পায়, তাহলে চুনোপুঁটিদের ধরে রেখে কী লাভ।'

অর্থাৎ তারেক রহমান যত অসুস্থই হোক না কেন, তাকে চিকিৎসার জন্যও এমনকি আদালতও জামিন দিতে পারবে না। তা ছাড়া কোনো অসুস্থ রাজনীতিবিদ জামিন পাচ্ছেন দেখে এ ধরনের মন্তব্য সত্যি সত্যি নিষ্ঠুর ও অমানবিক। রাজনীতিতে মতাদর্শগত বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু সে বিরোধ হত্যাকাণ্ডকে উসকে দিতে পারে না। তাতে আইনের শাসনের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হয়। রাজনীতিবিদদের নিজেদের মধ্যে অন্তত এ ধরনের সহমর্মিতা থাকা জরুরি।

আর তারেক রহমান দুর্নীতিতে 'বিশ্বচ্যাম্পিয়ন' হলেন কেমন করে? না দেশের কোনো আদালত তাকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে রায় দিয়েছে, না তথ্য প্রমাণসহ তার দুর্নীতির খতিয়ান কেউ প্রকাশ করেছে? না সে রকম কিছু ঘটেনি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের নেতানেত্রীরা অবিরাম প্রচার করেছেন, তারেক রহমান বাংলাদেশে দুর্নীতির

www.pathagar.com

প্রতীক। আর দায়িত্বহীন জবাবদিহিতাহীন কিছু সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল নীতিনৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সেসব কথা প্রচার করেছে। যেহেতু আওয়ামী লীগ বলেছে, তারেক রহমান বিশ্বসেরা দুর্নীতিবাজ। তাই তিনি দুর্নীতিবাজ হয়ে গেছেন? এই দাবি শুধু অশিষ্টই নয়, অশিক্ষাও বটে।

সরকারের সাথে সমঝোতা করে আদালতের জামিন না নিয়ে নির্বাহী আদেশে বিদেশে গেছেন আওয়ামী লীগের তিন নেতা শেখ হাসিনা, আবদুল জলিল ও মোহাম্মদ নাসিম। গত ১১ জুন শেখ হাসিনার মুক্তির আগের দিন বিকেল ৫টার পর খাস কামরায় বসে চারটি মামলায় শেখ হাসিনাকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতির আদেশ দিয়েছিলেন বিচারক। আদালতে সরকারি আইনজীবীরাও তখন শেখ হাসিনার পক্ষে ওকালতি করেন। এর নাম আঁতাত নয়? দুর্নীতির মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের ১৬ বছর কারাদণ্ড হয়েছে। তিনি সে দণ্ড ভোগ করছেন। এ রকম অবস্থায় অতীতের সব নিয়মকানুন উপেক্ষা করে নির্বাহী আদেশে মোহাম্মদ নাসিমকে মুক্তি দিয়ে সরকার নজির সৃষ্টি করেছেন। এর নাম আঁতাত নয়? আবদুল জলিলও চিকিৎসার জন্য কোনো আদালতের জামিন নিয়ে বিদেশে যাননি। গেছেন সরকারের নির্বাহী আদেশে। বারবার তার প্যারোলের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এর নাম আঁতাত নয়? আঁতাত। আর আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতের জামিন নিয়ে তারেক রহমানের মুক্তি প্রক্রিয়ায় এমন নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়া দিলো আওয়ামী লীগ?

তবু দুর্নীতির বিষয় একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। শুধু শেখ হাসিনা ও তারেক রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগে আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে পারি। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সরকার ১৫টি মামলা দায়ের করেছে। এর মধ্যে উচ্চ আদালত থেকে তিনটি মামলায় তার জামিন হয়েছে। বাকি কোনোটিতেই তিনি জামিন পাননি। মিগ-২৯ ক্রয় দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। হাইকেট বিভাগ শুনানি শেষে তার অনুপস্থিতির আবেদন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেন। আপিল বিভাগ তার আবেদন খারিজ করে দেয়। উচ্চ আদালতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে এ মামলা চলতে পারে। এতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৭৫০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি বিশেষ জজ আদালতে বিচারাধীন, আজম জে চৌধুরীর দায়ের করা চাঁদাবাজির মামলায়ও চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। নিম্ন আদালতে চার্জ গৃহীত হয়েছে। এতে ৩ কোটি টাকার চাঁদাবাজির অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। বিশেষ জজ আদালতে এ মামলায় শেখ হাসিনার বিচার চলছে। নাইকো দুর্নীতি মামলায় তার বিরুদ্ধে ১৪ হাজার ৩৮০ কোটি ৫০ লাখ টাকার দুর্নীতির অভিযোগে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তবে শেখ হাসিনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে মামলাটির কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ব্যবসায়ী নূর আলী তার বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেছেন।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা ও বিচারাধীন অন্য মামলাগুলো থেকে পাঠকরা তার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে পারবেন। মামলাগুলো হলো : জামায়াতে ইসলামীর ছয় নেতা-কর্মী হত্যা মামলা, ফ্রিগেট ক্রয় দুর্নীতিসংক্রান্ত তেজগাঁও থানার মামলা, মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্নীতি সংক্রান্ত রমনা থানায় মামলা, বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগে দুর্নীতিসংক্রান্ত তেজগাঁও থানায় মামলা, বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতিসংক্রান্ত তেজগাঁও থানায় মামলা, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাৎসংক্রান্ত রমনা থানায় মামলা, অবৈধভাবে সেনানিবাসে প্রবেশ ও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট লঙ্ঘনসংক্রান্ত ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা।

অপর দিকে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন দু'টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানি একটি মামলা দায়ের করেছে। জয়েন্ট স্টকের এই মামলাটি হাইকোর্ট ইতোমধ্যে বাতিল করে দিয়েছে। বাকি মামলাগুলো করা হয়েছে ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের বিরুদ্ধে। তাতে তারেক রহমানকে আসামী দেখানো হয়েছে। এর সবই বিভিন্ন থানায় দায়ের করা চাঁদাবাজির মামলা। এসব মামলা উচ্চতর আদালত স্থগিত করেছেন এবং তাতে তারেক রহমানের জামিন মঞ্জুর করেছেন। আর সাব্বির হত্যা ধামাচাপা দেয়ার মামলার এজাহারে তারেক রহমানের নামই ছিল না। ২৮ জন সাক্ষীর মাত্র একজন তারেক রহমানের নাম বলায় তাকে এই মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবার আওয়ামী লীগ নেতারা বলুন, কে বিশ্ব দুর্নীতিবাজ? তারেক রহমান, না তাদের দলের নেত্রী শেখ হাসিনা? সত্য যদি বলেন, তাহলে বলতেই হবে শেখ হাসিনাই বিশ্ব দুর্নীতিবাজ। একমাত্র সাব্বির হত্যা ধামাচাপা মামলা ছাড়া তারেক রহমানের বিরুদ্ধে আর কোনো মামলায় এ পর্যন্ত চার্জশিট হয়নি। চার্জশিট দেয়ার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। তাহলে এই মিথ্যা প্রচারণায় নামলেন কেন আওয়ামী নেতারা? তাদের দলের আরো অনেক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলার চার্জশিট হয়েছে। অনেক নেতার সাজা হয়েছে। তারা জেলের ভাত খাচ্ছেন। তাহলে চোরের মায়ের মতো মাথা তুলে বড় গলায় কথা বলেছেন আপনারা।

আওয়ামী লীগ এখন বলতে শুরু করেছে, এ সরকার বিএনপি-জামায়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ক্ষমতায় এসেছে। তাই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে সাব-জেলে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে দিয়েছে। তারেক রহমানকে মুক্তি দিয়েছে। বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিচ্ছে। যে কেউ আবেদন করে কারাগারে বন্দী কারো সাথে দেখা করতে পারেন। তা ছাড়া বেগম খালেদা জিয়া সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি নন। আর সরকার তারেক রহমানকে মুক্তি দেয়নি। তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের এই জামিনের বিরুদ্ধে সরকার ও দুদক সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করেছিল। সে আবেদনও খারিজ হয়ে গেছে। অপর দিকে শেখ হাসিনা, আবদুল জলিল এবং ১৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত মোহাম্মদ

www.pathagar.com

নাসিম সবাইকে মুক্তি দিয়েছে সরকার। তাহলে সরকারের সাথে আঁতাতটি কার? নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগেরই।

আর বর্তমান সরকার যদি বিএনপি-জামায়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ক্ষমতায় এসে থাকে তাহলে, আওয়ামী লীগ কেন এই সরকারকে একেবারে আঁচল বিছিয়ে স্বাগত জানাল? আগ বাড়িয়ে বলল, নির্ভয়ে কাজ করে যান। আওয়ামী লীগ এই সরকারের সব কর্মকাণ্ডে বৈধতা দেবে? এতটুকু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও কি তবে আপনাদের নেই?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিপদ এটাই। এখন পর্যন্ত এই অশুভ বৃত্ত থেকে বের হতে পারল না বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। যা কিছু পক্ষে যায়, তাই ভালো, যা কিছু বিপক্ষে যায়, তাই খারাপ। এমনকি যে কাজ আওয়ামী লীগের জন্য ভালো, সে একই কাজ অন্য কারো জন্য করা হলে তা-ও খারাপ। এটা এক অদ্ভুত মানসিকতা। এক অশুভ বৃত্ত। এই বৃত্ত ভাঙতে না পারলে দেশে বারবার এক-এগারোর মতো বিপর্যয় আসতে বাধ্য।

আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা নিশ্চিত জানে, চারদলীয় জোট নির্বাচনে গেলে সামনের যেকোনো নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি নিশ্চিত। সে কারণে ২০০১-০৬ সময়ে এই চারদলীয় জোট ভাঙার জন্য হেন অপপ্রচার নেই, যা তারা করেনি। চারদলীয় জোট জঙ্গিবাদের মদদদাতা, জামায়াতের সাথে জেএমবি কানেকশন প্রভৃতি বিষয় সরকার সংখ্যালঘুদের নির্যাতনকারী ইত্যাদি প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। যেটা যেমন প্রমাণ করা যায়নি, তেমনি জনগণ এসব বিশ্বাসও করেনি। বরং এসব অপপ্রচারে আওয়ামী জোটেরই জনসমর্থন কমেছে। তাই আওয়ামী লীগ চেয়েছিল চারদলীয় জোটকে কিভাবে নির্বাচনের বাইরে রাখা যায়। সেটা হয়তো তারা যাচ্ছে না সেই আশঙ্কায়ই তারা এতসব কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য দিতে শুরু করেছে। তবুও আওয়ামী লীগ কার্যত নিজের পায়েই কুড়াল মারছে। এতে চারদলীয় জোটের কোনো ক্ষতি করা যাবে বলে মনে হয় না।

০৬.০৯.২০০৮

www.pathagar.com

নির্বাচন বানচাল করতে চায় বিএনপি?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুকম্পায় নয়, আদালতের রায়ে বেগম খালেদা জিয়া জামিনে মুক্তি পেয়েছেন গত ১১ আগস্ট। সেদিন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত শেখ হাসিনা বলেছেন, 'নির্বাচন বানচাল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিএনপি।' এ জন্য তিনি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। বিএনপি চেয়ারপারসন আইনি প্রক্রিয়ায় মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই আওয়ামী নেতারা শেখ হাসিনার দেশে ফেরার নানান তারিখ ঘোষণা করছেন। কেউ বলছেন, এ মাসের মাঝামাঝি, কেউ বলছেন, এ মাসের শেষ সপ্তাহে, কেউ বলছেন আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফিরে আসবেন শেখ হাসিনা। কেউ আবার আর এক কাঠি সরেস। বলছেন, দেশে ফিরে সোজা সাব-জেলে চলে যাবেন তিনি। বিমানবন্দর থেকে সোজা। সরকারি অনুকম্পায় চিকিৎসার জন্য গত ১২ জুন যুক্তরাষ্ট্র রওয়ানা হয়ে যান। এরপর তার আবেদনে দু'মাস প্যারোলের মেয়াদ তিন মাস করা হয়েছে। সে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে গত ৮ আগস্ট। তার আগেই সরকার শেখ হাসিনার প্যারোলের মেয়াদ আরো এক মাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

এ বছর জুনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সংলাপ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের শর্ত ছিল, শেখ হাসিনাকে 'চিকিৎসার জন্য' মুক্তি দিয়ে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। সরকার অস্বাভাবিক দ্রুততায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শেখ হাসিনাকে মুক্ত করে বিদেশে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়। তারপর শেখ হাসিনা 'চিকিৎসার জন্য' বিদেশে চলে যান। বিদেশে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্রিটেন, ব্রিটেন থেকে কানাডা, কানাডা থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে ফিনল্যান্ড হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে শুরু করেন। আর সব জায়গায় দুর্নীতির অভিযোগে 'বন্দী' শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রদূতরা বিমানবন্দরে প্রোটোকল দিয়ে যাচ্ছেন।

চারটি সিটি করপোরেশন ও নয়টি পৌরসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের শর্ত ছিল, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি। তবে বেগম জিয়া স্পষ্ট

www.pathagar.com

করেই সরকারকে জানিয়ে দেন, মুক্তির জন্য তিনি সরকারের কাছে কোনো আবেদন জানাবেন না। কিন্তু সরকারি আনুকূল্যে শেখ হাসিনার মুক্তিলাভের জন্য তার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেছিলেন।

শেখ হাসিনা দুর্নীতির অভিযোগে আটক থাকার সময় বিএনপি-জামায়াতসহ চারদলীয় জোট একযোগে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করে আসছিল। সেটা তারা করেছিলেন দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। রাজনীতিকে রাজনীতিকদের হাতে ফিরিয়ে আনার জন্য। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান জোরদার করার জন্য। কিন্তু আওয়ামী লীগের তরফ থেকে একবারও বেগম জিয়ার মুক্তি দাবি করা হয়নি। এদিকে সরকার বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রক্রিয়া কেবলই বিলম্বিত করতে শুরু করে। এই বিলম্বের কারণেই আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন থেকে বিরত থাকে চারদলীয় জোট। কিন্তু নির্বাচন বানচালের কোনো ঘোষণা তারা দেয়নি। এই অবস্থায় ১৩টি স্থানীয় সরকার নির্বাচনেই আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। এই একদলীয় ও একতরফা নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ দারুণ স্বস্তিবোধ করেছে। চারদলীয় জোট ওই নির্বাচনে অংশ নিলে, আওয়ামী লীগের জন্য এতটা স্বস্তির কারণ ঘটত বলে মনে হয় না।

কথা হল, নির্বাচন কেন বানচাল করতে যাবে বিএনপি? মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বীরউত্তম মুক্তিযোদ্ধা, আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, উন্নয়ন, অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতার আদর্শ নিয়ে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুক্ত পরিবেশে যতগুলো নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিয়েছে, তার সবক'টিতেই বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সরকার গঠন করতে না পারলেও বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সিট পেয়েই বিরোধী দলের আসনে বসেছিল বিএনপি। সেই দল কেন নির্বাচন বর্জন করবে?

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের আগের পরিবেশ এমন কী মন্দ ছিল? সে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যেসব দাবি তুলেছিল, ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে তেমন কোনো দাবিই তোলেনি বিএনপি। আওয়ামী লীগের সাজানো নির্বাচন কমিশন ছিল, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিলেন, আওয়ামী লীগের সাজানো পাবলিক সার্ভিস কমিশন ছিল, তাদের মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ছিল, তার মধ্যেও তো নির্বাচন বর্জন করেনি বিএনপি। এত কিছু সাজানো থাকার পরও জনগণের বিরাট ম্যান্ডেট বিএনপি'র পক্ষেই গিয়েছিল, দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করেছিল বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট।

www.pathagar.com

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নির্বাচন তো মেনেই নিয়েছিল আওয়ামী লীগ। তারা তৎকালীন অবস্থায়ই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন, প্রার্থী বাছাই করেছিলেন। প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণাও শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন নির্বাচনের জমজমাট পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর নির্বাচনের কয়েক দিন আগে কেন তারা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন?

নির্বাচন বর্জনের এই সিদ্ধান্ত কার্যত নির্বাচন বানচালই করে দিলো। একথা সত্য, বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্বাচন বর্জন নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতই। সেটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিনিধিরা যেমন জোর গলায় বলতে থাকলেন, তেমনি বলতে থাকলেন তাদের এ দেশীয় এজেন্টরাও। কার্যত নির্বাচন বর্জন করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বাংলাদেশবিরোধী এজেন্ডাকেই বাস্তবায়িত করে বসল আওয়ামী লীগ। আবার আওয়ামী লীগও জোর গলায় বলতে শুরু করল, তারা নির্বাচনে না গেলে সে নির্বাচন বৈধতা পাবে না। তৎকালীন জোট সরকারও যে এটা উপলব্ধি করেনি, তা নয়। কিন্তু তারা তো তখন সরকারে ছিল না। তাদের করার ছিল না বেশি কিছু। চারদলীয় জোটও নির্বাচনের জন্যই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সামাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ভুল পরামর্শে দেশে এক অসাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করল আওয়ামী লীগ। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনই হলো না। রাজনীতিকদের বদলে এক কিম্ভূত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

এত দিন যারা বলছিলেন, 'আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না', এখন তারা সুর ঘুরিয়েছেন। বলছেন, নির্বাচন সঠিকভাবে হলে কোনো দল অংশ না নিলেও নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে। ১৩টি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়কে আওয়ামী লীগ তাদের প্রতি 'বিপুল জনমর্থন' হিসেবে দেখলেও ভেতরে ভেতরে তাদের শঙ্কা প্রকট। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতারা একবারও বলেননি, এ নির্বাচনে যেহেতু চারদলীয় জোট অংশ নেয়নি, অতএব এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নয়। আওয়ামী লীগ এমন একটা পরিবেশই চাইছে, যাতে চারদলীয় জোট নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে এবং এ সুযোগে তারা নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়।

আইনি প্রক্রিয়ায় বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তির পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। বেগম জিয়ার মুক্তির পর আওয়ামী লীগ নেতারা আবোলতাবোল বলতে শুরু করেছেন। প্রথম দিকে তারা বলেছেন, সরকার বিএনপি'র সাথে আঁতাত করেছে। এখন বলছেন, বিএনপি সরকারের সাথে আঁতাত শুধু নয়, সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। 'যুক্তি' হিসেবে বলছেন, তা না হলে বেগম খালেদা জিয়ার বাসায় গিয়ে চার উপদেষ্টা তার সাথে বৈঠক করতেন না। কিন্তু এর আগে চার উপদেষ্টা যখন শেখ হাসিনার বাসায় গিয়ে তার সাথে বৈঠক করলেন, তখন সেটা আঁতাত হয়নি? আওয়ামী লীগ বলতে চাইছে, শেখ হাসিনার সাথে সরকারের চার উপদেষ্টা বৈঠক করেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু বেগম জিয়ার সাথে তারা বৈঠক করবেন কেন?

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুরুতে মনে করেছিল, এক ফুৎকারে তারা উড়িয়ে দেবে বিএনপি ও চারদলীয় জোটকে। কিন্তু যত দিন গেছে, তাদের ব্যর্থতার পাহাড় যেমন জমেছে, তেমনি তারা বুঝতে পেরেছেন যে, অত সহজে বাংলাদেশ থেকে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি শক্তিগুলোকে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এদের প্রতি যে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থন রয়েছে, তাকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়ার জো নেই। বাংলাদেশ ৯০ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত। এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে খুব একটা সুবিধা করা যাবে না। তথাকথিত সুশীলসমাজও চামড়া বাঁচাতে সরে যাচ্ছে সরকারের কাছ থেকে। আবার সুশীলসমাজের কোনো জনভিত্তিও নেই। তারা স্বঘোষিত। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে বিজয় অর্জন করেছিল, তার জন্য আওয়ামী লীগকে ইসলামের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। স্লোগান তুলতে হয়েছিল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ।' শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের ইসলামের পক্ষে দাঁড়াতে হয়েছিল। শেখ হাসিনার সব নির্বাচনী পোস্টারের ছবিগুলো ছিল ইসলামধর্মনির্ভর। এগুলোতে দেখানো হয়, হিজাব পরে জায়নামাজে বসে মোনাজাত করছেন। ফুল হাতা জামা পরে তসবিহ জপছেন কিংবা তিনি নামাজে রত।

কিন্তু বিগত এক যুগে সেখান থেকে অনেক সরে গেছে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা। তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনায় 'সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ফলে, আওয়ামী লীগও উপলব্ধি করতে পেরেছে, ওই প্রক্রিয়ায় জনগণকে আর বিভ্রান্ত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ক্ষমতায় তাদের যাওয়া চাই-ই। আর আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় যেতে না পারে, তাহলে বিএনপি'র ক্ষমতায় যাওয়া রোধ করতে হবে।

আমরা এখনো আশা করতে চাই যে, দেশে যথাসময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। বেগম খালেদা জিয়ার জামিনে মুক্তির মধ্য দিয়ে সে সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। কিন্তু নির্বাচনে চারদলীয় জোটকে মোকাবেলা করার শক্তি আওয়ামী লীগের নেই।

ফলে ক্রমশই পুরনো বৃত্তে ফিরতে শুরু করেছে আওয়ামী লীগ। আবারও আগের কায়দায় নানা দাবি-দাওয়া উত্থাপন করতে আরম্ভ করেছে। শেখ হাসিনা নাকি এখনো কারাবন্দী, তাই তার বিরুদ্ধে সব মামলা প্রত্যাহার করে তাকে মুক্ত করে দিতে হবে। বেগম খালেদা জিয়াকে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আবারো প্রমাণহীনভাবে বেগম জিয়া ও তারেক রহমানকে 'দুর্নীতিবাজ দুর্নীতিবাজ' বলতে শুরু করেছে। আবারো তেমনি ইতর ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে। এভাবে নির্বাচন যদি সত্যি সত্যিই হয়, তাহলে সে নির্বাচন বর্জনের পথ করে রাখছে দলটি। যাতে নির্বাচন বানচাল হয়, যাতে সবাই আগের মতো বলতে পারে, আওয়ামী লীগ অংশ না নিলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না।

www.pathagar.com

কিন্তু এক নদীতে কি দু'বার গোসল হবে? যে পানি নদীর স্রোতে গড়িয়ে গেছে তাকে কি ফিরিয়ে আনা যাবে? নির্বাচনে চারদলীয় জোট অংশ নাও নিতে পারে জেনে যেসব বিদেশী 'মুরব্বি' বলেছিলেন, কোন দল অংশ নিলো কী নিল না, সেটা বড় কথা নয়। নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়াই বড় কথা। আওয়ামী লীগ অংশ না নিলে তারা কি নতুন করে আবার নতুন কথা বলতে শুরু করবেন?

বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির পর এই ক'দিনের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের জন্য আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে। আওয়ামী রাজনীতির লক্ষ্য যদি জনকল্যাণ হতো, তা হলে তারা এমন আচরণ করত না। বিএনপি'র যাত্রাভঙ্গ করতে গিয়ে এক-এগারোতে আওয়ামী লীগকেও নাক কাটতে হয়। ভবিষ্যতে একই ধরনের ষড়যন্ত্রে যদি তারা লিপ্ত হয়, তবে বর্তমানের চেয়েও বেশি মাশুল তাদের গুনতে হতে পারে। আওয়ামী লীগ নেতাদের সে বোধোদয় হলে সেটা তাদের জন্যও যেমন মঙ্গল, তেমনি দেশের মানুষের জন্যও কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

১৮.০৯.২০০৮

www.pathagar.com

সিইসি সাহেব, কার হাসি কে হাসে

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা যত বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন, বাংলাদেশে আর কোনো নির্বাচন কমিশনার কোনোদিন এত বিতর্কের সৃষ্টি করেননি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদ সাংবিধানিক। এ পদের গুরুত্ব, ভাবমর্যাদা ও দায়িত্ব বিশাল। সে কারণে এ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ, মিতাচার, সতর্ক কথাবার্তা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে আসীন ব্যক্তিকে থাকতে হয় দৃঢ়ভাবে নিরপেক্ষ। কারণ তার নিরপেক্ষতার ওপরই নির্ভর করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে সব স্তরের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা।

সাধারণত নির্বাচন কমিশন থাকে সরকারেরও ঊর্ধ্বে। তার কারণ সরকার যাতে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার কোনো অপচেষ্টাই চালাতে না পারে। বাংলাদেশে যে কিম্ভূত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু আছে, কোনো রাষ্ট্রে তার কোনো নজির নেই। এমনকি আফ্রিকার ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এমন অদ্ভুত কল্পনার জন্ম হয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের জন্য এটা আত্মগ্লানিকর ও অবমাননাকর।

বাংলাদেশে নির্বাচনের জন্য অনির্বাচিত যে সরকারকে আমদানি করার সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হয়েছে, এর নাম 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। লক্ষ্য ছিল, কোনো দলের প্রতি আনুগত্য নেই এমন শিশুতুল্য লোক একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করে দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু সংশয় ছিলই। তা না হলে এ ধরনের সরকারের আমলে তো আর নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এরকম শিশুসুলভ লোক দ্বারা পরিচালিত সরকার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেননি রাজনীতিবিদরা। ফলে নির্বাচন কমিশনকে তাদের রাখতেই হয়েছে, যাতে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে না পারে। ফলে বর্তমান নির্বাচন কমিশন হওয়ার কথা 'নিরপেক্ষর ওপর নিরপেক্ষ', 'নির্দলীয়ের ওপর নির্দলীয়'।

কিন্তু হা হতোস্মি! ৯০ দিনের জন্য আসা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০ মাস ধরে ক্ষমতায় আসীন রয়ে গেছে। থাকবে আরো সাড়ে তিন মাস। আর ক্ষমতায় আসীন হয়েই 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' এমন অপমানমূলক পদ্ধতিতে পূর্বতন নির্বাচন কমিশন

www.pathagar.com

সদস্যদের পদত্যাগে বাধ্য করেছে যে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। হতে পারে, এক দিন এদের 'অপমান হতে হবে তাদের সমান'। তারপর নিজেদের পছন্দের বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে আমদানি করেছে এবারের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

প্রথম থেকেই ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তারা নির্বিচারে জোট সরকারের সাবেক মন্ত্রী, এমপি, নেতাকর্মীদেরকে ঢালাওভাবে গ্রেফতার শুরু করে। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রের শক্তি, সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে তছনছ করে ফেলে। অনভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিহীন হওয়ায় বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সব স্থিতি ধ্বংস করে ফেলে। ফলে গোটা দেশ এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত। কেবলই বিনাশ আর কেবলই পিছিয়ে পড়া। বর্তমান নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পছন্দের লোকদের নিয়ে। তারা আর তাদের 'মামু'রা। ফলে প্রথম থেকেই এই সরকার যা বলে, নির্বাচন কমিশন 'বলে তার শতগুণ'। সরকার যখন যা বলে, নির্বাচন কমিশন তখন সেই ঢাক-ই পেটাতে থাকে। সরকার বলল, 'রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার করতে হবে। দলের গণতন্ত্রায়ন করতে হবে। গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে হবে।' আর যায় কোথায়। নির্বাচন কমিশন সমস্বরে বলতে থাকল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। করতে হবে, করতে হবে। এরপর রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে কিছু সংস্কারবাজের আবির্ভাব ঘটল। বিএনপিতে সংস্কারবাজ। আওয়ামী লীগে সংস্কারবাজ। এসব সংস্কারবাজকে কোলে তুলে নিয়ে সরকার বলল, এরাই হলো খাঁটি বিএনপি, এরাই হলো খাঁটি আওয়ামী লীগ। একচক্ষু নির্বাচন কমিশন সাথে সাথে কোনোরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে থাকল, এরাই খাঁটি, এরাই খাঁটি।

কিন্তু রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই এক সময় হাঁপিয়ে ওঠা সংস্কারবাজরা আলপিনের ছোঁয়ায় একেবারে ফুটো হয়ে গেল। সরকারও মুখ ফিরিয়ে নিলো সংস্কারবাজদের ওপর থেকে। তখন নির্বাচন কমিশনও রাতারাতি কোনো সৌজন্য কিংবা দ্বিধা ছাড়াই মুখ ফিরিয়ে নিলো সংস্কারবাজদের ওপর থেকে। একবার একে বিএনপি বলে, আবার ওকে বিএনপি বলে। সরকার যাকে চায়, তাকে বিএনপি বলে স্বীকার করে। আবার সরকার যদি না চায়, তাহলে তাকে অস্বীকার করে বসে। এরপর সরকার যখন রাজনীতিবিদদের সাথে একটা সমঝোতার পথে অগ্রসর হয়, নির্বাচন কমিশন তখন বলে, সংস্কারবাজদের বিএনপি বলে স্বীকার করায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বড় ভুল হয়ে গেছে। মূলধারার বিএনপি'র সাথে কথা না বলে আমরা আর কোনো সিদ্ধান্ত নেবো না, নির্বাচন কমিশনের এমন দেউলিয়াপনার নজির বাংলাদেশের ইতিহাসে নেই।

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ছিল পূর্ববর্তী সংসদ ভেঙে যাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা। সে নির্বাচন না করায় আদালত রায়

www.pathagar.com

দিয়েছেন, 'নির্বাচন কমিশন সংবিধান লংঘন করেছে।' তারপরও নির্বাচন কবে হচ্ছে, আদৌ হয় কি না হয়, তা নিয়ে নানা সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত বিধান অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে স্থান দেয়া হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেক ওপরে। নির্বাচন কমিশন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যা কিছু চাইবে, তার সবকিছুই করতে সরকার বাধ্য। কিন্তু যে নির্বাচন কমিশন সব সময় সরকারের হুকুমে মত বদল করেছে, তাদের পক্ষে সরকারের হুকুমের বাইরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্বাচন কমিশনকে দুই পয়সাও মূল্য দেয়নি। সরকারের নির্বাহী আদেশে শেখ হাসিনার মুক্তি এবং আদালতের জামিন আদেশে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির পর রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ সৃষ্টি হয়েছে। দৃশ্যত মনে হচ্ছে, সরকার বুঝি একটি নির্বাচন করতেই চাইছে। সে নির্বাচনের তারিখ ও শিডিউল ঘোষণা করার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে কে সেই বাহবা নেবেন, তা নিয়ে রীতিমতো এক প্রতিযোগিতা চলল সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহজুড়ে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই প্রশ্নে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন, 'প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে পারেন না। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকেই এটা ঘোষণা করতে হয়। তাই করা হবে। সংলাপ শেষে কমিশন নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাকে নিয়ে বসবে। তাদের পরামর্শ অনুসারে কমিশন বৈঠকে বসে কোন তারিখে কোন নির্বাচন করা যায়– সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। এরপর প্রধান উপদেষ্টার সাথে দেখা করে তাকে সংলাপ ও নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত অবহিত করা হবে।'

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, ২২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন সব নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সে সুযোগ দেননি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। গত ২০ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে দিলেন। সে অনুযায়ী ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাচন। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, 'আমি আজ জাতিকে এই মর্মে অবহিত করতে চাই যে, নির্বাচন কমিশন আমাকে জানিয়েছে, সংসদীয় নির্বাচন এ বছরের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, উপজেলা নির্বাচন হবে দু'দফায় আগামী ডিসেম্বরের ২৪ ও ২৮ তারিখে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বিস্তারিত তফসিল যথাসময়ে ঘোষণা করবে।'

www.pathagar.com

প্রধান উপদেষ্টা যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে বসতে পারেন, এ বিষয়ে সম্ভবত ন্যূনতম ধারণাও ছিল না প্রধান নির্বাচন কমিশনারের। ফলে ২০ তারিখ অপরাহ্নে সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, দুই-এক দিনের মধ্যেই নির্বাচনী শিডিউল ঘোষণা করা হবে। কে, কখন গিয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে নির্বাচনের তারিখ জানিয়ে এলো, তা এখনো স্পষ্ট হয়নি। ২২ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়ে ওঠেনি।

নিঃসন্দেহে এই ঘটনা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের জন্য অবমাননাকর। কিন্তু এই অপমান তাকে সহ্য করতে হতো না যদি না তিনি প্রথম থেকেই নিজের আত্মমর্যাদা ও সাংবিধানিক দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হতেন। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ছিল একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নির্দেশ দেয়া। সংবিধান অনুযায়ী সে নির্দেশ পালন করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাধ্য। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মর্জি অনুযায়ী তাদের ধামা ধরে সরকারের নির্দেশ পালন করে যাওয়ায়ই আজ এমন বিপাকে পড়েছেন প্রধান নির্বাচনার ও নির্বাচন কমিশন। মোসাহেবদের পরিণতি কখনোই এর চেয়ে খুব একটা ভালো হয় না।

তবে নির্বাচন কমিশনের সামনে এখনো অনেক কাজ। রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, নির্বাচনী আসনগুলোর সীমানা পুনঃনির্ধারণ, মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে উপজেলা নির্বাচন, সর্বোপরি, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কমিশনকেই। নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনের এই তারিখ প্রকৃতই নির্ধারণ করেছে কি না, নাকি সরকার এই তারিখ তাদের ওপর চাপিয়ে দিলো, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। চাপিয়ে দিলেও বোধ করি কমিশন নিজের মেরুদণ্ডহীনতার কারণেই এখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। একেই সম্ভবত ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলে।

প্রধান উপদেষ্টার এই ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন একেবারে থমকে আছে। একেবারে চুপচাপ। গত কয়েক দিনে তারা কেউ কোনো কথা বলেননি। সংবাদপত্রের ছবিতে দেখলাম, কী এক অনুষ্ঠানে তিনজনই গালে হাত দিয়ে বিষণ্ন মনে বসে রয়েছেন।

ইতিমধ্যে সরকার রাজনীতি নিয়ে আর এক দফা খেলাধুলা শুরু করেছে বলেই মনে হয়। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান ও অন্যান্য নেতা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির পর থেকে নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনী তারিখ ঘোষণার ভাষণের পরও জিল্লুর রহমান বলেছিলেন, 'ভাষণ শুনতে ভালোই লেগেছে। তবে এতে শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে। জাতীয়

www.pathagar.com

নির্বাচনের এক সপ্তাহ পর উপজেলা নির্বাচন হলে দেশে মারামারি ও হানাহানি ঘটতে পারে।' তার আগে তিনি বলেছিলেন, সরকার পতিত শক্তির প্রতি বেশি আন্তরিকতা দেখাচ্ছে। সরকার বিএনপি, জামায়াতকে ধুয়েমুছে সাফ করার কাজ করছে এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গায়ে কাদা লাগাচ্ছে। তারও আগে তারা নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণের বিরোধিতা করেছেন। এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা ওয়াশিংটন গিয়ে গোপন বৈঠক করেছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে। সে বৈঠকে আওয়ামী লীগের সাথে সরকারের কী সমঝোতা হয়েছে সেটা কোনো পক্ষই প্রকাশ করেনি। সেই সমঝোতার ভিত্তিতে গত ২১ সেপ্টেম্বর দলের জরুরি প্রেসিডিয়াম সভা ডাকে আওয়ামী লীগ। সেই সভায় আওয়ামী লীগ হঠাৎ করেই সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সব সংস্কারের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে। সভা শেষে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, 'আমরা সরকারকে ও নির্বাচন কমিশনকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, তাদের সব সংস্কারের প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে। এখন সবকিছু আমাদের কাছে ইতিবাচক মনে হচ্ছে। তবে জরুরি অবস্থা এবং উপজেলা নির্বাচন নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধান আসবে বলে আমরা মনে করি।' তিনি নির্বাচন কমিশনের সাথে বিএনপি'র আচরণকে 'দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেন।

নির্বাচন কমিশন ও সরকার নিয়ে এটি আওয়ামী লীগের ১৮০ ডিগ্রি উল্টো পথে যাত্রা। এর অর্থ দাঁড়ায়, আওয়ামী লীগ নিবন্ধনের শর্ত মেনে নিচ্ছে। আওয়ামী লীগ গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মেনে নিচ্ছে। যে অধ্যাদেশবলে আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করতে হবে তার সব অঙ্গসংগঠন। উপজেলা নির্বাচনও দু-এক দিন হেরফেরে হয়তো তারা মেনে নেবে। জরুরি অবস্থা সম্পর্কেও তাদের নরম সুর। সরকারের মধ্যে নিশ্চয়ই বিরাট স্বস্তি।

তাহলে নির্বাচন কমিশন এবার কী করবে? সরকার যদি নির্বাচনে জিতিয়ে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের সাথে আঁতাত করে (দৃশ্যত তা হয়েছে বলেই মনে হয়), তাহলে নির্বাচন কমিশনও কি সেই আঁতাতের অংশ হিসেবে সরকারের অনুগামী হয়ে আওয়ামী লীগকে জিতিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রয়াস পাবে? নির্বাচন কমিশনের এখন হয়তো ফিরে দেখার সময় হয়েছে। এই কমিশনের তিন সদস্যের কেউই ব্যক্তিত্বহীন মানুষ বলে চিহ্নিত ছিলেন না। কিন্তু কমিশনে এসে নিজেদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে সরকারের অনুগামী হয়েছেন তারা। ফলে কমিশনের মর্যাদা এখন ভূলুণ্ঠিত। একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনের ভাবমর্যাদা পুনরুদ্ধার জরুরি।

www.pathagar.com

যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন নির্বাচন কমিশনের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। সরকার চলুক সরকারের মতো। সরকারের সাথে লড়াই করে রাজনৈতিক দলগুলো আদায় করে নিক তাদের দাবি-দাওয়া। কিন্তু নির্বাচন কমিশন থাকুক তার নিরপেক্ষ অবস্থানে। যা ন্যায্য, যা ন্যায়সঙ্গত, যা ন্যায়বিচারমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের সে পথ অবলম্বন করাই ভালো। প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশন যদি তার সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা মনে রেখে অগ্রসর হতো, তাহলে এত প্রশ্ন, এত বিতর্কের জন্ম হতো না।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অপ্রয়োজনীয় কথা বেশি বলেন। অনেক সময় সেসব কথা মশকারার পর্যায়ে চলে যায়। বিএনপি'র মূলধারা নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ওনাদের সাথে তো কোনো লোক দেখি না। ওনাদের সাথে তো কোনো নেতা, এমপি, দেখি না। কেবল দু-একজন মহিলা দেখি।' বাকি সবাইকে তিনি দেখেছিলেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়াদের দলে। পরে 'ওনাদের' সাথে সবাইকে দেখতে পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন, জরুরি অবস্থার মধ্যে নির্বাচন সম্ভব নয়। 'পরীক্ষামূলক' ১৩টি স্থানীয় সরকার নির্বাচন জরুরি অবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠানের পর তিনি 'অবাক'। এত চমৎকার নির্বাচন হয়ে গেল জরুরি অবস্থার মধ্যে! সুতরাং তিনি বললেন, সব নির্বাচন জরুরি অবস্থার মধ্যেই সম্ভব। এ দিকে আবার গত ২২ সেপ্টেম্বর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট সম্পর্কে তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, 'হায় আল্লাহ, রাহমানুর রাহিম। পবিত্র রমজানে হুজুরদের কাছ থেকে কী শুনতে পেলাম। আমি অবাক হলাম।' একটি সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত থেকে এরকম ইয়ার্কি মানায় না মোটেও। এ আচরণ দলীয় রাজনীতিকের মতো, নিরপেক্ষ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতো নয়। কমিশন সতর্ক না হলে তাদের জন্য আরো অনেক হেনস্থা অপেক্ষমান।

২৫.০৯.২০০৮

www.pathagar.com

আশরাফুল ইসলাম কি বুঝে বলেছেন?

একই সাথে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সাবেক এ দুই প্রধানমন্ত্রীর আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করছেন প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক। কারাবন্দী উভয় নেত্রীর মামলাগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে তিনি তাদের বেশির ভাগ মামলার জামিন আদায় করেছেন। এ দুই নেত্রীর কেউই আজ পর্যন্ত মামলাগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে রফিকুল হকের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলেননি। কোনো দুর্মূর্খও আজ পর্যন্ত এমন কথা বলেনি, যেহেতু তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে জামিনে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন, তাই শেখ হাসিনার মামলাগুলোর যুক্তিতর্ক এমনভাবে উপস্থাপন করছেন, যাতে শেখ হাসিনা জামিন না পান, বরং বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উভয়েই তাকে একজন নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ পেশাদার আইনজীবী হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যকার তিক্ত রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তি ও তাদের মধ্যস্থতা করার জন্য দেশে কোনো নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না অনেক দিন ধরেই। সদ্য অবসর নেয়া প্রবীণ বিচারপতি? না। সদ্য অবসর নেয়া আপিল বিভাগের বিচারপতি? না। অন্য কোনো প্রবীণ বিজ্ঞ নাগরিক? না। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে ডেকে এনেছিলাম অস্ট্রেলীয় নাগরিক স্যার নিনিয়ানকে। তার মধ্যস্থতা? তাও না। এসব ক্ষেত্রে একদল রাজনীতিক বলছিলেন, না, এরা কেউই নিরপেক্ষ হতে পারেন না। মানি না। মানব না। সে ধরনের এক ভয়াবহ ঊষর অঙ্গনে ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের মতো একজনকে পাওয়া গেল, যার ওপর দুই নেত্রীই নির্ভর করেছেন। আস্থা স্থাপন করেছেন। নিশ্চিত হয়েছেন, রফিকুল হক কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করবেন না। এটা একটা আশা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সংবাদ।

শেখ হাসিনার দলে সুপ্রিমকোর্টের বাঘা বাঘা সব আইনজীবী আছেন। তার জোটে আছেন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বার্থরক্ষার দুনিয়া কাঁপানো আইনজীবী। তারা এতটাই প্রতাপশালী যে, প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মারা, এজলাস ভাঙচুর করা প্রভৃতি অপরাধ করেও তাদের আদালতে বিচারকের সামনে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। এসব আইনজীবীর কেউ কেউ আবার বাতিল হয়ে যাওয়া ২২

www.pathagar.com

জানুয়ারির (২০০৭) নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন। তা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা যখন গ্রেফতার হলেন, তখন তার পক্ষে লড়তে এ আইনজীবীদের কারো টিকিটিরও নাগাল পাওয়া গেল না। বরং তারা কোনো না কোনোভাবে সরকার পক্ষে উকিল হিসেবে নাম লিখিয়ে সরকারের দাসানুদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সে ধরনের দুঃসময়ে ব্যারিস্টার রফিক-উল হক এগিয়ে এলেন শেখ হাসিনা ও একই সাথে বেগম খালেদা জিয়ার মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে। আর উভয় নেত্রীই তার ওপর আস্থা জ্ঞাপন করলেন।

কোনো কোনো মামলায় শেখ হাসিনার জামিন ও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির স্বার্থে নির্বাহী আদেশে সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়েছে কিছু শর্তে। এ দিকে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সরকারের দায়ের করা চারটি মামলার সব ক'টিতে জামিন লাভ করে তিনিও বেরিয়ে আসেন জেল থেকে। তাদের কারামুক্তির পর ব্যারিস্টার রফিক-উল হক দুই নেত্রীকে এক টেবিলে বসিয়ে ভবিষ্যতের রাজনীতির একটি কাঠামোগত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। বেগম খালেদা জিয়া তার এ উদ্যোগকে সমর্থন দেন। বিদেশে অবস্থানরত শেখ হাসিনাও নীতিগতভাবে তার সম্মতি জানান ব্যারিস্টার হককে।

ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের এ উদ্যোগে আশান্বিত হয় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সুবিবেচক মানুষজন। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই (ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ) প্রধান আনিসুল হকও এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং তারা মধ্যস্থতা করতেও রাজি আছেন বলে জানান। ব্যারিস্টার রফিক-উল হক বলেন, এমনকি ওই বৈঠক হতে পারে তার বাসভবনেও।

এ ধরনের প্রস্তাব করে ব্যারিস্টার রফিক-উল হক ও এফবিসিসিআই প্রধান আনিসুল হক কী পাপ করলেন বোঝা গেল না। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলে বসলেন, 'দুই নেত্রীর বৈঠকের বিষয়ে একজন আইনজীবী ও ব্যবসায়ীরাই বেশি আগ্রহী। আমি মনে করি, তাদের রাজনীতিতে নাক না গলিয়ে আইন ও ব্যবসায় থাকা উচিত।'

কথাটা চমকে ওঠার মতোই। কী সাংঘাতিক এক রাজনীতিক এই সৈয়দ আশরাফ! তিনি ধরেই নিয়েছেন, রাজনীতি শুধু রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরই বিষয়। এতে 'নাক গলানো'র অধিকার নেই অন্য কোনো পেশার মানুষের। অর্থাৎ সৈয়দ আশরাফের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, এক শ্রেণীর মানুষের পেশা হবে রাজনীতি, যার মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করবে। সৈয়দ আশরাফ অবশ্য এর কোনো ব্যাখ্যা দেননি। রাজনীতি থেকে জীবিকা আসবে কিভাবে? কর্মী-সমর্থকদের মাসিক চাঁদায় লাখ লাখ রাজনৈতিক কর্মীর পেট ভরানো যাবে? তা হলে? আশরাফুল ইসলামের মর্মে বোধ করি রয়েছে, পেশা হিসেবে রাজনীতিকে বেছে নিলে আয়ের উৎস হবে চাঁদাবাজি। অর্থাৎ সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম রাজনীতিকদের এক টানে চাঁদাবাজের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। কী ভয়াবহ চিন্তা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের! তার এ

www.pathagar.com

বক্তব্য আরো অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেগুলো আলোচনার আমরা ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের প্রতিক্রিয়ার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি।

ব্যারিস্টার হক বলেছেন, 'আশরাফুল যদি আমাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলে থাকেন, তা হলে তিনি ভুল করছেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে এ বক্তব্য দিলে তা হবে দুঃখজনক। আমি দুই নেত্রীকে এক টেবিলে আলোচনার ব্যাপারে শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেছি, আশরাফুলের সাথে নয়। তার সাথে আমার পরিচয়ও নেই। আমি তো ব্রিফলেস ব্যারিস্টার, সে জন্য রাজনীতির কথা বলার চেষ্টা করছি। রাজনীতিতে নাক গলানোর চেষ্টা করছি। দুই নেত্রীকে একই আলোচনার টেবিলে বসার যে প্রস্তাব দিয়েছি, তার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমি দেশের মানুষের মনের কথা বলেছি। আর আইনজীবীদের রাজনীতি করা উচিত। তা না হলে জাতীয় সংসদের এক-তৃতীয়াংশ আসন খালি থাকবে। কারণ আমাদের সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১০০ জন আইনজীবী সংসদ সদস্য থাকেন। শুধু বাংলাদেশে নয়, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের অনেক সভ্য দেশের সংসদে এক বড় অংশ থাকেন আইনজীবীরা।'

আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কোনো পাল্টা বক্তব্য দেননি এফবিসিসিআই নেতারা। না দিয়ে থাকলে ভালোই করেছেন। এ ধরনের স্ববিরোধী বক্তব্যের জন্য কারো ওপর রাগ না করে বোধ হয় করুণা করাই ভালো।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ডজন ডজন আইনজীবী আছেন ও থাকবেন। আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মধ্যেও আইনজীবী আছেন। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমানও একজন আইনজীবী। শেখ হাসিনার আইনজীবী হিসেবেই তিনি বিশেষ কারাগারে গিয়ে শেখ হাসিনার সাথে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করে এসেছেন। সৈয়দ আশরাফের কথা মানলে এখনই আওয়ামী লীগ থেকে বিদায় করে দিতে হয় জিল্লুর রহমান, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আবদুল মতিন খসরু, সাহারা খাতুন, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, ব্যারিস্টার রোকন উদ্দীন মাহমুদ প্রমুখ আইনজীবীকে। পারবেন সৈয়দ আশরাফুল? তেমনিভাবে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের যদি রাজনীতিতে নাক না গলাতে হয়, তাহলে আওয়ামী লীগ থেকে বের করে দিতে হবে বেক্সিমকো গ্রুপের সালমান এফ রহমানকে, যমুনা গ্রুপের নুরুল ইসলাম বাবুল, এইচআরসি'র সাবের হোসেন চৌধুরীসহ অসংখ্য ব্যবসায়ী-শিল্পোদ্যোক্তাকে। পারবেন সৈয়দ আশরাফ?

আসলে কারো সমালোচনা করতে গেলে পরিমিতিবোধের এ আকাল আওয়ামী নেতাদের কণ্ঠে অহরহই ধরা পড়ে। দর্জি যদি হৃদরোগের শল্যচিকিৎসককে সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়, তবে তাকে নাক গলানো বলা যেতে পারে। মুচি যদি মঙ্গলগ্রহগামী নভোযানের কাঠামো তৈরির পরামর্শ দেয়, তবে তাকে নাক গলানো বলা যেতে পারে। কার্যত নাক গলানো বিষয়টি অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রধানত ব্যবহার হয়।

www.pathagar.com

সৈয়দ আশরাফ উপলব্ধিই করতে পারেননি যে, রাজনীতি কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে, ব্যক্তিগত পছন্দে নির্ধারিত হতে পারে না আপনি কোন দলের সমর্থক। সে ব্যক্তি হতে পারেন যেকোনো শ্রেণী পেশার মানুষ। আবার রাজনীতির নির্বাচনে প্রার্থী হলে ভোট চাইতে যেতে হয় সব পেশার মানুষের কাছে। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষক-সাংবাদিক-চিকিৎসক, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-কবি-সাহিত্যিক, গায়ক-আইনজীবী, অভিনয় শিল্পী ও বিজ্ঞানী রাজনীতি করে আসছেন। নির্বাচিত হলে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন। কেউ তো কোনোদিন কোনো দেশে প্রশ্ন তুলেনি। এই প্রথম এক অল্প পানির তিত পুঁটির ফড়ফড়ানি শুনলাম আমরা।

রাজনীতিককে যে বিরাট পণ্ডিত হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু তার মধ্যে রাজনীতির সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য। খুব পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাচনে পাস করে এসে মন্ত্রী-এমপি হবেন এমনও সচরাচর খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সাথে যদি মেধা যুক্ত হয়, তা হলে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তবে রাজনৈতিক বিরোধিতা যেন শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সে দিকেও নজর রাখা দরকার। আর সে কারণেই সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোতে রাজনীতি পরিচালনার জন্য থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গঠন করা হয়। সেখান নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ, দক্ষ মেধাবী ব্যক্তিদের সমাহার ঘটানো হয়, যাতে রাজনীতি সঠিক খাতে প্রবাহিত থাকে।

রাজনীতির ওপর দেশের শিল্পায়ন, বিনিয়োগ, উৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধি সব কিছু নির্ভরশীল। সঠিক রাজনীতি, সঠিক সিদ্ধান্ত, মেধা-প্রজ্ঞার সমন্বয়ের মাধ্যমেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। আর রাজনীতি পেশা নয়, সেবা। আশা করি আওয়ামী লীগের বিজ্ঞ ও মেধাবী ব্যক্তিরা দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদককে এ বিষয়ে খানিক বিদ্যাবুদ্ধির জোগান দেবেন।

০৯.১০.২০০৮

www.pathagar.com

হঠাও রেনেটা লক, বাঁচাও বাংলাদেশ

বাংলাদেশে প্রায় দু'বছর পর যখন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা। গত কিছু দিনের মধ্যে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সে ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সরকার, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি অনুযায়ী সরকার ও নির্বাচন কমিশন উপজেলা নির্বাচনের আগেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য খানিকটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছে। নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য প্রার্থিতা বাছাইয়ের কাজও চলছে। সারাদেশেই ঘরোয়া রাজনীতির আওতায় সীমিত পরিসরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তৎপরতা। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই সম্ভাবনায় মানুষের মনে খানিকটা স্বস্তির ভাব আসতে শুরু করেছে।

ঠিক তখনই কতকগুলো ঘটনা আবারো নির্বাচন নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করল। প্রথমত, নির্বাচনের সময় জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের জন্য সব রাজনৈতিক দলের দাবির বিরুদ্ধে সরকারের অনড় অবস্থান। তথ্য প্রমাণের অভাবে একবার ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দেয়ার পর জবরদস্তিমূলকভাবে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির দুর্নীতি মামলা পুনঃতদন্ত করে বেগম খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রিসভার ১০ মন্ত্রীসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান, বিচারপতি শরীফ উদ্দীন চাকলাদারের বাসভবনে বোমা পেতে রাখা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশীদের নগ্ন হস্তক্ষেপ, পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলেছে।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি যে পরিস্থিতিতে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, তার কোনো কিছুই এখন বাংলাদেশে বর্তমান নেই। ফলে বহু আগেই সরকারের উচিত ছিল জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়া। কিন্তু তা না করে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা দিয়েছেন, নির্বাচনের সময়ও জরুরি অবস্থা বহাল থাকবে। সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান যুক্তি দেখাচ্ছেন, মানুষের নিরাপত্তা এবং জনগণ যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য জরুরি অবস্থা নির্বাচনের সময়ও বহাল রাখতে হবে। সরকারের এ ধরনের যুক্তি বালখিল্যতা মাত্র। কারণ ইতঃপূর্বেও তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে

www.pathagar.com

নির্বাচনে জরুরি অবস্থা বহাল রাখার কোনো প্রয়োজন হয়নি। নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আর নিরাপত্তার প্রশ্নই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সরকারকে তো বলতে হবে বিচারপতি শরীফ উদ্দীন চাকলাদারের বাসভবনে কেমন করে বোমা পেতে রাখা সম্ভব হলো? জরুরি অবস্থা বহাল আছে। তার বাসভবনে পুলিশি নিরাপত্তা আছে, তিনি কোনো আত্মীয়স্বজনের সাথেও দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। তা হলে কেমন করে ঘটল এমন ঘটনা? পুলিশ বলেছে, বোমাটি তার বাসার বাগানে বাইরে থেকে ছুঁড়ে দেয়া হয়নি। ছুঁড়ে ফেললে বিস্ফোরণ ঘটত। অর্থাৎ বোমা দু'টি সুপরিকল্পিতভাবে তার বাসভবনে কেউ রেখে এসেছে। জরুরি অবস্থার মধ্যেও এটা রেখে আসা সম্ভব হলো কেমন করে? বিচারপতি চাকলাদারের কোর্ট থেকে বহুসংখ্যক রাজনীতিক জামিন লাভ করায়ই এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক বলেছেন, বিচারপতিদের ওপর চাপ সৃষ্টি অথবা নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য বিচারপতি চাকলাদারের বাসভবনে বোমা ফেলা হয়েছে। এটা হতে পারে বিচারপতিদের ভয় দেখানোর জন্য যে, দেখো জামিন দেয়া হলে কী হতে পারে। তাছাড়া নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা থেকে এ ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে। তিনি বলেন, যেকোনো মূল্যে ১৮ ডিসেম্বরের নির্বাচন হতে হবে। এই নির্বাচন বিচার বিভাগ ও দেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন।

হ্যাঁ, দেশে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত আছে। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। সব দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নও সম্পন্ন হয়েছিল। প্রচারকাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল পুরোদমে। কিন্তু বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা নস্যাৎ করার জন্য তখন মরিয়া হয়ে ওঠে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা। সেই কাতারে ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটিনেস, ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, ভারতীয় হাইকমিশনার বীনা সিক্রি আর জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রেনেটা লক ডেসালিয়ন।

তারা সবাই ভিয়েনা কনভেনশনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এমনভাবে বক্তব্য-বিবৃতি দিতে থাকলেন যে, রাষ্ট্র যেন তারাই পরিচালনা করছেন। তারা নির্দেশ দিচ্ছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা পালন করে যাচ্ছে। এক-এগারোর ভয়াবহ বিপর্যয়ের আগে দেশে অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সারাদেশে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন সরকার। আর সাথে সাথে ওই চার কুচক্রী হায় হায় করে ওঠে, না দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি না কি তখনো তৈরি হয়নি। অর্থাৎ যে অরাজক পরিস্থিতি তাদের কুমন্ত্রণায় সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা যেন বহাল থাকে। সেটা বহাল না থাকলে তো নির্বাচন বানচাল করা যাবে না। যদি ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হয়ে

www.pathagar.com

যেত, তাতে বিরোধী দল অংশ না নিলেও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকত। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে গঠিত সরকার দীর্ঘস্থায়ী হতো না সত্য, কিন্তু তারপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নতুন নির্বাচন করতে পারত রাজনৈতিক দলগুলো। সে রকম পরিস্থিতির নজির বাংলাদেশেই ছিল। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অংশ নেয়নি কোনো বিরোধী দল।

কিন্তু সে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান। যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কয়েক মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল সবার কাছে গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ফলে দেশে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা পেয়েছিল।

সে অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেই দেশী-বিদেশী কুচক্রীরা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা নস্যাতের জন্য সব রকম উসকানি অব্যাহত রাখে। ড. ইয়াজউদ্দিনের দুর্বল ও মেরুদণ্ড হীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার্যত এই কুচক্রীদের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে একটি দুর্বল গণভিত্তিহীন জবাবদিহিতাহীন সরকার প্রতিষ্ঠা; যারা তাদের কথামতো তাদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গত ২০ মাস ধরে বাংলাদেশে আমরা সে পরিস্থিতিই দেখেছি। বিদেশী রাষ্ট্রের পরামর্শ, বিশ্বব্যাংক আর আইএমএফ'র পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমান সরকার একের পর এক দেশের স্বার্থবিরোধী, গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে দেশের স্বার্থ হয়েছে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন।

আবারও যখন দেশে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অমনি ওইসব বিদেশী কূটনীতিক দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাতে শুরু করেছেন; যাতে জনপ্রতিনিধিত্বশীল কোনো সরকার ক্ষমতাসীন হতে না পারে। আর সে কারণে কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে আবারো এক-এগারোর আগের মতো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছেন তারা।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি বাংলাদেশে এসে প্রথমে বলেছিলেন, জরুরি অবস্থা জারি রেখে কেমন করে নির্বাচন করা যাবে, তিনি বুঝতে পারছেন না। তারপর বললেন, নির্বাচনে কোনো দল অংশ নিলো বা না নিলো, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে নির্বাচন 'সঠিকভাবে' অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না। তাই যদি হয়, তাহলে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে তারা তখন এমন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন কেন? কেন বলেছিলেন, সব দলের অংশগ্রহণ না থাকলে সে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। তা হলে তো ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হতে দেয়া উচিত ছিল। দেখা উচিত ছিল যে, নির্বাচন সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না।

এখন সব রাজনৈতিক দল জরুরি অবস্থার অবসান চাইছে। সব দলই বলছে, নির্বাচনের আগে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সুর খানিকটা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করেছেন, জরুরি অবস্থার মধ্যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে না।

www.pathagar.com

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এই বক্তব্যে মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং জাতিসঙ্ঘ কর্মকর্তাদের বক্তব্য থেকে। ইইউ প্রতিনিধি দল ঢাকা এসে বলেছিল, জরুরি অবস্থার মধ্যে নির্বাচন হলে সে নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না। সাধারণত তারা তা পাঠান না। পরে ব্রাসেলসে গিয়ে তারা জানিয়ে দিয়েছেন, জরুরি অবস্থার মধ্যে নির্বাচন হলেও তাতে তারা পর্যবেক্ষক পাঠাবেন। একইভাবে পর্যবেক্ষক পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে জাতিসঙ্ঘও। কিন্তু ২২ জানুয়ারির নির্বাচন আওয়ামী লীগ বর্জনের ঘোষণা দিলে আমেরিকার তল্পিবাহক এই জাতিসঙ্ঘই নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। অর্থাৎ মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রয়োজনে ভালো ভালো কথা বলে যাবেন, আসল কাজ করে যাবেন তাদের তল্পিবাহকরা।

বাংলাদেশে জাতিসঙ্ঘ মিশনের আবাসিক সমন্বয়ক ও ঢাকায় ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি রেনেটা লক ডেসালিয়ন বলেছেন, জরুরি অবস্থার মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। তার প্রমাণ হিসেবে তিনি একদলীয় ১৩টি সিটি ও পৌরসভা নির্বাচনের উদাহরণ দিয়েছেন। বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল যখন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে জরুরি অবস্থার প্রত্যাহার দাবি করছে, তখন রেনেটা লকের এই বক্তব্য ভিয়েনা কনভেনশনের লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ। রেনেটার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের দাবিতে যদি বড় রাজনৈতিক দল/দলগুলো নির্বাচনে অংশ নাও নেয় তাহলেও সে নির্বাচনকে বৈধতা দেয়ার জন্য পর্যবেক্ষক পাঠাবে বাংলাদেশে।

১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশন জাতিসঙ্ঘেরই তৈরি। তাতে স্পষ্ট বলা আছে, কূটনীতিকদের দায়িত্ব হচ্ছে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। জাতিসঙ্ঘের ওয়েবসাইটে সদস্য দেশগুলোতে জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়কের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বলা আছে, 'জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়ক জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি। প্রতিটি সদস্য দেশে জাতিসঙ্ঘের যে সব অঙ্গ সংস্থা কাজ করে তিনি তাদের প্রধান। আবাসিক সমন্বয়কের মূল দায়িত্ব হল, জাতিসঙ্ঘের পক্ষে এর অঙ্গ সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করা। রেনেটা লক তার ওপর জাতিসঙ্ঘ অর্পিত দায়িত্ব কতটুকু পালন করছেন বলতে পারি, কিন্তু শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে এক-এগারোর বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসঙ্ঘের এই আবাসিক সমন্বয়কারী রেনেটা লক ডেসালিয়ন নজিরবিহীন জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। এক-এগারোর আগে বাংলাদেশের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব বান কি মুন ১০ জানুয়ারি ২০০৭-এ এক বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিতে তিনি বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল প্রত্যাহারসহ নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সমঝোতার ভিত্তিতে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু পর দিন ১১ জানুয়ারি জাতিসঙ্ঘের এই সমন্বয়ক রেনেটা লক ডেসালিয়ান জাতিসঙ্ঘের

www.pathagar.com

পক্ষে এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, সব দল অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচন বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবের বক্তব্যের সাথে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিও একটি হুঁশিয়ারি যুক্ত করে দেন। তাতে বোঝানো হয়, যদি সেনাবাহিনী পরাশক্তির কাছে অগ্রহণযোগ্য ও অবৈধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা দেয়, তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জাতিসঙ্ঘ মিশনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। রেনেটা লকের এমন একটি জালিয়াতির ফলে সেনাবাহিনীতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় সেনাবাহিনীর সমর্থিত ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার।

বাংলাদেশে আবারো একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে আবারো তৎপর হয়ে উঠেছেন রেনেটা লক। আমরা বলতে চাই, শুধু রেনেটা লকই নন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে কূটনীতিকদের মন্তব্য-বিবৃতি প্রতিহত করতে হবে। কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও ভিয়েনা কনভেনশন সবাইকে মেনে চলতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও বুঝতে হবে, হস্তক্ষেপকারী কূটনীতিক কোনো বন্ধু নন, বন্ধু শেষ পর্যন্ত জনগণই।

তাই জাতিসঙ্ঘের কাছে আমাদের দাবি, অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে রেনেটা লককে প্রত্যাহার করে নেয়া হোক। আর রাজনীতিকদের সবার কাছে আবেদন, দেশ ও জনগণের স্বার্থে ১৮ ডিসেম্বরের নির্বাচন বানচালের সব ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবেই নস্যাৎ করে দিন। এ দেশ আমাদের, বিদেশী কূটনীতিক বা জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধির নয়।

১৫.১০.২০০৮

www.pathagar.com

‘চার দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস’

সরকার ঘোষিত সময়সীমা অনুযায়ী আগামী ১৮ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে সংশয়ের এখনো অবসান হচ্ছে না। সরকারের উপদেষ্টারা এমনভাবে কথা বলছেন, তাতে নির্বাচন নিয়ে রহস্য কেবলই বাড়ছে। দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে প্রধান অন্তরায় জরুরি অবস্থা বহাল রাখা। দেশের সব রাজনৈতিক দল দাবি করছে, নির্বাচনের আগে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কিন্তু জরুরি অবস্থা বহাল রাখার ব্যাপারে সরকারের অবস্থান অনড়। এই ব্যাপারে সরকার প্রকাশ্যে যে যুক্তি দেখাচ্ছে, তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। সরকার বলছে, নির্বাচনের সময় ভোটারদের নিরাপত্তা বিধান ও ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে, সে জন্য জরুরি অবস্থা বহাল রাখা দরকার। জরুরি অবস্থা বহাল রাখার ব্যাপারে সরকারের এ যুক্তি হাস্যকর। কারণ এর আগেও তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে নির্বাচন হয়েছে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। দেশে-বিদেশে তা প্রশংসিতও হয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ওই তিনটি নির্বাচনের সময় দেশে জরুরি অবস্থার কোনো প্রয়োজন হয়নি। মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পেরেছে।

সুতরাং জরুরি অবস্থা বহাল রাখার ক্ষেত্রে সরকারের যুক্তি ধোপে টেকে না। তা হলে এর পেছনে দু’টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, জরুরি অবস্থা বহাল রেখে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর কিছু কিছু নেতাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে চায়। নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি নিম্ন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হলে, তিনি যদি উচ্চ আদালতে আপিল করেন, তবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। কিন্তু জরুরি আইনে নিম্ন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উচ্চ আদালতে আপিল করলেও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। তা ছাড়া জরুরি বিধিতে সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে, জরুরি অবস্থা তুলে নিলে তার অনেক কিছুই অকার্যকর হয়ে পড়বে। সেটাও সরকারের ভয়।

www.pathagar.com

কিন্তু কিছু লোককে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে সরকারের কী দায়? কেন তাদের নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে হবে? এর কারণ সম্ভবত এই যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিনাপ্রমাণে কিছু রাজনীতিককে দুর্নীতিবাজ, মহাদুর্নীতিবাজ বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু এসব অভিযোগের কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ফলে মুখ রাখার জন্য হলেও কিছু লোককে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে হবে কিংবা সরকার তাদের অপছন্দের কিছু লোককে নির্বাচিত হতে দিতে চায় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ হলে তাদের এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিতে হতো না।

দ্বিতীয়ত, আমরা বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে, গত বছরের ১১ জানুয়ারির যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে দেশী-বিদেশী কুচক্রী মহলের চক্রান্ত। এক-এগারোর আগে বিদেশী কূটনীতিকদের অপতৎপরতা আমরা লক্ষ করেছি। তারা সব কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণভার কার্যত নিজেদের হাতে তুলে নেন এবং তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নানা ধরনের নির্দেশনা দিতে শুরু করেন। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোও অনেকাংশে বিদেশী কূটনীতিকনির্ভর হয়ে পড়েছিল। তাদের মদদ ও কুপরামর্শে দেশের রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে এক-এগারোর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক-এগারোর সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদেশীদের উদ্দেশ্য মুসলমানপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা প্রতিহত এবং বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদ, গ্যাস, কয়লা, তেলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অনির্বাচিত, জনপ্রতিনিধিত্বহীন, জবাবদিহিতাহীন সরকারের মাধ্যমে যেভাবে স্বার্থ হাসিল করা যায়, নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে তা আদায় করা যায় না। এখন মনে হচ্ছে, ১৮ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে তেমনই একটি 'নির্বাচিত' সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা।

এখানে আলামতগুলো বিশ্লেষণ করা যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে, আগামীতেও অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটই ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু তারা ক্ষমতায় এলে তো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতলব হাসিল হয় না। সুতরাং এমন একটা কৌশল নিতে হবে যাতে বিএনপি-জামায়াতসহ চারদলীয় জোট অনেক কম আসনে জয়ী হয়। আর যারা জয়ী হবেন, তারাও যেন সরকারের তল্পি বহন করতে রাজি হন।

পত্রপত্রিকার রিপোর্টে বোঝা গেছে, সরকার সেই মতলব থেকে বিএনপি'র হাতে ১০৯ আর আওয়ামী লীগের হাতে ৪২ জনের একটি নেগেটিভ তালিকা ধরিয়ে দিয়েছে। আগামী নির্বাচনে বিএনপি ওই ১০৯ জনকে এবং আওয়ামী লীগ ওই ৪২ জনকে নির্বাচনে প্রার্থী করতে পারবে না। একই সাথে সরকার এ দু'টি দলের হাতে একটি

www.pathagar.com

পজিটিভ তালিকাও তুলে দিয়েছে, আগামী নির্বাচনে যাদের মনোনয়ন দিতে হবে। তা ছাড়া 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' চাইছে, বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ১৮ ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশ না নিক। এর কারণ কী? কারণ হলো, সরকার ১৮ ডিসেম্বরের নির্বাচনে চায় তাদের ইচ্ছার সংসদ যারা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব অপকর্মকে জাতীয় সংসদে বৈধতা দেবে। এদের প্রস্থানের পথ নিশ্চিত করে তারপর আবার নির্বাচন হবে। সে নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা নির্বাচন করে প্রকৃত সরকার গঠন করবেন। কী দারুণ প্রস্তাব!

সরকার বলেনি যে, তারা রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে এমন কোনো 'নেগেটিভ' ও 'পজিটিভ' প্রস্তাব তুলে দেয়নি। তাতে বিশ্বাস করতেই হবে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন অপকর্মটি করেছে। ফলে এটা এখন খুব স্পষ্ট যে, আগামী সংসদ নির্বাচনের (যদি অনুষ্ঠিত হয়) মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

এক দিকে সরকারের নেগেটিভ-পজিটিভ লিস্ট, তার ওপর দুই নেত্রীকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা, সেই সাথে জরুরি অবস্থা বহাল রাখার কোশেশ– সব মিলিয়ে নির্বাচনী পরিবেশ ঘোলাটেই হচ্ছে।

তার ওপর, এই সরকারের পরামর্শদাতা বিদেশীদের নানা ধরনের তৎপরতা নির্বাচন অনিশ্চিত করেই রাখছে। রাজনৈতিক দলগুলো যখন জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, তখন সুর বদলে ফেলছেন এই সরকারের বল-ভরসা বিদেশীরা। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি ঢাকায় এসে প্রথমে বলেছিলেন, জরুরি অবস্থার মধ্যে কিভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব, তা তিনি বুঝতে পারেন না। তারপর আস্তে আস্তে তিনি কথার পরিবর্তন করছেন। একবার নয়, বারবার পরিবর্তন করেছেন। পরে তিনি একবার বলেছেন, নির্বাচনের সময় জরুরি অবস্থা শিথিল করা যেতে পারে। সর্বশেষ গত ২২ অক্টোবর তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর যে সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিয়েছে, জরুরি অবস্থা বহাল থাকলেও সে সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রও এখন চাইছে, নির্বাচনের সময়ও জরুরি অবস্থা বহাল থাকুক। যুক্তরাষ্ট্রের ১২০ জনের পর্যবেক্ষক দলের প্রথম টিমটি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা এসে পৌঁছবে।

একইভাবে সুর বদল করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তাদের প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসে প্রথমে বলেছিল, ইইউ সাধারণত জরুরি অবস্থার মধ্যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাতে পর্যবেক্ষক পাঠায় না। তখন বাংলাদেশের সুদর্শন উপদেষ্টা বলেছিলেন, তারা বাংলাদেশের 'বিশেষ পরিস্থিতি' ইইউকে বোঝাবেন এবং নিশ্চয়ই তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে রাজি হবেন। এখন তারাও রাজি। জরুরি অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের নির্বাচনে তারা পর্যবেক্ষক পাঠাবেন। অর্থাৎ 'ইলেকশন বাই সিলেকশন' হলেও তারা সে নির্বাচনকে বৈধতা দিতে রাজি আছেন। কিংবা তারা বাংলাদেশে তেমন নির্বাচনই চাইছেন।

www.pathagar.com

এ দিকে জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিজ রেনেটা লক ডেসালিয়ন তো সব শিষ্টাচার ভঙ্গ করে বলেছেন, জরুরি অবস্থার মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি ৩ আগস্টের ১৩টি সিটি ও পৌরসভার একদলীয় নির্বাচনের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ওই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। অর্থাৎ জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধি বাংলাদেশের জনগণের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে জরুরি অবস্থার মধ্যেই নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করে যাচ্ছেন।

এর মধ্যে দুই দিনের এক ঝটিকা সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন যুক্তরাজ্যের এশিয়া, আফ্রিকা ও জাতিসঙ্ঘবিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লর্ড মার্ক মালোচ ব্রাউন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জরুরি অবস্থাবিহীন মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচন দেশে-বিদেশে অধিকতর বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। তবে দুর্নীতির দায়ে জরুরি আইনে অভিযুক্তদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত নয়। অভিযুক্তরা উচ্চ আদালত থেকে দায়মুক্ত হয়ে এলে সমস্যা নেই। তাই জরুরি অবস্থা রাখার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থান যুক্তিযুক্ত।

বসে থাকেননি ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী। তিনিও সুর মিলিয়ে বলেছেন, জরুরি অবস্থা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়।

সরকারও চাইছে জরুরি অবস্থার মধ্যে নির্বাচন হোক। আর সরকারের বল-ভরসা বিদেশীরাও বলছে, জরুরি অবস্থার মধ্যেই নির্বাচন হোক। ব্রিটিশমন্ত্রী আর এক কাঠি সরেস। তিনি বলেছেন, নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো যেন সরকারকে সহযোগিতা করে। তার অর্থ যা যা বলে, যেভাবে করতে বলে, সেভাবেই যেন সব কিছু করে রাজনৈতিক দলগুলো। মানে সরকারের কোনো পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে পারবে না তারা। সরকারের অনুগত থাকবে রাজনৈতিক দলগুলো। জরুরি অবস্থা জারি থাকুক, নেতাকর্মীরা বন্দী থাকুক, তাদের নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা হোক, তবু তারা যেন সরকারকে সহযোগিতা করেন।

তিনি আরো বলেছেন, জরুরি আইনে অভিযুক্তদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত নয়। ব্রিটেন নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গণতন্ত্রের দেশ। সেই দেশের মন্ত্রী বলছেন, জরুরি আইনে অভিযুক্তদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া যাবে না। ব্রিটেনে প্রকাশ্যে এ ধরনের কথা বললে এই ব্রিটিশমন্ত্রী নিশ্চয়ই পচা ডিমের ঢিল খেতেন। অথচ বাংলাদেশে তিনি অবলীলায় এমন বেআইনি কথা বলতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

এখন পরিস্থিতি তা হলে কী দাঁড়াল? সরকার ও তাদের বিদেশী পরামর্শদাতারা চাইছে জরুরি অবস্থার মধ্যেই নির্বাচন হোক; যে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ও তাদের বিদেশী মদদদাতাদের পছন্দের লোকদের নির্বাচিত করে আনা সম্ভব হবে। অনির্বাচিত সরকারের সাথে চুক্তি করলে তা পরে নির্বাচিত সরকার বাতিল করতে পারবে। তাই এমন একটি সরকার চাই, যাদের একটি নির্বাচিত চেহারা থাকবে, কিন্তু তারা হবে সাম্রাজ্যবাদীদের 'হুকুম বরদার' আর একটি ড. ফখরুদ্দীন সরকার।

রাজনৈতিক দলগুলোকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের মিষ্টি কথা, সরকারের উপদেষ্টাদের হেঁয়ালিপূর্ণ বক্তব্যে রাজনৈতিক দলগুলো যদি বিভ্রান্ত হয়, তা হলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। সেই সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর ভবিষ্যৎ হয়ে পড়বে অন্ধকার। দলগুলোকে মনে রাখতে হবে, দলের চেয়েও দেশ বড়। সেই দেশই আজ বিপন্ন। তাই একযোগে অভিন্ন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সরকারকে বাধ্য করতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে। সেটাই এই মুহূর্তে জরুরি ও প্রধান কাজ।

২৯.১০.২০০৮

www.pathagar.com

সিইসি সাহেবের ময়লা যাচ্ছে না

ভেবেছিলাম, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হয়তো ভালো হয়ে যাবেন কিংবা ভালো হয়ে গেছেন এবং ১৮ ডিসেম্বরের সম্ভাব্য নির্বাচনের আগে সম্ভবত তার সম্পর্কে আর কিছু লিখতে হবে না। কিন্তু না, পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবাদে পড়েছিলাম 'কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না।' প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা এমন এক ময়লা যে, শত ধোয়ায়ও তার কলঙ্ক-কালিমা পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলো কী বুঝতে পারছে, জানি না। আমরা যারা সাধারণ পাবলিক তাদের কাছে একথা আর অস্পষ্ট নেই যে, এরকম একচোখা সিইসি'র অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন একেবারেই অসম্ভব।

আগেও লিখেছি, আমি দুই টাকার বাস কিংবা কাউন্টার সার্ভিসের বাসে চলাফেরা করি। এসব বাসে যারা যাতায়াত করেন তারা আমার মতোই অতি সাধারণ পাবলিক। খেটে খাওয়া মানুষ। তারা কথা বলতে সতর্কতা অবলম্বন করেন না। তারা সিইসি ড. হুদাকে ছি: ছি: বলে সম্বোধন করেন। প্রথম থেকে তিনি যেসব কথা বলে আসছেন তাতে এমন একটি সাংবিধানিক পদ ছেড়ে, আত্মমর্যাদাশীল মানুষ ছেড়ে বহু আগেই তার বিদায় নেয়া উচিত ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এক কবিতায় লিখেছেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' সিইসি সাহেব পতাকা পেয়েছেন বটে কিন্তু সম্ভবত মহান আল্লাহতায়ালা তাকে সেটা বহন করার শক্তি দেননি।

দায়িত্ব গ্রহণের একেবারে শুরু থেকে তিনি যেসব কথা বলে আসছেন তার কোনোটাই যৌক্তিক ও নিরপেক্ষ নয়। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, চাকরির মেয়াদ শেষে এই ছি: ছি: সাহেব বড় একটি সরকারি পদে যোগদানের জন্য জোট সরকারের আমলে বর্তমানে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত এক রাজনীতিকের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তদবিরে গিয়েছিলেন। সে তদবির সফল না হওয়ায় বিএনপি ও জোট সরকার এবং জোটের শরিকদের প্রতি তার ক্ষোভের অন্ত নেই। ফলে তিনি চান্স পেলেই বিএনপি ও তার শরিকদের প্রতি গালমন্দ করার সুযোগ হাতছাড়া করেননা। আওয়ামী লীগ তাকে কী দিয়েছে জানি না। কিন্তু তার আওয়ামীপ্রীতি নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে এক নিকৃষ্ট নজিরে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন যখন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুরু করল তখন সিইসি সাহেব বিএনপি বলে কাউকে চিনতেই পারছিলেন না। বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে দলের মহাসচিব ও প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করেন। এরপর সরকার খালেদা জিয়াকে দুর্নীতির অভিযোগ এনে মামলা দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করে। অন্তরীণ হওয়ার আগে বেগম খালেদা জিয়া মান্নান ভূঁইয়ার স্থলে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে মহাসচিব নিয়োগ দেন। কিন্তু 'ছিঃ ছিঃ সাহেব' সে নিয়োগকে অবৈধ ঘোষণা করেন। কী তার ভাষা! কী তার সিদ্ধান্ত! তিনি বললেন, 'এটা ভারি অন্যায় কাজ। মান্নান ভূঁইয়া এত দিন দলের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করলেন। অথচ কলমের এক খোঁচায় তাকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে, এটা হতে পারে না। এ মনোভাব স্বৈরাচারী।' অতএব তার দৃষ্টিতে মান্নান ভূঁইয়াই বিএনপি'র মহাসচিব। খোন্দকার দেলোয়ার নন। যেন তিনিই বিএনপি'র চেয়ারপারসনের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। ফলে তিনি সংলাপের জন্য খোন্দকার দেলোয়ারের বদলে মান্নান ভূঁইয়াকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন।

কেন মান্নান ভূঁইয়াকে আমন্ত্রণ জানালেন? তাকে জানানো হলো, বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী খোন্দকার দেলোয়ারই দলের মহাসচিব। তাহলে মান্নান ভূঁইয়া কেন? সিইসি তখন বললেন, মান্নান ভূঁইয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'র কারণে। মান্নান ভূঁইয়াকে তার বড় প্রয়োজন ছিল। যে বিএনপি তাকে চাকরি দেয়নি, সে বিএনপি'র অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। সম্ভবত এটাই ছিল তার 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'। কিংবা তাকে অন্য কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল, খোন্দকার দেলোয়ারকে নয়, বিএনপি'র প্রতিনিধি হিসেবে মান্নান ভূঁইয়াকেই তাদের বেশি প্রয়োজন। সুতরাং 'জো হুকুম'। সিইসি সাহেবের কাছে মান্নান ভূঁইয়া চিরজীবী হোক।

কিন্তু এই সিইসিকে তো শেষ পর্যন্ত তার থু থু চাটতে হয়েছে। বলতে হয়েছে, মান্নান ভূঁইয়াকে বিএনপি'র প্রতিনিধি হিসেবে ডাকা ছিল তার চরম ভুল এবং সে জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। লজ্জা থাকলে এবং সংবিধান ও শপথ বাক্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা থাকলে উচিত ছিল তখনি তার বিদায় নেয়া। কোনো ভদ্রলোক এমন আচরণ করতে পারেন বলে কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল চিকিৎসা শেষে ঢাকায় ফিরে এসে ঘোষণা দিলেন, তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান বললেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। আবদুল জলিলই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে শেখ হাসিনা বললেন, 'যাও বাচ্চা শো রাহো।' অর্থাৎ আবদুল জলিল নন, অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামই সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। এরপর সিইসি আবদুল জলিলের জন্য কোনো মায়াকান্না করেননি, যেমনটি করেছিলেন মান্নান ভূঁইয়ার জন্য। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্ত শিরোধার্য হলেও

www.pathagar.com

বিএনপি চেয়ারপারসনের সিদ্ধান্ত তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ এক দারুণ প্রধান নির্বাচন কমিশনার!

এটা সিইসি সাহেবের সূচনা মাত্র। আওয়ামী লীগ যখন সংলাপের জন্য নির্বাচন কমিশনে এলো, তখন সে কী বিগলিত দশা! সূচনা ভাষণে তিনি বললেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। দেশ স্বাধীন করেছে। ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগকেই তিনি ক্ষমতায় দেখতে চান। কারণ তিনি যে, সিইসি'র মতো বিশাল পদে আসীন হয়েছেন, সেও আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠা আন্দোলনের কারণেই। বেহায়াপনার একটা সীমা আছে। সিইসি সে সীমানা ইতোমধ্যেই লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু তিনি টের পাচ্ছেন না যে, সীমানা লঙ্ঘনকারীকে কেউ পছন্দ করে না। তিনি সম্প্রতি জেলা প্রশাসকদের এক সম্মেলনে আবারো যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেছে। জেলা প্রশাসকরা নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রিটার্নিং অফিসারই তার এলাকার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

রিটার্নিং অফিসার, ডিসিদের তিনি যেসব নসিহত করেছেন, তাতে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কী চান? তিনি বলেছেন, '২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মতো কোনো নির্বাচন তিনি দেখতে চান না। বিগত সময়ে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি। সুতরাং তিনি ১৯৭০ সালের মতো একটি নির্বাচন করতে চান। এটিও এক অতি নিকৃষ্ট দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ।

সিইসি সাহেবের মতে, ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠু হয়নি। অথচ দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সবাই একযোগে স্বীকার করছেন, বাংলাদেশে এই তিনটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তাই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলোও খুব একটা শোর তুলতে পারেনি। সবাই নির্বাচনের ফল মেনে নিয়েছেন।

জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচন নিয়ে বিশেষভাবে কিছু বলেননি প্রধান নির্বাচন কশিমনার। তার যত রাগ ২০০১ সালের নির্বাচনের ওপর জেলা প্রশাসকদের তিনি বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডিসিরা সব রকম প্রভাব থেকে বিরত থাকবেন। তবে তারা নির্বাচন কমিশনের উপদেশ, সঙ্কেত ও আদেশ মেনে চলবেন। তিনি বলেন, ২০০১ সালের নির্বাচনে কে কি করেছে, সে বিষয়ে তার কাছে তথ্য আছে এবং কারো আর সে ধরনের কাজ করা উচিত হবে না।

২০০১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের মনোনীত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদের অধীনে। তিনিও ছিলেন এ টি এম শামসুল হুদার মতোই একজন সাবেক আমলা। ২০০১ সালের নির্বাচনও অবাধ ও সুষ্ঠু বলে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছিল। নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওই নির্বাচন মেনে নিয়ে শুধু এতে 'সূক্ষ্ম' কারচুপি হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছিলেন।

www.pathagar.com

ওই পর্যন্তই। এর আগে কোনো সিইসি তার পূর্ববর্তী কোনো সিইসি'র নির্বাচনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অন্যায় মন্তব্য করেননি। তাহলে ড. হুদার এমন গাত্রদাহ কেন সৃষ্টি হলো?

এর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করলেই সিইসি'র নির্লজ্জ আওয়ামীপ্রীতি মুখ ব্যাদান করে বেরিয়ে আসবে। কী হয়েছিল ২০০১ সালের নির্বাচনে? ওই নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। সিইসি খুব স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন, তিনি ২০০৮ সালে তেমন নির্বাচন আর দেখতে চান না, যে নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তাহলে তিনি এমন নির্বাচন দেখতে চান, যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের মতো সব আসনে জয়ী হতে পারে।

সিইসি সাহেব ডিসিদের বলেছেন, তাদের 'নির্দেশ ও সঙ্কেত' গ্রহণ করতে হবে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে। তিনি কী নির্দেশ দেবেন? আশঙ্কা হয়, তিনি হয়তো বলবেন, 'অমুক দলের অমুক প্রার্থীকে জিতিয়ে দাও। আর অমুক দলের অমুককে শিজিল করে দাও। ডিসিদের সে ক্ষমতা থাকবে। অতএব সব ফাঁক-ফোকড় বন্ধ করেই আওয়ামী লীগকে জিতিয়ে আনা হবে।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে বিতর্কিত গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশবলে একটি তালিকা তৈরি করেছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশন আগামী নির্বাচনে যাদের অংশ নিতে দিতে চায় না, তাদের নাম আছে এতে। নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসকদের ক্ষমতা দিয়েছে ওই তালিকাভুক্তদের মনোনয়নপত্র বাতিল করার। তাছাড়া, জেলা প্রশাসকরা নির্বাচন চলাকালে নির্বাচনী বিধিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগে যেকোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করতে পারবেন। পরে এ অভিযোগ প্রমাণিত নাও হতে পারে। শত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পরও যদি দেখা যায়, চারদলীয় জোটের কোনো প্রার্থী নির্বাচনে জিতেই যাচ্ছেন, তবে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে তাকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দেয়া যাবে। কী চমৎকার সব পরিকল্পনা।

১৯৯১ নয়, ১৯৯৬ নয়, ২০০১ নয়, ১৯৭০ সালের মতো নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। সিইসি ড. হুদা সে সময় দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন না। ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের অধীনে। সে আদলে নির্বাচন করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের সময় জরুরি অবস্থা বহাল রাখার জন্য ওকালতি করে যাচ্ছেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সব মানুষ স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের জন্য একাট্টা ছিল। সে লক্ষ্যেই তারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছিল। সে নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে ভোট কেন্দ্রে যেতে হয়নি। সে জন্য প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারই যথেষ্ট ছিলেন। কেউ সে নির্বাচনের

www.pathagar.com

ফলাফলের প্রতিবাদ করেনি। কারণ এ দেশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল, দাবি আদায়ে তারা ঐক্যবদ্ধ। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে।

সিইসি সাহেব ১৯৭০ সালের মতো নির্বাচন করে আওয়ামী লীগকে সব আসনে জয়ী ঘোষণা করতে চাইছেন। ১৯৭০ সালের মতো নির্বাচন করা, শতাধিক রাজনীতিককে নির্বাচন থেকে বিরত রাখা, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশবলে রাজনীতিকদের নির্বাচন করতে না দেয়া, প্রার্থিতা বাতিলে ডিসিদের ক্ষমতা দেয়া এবং কমিশনের আদেশ, নির্দেশ, ইঙ্গিত মেনে চলার কথা বলা– সবকিছু মিলিয়ে এটা এখন স্পষ্ট হয়েছে, তিনি আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী করতে চাইছেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সিইসিসহ নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের পদত্যাগ দাবি করেছেন। কারণ এই কমিশন দিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব। তা ছাড়া কমিশন প্রশাসনও সাজিয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থক আমলাদের দিয়ে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা যায় না।

গত ২০ মাসে সিইসিসহ নির্বাচন কমিশনারদেরও কেউই নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে পারেননি। তাদের কার্যক্রম একদেশদর্শী, পক্ষপাতমূলক এবং বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের প্রতি বিদ্বিষ্ট। নির্বাচন নিয়ে কমিশন ও সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক কথাবার্তা বলা হলেও নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি। নির্বাচন কমিশনই যেহেতু এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাদের পদত্যাগ করেই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ করা সম্ভব। তা না হলে এই কমিশনকে চরম অবমাননার পথে বিদায় নিতে হতে পারে।

০৬.১১.২০০৮

www.pathagar.com

গোপনে যে কত খাত ধ্বংস হয়ে গেছে!

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২১ মাসে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খাতের যে অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে, আগামী ২১ বছরেও সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যাবে কি না, সন্দেহ আছে। দুর্নীতি দমনের নামে সরকারের অপরিণামদর্শী ও কাণ্ডজ্ঞানহীন পদক্ষেপের ফলে বিনিয়োগ কমেছে। রুদ্ধ হয়ে গেছে কর্মসংস্থানের পথ। তার ওপর, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নামে শত বছরের পুরনো হাটবাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিয়ে তারা রাষ্ট্রের যেমন শত শত কোটি টাকার লোকসান করেছে, তেমনি বেকার করে দিয়েছে লাখ লাখ মানুষকে। ফলে এই ২১ মাসে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে কয়েক কোটি মানুষ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া। এ ক্ষেত্রে দায়হীন দায়িত্বহীন সরকার নীরব দর্শক মাত্র।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এসব পদক্ষেপের ফলে কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ। বাজার সয়লাব বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় পণ্যে। এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে আমাদের সবচেয়ে বড় রফতানি খাত গার্মেন্টসে। ভালো ভালো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ বন্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। গার্মেন্টস শিল্পের মালিকরাও বারবার অভিযোগ করেছেন, সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কারণে এই শিল্পে হামলা অব্যাহত থাকতে পেরেছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব শিল্পের মালিকরা গোলযোগের আশঙ্কায় পুলিশ ডেকেছেন। অথচ ডজন ডজন পুলিশ-র‍্যাবের সামনে গুটিকয় হামলাকারী গার্মেন্টসে অগ্নিসংযোগ করে চলে গেছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেসব দৃশ্য দেখেছে। তাহলে কি সরকার চেয়েছে, ধ্বংস হয়ে যাক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই বিশাল খাত!'

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আর একটি বড় খাত জনশক্তি রফতানি। এই সরকারের ২১ মাসে ওই খাতেও বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের ৮০ শতাংশই কাজ করেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয়। আর জনশক্তি রফতানি ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মরত বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালায় ভারতীয় প্রচারমাধ্যমগুলো। খুন-ধর্ষণ-ডাকাতি প্রভৃতি ঘটনার জন্য তারা বাংলাদেশী শ্রমিকদের দায়ী করে সমন্বিত

www.pathagar.com

অপপ্রচার চালাতে শুরু করে দেয়। এ ক্ষেত্রে ওসব দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো কার্যকর কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেনি। ফলে অপ্রমাণিত অভিযোগে ওসব দেশ থেকে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশীদের ফেরত পাঠানো শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় কূটনৈতিক পদক্ষেপের বদলে আমাদের উপদেষ্টারা মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কর্ম অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান জানাতে শুরু করেন।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, আর ইউরোপ-আমেরিকায় দক্ষ লোকদের কর্মসংস্থানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেননি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা। একজন দক্ষ কর্মী, যিনি ইউরোপ-আমেরিকায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন, তিনি সেসব দেশে অভিবাসনের চেষ্টা করেন। ফলে তিনি দেশে টাকা পাঠান কম। নিজের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন। কিন্তু যে শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করছেন, তিনি নিজে কোনো মতে টিকে থাকার অর্থ হাতে রেখে বাকি সব টাকাই দেশে পাঠান, পরিবার-পরিজনের কাছে। ফলে কর্মসংস্থানের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য আমাদের জন্য অনেক বেশি লাভজনক।

এক দিকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপপ্রচার, অপর দিকে সরকারের নির্লিপ্ততা ও নিষ্ক্রিয়তায় মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে ধস নেমে এসেছে। সেখানে এমনও ঘটেছে যে, পথের মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সরাসরি প্লেনে তুলে দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো সরকার ঘোষণা করেছে, কোনো নিয়োগকর্তা যদি একজন বাংলাদেশী শ্রমিককে বিদায় করে দেয়, তবে তাকে দু'জন ভিনদেশী কর্মী নিয়োগের অনুমতি দেয়া হবে। ফলে নিয়োগকারীরাও অত্যুৎসাহে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিদায় করে দিয়েছেন। কিন্তু এর কোনো পর্যায়েই কোনো রূপ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারেনি আমাদের সরকার। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এ খাতেও ধস নেমেছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এসব খাতে বিপর্যয়ের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরো কত খাত যে গোপনে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, সেটা আমরা খোঁজ পাইনি। তেমনি একটি খাত শিপিং এজেন্সি। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত একটি খবর দেখে কৌতূহলবশত খোঁজ নিতে গিয়ে আর এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়ল।

বাংলাদেশে চলাচলকারী বিদেশী জাহাজ কোম্পানিগুলো স্থানীয় এজেন্ট নিয়োগ করে থাকে। এই এজেন্টরা কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স থেকে শুরু করে জাহাজের নাবিক ও ক্রুদের দেখভাল করে থাকে। সে জন্য তারা বৈদেশিক মুদ্রায় নির্ধারিত হারে কমিশন পায়। সেভাবে প্রায় সাড়ে তিন কাস্টমস এজেন্টরা বছরে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা উপার্জন করে। আর এ কাজে নিয়োজিত আছেন লক্ষাধিক অভিজ্ঞ কর্মী।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এ খাতকেও গোপনে ধ্বংস করে দেয়ার একটি চক্রান্ত চলছে। দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে বাংলাদেশীরাও এ ধরনের ব্যবসা করে আসছেন। কিন্তু সম্প্রতি এ ব্যবসাও প্রচলিত বিধিবিধান ও নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার

www.pathagar.com

চক্রান্ত করা হয়েছে। কিন্তু গত অক্টোবরে সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন ফরাসি কোম্পানি 'সিএমএ সিজিএম বাংলাদেশ শিপিং লিমিটেডকে শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স দিয়েছিল চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস। এ রকম একটি লাইসেন্স পাওয়ার জন্য বাংলাদেশীদের যেখানে মাসের পর মাস ধরণা দিতে হয়, সেখানে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই অস্বাভাবিক দ্রুততায় বিদেশী এই প্রতিষ্ঠানটির লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। পরে বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড লাইসেন্সটি সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেয়।

কিন্তু কেমন করে, কারা, কী ধরনের তদবিরের মাধ্যমে চট্টগ্রাম কাস্টমস থেকে এই লাইসেন্স বের করে নিয়েছিল, সেটাও কম রহস্যময় নয়। ওই লাইসেন্সটি স্থগিত করার প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকার ফরাসি দূতাবাস। তারা বলেছেন, সরকারের এ ধরনের আচরণে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশের ২০০৫ সালের শিল্পনীতির ১৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

১. (ক) বাংলাদেশ শিল্পনীতি ২০০৫-এর অধ্যায় ১৪-এ বৈদেশিক বিনিয়োগের বিধান হলো সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত শিল্প, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বাংলাদেশের সকল শিল্পে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। (খ) শিল্পনীতির ২০০৫-এর অধ্যায় ৪-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস হলো উৎপাদন ও সেবা এ দু' ধরনের কর্মকাণ্ড শিল্প হিসেবে সংজ্ঞায়িত। (১) উৎপাদন শিল্পের সংজ্ঞা হলো প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন, পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের মেরামত, পুনঃসংস্কার সাধন ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয় কাজগুলো এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। (২) সেবা শিল্পের সংজ্ঞা হলো যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব কর্মসেবা এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সেবা শিল্পসেবা নয়। সুতরাং এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগের কোনো সুযোগ নেই।

এ ছাড়া বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭-এর ১৮ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ কিংবা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করতে পারবেন না, যার ফলে কোনো একটি কোম্পানির ওপর বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, সে নিয়ন্ত্রণ বন্ধ হয়ে যায়। এই আইনের ১৮ ধারা মোতাবেক বিদেশীদের এজেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপিত আছে। কাস্টমস আইন ১৯৬৯ অনুসারে 'এজেন্ট' অর্থ, লাইসেন্সকৃত কোনো ব্যক্তি এবং শিপিং এজেন্ট, ক্লিয়ারিং ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, কার্গো এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিধিমালা ১৯৮৬ অনুযায়ী এজেন্ট অর্থ হচ্ছে কাস্টম হাউস বা কাস্টম স্টেশনে কোনো যানবাহন প্রবেশ বা খালাস অথবা আমদানি, অথবা রফতানি অথবা ব্যাগেজ সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এজেন্ট।

www.pathagar.com

সে হিসেবে, বিদেশীদের এই খাতে বিনিয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই।

তা ছাড়া ক্লাস্টম এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা ১৯৮৬-এর ২৩টি ধারার কোথায়ও বিদেশীদের কাস্টমস্ এজেন্ট লাইসেন্স দেয়ার কোনো বিধান নেই। তা সত্ত্বেও কোন অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে এমন ঘটল?

বিদেশীদের কাস্টম এজেন্ট লাইসেন্স দিলে বৈদেশিক মুদ্রায় আয়কৃত ২ হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে চলে যাবে। আর এ ধরনের ব্যবসায় আর্থিক বিনিয়োগ অতি সাধারণ। কর্মদক্ষতাই এখানে বড় কথা। বিদেশীদের এ ব্যবসার অনুমতি দিলে তারা বিনা পুঁজিতেই নিয়ে যাবে ২ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। এসব কথা বিবেচনা করেই ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ বহু দেশে কাস্টমস্ এজেন্ট হিসেবে বিদেশীদের কাজ করতে দেয়া হয় না।

তা ছাড়া শিপিং এজেন্সির ক্ষেত্রে যদি বিদেশীদের অনুমোদন দেয়া হয়, তাহলে বিমান এজেন্ট থেকে বড় বড় সেক্টরেও সে সুযোগ দিতে হবে। ফলে এসব খাতে কর্মরত লাখ লাখ দক্ষ কর্মী রাতারাতি বেকার হয়ে পড়বেন এবং দেশ হারাবে আরো বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

বাংলাদেশে এ ধরনের এজেন্সি ব্যবসা বাংলাদেশীরাই করবেন, সে চিন্তা থেকেই কাস্টমস্ লাইসেন্সিং বিধিমালার ১১ ধারায় বিধান রাখা হয়েছে যে, কোনো লাইসেন্সধারীর মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীর নামে লাইসেন্স ইস্যু করা হবে। সে ক্ষেত্রে হঠাৎ করে এ ধরনের এজেন্সি ব্যবসা বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার অপচেষ্টা কারা করল, সেটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের এজেন্সি ব্যবসায় নিয়োজিত আছে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান। তাতে কর্মরত আছেন লাখ লাখ লোক। এই ব্যবসা বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তারা স্বদেশী কিংবা চীন-ভারত-শ্রীলঙ্কার লোকদের এখানে নিয়োগ দেবে। কর্মরত জনবল কমবে। বেকারত্ব বাড়বে। লাখ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরো একটি খাত মুখ থুবড়ে পড়বে। সে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা কল্পনাও করা যায় না।

এ আত্মঘাতী ঘটনাবলি সম্ভবত ঘটছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের অগোচরেই। আমরা তাদের অনুরোধ করি, তারা যেন অনুসন্ধান করে দেখেন, আর কোথায়ও গোপনে ঘটে গেছে কি না এমন বিপর্যয়। আর অবিলম্বে এই ষড়যন্ত্র রুখে দিন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাতগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা নিন।

১০.১১.২০০৮

www.pathagar.com

দুদক, থামলে ভালো লাগে

বাংলাদেশের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করার জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন তার মধ্যে একটি। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে ক্ষমতায় আসীন হওয়া বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে একেবারে প্রথম থেকেই। ক্ষমতার মদমত্ততায় কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা জোর করে একের পর এক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয়। তারা নির্বাচন কমিশন থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন পর্যন্ত প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তছনছ করে ফেলে। এসব প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরত ব্যক্তিরা শিক্ষা-দীক্ষায় মানে-মর্যাদায়, সামাজিক অবস্থানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের চেয়ে বহুগুণ উর্ধ্বে ছিলেন। এসব সম্মানিত ব্যক্তিকে তারা দায়িত্ব থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে শুরু করেন। আমরা তখনই সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম যে, এভাবে একের পর এক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দেয়ার পরিণাম ভালো হবে না। এসব পদক্ষেপ দেশে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করবে। সে সতর্ক বাণীতে কান দেয়নি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এখন প্রমাণিত হয়েছে, এসব সাংবিধানিক পদ থেকে অভিজ্ঞ, দক্ষ, সম্মানিত ব্যক্তিদের তাড়িয়ে যাদের বসানো হয়েছে, তারা অপরিণামদর্শী, বিবেকহীন ও আনাড়ি। এরা সঙ্কট মোচন তো করতে পারেইনি বরং সঙ্কট বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেছে। সে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ছিল নিষ্ঠুর ও জবরদস্তিমূলক। কমিশনের প্রধানসহ অন্য সদস্যদের জবরদস্তিমূলকভাবে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। তারপর আসীন করা হয় বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে। এই কমিশন প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এক দিনের জন্যও নিজেদের নিরপেক্ষ প্রমাণ করতে পারেনি। বরং তাদের বক্তব্যে বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাত নির্লজ্জভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তারা রাজনৈতিক দল ভাঙার সরকারি অপপ্রয়াসের সাথে হাত মিলিয়ে প্রমাণ করেছে, স্বাধীনভাবে কাজ করার কোনোরূপ যোগ্যতা তাদের নেই। বরং সরকারের নির্দেশ পালনেই তারা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ফলে বাংলাদেশে এত বিতর্ক কোনো নির্বাচন কমিশন নিয়ে ওঠেনি। বর্তমান নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমনকি নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করে বসেছেন

www.pathagar.com

প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নন। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তাদের এখতিয়ারের সীমারেখা মেনে চলেনি। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনসংক্রান্ত সব কাজের এখতিয়ার চলে যায় সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের হাতে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান নিজেই জানিয়ে দিলেন, নির্বাচন ১৮ ডিসেম্বরই অনুষ্ঠিত হবে। অথচ তার আগের দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন, ২৮ ডিসেম্বরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনী তফসিল পুনর্নির্ধারণ করতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু হোসেন জিল্লুরের ওই বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারেননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ২৯ ডিসেম্বর করার ঘোষণাটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার দিতে পেরেছেন। এ জন্য তাকে এই প্রথমবার একটা শাবাশি দিতেই হয়।

জবরদস্তিমূলক কায়দায় সরকার ভেঙে দিয়েছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এরপর তার চেয়ারম্যান হিসেবে সরকার নিয়োগ দিয়েছে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. সা'দত হুসেনকে। আমলা হিসেবে তার দক্ষতা যাই থাকুক না কেন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি এক লেজেগোবরে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। ২৭তম বিসিএস নিয়ে তিনি তুঘলকি কা করেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে তার কোনো নজির পাওয়া যাবে না। উপরন্তু যেসব দুর্নীতির মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ সিনিয়র মন্ত্রীরা পর্যন্ত জেল খেটেছেন, যেসব মামলায় অন্যতম প্রধান আসামি হওয়ার কথা ড. সা'দতের। কিন্তু তিনি ভাগ্যবান ও সম্ভবত ক্ষমতাধর ব্যক্তি। জেল তো তাকে খাটতে হয়ইনি, উপরন্তু পুরস্কার হিসেবে তাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের লাভজনক পদে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই পদে যোগদানের আগে তিনি পূর্ববর্তী প্রধান নির্বাচন কমিশনার সম্পর্কে নানা কটূক্তি করে তাকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিবেকবান মানুষ হলে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি মামলার দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ইতোমধ্যেই তিনি পদত্যাগ করতেন। কী ভালো মানুষ এই ড. সা'দত হুসেন!

গত দুই বছরে বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক পুনর্গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে এই দুদক রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে অভিযোগ এনে তাদের জেলে পুরে এবং তাড়া করতে শুরু করে 'পাগলা কুকুরের' মতো। দুদক'র নবচেয়ারম্যান সাফফান সাফফা চেয়ারম্যান সাবেক সেনাপ্রধান হাসান মশহুদ চৌধুরী ক্ষমতা হাতে পেয়ে ঘোষণা করেন যে, দুর্নীতিবাজ রাঘববোয়ালদেরই শুধু ধরা হবে না, বরং চুনোপুঁটিরাও রেহাই পাবে না। তারপর গোটা দেশের ওপর একেবারে হামলে পড়ে এই দুদক।

পৃথিবীতে দুর্নীতিমুক্ত কোনো সমাজ নেই। দুর্নীতি নির্মূল করা যায় না। নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই সামান্য ধারণাও দুর্নীতি দমন কমিশনের আছে বলে মনে হয়নি। কোথায়ও দুর্নীতির মাত্রা বা অঙ্ক কম, কোথায়ও বা বিশাল। আমাদের ছোট অর্থনীতির দেশ,

www.pathagar.com

এখানে দুর্নীতির মাত্রা কম। এখানকার আরদালি বা পুলিশ ১০-২০ টাকা ঘুষ খায়। কিন্তু বড় অর্থনীতির দেশে ঘুষ লেনদেন হয় হাজার হাজার কোটি টাকায়। দুর্নীতি দমনের নামে বাংলাদেশে যে কেয়ামত নিয়ে আসা হয়েছে, পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো এমন কাণ্ড ঘটেনি। কমিশন এমন একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছে যে, বিত্তবান মানে দুর্নীতিবাজ, যেন দুর্নীতি ছাড়া সৎ কোনো পথে টাকা উপার্জন একেবারেই অসম্ভব। ফলে, কার কোথায় টাকা আছে, কার বাড়ি-গাড়ি আছে, ব্যাংকে সঞ্চয় আছে, পাকড়াও করো সব বেটাকে। যেন বাংলাদেশকে ফকিরনীর দেশ বানানোর এক প্রাণান্ত অভিযান।

লোকে কেন দামি গাড়িতে চড়বে? আটকাও গাড়ি। লোকে কেন ভালো বাড়িতে থাকে, তালা ঝোলাও ও বাড়িতে। লোকের কেন শিল্পকারখানা থাকবে? নাও ব্যাটার সম্পদের হিসাব। মনে হলো, সব পদক্ষেপ নেয়া হলো, ইতর ঈর্ষাপরায়ণতা থেকে। আমার মার্সিডিজ গাড়ি নেই, আর একজনের থাকবে কেন। ক্ষমতা হাতে পেয়েছি। হঠাও সব।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একশ্রেণীর মিডিয়া মতলবি মদদ দিয়ে যেতে থাকল। তারা বিভিন্ন রাজনীতিক-ব্যবসায়ী-শিল্পপতির মনগড়া দুর্নীতির কাহিনী প্রচার করতে শুরু করল। আর সে সব কাহিনীকে ভিত্তি করে দুদক হানা দিতে শুরু করল। কোনো তথ্যপ্রমাণের তোয়াক্কা তারা করল না। আটক হলো যেমন হাজার কোটি টাকার মালিক। তেমনি রেহাই পেলো না লাখপতিও। ফলে দেশজুড়ে এক বিশাল আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো।

এই কাণ্ড জ্ঞানহীন অভিযানের শুরুতেই আমরা বলেছিলাম, এ ধরনের পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। আমরা বলেছিলাম, এই অভিযানে দেশের বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটবে। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হবে। কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে। কালো টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাবে। নতুন করে কেউ ছোটখাটো শিল্পকারখানা স্থাপনেও উদ্যোগী হবে না। এর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। গত দু' বছরে দেশে বিনিয়োগ হয়নি, নতুন কলকারখানা স্থাপিত হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা। বেকারত্ব বেড়েছে, দারিদ্র্য বেড়েছে। নতুন করে ১০ শতাংশেরও বেশি মানুষ চলে গেছে দারিদ্র্য সীমার নিচে।

তবে এ বিষয়ে একটা জিনিস লক্ষণীয়। তথাকথিত দুর্নীতি দমন অভিযানে দুদক রাজনীতি ও ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে যে রকম পদক্ষেপ নিয়েছে, আমলাদের বিরুদ্ধে সে রকম কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। রাজনীতিকদের ফাঁসানোর জন্য মামলার পর মামলা দিয়েছে দুদক। যেনতেন প্রকারে সাজানো এসব মামলায় উচ্চতর আদালত থেকে জামিন পেলে, মুক্তির দিন দুদক নতুন মামলা দিয়েছে, যা মামলায় জামিন পেলে নতুন মামলা যেন জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে দুদক। এসব ক্ষেত্রেও দুদক বুঝতে চায়নি যে, আমলাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজনীতিকদের পক্ষে দুর্নীতি করা অসম্ভব ব্যাপার।

www.pathagar.com

সে চিত্র দেখা গেল ট্রুথ কমিশনে। সরকার ট্রুথ কমিশন গঠন করেছিল, রাজনীতিকদের কাছ থেকে দুর্নীতির স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। আশা করেছিল এই কমিশনে এসে রাজনীতিকরা বলবেন, আমি অত টাকা দুর্নীতি করেছি। আমি পাকা চোর অতিশয়। না, ট্রুথ কমিশনে কোনো রাজনীতিক এসে বলেননি যে, তিনি চোর। ট্রুথ কমিশনে এ পর্যন্ত ৪৭৯ জন অনুকম্পা লাভের জন্য আবেদন করেছেন। তার মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের স্ত্রীই আছেন ৪১৩ জন। ৩৬৪ জন সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের স্ত্রী ৪১ জন। ২৯ জন ব্যবসায়ী ও ৩৫ জন অন্য পেশার মানুষ।

দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের এই বিশাল কাফেলা সাফফান সাফফা দুদক'র দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কেন? এরা সরকারকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা দিয়ে নিজেদের বাকি টাকা হালাল করে নিতে পারবে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, দুর্নীতি দমন দুদক'র উদ্দেশ্য নয়, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের হেয় প্রতিপন্ন করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প ধ্বংস করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দুদক'র মূল্য লক্ষ্য। তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। দেশে ক্যাপিটাল মেশিনারির আমদানি কমেছে। কিন্তু অন্যান্য পণ্য আমদানি বেড়েছে। ২০০৬ সালে মোট আদায় ছিল ১৭ বিলিয়ন ডলারের কিছু ওপরে। ২০০৮ সালে সে আমদানি দাঁড়িয়েছে ২৩ বিলিয়ন ডলারের ওপর। মাত্র দুই বছরে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের পণ্য বেশি আমদানি হয়েছে। তার অর্থ সরকার ও দুদক'র সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে বাংলাদেশে বিদেশীদের বাজারে পরিণত হতে যাচ্ছে।

তবে দুদক'র দায়ের করা খামখেয়ালি মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে মুক্ত হয়েছেন রাজনীতিবিদরা। কিন্তু দুদক রাজনীতিকদের দমনের মিশন সম্ভবত এখন পর্যন্ত বাদ দেয়নি। তারা শিক্ষাও নেয়নি তাদের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড থেকে। সে কারণে এখনো নতুন করে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেই যাচ্ছে।

কিন্তু কী নৈতিক শক্তি আছে দুদক চেয়ারম্যানের? তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছেন সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান। দুর্নীতির অভিযোগটি তো তিনি স্বীকারও করেছেন। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কোড ভঙ্গ করে তিনি বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরি করেছেন। তার নিজের বাড়িকে বৈধতা দেয়ার জন্য সেনাপ্রধান থাকা অবস্থায় জরিমানা দিয়ে অবৈধ স্থাপনা বৈধ করার ব্যবস্থা করেন তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তারপর অবৈধ বাড়িটি বৈধ করার জন্য তিনি নিজের করা আইনে আড়াই লাখ টাকা জরিমানাও দিয়েছেন। তা হলে কোন নৈতিক শক্তির বলে তিনি এখনো আঁকড়ে আছেন দুদক চেয়ারম্যানের পদ। কোন নৈতিক বলে তিনি একের পর এক দুর্নীতির মামলা দায়ের করে যাচ্ছেন রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে?

আবার এই হাসান মশহুদ চৌধূরী সেনাপ্রধান হিসেবে ট্রাস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালে ৩৫ কোটি টাকা পুঁজির ২৩ কোটি টাকাই লোপাট হয়ে যায়। ব্যাংক এখন বলছে, ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যাংক ওই টাকা লোকসান দিয়েছে। সে লোকসান অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে তিনি ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তার নেতৃত্বে পরিচালনার সময় ব্যাংক যে লোকসান দিয়েছে, তাতে রাষ্ট্রের ২৩ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগে সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা জেল খেটেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষতি করার দায়ে দুদক চেয়ারম্যান কেন বাইরে থাকবেন। তিনি কেমন করে এখন আঁকড়ে আছেন দুদক চেয়ারম্যানের পদ। আমরা তো মনে করি নৈতিকতার স্বার্থেই তার অবিলম্বে দুদক চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দেয়া উচিত।

কিন্তু সরকার বা দুদক'র কাছে এসব নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই। মূল্য যদি থাকত তাহলে সারা দেশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নামে কোটি কোটি লোককে পথে বসাতেন না। এক দিকে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণকারী একজনকে দুদক'র চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে পুরস্কৃত করবেন, অন্য দিকে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগে সেই স্থাপনা ভেঙে দেবেন, তা কেমন করে হয়। তবে অন্যদেরও জরিমানা দিয়ে বৈধ করে দেয়া হলো না কেন? সুতরাং বড় বড় কথা বলা, আর তথাকথিত দুর্নীতির মামলা জারি থেকে আমরা সরকার ও দুদককে বিরত থাকতে বলি।

আমরা বলতে চাই, এসব কাজ এখন আর আপনাদের মানায় না। ঢাকা শহরের অনেক ট্রাক-বাসের পেছনে লেখা দেখি, থামলে ভালো লাগে। আমরা সরকার ও দুদককে বলতে চাই, বন্ধ করুন এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করা। কারণ সে নৈতিক অবস্থান আর আপনাদের নেই। তাই, থামলে ভালো লাগে।

২৬.১১.২০০৮

www.pathagar.com

ছল-ছুতার তো অভাব হয় না

খুব সহজেই নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা। আশা ছিল, সরকার ও নির্বাচন কমিশন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, যাতে নির্বাচন থেকে বিরত রাখা যাবে চারদলীয় জোটকে। আর চারদলীয় জোট নির্বাচনে না এলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় রোখে কে। সেভাবেই যেন সাজানো-গোছানো হচ্ছিল সবকিছু। তাই শেখ হাসিনাও ঘোষণা করেছিলেন, নির্বাচন যথাসময়ে হতেই হবে। তাতে কোনো দল এলো, না এলো, সেটা বড় কথা নয়। এসব কথা বলার সময় শেখ হাসিনা মনে রাখেননি যে, ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচন ভ্ুল হয়ে গিয়েছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন জোট নির্বাচনে না আসায়।

আসন্ন নির্বাচন থেকে চারদলীয় জোটকে দূরে রাখা যাবে, এই আশায় বুক বেঁধেই আওয়ামী লীগ সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সফল শর্ত কবুল করেই নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেয়। এর মধ্যে যেসব বিষয় নির্বাচনে যাওয়ার অনুকূল ছিল না, সেগুলো হলো, জরুরি অবস্থা বহাল থাকা। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৯১ই ধারা বহাল থাকা আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র ১০ দিন পর উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠান। আওয়ামী লীগ অত্যন্ত মিনমিনে গলায় দায়সারাভাবে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিল। আর উপজেলা নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বলেছিল। এমনকি তখন এরা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯১ই ধারা বাতিলের দাবিও করেনি। সরকার তাদের এ দুই দাবির ব্যাপারে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য না করলেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল।

এ কথা সত্য, চারদলীয় জোট নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় না থাকলে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে শক্তিশালী দল। আওয়ামী লীগ দেখেছে, চারদলীয় জোট 'পরীক্ষামূলক' ১৩টি স্থানীয় সরকার নির্বাচন বর্জন করলে ১২টিতেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়লাভ করে এসেছেন। এটাই তো ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং সরকার যাই করুক, চারদলীয় জোট নির্বাচনের মাঠে না থাকলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত। তাই যেভাবেই হোক না কেন, চারদলীয় জোটকে নির্বাচনের বাইরে রাখতে হবে। সরকারের একটি মহলও সেভাবেই ছক সাজিয়েছিল।

www.pathagar.com

এ দিকে চারদলীয় জোট নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নেয়ার শর্ত হিসেবে চার দফা দাবি তুলে ধরেন। এই চার দফা দাবির মধ্যে ছিল, জরুরি অবস্থা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, উপজেলা নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে কমপক্ষে এক মাস পিছিয়ে দেয়া, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯১ ধারা বাতিল এবং হজযাত্রীদের ভোট নিশ্চিত করা।

তার এই দাবিগুলোর ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করলেও এ নিয়ে সরকার ইঁদুর-বিড়াল খেলতে শুরু করে। তখন বেগম খালেদা জিয়া দাবি পূরণের জন্য ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেন। এই দাবিগুলোর ব্যাপারে সরকারের উপদেষ্টারা নানামুখী দেন-দরবার শুরু করেন। সরকারের ভেতরকার আওয়ামী-বান্ধব লবিও তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়ার বেঁধে দেয়া সময়সীমার শেষ দিকে অনেক নাটকীয়তার পর সরকারের মুখপাত্র ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ঘোষণা করেন, ১৮ ডিসেম্বরই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে প্রাথমিকভাবে আওয়ামী লীগ প্রায় নিশ্চিত অবস্থায় পৌঁছে যে, চারদলীয় জোট নির্বাচনে আসছে না এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনে বিজয় ও সরকার গঠন অতি কাছে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জিতিয়ে দেয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ ১৭ নভেম্বর থেকে তাদের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করতে শুরু করে। আওয়ামী লীগ উপলব্ধিই করতে চায়নি যে, চারদলীয় জোটকে নির্বাচনের বাইরে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠান কতটুকু যৌক্তিক বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

এ দিকে বেঁধে দেয়া সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও চারদলীয় জোট তাদের দাবির ব্যাপারে অনড় অবস্থান নেয়। ফলে বেকায়দায় পড়ে সরকার। সরকারের ওপর দেশী-বিদেশী চাপ বাড়তে থাকে। এরা সব দলের অংশ নেয়ার ভিত্তিতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ওপর জোর দেন। এতে সরকার বাধ্য হয়েই চারদলীয় জোটের সাথে আবারো আলাপ-আলোচনা শুরু করে ২২ ও ২৩ নভেম্বর। আওয়ামী লীগ এই আলোচনায় সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে শুরু করে নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত চলছে।

শেষ পর্যন্ত ২৩ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল পুনর্নির্ধারণ করেছে। তাতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১১ দিন পিছিয়ে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২৪ দিন পর উপজেলা নির্বাচন ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। নির্বাচন কমিশন জানায়, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৯১ ধারার অপ্রয়োগ রোধে কমিশন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করবে। সেনাবাহিনী প্রধান জানান, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের জন্য তিনিও সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন। সরকার মুখপাত্র হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, নির্বাচনের আগে যৌক্তিক সময়ে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।

www.pathagar.com

সরকারের এ ঘোষণার পর জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে তথা আরপিও'র ৯১ ধারা বাতিলসাপেক্ষে চারদলীয় জোট নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বদলে যায় রাজনীতি ও নির্বাচনের দৃশ্যপট। একেবারেই ওয়াকওভারের পর্যায় থেকে আওয়ামী লীগের অবস্থান চলে আসে তুমুল প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে। ফলে আওয়ামী লীগ বলতে শুরু করে, নির্বাচনী তফসিল বারবার পেছানোর ফলে আওয়ামী লীগ বেকায়দায় পড়ে গেছে। কারণ, ইতোমধ্যে চারদলীয় জোট জেনে গেছে, কোন আসনে আওয়ামী জোটের প্রার্থী কে? ফলে চারদলীয় জোট প্রার্থী বাছাইয়ে যেতে চিন্তাভাবনা করে অগ্রসর হতে পেরেছেন।

আওয়ামী লীগ তখন নির্বাচনে যাওয়ার শর্ত হিসেবে তিন দফা দাবি ঘোষণা করে। এই তিন দফা দাবি হলো : ০১. নির্বাচনের আগে অবশ্যই অবশ্যই, অবশ্যই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হবে, ০২. ৯১ ধারা বাতিল করতে হবে এবং ০৩. উপজেলা নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে ঘোষণা করতে হবে।

যে দাবিগুলোকে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করে আসছিল, সে দাবিগুলো আওয়ামী লীগই আবার উত্থাপন করল কেনো? এটাও একটি বড় প্রশ্ন। চারদলীয় জোট ওই দাবিগুলো উত্থাপন করলে যদি নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে ওই দাবি উত্থাপন করে কি আওয়ামী লীগ এখন নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে? আবারো শেষ মুহূর্তে এরা অকারণে নির্বাচন বর্জন করে বসবে না তো?

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশ নেয়ার সব প্রস্তুতি তো আওয়ামী লীগ সম্পন্ন করেছিল। মনোনয়ন ফরম বিক্রি করেছিল। মনোনয়ন প্রার্থী সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। প্রার্থী বাছাই সম্পন্ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমাও দিয়েছিলেন। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় নেমে পড়েছিল আওয়ামী লীগ ও তার শরিকরা। সে নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ মহাজোট করেছিল। এখন যারা আওয়ামী লীগের সাথে আছেন, তখনো তারাই ছিলেন। চারদলীয় জোটও তেমনি আছে।

গত বছর ২ জানুয়ারি পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজ করছিল। দেশব্যাপী নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। কিন্তু মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর ৩ জানুয়ারি হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগ একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করে বসে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচনে যাবে না এবং এরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ঘোষণাও দেন।

সেই সাংবাদ সম্মেলনে মহাজোট নেত্রী যা বলেছিলেন, তা আবার একটু স্মরণ করা যেতে পারে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি। রিপোর্টে বলা হয় : আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহাজোটের পক্ষ থেকে আগামী ২২ জানুয়ারির পাতানো নির্বাচনে অংশ নেয়া

www.pathagar.com

না সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। নির্বাচনের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অবৈধভাবে প্রধান উপদেষ্টার পদ দখল করে ইয়াজউদ্দিন বৈধ ভোটার তালিকাবিহীন একটি নির্বাচন করতে চান। কিন্তু আমরা এ ধরনের নির্বাচনকে বৈধতা দিতে পারি না। সংবিধানের ৫৮(ঘ) অনুচ্ছেদে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথা বলা আছে। আর সেই ধরনের নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে জনগণকে সাথে নিয়েই আমরা নির্বাচনে যাবো।

রিপোর্টে বলা হয়, 'মহাজোট প্রার্থী (শেখ হাসিনা) বলেন, বর্তমান তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের আর ১৯ দিন বাকি। কিন্তু এখন পর্যন্ত সঠিক ও ক্রটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। শোনা যাচ্ছে, ৭ জানুয়ারির পর ভোটার তালিকা দেয়া হবে। অথচ ভোটার তালিকা বিধিমালা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে যাচাই-বাছাই করার জন্য ১৫ দিনের সময় দিয়ে জনসমক্ষে টানিয়ে দেয়ার বিধান রয়েছে। তাহলে ২২ জানুয়ারি নির্বাচন হলে ১৫ দিন সময় নিয়ে যাচাই বাছাই, পরবর্তীতে সংশোধন ও প্রকাশের সময় কোথায়? তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন তিন ধরনের ভোটার তালিকা সরবরাহ করছে। এতে নাম, পিতার নাম, ভোটার ক্রমিক নাম্বার কোনোটিরই মিল নেই। অনেক ক্ষেত্রে একই ক্রমিক নাম্বার ও হোল্ডিং নাম্বারের বিপরীতে ভোটারের নাম, বয়স ও পেশা সব তথ্যই ভিন্ন। ২০০০ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে অমন ভোটারদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। তালিকায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে অনেক ভোটারের নাম দিয়ে ব্যাপকহারে ভুয়া ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'

রিপোর্টে বলা হয়, 'শেখ হাসিনা এই মর্মে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে, নির্বাচনের দিন প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারের কাছে সেই ভোটার তালিকা দেয়া হবে, যা থেকে ইতোমধ্যেই মহাজোটের নেতা-কর্মী- সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করেই নতুন ভোট কেন্দ্র বাড়ানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চার-পাঁচ মাইল দূরে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে মহাজোটের পক্ষে ভোটাররা ভোট দিতে না পারেন।'

এই দীর্ঘ ক্লান্তিকর প্রসঙ্গ পাঠকদের সামনে তুলে ধরে বিরক্তি উৎপাদনের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু এই উদ্ধৃতি দেয়াই হয়েছে আওয়ামী লীগ নেত্রীর বক্তব্যের অসঙ্গতি তুলে ধরার জন্য। প্রথমত, তিনি বলেছেন, অবৈধভাবে প্রধান উপদেষ্টার পদ দখল করে ইয়াজউদ্দিন বৈধ ভোটার তালিকাবিহীন একটি নির্বাচন করতে চান। এই বক্তব্য সত্য নয়। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, প্রধান উপদেষ্টার পদে যখন আওয়ামী লীগ কাউকেই মানছিল না, তখন আলোচনার শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও বিএনপি'র তৎকালীন মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার কাছে সংবিধানের শেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, উভয় দল রাজি থাকলে তিনি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন। তাতে উভয়ে সম্মত হলে

www.pathagar.com

তিনি ওই দায়িত্ব নেন সংবিধানের ধারা অনুযায়ী। তখন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, দেখা যাক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেন কি না।

নির্বাচন বর্জনের জন্য শেখ হাসিনা ভোটার তালিকার কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। ভোটার তালিকা প্রকাশ্যে টানানো, যাচাই-বাছাইয়ের পর সংশোধনের বিধিমালা মানা হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন। এবারো ভোটার তালিকা প্রকাশ্যে টানানো হয়নি। যাচাই-বাছাই করা হয়নি। তাহলে এবারো কি প্রয়োজনে একই যুক্তিতে নির্বাচন বর্জনের দিকে যাবে আওয়ামী লীগ?

শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছিলেন যে, নির্বাচন কমিশন তিন ধরনের ভোটার তালিকা তৈরি করেছে। তার একটিতে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের নাম নেই। ভোটের দিন সেই তালিকা ধরিয়ে দেয়া হবে রিটার্নিং অফিসারদের হাতে। ফলে তার দলের সমর্থক ও সংখ্যালঘুরা ভোট দিতে পারবে না। এ অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ হাওয়াই ও ভিত্তিহীন। এবারো নির্বাচনে জয়ের নিশ্চয়তা না পেলে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ আনবে না তো?

তিনি অভিযোগ করেছিলেন, নতুন যেসব ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, তা ভোটারদের বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহাজোটের সমর্থকরা যাতে অতদূরে গিয়ে ভোট দিতে না পারেন। এ অভিযোগও ছিল হাস্যকর। কারণ, ভোট কেন্দ্র দূরে হলে মহাজোটের ভোটারদের জন্য যেমন অসুবিধা, তেমনি চারদলীয় জোটের ভোটারদের জন্যও অসুবিধা হওয়ার কথা। কিন্তু শেখ হাসিনা বললেন, মহাজোটের ভোটারদের অসুবিধার সৃষ্টির জন্যই এটা করা হয়েছে।

এই খোঁড়া, অগ্রহণযোগ্য যুক্তিতে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করেছিল আওয়ামী লীগ। এবারো আগ থেকেই বলতে শুরু করেছে, একটি জোটের প্রতি পক্ষপাত করা হচ্ছে। সূক্ষ্ম কারচুপি করার চেষ্টা হচ্ছে, নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্দেহ নেই, দেশে এখন একটা নির্বাচনমুখী জোয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হলে তা আরো বেগবান হবে। তাই সব মহল থেকেই দরকার সতর্ক পদক্ষেপ, যাতে উটকো ধুয়া তুলে এবারের নির্বাচনও কেউ বানচাল করে দিতে না পারে। কারণ, দুষ্ট লোকের ছলের অভাব হয় না।

০৩.১২.২০০৮

www.pathagar.com

মিডিয়ায় নির্বাচনী অপপ্রচার

চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে সমন্বিত অপপ্রচার আবারো জোরদার করে তুলেছে এক শ্রেণীর মতলবি মিডিয়া। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় আনার দাবিদার এসব পত্রিকায় এমনি প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল এক-এগারোর আগে ও পরে। জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপি ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এসব মিডিয়া ধারাবাহিকভাবে নানা ধরনের কল্পকাহিনী ছাপিয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। আবার এক-এগারো'র পরবর্তী সময়ে জোটের নেতাকর্মীদের গ্রেফতারে সরকারকে প্রলুব্ধ করতে এরা নানা ধরনের কল্পকাহিনী প্রচার করতে থাকে। সরকারও পত্র-পত্রিকার বিনা প্রমাণের ওসব রিপোর্টের ভিত্তিতে সোৎসাহে জোটের নেতাকর্মীদের ঢালাওভাবে আটকাভিযান শুরু করে দিয়েছিল।

সরকারের এসব কর্মকাণ্ড যে কতটা অপরিণামদর্শী, অবিবেচনাপ্রসূত ও বিদ্বেষপূর্ণ ছিল, তা এখন প্রমাণিত হয়েছে। সরকারের ওই সব ঠুনকো অভিযোগের প্রায় কোনোটাই আদালতে টিকছে না। সরকার তিলকে তাল করেছিল বলেই আদালতের বিবেচনায় সেগুলো গুরুত্ব পায়নি। মাঝখানে এই সরকারের দুই বছরের শাসনকালে দেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

নমুনা হিসেবে টেনে নিলাম ১৬ ডিসেম্বরের একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় দু'টি সংবাদ। '৫৩৩ অসহায় মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বন্ধ করে দেয় জোট সরকার।' 'নির্বাচন ২০০১ ফলাফলে অসঙ্গতি। ২৫৩৪ কেন্দ্রে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট দেখানো হয়েছিল।' শেষ পৃষ্ঠায় প্রধান তিনটি খবরের শিরোনাম : 'রাজধানীর ১৫ আসন। এরশাদের বিরুদ্ধে ১৩টি, হান্নান শাহের ৯টি ও পিন্টুর বিরুদ্ধে আছে ১০ মামলা।' 'নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের আশঙ্কা ভোলার সংখ্যালঘুদের।' 'মুক্তিযোদ্ধাদের চক্ষুশিবিরের আয়োজক জামায়াত প্রার্থীর অর্থের যোগানদাতা।'

এর প্রতিটি সংবাদের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতার বিশ্লেষণ একটু পরে করব। এর আগে শিরোনামগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, চারদলীয় জোটের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির কী প্রাণান্ত প্রয়াসই না চালিয়েছে পত্রিকাটি। প্রথম শিরোনাম থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, চারদলীয় জোট কী সাংঘাতিক মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাবিরোধী। তারা অসহায়

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় শিরোনামটি থেকে বোঝা যায়, ২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোট যে জয় লাভ করেছিল, তা করেছিল ব্যাপক জালভোট দিয়ে আর নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে। শেষ পৃষ্ঠার প্রথম শিরোনাম থেকে বোঝা গেল, ঢাকার আসনগুলোতে বিএনপি প্রার্থীরা কত বড় ক্রিমিনাল যে, তাদের বিরুদ্ধে ৯টি-১০টি করে মামলা হয়েছে। দ্বিতীয় শিরোনামটিতে ভোলার দু'টি আসনে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের আশঙ্কা করা হয়েছে। কারণ, ওই দু'টি আসনেই গত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। শেষ শিরোনামটিতে বলা হয়েছে, জামায়াত প্রার্থীর অর্থের জোগানদাতা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চক্ষুশিবিরের আয়োজন কেন করবে। অর্থাৎ তারা চান প্রয়োজনে অন্ধ হয়ে যাবেন দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন যে মুক্তিযোদ্ধা। এসব সংবাদের একটাই লক্ষ্য, তা হলো, আসন্ন নির্বাচনে চারদলীয় জোট প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

এবার সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। প্রথম সংবাদটি হলো, '৫৩৩ অসহায় মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বন্ধ করে দেয় জোট সরকার।' তাতে মাদারীপুর জেলার পশ্চিম মাঠ গ্রামের 'অসহায় মুক্তিযোদ্ধা' মোক্তার হোসেনের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি ২০০০ সালের ১ জুলাই থেকে মাসে ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেতে শুরু করেন। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২০০২ সালের ৩০ জুলাই থেকে কোনো কারণ ছাড়াই তার ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু মোক্তার হোসেন নয়, জোট সরকার এ রকম আরো ১ হাজার ৬৩ জনের ভাতা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় বলে পত্রিকাটি অনুসন্ধানে নাকি জানতে পেরেছে। ভাতাবঞ্চিতদের ৫৩৩ জন তাদের ভাতা বহালের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে ১৬৭ জনকে ভাতা প্রদানের পক্ষে রায় দেয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরকার আপিল করে। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখার নির্দেশ দেন ২০০৮ সালের ২৩ মার্চ। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তারা ভাতা পাননি।

পত্রিকাটি অনুসন্ধানে জানতে পেরেছে ১ হাজার ৬৩ জনের ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে জোট সরকার। কিন্তু জানতে পারেনি এর কারণ। অসহায় মুক্তিযোদ্ধারা ভাতা পেয়ে আসছেন অনেক আগে থেকেই। এঁরা কেন ২০০০ সাল থেকে ভাতা পেতে শুরু করলেন? তার আগে কেন তাদের এই ভাতা দেয়া হয়নি? কারণটা যদি বের করা না যায়, তাহলে দোষারোপ করা যাবে কিভাবে? প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বন্ধ হলে সেটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। সে জন্যই পত্রিকাটির উচিত ছিল অনুসন্ধান করে কারণটা খুঁজে বের করা। যেহেতু জোটের বিরুদ্ধাচার করতে হবে, তাই কারণ অনসন্ধানে মনোযোগ দেয়ার সময় পায়নি পত্রিকাটি। তা ছাড়া যে ১৬৭ জন আপিল বিভাগের রায়ে মার্চে ভাতার আদেশ পেয়েছেন, ওই পত্রিকাটির ডেকে আনা সরকার কেন নয় মাসেও সে রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলো না, সেটা কেন জানতে চাইলেন না তারা?

২০০১ সালের নির্বাচনে ২৫৩৪ কেন্দ্রে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছে পত্রিকাটি। তার আগের দিনও পত্রিকাটির প্রধান সংবাদ

www.pathagar.com

শিরোনাম ছিল 'গত নির্বাচনে (২০০১) ৫২ আসনের ১১১ কেন্দ্রে দ্বিগুণ ভোট!' এসব রিপোর্টে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে, জোটের সমর্থকরাই জাল ভোট দিয়ে ও কারচুপি করে নির্বাচনে জয় লাভ করেছিল। পত্রিকাটির এই রিপোর্ট কতটা মতলবি ও কতটা সারবত্তাহীন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল দৈনিক আমার দেশ-এ ১৭ ডিসেম্বর ও ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত দু'টি প্রতিবেদন থেকে।

নির্বাচন কমিশনের গেজেট নির্বাচন বিষয়ে একমাত্র প্রামাণ্য দলিল। সে গেজেটে প্রথম আলোর রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। প্রথম আলো লিখেছে, দ্বিগুণ ভোট পড়েছিল জয়পুরহাট-১ আসনের ধরঞ্জি হাইস্কুল কেন্দ্রে। প্রথম আলোর হিসাব মতে, ওই কেন্দ্রে ১২২৯ ভোটারের বিপরীতে ভোট পড়েছিল ২৫১০টি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের গেজেটে আছে, ওই কেন্দ্রে ভোটার ছিল ২৮৮৯ জন। প্রথম আলোর রিপোর্টে বলা হয়েছে, দিনাজপুর-৫ আসনে রাজবাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৯৯৪ ভোটের বিপরীত ভোট পড়েছিল ২৫৯৫টি। নির্বাচন কমিশনের গেজেটে আছে, ওই কেন্দ্রে ভোটার ছিল ২৯৯৪ জন। প্রথম আলো লিখেছে, রাজশাহী-২ আসনের রায়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২১২৪ ভোটারের বিপরীতে ভোট পড়েছিল ২৭১০টি। নির্বাচন কমিশনের গেজেটে আছে, ওই কেন্দ্রে ভোটার ছিল ৩১২৪ জন। এমনি অসঙ্গতিতে ভরা প্রথম আলোর রিপোর্ট। কিন্তু রিপোর্টটি করার আগে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রকৃত অবস্থা আড়ালেই রেখে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোনো কেন্দ্রে যত ভোটার থাকে, ঠিক ততটা ব্যালটই পাঠানো হয়। ফলে নির্বাচনে যত অনিয়মই হোক না কেন, ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট পড়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।

তা সত্ত্বেও এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য নির্বাচনে জাল ভোট ও কারচুপি করার কথাটা জোটের বিরুদ্ধে আগেভাগেই তুলে রাখা, যাতে প্রয়োজনে সে অস্ত্রটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এ দেশের মানুষ অতটা অন্ধ নয়। কিংবা মাঠে 'প্রথম আলো' একা নয়। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার মিডিয়াও এখন অনুপস্থিত নেই।

রাজধানীর ১৫টি আসনে কার বিরুদ্ধে কতটি মামলা আছে, তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছে প্রথম আলো। কার বিরুদ্ধে কী মামলা সে কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। প্রথম আলোর সম্পাদক-প্রকাশকের বিরুদ্ধেও মামলা আছে। তাহলে কি আমরা তাকে ক্রিমিনাল বলতে পারি না? আর বর্তমান সরকারের আমলে যেসব মামলা হয়েছে, সেগুলো যে হয়রানিমূলক, সেটা তো এখন প্রমাণিত সত্য। জেলগেটে বিএনপি নেতা হান্নান শাহকে গ্রেফতারের সময় মামলা হয় যে, তিনি জরুরি বিধি ভঙ্গ করেছেন। এ মামলার কী সারবত্তা আছে? আর মামলা থাকলেও অপরাধী বলে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায় না, যতক্ষণ না আদালত তাকে দোষী বলে রায় দেয়। আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধেও মামলা আছে। সে মামলা শিরোনামে আসেনি। ভেতরে উল্লেখ আছে, সে মামলাগুলো হয়েছিল জোট সরকারের আমলে। বিএনপি প্রার্থীদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

মামলাগুলো কবে করা হয়েছে, রিপোর্টে সেটা উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকেই মতলবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের আশঙ্কা ভোলার সংখ্যালঘুদের। এটাও এক মতলবি প্রচারণা। জোট সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কল্পকাহিনী আমরা অনেক শুনেছি। এবারো আগেভাগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখা হচ্ছে, যাতে জনগণ চারদলীয় জোটকে সরকার গঠনে নির্বাচিত করলে একই কায়দায় আবার তাদের সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালানো যায়।

মুক্তিযোদ্ধাদের চক্ষুশিবিরের আয়োজক জামায়াত প্রার্থীর অর্থের জোগানদাতা। এটাও এক সাংঘাতিক খবর? বিনামূল্যে মুক্তিযোদ্ধাদের চোখের ছানি অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজশাহী ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। চক্ষুশিবির পরিচালনার সাথে 'জড়িত' আছেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জাহাঙ্গীর। তিনি নাকি রাজশাহী-৩ আসনে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনে ৫০ হাজার টাকা জোগান দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এখন উপায়? এক দিকে তিনি জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনে টাকা দেবেন, অপর দিকে বিনামূল্যে মুক্তিযোদ্ধাদের চোখের ছানি অপারেশন করবেন, তা তো হতে পারে না। একে এক বিরাট বৈপরীত্য হিসেবে দেখেছে পত্রিকাটি। অথচ ঢাকায় যারা জামায়াত সমর্থক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, তাদের চেম্বারে অনেক ঘাদানিক সমর্থককে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে কট্টর আওয়ামীপন্থী ডাক্তারের কাছ থেকে হৃদরোগের চিকিৎসার পরামর্শ নিই। তিনি আমার চিকিৎসা আলোচনার সময় আমার লেখার ও বলার তীব্র সমালোচনা করেন। চিকিৎসার সাথে রাজনৈতিক বিশ্বাসের কী সম্পর্ক, তা বুঝতে পারলাম। আসলে এ সংবাদটি প্রকাশেরও উদ্দেশ্য হলো, জনমনে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে চারদলীয় জোট সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা।

প্রায় প্রতিদিনই এখন চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর মিডিয়া এমন বিদ্বিষ্ট প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এসব অপপ্রচারের মাধ্যমে খুব কমই ফায়দা হাসিল করা সম্ভব হয়। এ ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে এর আগে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রচার সংখ্যার শীর্ষ থেকে পাতালে পড়েছে, জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এখন সেখানে আট-নয় মাসের বেতন বাকি। চারদলীয় জোটকে এই মিডিয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে এবং জনগণকেও সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে জনগণ এই সন্ত্রাসীদের প্রত্যাখ্যান করে।

২২.১২.২০০৮

www.pathagar.com